

বাংলার ছোটগল্প



# বাংলার ছোটগল্প

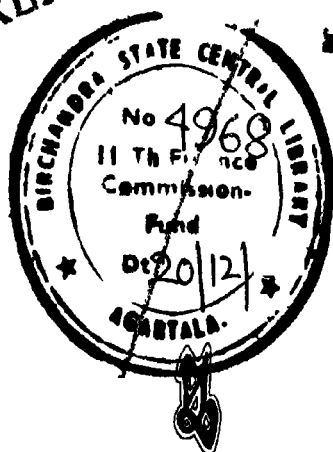
দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পাদনা

ড. বিজিত ঘোষ

S.L-6808.  
REFERENCE

RETROJAN/21/21  
B. C. S. C. L.



স্বরূপ

৯এ নবীন কুণ্ড গেন

কলকাতা ৭০০ ০০৯

BCSC Public Library  
11th Fl. Coll. No. 4968  
11th Fl. Com. M.R. No. 14931

BANGLAR CHHOTO GALPA  
Collection of Bengali Short Stories  
2nd Volume  
Edited by  
Dr Bijit Ghosh

Price Rs 100/-

প্রচ্ছদ : সুনীল শীল

ISBN 81 7332 374 3

দাম : ১০০ টাকা

পুনশ্চ, ১১৪ এন ডাঃ এস. সি. ব্যানার্জী রোড, কলকাতা - ৭০০০১০ থেকে  
সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং ডটলাইন প্রিন্ট আ্যান্ড প্রসেস ১১৪ এন  
ডাঃ এস. সি. ব্যানার্জী রোড, কলকাতা-৭০০ ০১০ থেকে মুদ্রিত।



‘যারে নিজে তুমি ভাসিয়েছিলে দুঃখ ধারার ভরা স্রোতে  
তারে ডাক দিলে আজ কোন্ খেয়ালে  
আবার তোমার ও পার হতে।।  
শ্রাবণ – রাতে বাদল-ধাবে উদাস কবে কাঁদাও যাবে  
আবার তাবে ফিরিয়ে আনো ফুল-ফোটানো ফাগুন বাতে।।’

শ্রদ্ধেয় স্যার (অধ্যাপক মিহির দেব বর্মণ)-কে



## প্রাসঙ্গিক কয়েকটি কথা : দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড শুরু করেছি সেকালের বিশিষ্ট কথাক্ষিপ্তী অনুরূপা দেবীর অসম্ভব জনপ্রিয় 'মা' গল্পটি দিয়ে। বর্তমান খণ্ডটি শেষ করেছি ছোটগল্পের ইতিহাসেব ধারায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রূপকার বনফুল (ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়)-কে দিয়ে।

এই খণ্ডের কালজয়ী গল্পকারগণ অসংখ্য অসাধারণ গল্প লিখেছেন। এঁদের কেবলমাত্র একটি করে গল্প গ্রহণ করে তৃপ্ত থাকা যায় না। আর তা যায় নি বলেই এখানে গৃহীত একটি করে সেরা গল্পের পাশাপাশি মনে পড়ে যাচ্ছে এঁদের আরো একাধিক শ্রেষ্ঠ গল্পের কথাও।

যেমন, অনুরূপা দেবীর 'কনে দেখা', 'ভুলভাঙা', 'পরাজয়', 'আংটি'; উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কিস্তিমাত'; নিরুপমা দেবীর 'স্নেহের সার্জারী', 'পলায়ন' 'প্রত্যাখ্যান', 'শৈফালিকা', নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের 'পাঁকের ফুল নষ্টার্নাধি', 'বিশ্বনাথ', সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'শান্তি', 'পূর্বস্বা ভাগ্যম', 'ডিটেকটিভের গল্প', 'ঠাকুরঝি', জগদীশ গুপ্তের 'ভারতবর্ষের অভদ্রতা', 'শক্তি অভয়া', 'তুষিত আত্মা', হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'খানিকটা আমার তার', 'শিউলি', 'কুসুম'; মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ফিরে ফিরতি', 'মুক্তি', 'প্রেমাক্ষুব ভ্রাতারীর 'আদরিণী', 'বাণ', 'বড়দা', 'আয়ি', গিবিবালা দেবীর 'নির্বন্ধ', শান্তা দেবীর 'রূপকথা', 'পিতৃদায়', 'পথবাসিনী', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুইমাচা', 'অভিশপ্ত' 'বরযাত্রী', 'কিম্বদন্ত' ... .. গল্পগুলি তো অ-সাধারণ।

গোকুল নাগের 'বাবাপাতা', ববীন্দ্রনাথ মৈত্রের 'লাউডগা', 'উদাসীর মাঠ', 'কানভাসার', 'লিপিবর্তনী', 'জলপানি', বমেশচন্দ্র সেনের 'বালির বাঁধ', 'যৈবন', ভবানী সিংহের 'ফিশারী', শৈলবালা ঘোষজায়াব 'সূক্ষ্ম ধর্মজ্ঞান', ধৃজটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'একদা তুমি প্রিয়ে', সীতা দেবীর 'পূজাব তত্ত্ব', 'স্মৃতিরক্ষা', 'নিবেট গুকের কাহিনী', 'আত্মা', বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'শেষ লেখা', 'বীরুর প্রশ্ন', 'স্বাধীনতা ডিনার', 'ফীট অফ প্রিন্সেপেটাব', 'গল্পী' প্রভৃতি গল্পগুলিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আবাব মণীন্দ্রলাল বসুর 'অলকা', পবিত্র গোস্বামীর 'কৃষ্ণধর্মব চাল', 'ভাঙন', 'পরিচয়', 'হত্যা', 'তারিণী মাস্টার', 'সিনেমা নায়কের আত্মকথা' গল্পগুলি সমকালে বিশেষ খ্যাতি পেয়েছিল।

তারাক্ষব বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অগ্রদানী', 'তারিণীমাঝি', 'ভলসাঘর', 'কালাপাহাড়', 'রসকলি', 'বোবাকান্না', 'না', 'তমসা', 'ইস্কাপন', 'শেষ কথা' প্রভৃতি কালোত্তীর্ণ অসামান্য সৃষ্টি। আর, বনফুলের 'নিমগাছ', 'চান্দ্রায়ণ', 'সুলেখাব কান্না', 'ছোটলোক', 'বিধাতা ও ভ্রূত দেবতা', 'শ্রীপতি সামন্ত'-র মতো অসাধারণ সব গল্পকেও বাদ দিতেই হয়েছে, যেহেতু পরিসরের কথা ভেবে একজনের একের অধিক গল্প গ্রহণ কবা কোনোমতেই সম্ভব হয়নি।

তবে যা গ্রহণ করেছি সেগুলির প্রতিটিই এক একটা হীরক-খণ্ডের মতো দ্যুতিময়। এই খণ্ডে মোট গল্পের সংখ্যা ৩৯। সময়সীমা ১৮৮১ থেকে ১৮৯৯।

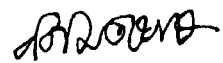
পুনশ্চ : বিশেষ উৎসাহী/আগ্রহী সহৃদয় পাঠকদের জ্ঞাতার্থে কয়েকটি কথা। দশ খণ্ডের 'বাংলার ছোটগল্প' গ্রন্থের কেবলমাত্র প্রথম খণ্ডেই রয়েছে বাইশ পৃষ্ঠার একটি তথ্যসমৃদ্ধ দীর্ঘ ভূমিকা। সেখানে আছে বাংলা গদ্যের সূচনা, গদ্যগ্রন্থ, গদ্য-সাহিত্য, আদি-গল্প, গল্প, ছোটগল্পের আবির্ভাব ; তার জন্ম ও উৎস সম্বন্ধ, সংজ্ঞা ইত্যাদি বিষয়ে উপব দীর্ঘ আলোচনা। আছে অসংখ্য ছোটগল্প সৃষ্টির অনিবার্য প্রেরণা হিসেবে অপরিহার্য পটভূমি সমূহের (ভারতবর্ষের বহু বিচিত্র সামাজিক পরিস্থিতি, নানা ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-সংঘাত-সংঘর্ষ, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের নানাবিধ সমস্যা, সংকট ইত্যাদি) তথ্য ও প্রমাণ সহযোগে বিস্তৃত বিশ্লেষণ।

বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামল্লভূরে ভেঙে পড়া বাংলার সমাজ-অর্থনীতি, দেশভাগ, খণ্ডিত-স্বাধীনতা-প্রাপ্তি, উদ্ধাস্ত শ্রোত, সেই মহা-প্রলয়ের সময়ের জীবন্ত ছবিও (এক-একটি কালজয়ী গল্পের সঙ্গে যে পটভূমির অঙ্গাঙ্গী যোগ) প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় আমি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

আগস্ট আন্দোলন, ১৯৪৬-এর ভাড়াঘাতী দাঙ্গা তথা 'গ্রেট ক্যালকাতা কিলিং' আর ঠিক তার পরই তেভাগা আন্দোলন; পরবর্তীকালে 'নকশাল আন্দোলন', 'জরুরী অবস্থা', বার বার বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির উত্থান, — এ-সব কিছুই বাংলার গল্পকে দিয়েছে নতুন প্রাণ। তারও অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ সেখানে করেছি আমি।

আবার বিভিন্ন সাহিত্য-আন্দোলন ('কম্বোজ', 'শ্রুতি', 'হাফরি জেনারেশন', 'শান্ত্রিবিরোধী সাহিত্য আন্দোলন', 'এই দশক', 'নিম্ন সাহিত্য-আন্দোলন', 'নতুন রীতির গল্প আন্দোলন' ইত্যাদি); লেখক-পাঠক-সম্পাদক-প্রকাশকের ছোটগল্প ব্যাপারে দায়িত্বহীনতা ও দায়িত্বের কথা; সর্বোপরি পাঠকের কাছে সে-কাল ও এ-কালের ছোটগল্পের প্রতি আকর্ষণ-বিকর্ষণের সম্ভাব্য কারণগুলিও বিশ্লেষিত হয়েছে সেই ভূমিকায়।

তাই, উৎসুক শ্রদ্ধেয় পাঠক সেটি একবার দেখে/পড়ে নিলে সম্পাদকের শ্রমের ভার কিছুটা লাঘব হবে।



(ড বিজিত ঘোষ)

## সূচীপত্র

অনুরূপা দেবী	মা	১১
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	প্রমাণ	১৭
বিভূতিভূষণ ভট্ট	দ্বিদল কমল	২৭
নিরুপমা দেবী	আলোষা	৩০
উর্মিলা দেবী	লতা	৫৩
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	নির্বাসিত	৬৬
নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত	ঠানদাঁদি	৭৮
সৌবীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	নামৈব কেবলম্	৯০
ভগদাশ গুপ্ত	পয়োমুখম্	৯৫
মাধুরীলতা	চোর	১০৮
সুকুমার রায়	ব্যা	১১৩
কিরণধন চট্টোপাধ্যায়	লাভার	১১৫
দাঁশেরঞ্জন দাশ	পার্বতী	১১৯
হেমেন্দ্রকুমার রায়	নিতান্ত হাল্কা মামলা	১২৭
সবসীবালা বসু	উচ্ছৃঙ্খল	১৪০
মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	সাগরের মায়া	১৫০
নরেন্দ্র দেব	অপবাদ	১৫৮
প্রমোদ্রর আতথী	গরীব	১৭৬
গিবিবালা দেবী	আকাশ-প্রদীপ	১৮৫
হেমেন্দ্রলাল রায়	পথের ধুলোয়	১৯০
জ্যোতির্ময়ী দেবী	একটা প্রকাণ্ড 'হাঁ'	১৯৬
শান্তা দেবী	সিঁথির সিঁদুর	২০৬
পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়	মুকুব	২১৬
বিজয়রত্ন মজুমদার	পরিবর্ত	২২৪
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	মেঘমল্লার	২৩৪
গোকুলচন্দ্র নাগ	শিশির	২৪৯
রবীন্দ্রনাথ মৈত্র	টারার	২৫১
রমেশচন্দ্র সেন	সাদা ঘোড়া	২৬২
শৈলবালা ঘোষজায়া	কপূরের মালা	২৬৭
ধৃজটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	নিমন্ত্রণ-রক্ষা	২৭৬
সীতা দেবী	মুক্তির মূল্য	২৮৫

খগেন্দ্ৰনাথ মিত্ৰ	যীৰ্ছদী	২৯৯
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	পটুবাণী	৩০৩
প্ৰভাবতী দেৱা সবস্বতী	গাঁয়েৰ ডাক্তাৰ	৩১৬
নগীন্দ্ৰলাল বসু	মাহেৰ দিন	৩২৬
পৰিমল গোস্বামী	শেখেৰ হিসাব	৩৩৬
অপৰ্ণা দেৱী	বিমাতা	৩৩৯
তাবাশঙ্কৰ বন্দোপাধ্যায়	ডাঙনী	৩৪৪
বনফুল	অদ্বিতীয়া	৩৫৬

মা

অনুরূপা দেবী

॥ ১ ॥

মিসেস ম্যাকোহন তাহার একমাত্র সন্তানটিকে জন্ম দিয়া যখনই রোগশয্যা গ্রহণ করিলেন, তখন হইতেই তাহার পিতৃস্নেহবর্ধিত শিশুটির ভবিষ্যৎ চিন্তায় তাহার দৃষ্টিতাপীড়িত চিত্ত ভাবনাব ঘনতালে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।

গুলজান শিশুর ধাত্রী। সে তাহার উল্কিবর্ণিত শ্যামল অনাবৃত বাহুর উপরে তাঁহার গুত্র মল্লিকা ফুলের মত সুন্দর শিশুটিকে দেলাইয়া ঘুমপাড়ানি ছড়া বলিতে বলিতে সম্মুখে বারান্দায় পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছিল।

“না বাজা কা পলটন না রাজাকা ঘোড়া,—

মূলকমে বাবুয়াকা কোই নেই জোড়া।

আগে যায় রোসনাইয়া, পিছে যায় হাতী,

মেরি গদিপব চলে বাবুয়া, মাথে লাল ছাতি।”

মিসেস ম্যাকোহন জীবন্ত ললাটে উত্তপ্ত হস্ত ঘর্ষণ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। কত সাধের ধন তাহার— তিনি তাহাকে একটি দিনের জন্যও অমূল্য কবিতা কোলে লইয়া আদর করিতে পারিলেন না। এ দুঃখ যে মরিলেও যাইবে না।

শিশু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, গুলজান তাহাকে তাহার দেলার বিছনায় শোয়াইয়া সাবধানে নেটের ছোট মসাবিটি তাহার উপরে টানিয়া দিয়া রোগীর গৃহে প্রবেশ করিল।

মিসেস ম্যাকোহন তাহার বিবাহিত তিনটি বৎসব এই বিদেশী সঙ্গিনী গুলজানের সেবা যত্ন ও আন্তরিক হৃদাত্ম্য তাহার সহিত প্রভুভূতা সম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়া তাহাকে যেন তাঁহার এ সংসারের একমাত্র সহায়রূপেই দেখিতেছিলেন। রোগ যতই বৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হইতেছিল বিদায়ের কাল নিকটতর হইতেছে বুঝিতে পারিয়া স্বামীপ্রেমে বঞ্চিতা দুর্ভাগিনী তাহার হতভাগা সন্তানের জন্য ইহাকেই তত নির্ভর করিয়া ধরিতেছিলেন। ছেলেটি যেন গুলজানের প্রাণ। তাহার বয়সী তাহার নিজের ছেলে ইয়াসিনের চেয়েও সে যেন তাহাকেই অধিকতর ভালবাসে।

গুলজান ভূমে বসিয়া তাহার উত্তপ্ত ললাটে ধীবে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিল, বিষণ্ণ চক্ষু তাহার জ্যোতিহীন উৎসুক নোত্রের সহিত মিলিত করিয়া কহিল “মেমসাহেব।”

“প্রতিজ্ঞা করো গুলজান যে আমি মরে গেলে তুমি আমার যাদুকে আমার জেসুনকে ছেড়ে যাবে না? যতদিন বেঁচে থাকবে তাকে ইয়াসিনের মতন ভালবাসবে?” দুর্বল হস্ত গুলজানের পরিপুষ্ট স্থূল বাহুর উপরে স্থাপন করিয়া স্নেহকৃতরা জননী ধাত্রীর মুখের দিকে ব্যাকুলনেত্রে চাহিয়া এই কথা বলিলেন। যেন এই অনুরোধটি রক্ষিত হইতে তিনি যতটুকু সম্ভব শান্তভাবে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইবার চেষ্টা করিতে পারেন। গুলজান তাহার ‘ছেটি বাবা’কে তাহার ইয়াসিনের মত ভালবাসা দিতে হৃদয়ের সঙ্গেই প্রস্তুত আছে, তাহার জন্য তাহাকে আর নতুন করিয়া চেষ্টা করিতে হইবে না। কিছু না ভাবিয়া না চিন্তিয়া কাতর

চিন্তে দৃঢ়কণ্ঠে গুলজান বলিয়া গেল, “আম্মার নামে শপথ, আমার প্রাণ থাকতে আমি আপনাদের ছেলেকে ছেড়ে যাব না। নিজের ছেলের চেয়েও বেশি যত্নে তাকে পালন করব।”  
মিসেস ম্যাকোহনের নেত্রসোটি প্রদীপের শেষরশ্মিটুকুর মত পরমউজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

॥ ২ ॥

মেমসাহেবের মৃত্যুর পর কাপ্তেন সাহেব গুলজানকে ডাকিয়া বলিলেন, “তুমি ছেলেটাকে বড়ই ভালবাসো দেখতে পাই। ওটাকে আমি তোমাকে দিলাম। দশ টাকা করে তুমি বেশি পাবে, ওর সব ভার তোমার। আমায় কোন রকম বিরক্ত করো না— ও কি! কেঁদে যে অস্থির হলে! যাও যাও, আমি কাল্লাকাটি দেখতে পারিনে যাও—”

কে জানে কেন ছেলেটার জন্মদিন হইতেই কাপ্তেন সাহেবের তাহার প্রতি কেমন একটা অহেতুকী বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। একটা রাস্তার কুড়ানো ছেলেব উপর লোকের যেটুকু মায়া জন্মায় নিজের সন্তানের উপর সেটুকুও মনতা ছিল না। পত্নীর প্রতি ভালবাসাব অভাবই বোধ হয় এ ভাবের মূলগত কারণ।

গুলজান বেতনবৃদ্ধির জন্য আত্মদ প্রকাশ করিল না। বাছাকে সে নিজের কাছে পাইয়াছে, ইহাই তাহার যথেষ্ট পূবস্বার।

বৎসব ঘুরিয়া গেল। জেসুন ও ইয়াসিন দুইটি বিভিন্ন জাতীয় শিশু একখানি স্নেহতপ্ত অঙ্ক জুড়িয়া এক সঙ্গেই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। একটি সবল শাখা দুইটি কোমল লতাকে যেমন সমান স্নেহে বক্ষে ধরিয়া থাকে গুলজানের চিন্তেও সেইরূপ তাহাব দেহসম্বৃত ও প্রতিপালিত শিশু দুটিব মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য বোধ কবিত না।

মেজর লরির স্ত্রীব সহিত ছেলে দুটিকে লইয়া গুলজানকে কাপ্তেন সাহেব পাহাড়ে পাঠাইলেন।

পাহাড় হইতে ফিরিবার দিন মিসেস লরি তাহাকে তাহার নূতন প্রভুপত্নীর সংবাদ জানাইয়া কহিলেন, “কাপ্তেন সাহেব তোমায় পূর্বে জানাতে নিষেধ করবেছিলেন তাই এতদিন বলিনি।”

গুলজানের বর্ণ সাধারণ নিম্নশ্রেণীর ভাবতীয় স্ত্রীলোকের মত কালো ছিল না। তাহাব শ্যামবর্ণ মুখ সহসা পাংশু হইয়া গেল, গৃহে বিমাতা আসিয়াছে। যদি সে বাছাকে তাহার কোল হইতে ছিনাইয়া লয়?

ট্রেন হইতে নামিবার সময় তাহার পা কাঁপিতেছিল। শিশুকে সে দৃঢ় হস্তে চাপিয়া ধরিয়া অনিচ্ছুক ভাবেই নামিল।

স্টেশনে প্রভু বা প্রভুপত্নীর সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল না, বাড়ি আসিয়া পৌঁছিলে বারান্দায় সে কাপ্তেন সাহেবের সহিত তাহার নূতন স্ত্রীকে দেখিল। নূতন গৃহিণী সুন্দরী ও সুষাঙ্ক্যসম্পন্ন। প্রথম দর্শনেই তাহার বেশভূষা ও ধরনধারণে গুলজানের চিত্ত তাহার প্রতি বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। হায়! তাহার মেমসাহেব সেই নম্রশান্তকরুণহৃদয়া নারী তিনি কখনও এমন দামী পোষাক এমন উজ্জ্বল হীরার আংটি পরিতে পান নাই। নূতন মিসেস ম্যাকোহন ঈষৎ হাসিয়া শিশুর দিকে হাত বাড়াইয়া দিলেন। গুলজানের বুকেটা অমনি একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল। শিশু কিন্তু বিমাতার কোলে গেল না, সে দুই হাতে ধাত্রীর কুর্ভাতা মুঠা করিয়া চাপিয়া ধরিল। কাপ্তেন সাহেব স্ত্রীর হাত ধরিয়া বলিলেন,

“কোনও দরকার নেই ক্রেরা। ওটাকে আমি আয়ার হাতেই দিয়েছি। ছেলের হাস্যম তোমায় বইতে হবে না, চলো আমরা বেড়িয়ে আসি”—

তাহার বুকের দুলালকে পাছে কাড়িয়া লয় এই ভয়ে গুলজানের নিঃশ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল— মনিবের কথা শুনিয়া সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। শিশুকে সে চুষনের পর চুষনে বিব্রত করিয়া তুলিল।



কিন্তু এ আনন্দ স্থায়ী হইল না। ওলজান শীঘ্রই বুঝিতে পারিল পদ্মপত্রে জনবিন্দুর মত তাহার অধিকার এখানে প্রতি মুহূর্তেই অস্থায়ী হইয়া উঠিতেছে। নূতন গৃহিণী তাহাকে দেখিতে পারেন না।

সপত্নীসন্তান সাধারণতঃ বিমাতার স্নেহভাজন হইতে পারে না, বিশেষ আবার যেখানে স্বয়ং শিশুর পিতাই তাহার প্রতি স্নেহলেশহীন। জেসুন তাহার সৌখিন বিমাতাব চক্ষুশূল হইতেছিল।

একদিন ওলজান নিজের ঘর হইতে উচ্চ ব্রন্দনের শব্দ পাইয়া উদ্বিগ্ন হইয়া আসিয়া দেখিল, মিসেস ম্যাকোহন তাহার মেহগনি ক্রস দিয়া শিশুকে প্রহাব করিতেছেন। ক্রোধে তাহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল, স্ত্রীশূন্য হইয়া সে প্রভুপত্নীর হস্ত হইতে ক্রসখানি টানিয়া লইয়া সবেগে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া তীব্র ভৎসনাসূচক স্ববে উচ্চারণ করিল—  
“মেমসাহেব!”

তারপর আহতপৃষ্ঠ বোদনকার্শ্পত শিশুকে কোলে উঠাইয়া লইয়া দ্রুতপদে সে ঘর হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। মিসেস ম্যাকোহন গভীর স্বরে কহিলেন, “পাজি ছেলটাকে তুমি যে বকম নষ্ট করচ তাও শীঘ্রই সৈ ডাকাতের দলে ঢুকবে দেখচি! আর না!—আমাকে শোধরাবাব ব্যবস্থা করিতে হবে।”

ওলজান সব কথা দাঁড়াইয়া না শুনিয়াই চালায়া গেল কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনের ভিতরে নিজের ব্যবহারের ফল, আসন্ন বিপদের একটা ছায়া উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিল। শিশুকে পুরাতন ভূতা ফৈদুর কাছে রাখিয়া একটু মিছরি হাতে দিয়া সে সশঙ্কচিত্তে প্রভুপত্নীর গৃহে ফিবিয়া আসিয়া চোখের জলে ভাসিয়া বলিল, “মেমসাহেব! নিজের ব্যবহারের জন্য আমি নিতান্ত দুর্গন্ধিত হইছি, দয়া কবে এবার মাপ করন, আব কখনও আমি এ বকম করবো না। ছেলটা আমার প্রাণ তাই হঠাৎ বড় রাগ হয়ে গেছিলো।”

মিসেস ম্যাকোহন হিন্দি ভাষা ভাল বুঝিতেন না, তথাপি যেটুকু বুঝিলেন তাহাতে তাহার সংকল্প শিথিল হইল না। স্থির কণ্ঠে কহিলেন, “তোমার মাহিনা বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তুমি এখনি যাও, ছেলে তোমাব নয়, আমি ওকে সোজা করবার ব্যবস্থা করচি।”

ওলজান মুহূর্তে চারিদিক অন্ধকার দেখিল। আতর্ভাবে সে প্রভুপত্নীর পদতলে বসিয়া দুই হাত যুক্ত করিয়া কাদিয়া কহিল, “মেমসাহেব আমায় তাড়িয়ে দিবেন না। মৃত মেমসাহেবের কাছে আমি সত্য করেছি কখনও তাঁর ছেলেকে ছেড়ে যাব না। হয় দয়া করে আমাকে রাখুন, না হয় আমার বাচ্চাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে দিন।”

“এ মাগীব তে স্পর্ধাও কম না।” ঘৃণার সহিত গৃহিণী হাসিয়া ফেলিলেন। কাণ্ডেন সাহেব ওলজানের কণ্ঠ শুনিয়া গৃহের মধ্যে উঁকি দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাপাব কি ক্রেয়া?”

ক্রেয়া কহিল, “আমি ওকে মাইনে চুকিয়ে দিয়ে চলে যেতে বলচি, কিন্তু উনি বলচেন কিছুতেই যাবেন না।”

কাণ্ডেন সাহেব ভূভঙ্গি কবিয়া দ্বাবের উপরে মুষ্ঠাঘাত ও ভূমে পদাঘাত করিয়া কহিয়া উঠিলেন, “তুমি যখন যেতে বলছো তখন নিশ্চয়ই যেতে হবে, যাবে না কি।”

মুহূর্তে ওলজানের অশ্রু শুকাইয়া গিয়া দুই চক্ষু আগুনের মত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া, স্থির কণ্ঠে কহিল,—

“হ্যাঁ সাহেব, আমি যাচ্ছি।” তারপর সে দৃঢ় পদক্ষেপে ঘর ছাড়িয়া চালায়া গেল।

শিশু তখনও অনুচ্চ স্বরে কাদিতেছিল, পৃষ্ঠের কোমল চামড়া রাঙা হইয়া বহিয়াছে, মিছরি সে স্পর্শও করে নাই। ফৈদু শিশুকে প্রত্যাৰ্পণ করিবার সময় ধাত্রীব মুখের স্বাভাবিক গাভীর্য দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া রহিল।

কাণ্ডেন সাহেব অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার নূতন সঙ্গিনীর সহিত ক্লাবে চলিয়া গেলেন। চার ঘণ্টার পূর্বে তাঁহারা ঘরে ফিরিবেন না। গুলজান মনিবপুত্রকে কোলে তুলিয়া লইয়া নিজের ঘরে আসিল। একবার সে শিশুকে ভুনে নামাইয়া নিজের ছোট সিন্দুকটি খুলিয়া তাহার সঙ্কীর্ণ টাকাপয়সাগুলি দড়ির গাঁজের মধ্যে পুরিয়া কোমরের ঘুপ্তিতে বাঁধিয়া লইল, তাবপব দুটি শিশুকে দুই কোলে লইয়া ধীব পদক্ষেপে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। উর্ধ্ব চাহিয়া মনে মনে করিল, “মেনসাহেব! তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি— সে সত্য রাখার জন্য আজ গুলজান এই পাপ করতে বাধ্য হলো। তুমি স্বর্গে থেকে সাহায্য কর। আমি বেঁচে থাকতে তোমার ছেলেকে নিষ্ঠুর বিমাতার হাতে দিতে পারব না।”

শিশুও সহিত গুলজানের অদৃশ্য হওয়ার সংবাদ প্রচার হইলে কাণ্ডেন সাহেব কোন বকম চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়াই স্ত্রীকে কর্হিলেন, “আঃ যেতে দাও না কেরা, কি হবে সেটাকে নিয়ে? তোমার আমার চেয়ে সে স্ত্রীলোকটা বরং ছেলেটাকে পেয়ে ডের বেশি খুশি থাকবে।”

কথাটা সত্য। তথাপি লোকে কি বলিবে? এই ভাবিয়া মিসেস ম্যাকোহনের বিবেক এই নিষ্ঠুর যুক্তির বিপক্ষে জাগরিত হইয়া উঠিল।

একটা আয়া দুই কাঁধে দুইটা সমবয়স্ক শিশু— তাহার একটি সাদা ইউরোপীয় এবং অপবটি পশ্চিমী মুসলমান শিশু—লইয়া পলাতক, ইহাদেব ধরিয়া দিতে পাবিলে পুৰস্কার দেওয়া হইবে, এইকপ একটা বিজ্ঞাপন কাগজে দেওয়া হইল। কিন্তু চেষ্টা সফল হইল না। গৌরবর্ণ, শ্যামবর্ণ এবং কৃষ্ণবর্ণ একটি দুটি তিনটি ছেলে কোলে-কাঁখে-কবা স্ত্রীলোক পথে ঘাটে অনেক দেখা গেল। শুভ্র শিশু সংযুক্ত নারী কোথাও মিলিল না।

## ॥ ৩ ॥

গুলজান গোরখপুর হইতে পলাইয়া হাঁটাপথে পশ্চিমবঙ্গ উত্তীর্ণ হইয়া পদ্মাপারে নিজের দূব সম্পর্কীয় ভ্রাতার কাছে আশ্রয় লওয়ার পব ষোল বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। ইয়াসিন এখন সূত্রীসবল যুবাপুরুষ। এখন সে মাতুলের গাড়িখোড়ার ব্যবসায়ের অংশীদার। গুলজান তাহার জন্য কঠিনতর পরিশ্রম করিতে এখনও শ্রান্তি বোধ করিত না। সে মায়েব চেয়ে দাসীর মতই তাহার সেবা করিত। ছেলেও মা ভিন্ন কাহাকেও চিনে না, এখনও সে মায়ের কোলের শিশু, আদরের দুলাল।

শবীরের শক্তিতে মনের তেজে ইয়াসিন নিজের কার্যে বেশ একটু উন্নতি করিতে লাগিল। তাহার মধ্যে কি ছিল তাহা সে নিজেই জানিত না কিন্তু এইটুকু সে লক্ষ্য করিয়াছে যে তাহার মুখে চাহিয়া দেখিলেই তাহার ইংবাজ আবেহীর চোখে একটা বিস্ময়পূর্ণ স্নেহ-করণার ভাব ব্যক্ত হইয়া উঠিত এবং সে ভাড়াটা বেশ ভাল রকমই লাভ করিয়া আসিত। আর ইহাও এক বিচিত্র ব্যাপার যে, ঐ সকল সুপারিচ্ছদধারী সুন্দরমূর্তি নর-নারীদের দেখিলে তাহাও প্রাণের মধ্যে কি যেন একটা আকুলতা উদ্ভাস হইয়া উঠিতে চাহিত, তাহাদেব সান্নিধ্য সে পাথরের চুম্বক আকর্ষণের মত কিছুতেই যেন ছাড়াইয়া লইতে পারিত না।

একদিন গুলজান দেখিল, ইয়াসিন নিজের অঙ্গ হইতে দড়ি-বাঁধা মিরজাই খুলিয়া রাখিয়া বিস্ময়ব্যাকুলনেত্র নিজের অঙ্গের প্রতি চাহিয়া আছে। গুলজানকে দেখিয়া সে হসিতে কাছে আসিতে বলিল। কম্পিতপদে গুলজান নিকটে আসিলে সহসা যুবক স্খিগ্ৰস করিয়া উঠিল, “মা, এব মানে কি আমায় বলো, কেন আমার গা এত সাদা? আমি শুনেছি, আত্মই ওনেছি— লোকে বলে— ওঃ আমি বলতে পারিনে— সে কী ভয়ানক কথা— বলে আমি তোমার জারজ! আমি সাহেবের ছেলে?”

সর্পাহতের মত গুলজান আড়ষ্ট হইয়া রহিল, তাহার মুখে বাক্য সবিল না। সূদীর্ঘ দিনে যে স্মৃতি অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছিল সহসা তাহা মেঘোদ্ভিন্ন সূর্যকিরণের মত ফুটিয়া উঠিল। নিষ্ঠুর সন্দেহে ইয়াসিন উন্মাদের মত লাফাইয়া নায়ের হাত চাপিয়া ধরিল।

“সত্যি, তবে সত্যি! আমি তবে সাহেবেব ছেলে?”

যন্ত্রচালিতের মত গুলজান উত্তর করিল, “হ্যাঁ”।

“রাক্ষাস!” ইয়াসিন বায়ের মত গর্জিয়া উঠিল, “কেন আমায় নুন খাইয়ে মারিসনি?”

গুলজানেব সর্ব শরীর কাঁপতেছিল। আত্মপরিচয় জানিয়া নইয়াছে, এইখান হইতেই সে তবে নিজের জন্য পথ নির্বাচন করিয়া লউক। সে যে কোন পথ বাছিয়া নইবে ইহাও সে জানিত। কস্পতস্বরে কহিল, “বাছা, আমার সব কথা না শুনে তুমি বাগ কবো না, আগে সবটা স্থির হয়ে শুনে যাও”— এই বলিয়া সে সমস্ত কাহিনীটা এক নিঃশ্বাসে বলিয়া গেল। সে বলিল, “তুমি সাহেবেব ছেলে এ কথা সত্য কিন্তু আমার গর্ভে তোমার জন্ম হয়নি। আমার গর্ভজাত সন্তান ইয়াসিনেব যোলবৎসর পূর্বে মৃত্যু হয়েছে, তুমি মেমসাহেবেব পুত্র। তোমার বাপ তোমার মাকে দুচক্ষে দেখতে পারতেন না, তোমার প্রতিও তাঁর এতটুকু স্নেহ ছিলনা, তোমার মা মৃত্যুর ঠিক পূর্বক্ষণেই আমাকে সত্য করিয়ে নিয়েছিলেন যে জীবন থাকতে আমি তোমায় ছেড়ে যাবনা।”

তাবপর সে অত্যন্ত মৃদু ও হৃদয়ভেদী স্বরে তাহাদের পলায়নের কাহিনী বিবৃত করিতে লাগিল, গুলিয়া ইয়াসিন কিছুই বলিল না। সে যেন অকস্মাৎ একটা প্রস্তবমূর্তিতে পরিণত হইয়া গিয়াছিল।

গুলজান কহিতে লাগিল — “গুলুম আমাদের ধরবার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। ধরা পড়লে যে কি হবে আমার জানাই ছিল, মাথায় বজ্রাঘাত পড়ল। গোরখপুত্রের শালেশ জঙ্গলে একজন সন্ন্যাসী থাকতেন, তাহারই কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লুম। তিনি বললেন,— দুজন সঙ্গে থাকলে ধরা পড়বে, একজনকে ত্যাগ কবে যাও। পরামর্শ উচিত মতই কিন্তু কবা বড় কঠিন। কাকে ত্যাগ করব? কোথায় রাখব? বিশ্বাস করবার কে আছে যে পুরস্কারেব লোভে আমাদের ধরিয়ে দেবেন? আমি তোমার মাকে স্মরণ করলুম। বললুম— “আমার সমস্যা দূর করে দাও, নিজের ছেলের মায়ায় আমি যেন তোমার ছেলেকে ফেলে না যাই। তার কিনাটা বড়ই নিষ্ঠুর।” বোধহয় তোমার মা সে কথা স্বর্গে থেকে শুনেও ছিলেন। সেই রাত্রেই ফকিরের আশ্রমে আমার নিজের ছেলেকে ফেলে তোমাকে তার কাপড় পবিয়া ও একলকম বৎ মাথিয়ে নিয়ে আবাব পথে বাব হলুম। ইয়াসিনেব ক্ষীণ ক্রন্দন ক্রোশের পর ক্রোশ ধরে আমার কানে বাজতে লাগল, ভুরে সে যেন সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সত্য যে সবার চেয়ে বড়। ঈশ্বর যে সকলেবই উপরে বাপ। আমি যে তোমার মাকে কথা দিয়েছিলুম! এখানে আসবার পর চিঠি লিখে খবর নিয়েছিলুম, সেই রাত্রেই সে মারা গ্যাছে। আমি মনে করি তুমিই আমার ইয়াসিন।

এখন তুমি বড় হয়েছ, তোমার পথ তুমি ঠিক কবে নাও— তবে আমার প্রতি এইটুকু দয়া কবো, যেখানে থাকো আমাকে তোমার বাড়ির দাসী কবে রেখো।”

ইয়াসিন অনেকক্ষণ নিষ্পন্দ হইয়া শূন্যদৃষ্টিতে একদিকে চাহিয়া রহিল। তাবপর হঠাৎ সে স্বপ্নমুগ্ধের মত এক পা এক পা কবিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। একটিও কথা কহিল না। গুলজানও তাহাকে তাহাতে বাধা দিল না। নিজের সে নিঃশব্দে কাঁদিতোছিল।

সমস্ত দিন পথে পথে ঘুরিয়া রাতে আবার ইয়াসিন গৃহে ফিবিয়া আসিল। গুলজানও জনিত যে সে আর একবার আসিবে। সে তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। ইংরাজটোলায় আত্র ইয়াসিন অনেক ঘণ্টা কাটাইয়াছে। খোলা জানালার নেটের পর্দা বাতাসে কাঁপিয়া সরিয়া যাইতেছিল। ভিতরে শুভ্র আন্তরগবিত্ত তেবিল ঘেরিয়া টোঁকিওলি সাজান, হাস্য-কৌতুকেচ্ছসিত সুপরিচ্ছদধারীগণ সেই টোঁকি দখল করিয়া রহিয়াছে। রৌপ্য চামচের টুন টান শব্দে এবং খাদ্য ও পানীয় দ্রবোর সুপ্রচুর সদগন্ধে বায়ু পূর্ণ করিয়া মধ্যাহ্নভোজন চলিতেছে। সন্ধ্যায় কোন গৃহে মধুরস্বরে পিয়ানো বাজিয়া উঠিল, কোনও উদ্যানপথে শ্রান্ত প্রণয়ী দুইখানি ব্যগ্রহস্তে বাঁধা পড়িলেন। কোথাও বা ঠেলাগাড়িতে শিশুকে বসাইয়া পার্শ্বে জনক-জননী স্নেহাস্যে তাহাব দিকে চাহিয়া আছেন। ইয়াসিনের প্রাণের ভিতবে ব্যাকুলতা অসম্বরণীয় হইয়া উঠিতে লাগিল। সে এই দীনহীন অশ্বপালক—ছোটের মেরজাই গায়ে নাগারা-জুতা-পরা নগণ্য ঘৃণিত ইয়াসিন; সে কিন্তু উহাদেরই মত ইংরেজসন্তান, ইহা বা তাহার আপনার লোক। সেও এইরূপ সুখস্বচ্ছন্দ্য এই মূর্ত্ত হইতেই ব্রহ্ম কবিত্তে সক্ষম। শুধু একবার ছুটিয়া গিয়া ওই যে— ম্যাজিস্ট্রেট, জেলার আদালত হইতে শতপ্রাণীর মুণ্ডগণ্ডব ব্যবস্থা কবিয়া টমটম চড়িয়া ফিরিতেছেন তাঁহাকে সব কথা বলিবার মাত্র অপেক্ষা।

কিন্তু— না না, একি সে ভাবিতেছে! সে পাগল হইয়া যাইবে না কি? সে তো গুলজানের কথা ভাবিতেছে না? ম্যাজিস্ট্রেট যখন তাহার কাহিনীর সত্যাসত্য বিচার করিবার জন্য তাহাকে ডাকিয়া আনিবেন? এবং তাবপব, পরের ছেলে— ইংবাজেব সন্তানকে তাহাব পিতৃগৃহ হইতে চুরি কবিয়া আনাব জন্য তাহাকে যখন চালান দিবেন? উঃ না! ঈশ্বর তাহাকে এই দুরন্ত লোভ হইতে রক্ষা করুন!

গভীর অন্ধকারে চাবিদিক ভরিয়া গিয়াছিল। দরিদ্র পল্লীতে কঁচিৎ কোন ক্ষুদ্র জানালার ভগ্ন কবাটের ফাঁক দিয়া কেরোসিনের প্রচুর ধূমের সহিত ক্ষীণালোক রেখা প্রকাশিত হইতেছে। ইহার ভিতরে সমস্ত নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। তাঁরস্বরে ঝিঝি ডাকিতেছিল। অশ্রুট নক্ষত্রালোকে গুলজান দাওয়ায় চারপায়ার উপরে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ইয়াসিন আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। সে বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছে, গুলজানকে ফাঁসাইয়া সে নিজেকে কাপ্তেন ম্যাকোহনের পুত্র বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিবে না— কিছুতেই না! পথে দুইজন ইংরাজের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহারা চলিতে চলিতে হঠাৎ তাহার দিকে চাহিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেও কৌতুহলী হইয়া চলিয়া না গিয়া দাঁড়াইয়া দুই চোখ তুলিয়া তাহাদের চোখের দিকে চাহিয়া দেখিল। একজন ইংরাজ অপরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “বাই জোভ! নিশ্চয়ই এ ছেলটি একজন ছদ্মবেশী ইউরোপিয়ান!” বাঘের মত গর্জিয়া উঠিয়া সে তাহাদের উপর লাথাইয়া পড়িল, গর্জন স্বরে কহিয়া উঠিল “চুপ রও।”

ইংরাজ দুজন উচ্চহাস্য করিয়া চলিয়া গেল।

অন্ধকারে কেহ কাহারও মুখ দেখিতে পাইতেছিল না। বাত্রেব বাতাস কেবলি বিলাপেব নিঃশ্বাসের মত যবে ও বাহিবে ঘুরিয়া ফিরিতেছিল। দু একটা নিশাচর প্রাণীর ক্ষীণ বর্ণশব্দ আর্ট হৃদয়েব যন্ত্রণাকর্ম্মার মত শূন্যে চকিত হইয়া মিলাইয়া যাইতেছে। মৃদুস্বরে গুলজান ডাকিল — “ইয়াসিন! — জেসুন বাবা!”

জেসুন তাহার নুকের উপব মাথা বাখিয়া বলিল— “মা!”

## প্রমাণ

### উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

তিনটি প্রাণী লইয়া সংসারটি কালশ্রোতে সুখের তবণীর মত ভাসিয়া চলিতেছিল। স্বামী সুধাময়, স্ত্রী অরুণা এবং কন্যা বরুণা। সুধাময়ের বয়স পঁয়ত্রিশ বৎসর, মাঠে-ন্ট অফিসে বড় চাকরি করে, শরীর একটু রুগ্ন এবং অলস, মনটি কিন্তু বিশেষভাবে প্রবণ এবং প্রবল, অর্থাৎ গিবিনদীর মত, অতি অল্প কারণেই বহিতে আরম্ভ করে এবং যখন বহিতে আরম্ভ করে তখন খবশ্রোতে যুক্তি ও তর্ককে উপলব্ধির মত ভাসাইয়া লইয়া চলে। স্ত্রী অরুণার বয়স পঁচিশ বৎসর। গত পাঁচ বৎসর হইতে যাহাবা তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে, তাহাদের মনে হয় সে যেন যৌবনের সর্বান্তস্তরে উপনীত হইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে— যেখন হইতে তাহাব পতনের কোন লক্ষণ নাই। কেবলমাত্র একটি সন্তানের মাতৃত্বে অভিষিক্ত হইয়াই সে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে। তার মনের তুষ্টি এবং দেহের স্বাস্থ্য উভয়ের সাহচর্য্যে তাহাব নিটোল প্রসন্ন মূর্ত্তিখানি সুদৃষ্টি চিত্রকরের অঙ্কিত চিত্রের মত চিত্তাকর্ষক। এবং কন্যা বরুণা তাহার জননীর বাল্য মূর্ত্তিখানি সম্পূর্ণভাবে বহন করিয়া কৈশোবেব সীমান্ত অতিক্রম করিবাব উপক্রম করিতেছিল। সে যে তাহার জনক-জননীর একমাত্র সন্তান হইয়া তাঁহাদের স্নেহ-ভালবাসার ষোল আনার অধিকারিণী হইয়াছে— এই অত্রান্ত জ্ঞানটির দ্বারা তাহার মনেব মধ্যে একটি সুমিষ্ট অভিমান সঞ্চারিত হইয়াছিল।

সেদিন ছুটির দিন ছিল। শীতেব মধ্যাহ্নে আহাবের পর শয্যার উপর অর্ধশায়িত হইয়া সুধাময় ইংরাজি সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিল। এবং অদূরে একটা বেতের চেয়ারের উপর বসিয়া অরুণা নিবিষ্টমনে একটা লেসের উপর রেসমের ফুল তুলিতেছিল। বরুণা বাড়ি ছিল না: স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর গুরুতর অসুখ শুনিয়া দেখিতে গিয়াছিল।

সংবাদপত্রের একটা বিশেষ অংশ সুধাময়ের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করিল। বড় বড় অক্ষরে হেড-লাইন :— “আমেরিকা প্রতাগত জ্যোতিষী স্বামী বিমলানন্দ এম-এর অভূত কাহিনী”। তাহার নিম্নে মুদ্রিত বিবরণ পাঠ করিয়া সুধাময় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। উঃ কি আশ্চর্য ক্ষমতা! হিন্দুগণ যে জ্যোতিষশাস্ত্রকে অন্ধশাস্ত্রের স্তরে লইয়া গিয়াছিল, এতদিনে এই মহাপুরুষ তাহা সপ্রমাণ করিলেন। যে সংশয়ী জাতি হিন্দুর জ্যোতিষশাস্ত্রকে এতদিন ‘বৃজরুণী’ বলিয়া পরিহাস করিয়া আসিয়াছে, তাহারাই এখন তাহার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। বলিতেছে, এই মহাজ্ঞানীর নিকট অদৃষ্ট সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হইয়া ভূত এবং ভবিষ্যত ঠিক বর্তমানের মতই প্রত্যক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে! সুধাময় শয্যার উপর উঠিয়া বসিল।

স্বামীর ওৎসুকা লক্ষ্য করিয়া অরুণা কহিল, “অত মন দিয়ে কি পড়ছ?”

সুধাময় কহিল, “কলিকাতায় বিমলানন্দ স্বামী নামে একজন জ্যোতিষী এসেছেন। তাঁর অভূত ক্ষমতা! তিনি যা গণনা করেন তার একটিও ভুল হয় না। ইনি আমেরিকায়

গিয়েছিলেন— সেখানকার একজন পাদরি সাহেব বলেছেন, যে একজন পণ্ডিতের অঙ্ক কষায় ভুল হতে পারে কিন্তু ঐর জ্যোতিষ গণনায় ভুল হবার যো' নেই। তা ছাড়া আরও অনেক সাহেব ঐর গণনা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছেন।”

অরুণা দস্তের সাহায্যে সুতা কাটিয়া বলিল, “কি দেখে গণনা করেন?”

“কোষ্ঠি দেখে, হাতের রেখা দেখে, কপালের রেখা দেখে, যেমন করে বলবে তেমন করে গণনা করবেন, অথচ গণনার ফল ঠিক এক হবে। আমেরিকায় একজন লোকের কপালের রেখা দেখে ইনি গণনা করেন— তারপর দশ দিন পরে সেই লোকের মুখ ঢেকে হাতের রেখা দেখান হয়। তিনি হাতের রেখা দেখে যা গণনা করেছিলেন, তা আগেকার গণনার সঙ্গে একেবারে ঠিক মিলে গিয়েছিল!”

অরুণা আর কিছু না বলিয়া নিজের কার্বে মন নিবিষ্ট করিল।

সুধাময় কহিল, “গোটা কুড়িক টাকা দাও, আর বেরবার কাপড় দাও— এ সুযোগ ছাড়া হবে না।”

অরুণা কহিল, “স্বামীজির সঙ্গে দেখা কর্তে যেতে হবে না কি?”

“হ্যাঁ। আর চার দিন পরে তিনি জাপান রওয়ানা হবেন। হুগ্ সাহেবের বাজারের দক্ষিণে তিনি আছেন। এগারটা থেকে আটটা পর্যন্ত লোকজনের সঙ্গে দেখা করেন।”

“তা' টাকা কি হবে?”

“আধ ঘণ্টা গণনা করবার জন্য তাঁর ফি দশ টাকা।”

অরুণা মৃদু হাস্য করিয়া কহিল, “যখনই শুনেছি আমেরিকা ফেরৎ, তখনই বুঝেছি যে পাকা ব্যবসাদার লোক। যে স্বামী ব'লে নিজেকে পরিচয় দেয়— তার এত টাকার প্রয়োজন কি? আধ ঘণ্টায় দশ টাকা?”

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সুধাময় কহিল, “বল কি! যিনি এত বড় একজন মহাত্মা বার্ত্ত, তাঁর কি কোন মহৎ উদ্দেশ্য নেই তুমি মনে কর? এ টাকা ইনি নিজের জন্য নিচ্ছেন না— এই টাকা নিয়ে ইনি কাশীতে হিন্দু কলেজ অফ্‌ অ্যাস্ট্রলজি খুলবেন এবং এত বড় একটা মৃতপ্রায় শাস্ত্রকে জীবন দান করবেন।”

সুধাময়ের কথা শুনিয়া অরুণা শুধু একটু মৃদু হাস্য করিল— কিছু বলিল না। জ্যোতিষ সম্বন্ধে তাহার স্বামীর অন্ধ বিশ্বাস এবং অনুরাগের কথা সে সম্পূর্ণ অবগত ছিল, প্রতিনিয়ত পুঁথি বগলে পথে পথে ঘুরিয়া ভাগ্য-নির্ণয় করিবার নামে যাহারা লোক ঠকাইয়া বেড়ায়, তাহাদের মধ্যে ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি আছে বলিয়া যাহার দৃঢ় বিশ্বাস, আমেরিকা প্রত্যাগত ইংরাজি সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত স্বামীজি সম্বন্ধে তাহার ধারণা টলাইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, তাহা অরুণা বিশেষরূপে জানিত।

সুধাময়কে টাকা দিবার সময় অরুণা জিজ্ঞাসা করিল, “আমার সম্বন্ধে কি জিজ্ঞাসা করবে শুন?”

সুধাময় স্নেহভরে পত্নীর নাসিকায় অঙ্গুলি ব'সাইয়া কহিল, “জিজ্ঞাসা করুব কতদিনে তোমার একটি খোকা হবে।”

অরুণা কহিল, “সে খবরের জন্য আমি একটুও বাস্তব নই, ভগবানের কৃপায় আমাব করুণা বেঁচে থাক— তা হ'লেই হ'ল।”

“তবে কি জিজ্ঞাসা করুব?”

স্বামীর মুখের উপর প্রশান্ত দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া সহাস্যমুখে অরুণা কহিল, “জিজ্ঞাসা ক'রো, কবে তোমার পায়ে মাথা রেখে আমি মরতে পাব।”

সুধাময় কহিল, “তার চেয়ে জিজ্ঞাসা করব কতদিনে তোমাব বৈধবা যোগ—”

দ্বরিতবেগে অরুণা সুধাময়ের মুখ চাপিয়া ধরিল, কহিল, “ফের যদি ও-সব কথা বলবে তা ভাল হবে না বলছি!”

॥ ২ ॥

প্রকাণ্ড অট্টালিকার নিম্নতলের দুইটি কক্ষ ভাড়া লইয়া বিমলানন্দ স্বামী দোকান সাজাইয়াছেন। সুধাময়কে অন্বেষণ করিতেই ইহল না। সুবিস্তৃত সাইনবোর্ডের উপর অতি বৃহৎ অক্ষরে ইংরাজিতে লেখা — “গ্লোতিষী শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ স্বামী, এম. এ.”। এত বৃহৎ এবং উজ্জ্বল যে, কোন পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে বিফল হয় না। নামের উভয় পার্শ্বে রাশিচক্র এবং গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি বিচিত্র বর্ণে অঙ্কিত এবং দ্বায়েব উভয় পার্শ্বে দুইটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সাইনবোর্ডে স্বামীজির জ্ঞান ও গরিমাব কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত। দ্বাবের নিকট তক্মা পবা ভূতা বসিয়া হ্যান্ডবিল বিতরণ করিতেছে, বাবস্থা এমন সুন্দর যে, কেহ যে হ্যান্ডবিল না লইয়া তাহাকে অতিক্রম করিয়া যাইবে তাহাব উপায় নাই। এমন কি সুধাময়কেও একটি হ্যান্ডবিল হাতে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিতেই ইল।

প্রথম কামবাটি স্বামীজির অফিস। সেখানে নানাজাতের এবং নানাশ্রেণীর অভ্যাগতের দল বসিয়া আছে, পার্শ্বের ঘরে স্বামীজি বসিয়া গণনা করিতেছেন— যেমন যাহাব ডাক পড়িতেছে সে যাইতেছে।

সুধাময় প্রবেশ করিতেই একটি কর্মচারী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি গণনা করাবেন কি?”

“আজ্ঞে—হ্যাঁ।”

“কতক্ষণ সময় নেবেন?”

“আধ ঘণ্টা।”

হস্ত প্রসারিত কবিয়া কর্মচারী কহিল, “দশ টাকা দিন।”

সুধাময় ব্যাগ হইতে একটি দশ টাকার নোট বাহিব কবিয়া প্রশ্ন করিল।

কর্মচারী জিজ্ঞাসা করিল, “আপনার নাম?”

সুধাময় একটু ইতস্ততঃ করিয়া কি ভাবিয়া প্রকৃত নাম গোপন কবিল। কহিল, “দিনোদবিহারী গুপ্ত।”

কর্মচারী তখনই বিনোদবিহারী গুপ্তর নামে দশ টাকার একখানি রসিদ লিখিয়া সুধাময়কে দিল। সুধাময় পড়িয়া দেখিল, তাহার মধ্যে তাহার সময় নির্দ্ধারিত রহিয়াছে ৫/৮ টা ইইতে ৬টা। তখন বেলা ২/৮ টা মাত্র।

সুধাময় কহিল, “আর একটু আগে আমার সময় দিতে পারেন না কি?”

কর্মচারী হাসিয়া কহিল, “আগেকার সমস্ত সময় বুকড (booked) হয়ে রয়েছে। কে আপনাকে অসুবিধায় ফেলে আপনাকে সময় দেবে বলুন? আপনি ইচ্ছে কবলে বাড়ি ঘুরে আসতে পারেন কিংবা অন্য কোথাও যদি কাজ থাকে—”

সুধাময় কহিল, “না তা হলে অপেক্ষাই করি।”

“যেমন আপনার সুবিধা” বলিয়া কর্মচারী অন্যত্র চলিয়া গেল। সুধাময় বসিয়া হ্যান্ডবিলখানি পড়িতে লাগিল। হ্যান্ডবিলটি স্বামীজির ক্ষমতা এবং কীর্তিকাহিনীর সম্পূর্ণ বিবরণী। খবরের কাগজে ইহার দশভাগের একভাগও প্রকাশিত হয় নাই। হ্যান্ডবিলখানি পাঠ কবিত্তে করিতে বিষয়ে ও সম্বন্ধে সুধাময়ের মন ভরিয়া উঠিল। আব কিছুক্ষণ পরেই এই যাদুকরের মন্ত্র প্রভাবে তাহাব ভবিষ্যৎ জীবনের যবনিকাখানি উন্মোচিত হইয়া যাইবে

এবং এতদিন ধরিয়া যাহাকে সে অদৃষ্ট মনে করিয়া নিগূঢ় রহস্যের মধ্যে নিহিত মনে করিত, তাহা তাহার চক্ষের সম্মুখে প্রত্যক্ষরূপে প্রকাশিত হইয়া উঠিলে!

স্বামীজির ঘরের মধ্যে বেল বাজিয়া উঠিল এবং তাহার পরেই একটি ইংরাজ-মহিলা ঘব হইতে বাহির হইয়া আসিল।

বাহিরে একটি ইংরাজ অপেক্ষা করিতেছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, “কেমন দেখলেন?” ইংরাজ-রমণী চক্ষু বিস্ময়িত করিয়া, “The most wonderful man! He works miracles!”

শুনিয়া সুধাময় মুগ্ধ হইয়া পড়িল। তাহার পর দীর্ঘ অপেক্ষার পর যখন তাহার ডাক পড়িল, তখন মস্তাভিভূতের মত সুধাময় স্বামীজির কক্ষে প্রবেশ করিল।

॥ ৩ ॥

একটি শ্বেত পাথরের টেবিলের সম্মুখে, চেয়ারের উপর বিমলানন্দ স্বামী বসিয়া আছেন। দীর্ঘ বলিষ্ঠ গৌরবর্ণ দেহ, চক্ষু দৃষ্টি দীপ্ত প্রভায় জ্বলিতেছে এবং সমস্ত মুখের মধ্যে ভীষণ প্রতিভাব চিহ্ন পরিস্ফুট। সুধাময়ের মনে হইল, গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দ্বারা স্বামীজি যেন তাহার জীবনের সমস্ত অতীত এবং ভবিষ্যৎ ঘটনা দেখিয়া লইতেছেন— যেন সে অতলস্পর্শী দৃষ্টি হইতে কোন কিছু গোপন রাখিবার উপায় নাই। বিস্ময়ে ও সন্ত্রমে সুধাময় স্বামীজিকে অভিবাদন করিতে ভুলিয়া গেল।

সুধাময়ের আপাদ-মস্তক গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া বিমলানন্দ কহিলেন, “নাম ঠাড়াইয়াছ কেন? তোমার যা’ লক্ষণ এবং ইঙ্গিত, তাতে তোমার নাম বিনোদবিহারী ওপ্ত হতেই পাবে না। তুমি আমাকে পরীক্ষা করিতে এসেছ দেখছি। কিন্তু বাপু তোমবা আধুনিক শিক্ষালাভ কবে, astrology-কে যে লোক ঠকাবার একটা উপায় বলে মনে কব সেটা একটা মস্ত ভুল! আব সমস্ত উপায়েই লোক ঠকান যায়, শুধু জ্যোতিষ গণনার দ্বারা যায় না। কারণ যে তোমার অতীত জীবনের ঘটনা বলার স্পর্ধা করছে, সে তোমাকে ঠকাচ্ছে কি ঠকাচ্ছে না, সে বিষয়ে তোমার কোন সংশয় থাকবার কারণ থাকে না।”

সুধাময় অপ্রতিভ হইয়া কহিল, “আমার অপরাধ হয়েছে। আমাকে ক্ষমা করুন। আমার নাম সুধাময় বসু।” বিস্ময়ে ও ভক্তিতে সুধাময় বিহুল হইয়া গিয়াছিল।

বিমলানন্দ মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন, “তুমি অপরাধ করনি। যারা জ্যোতিষ গণনাঘ ভুল করে তারাই অপরাধী। তাদের দোষেই জ্যোতিষশাস্ত্রে লোকের আস্থা নেই। বোস।”

স্বামীজির সম্মুখে চেয়ারের উপর সুধাময় বসিল।

“কোষ্ঠি দেখাবে, না হাতের রেখা দেখব?”

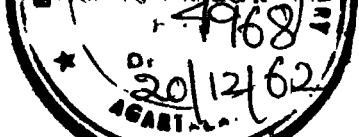
সুধাময় কহিল, “আপনার যা ইচ্ছা, কোষ্ঠিও এনেছি।”

স্বামীজি কহিলেন, “হাতই দেখি— কোষ্ঠির গণনার ভুল হতে পারে, হাতের রেখা মিথ্যা কথা বলে না।”

সুধাময় হাত বাড়াইয়া দিল। স্বামীজি হাতের রেখা দেখিয়া কাগজে গণনা করিতে লাগিলেন। প্রথমে কক্ষমণ্ডলী দেখি, তাহার পর জন্মবৎসর, জন্মদিন সমস্ত গণনা করিলেন। তাহার পর জীবনের অতীত ঘটনা দুটি একটি বলিতে লাগিলেন।

সুধাময় কহিলেন, “আপনি মহাত্মা; আপনার গণনার কোন ভুল হয় নাই।”

স্বামীজি কহিলেন, “তুমি বিবাহিত। তোমার স্ত্রী জীবিত, কিন্তু তুমি নিঃসন্তান। তোমার সন্তান হয় নাই; কখন হইবেও না।”





সুধাময় একটু বিস্মিত হইয়া কহিল, “একটু ভুল হচ্ছে।”

স্বামীজি পুনরায় গণনা করিয়া কহিলেন, “না, ভুল হয়নি। তোমার স্ত্রী জীবিত। কিন্তু তুমি নিঃসন্তান।”

সুধাময় একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, “আজ্ঞে আমার একটি মেয়ে আছে।”

“জীবিত?”

“জীবিত।”

“প্রতারণা করো না।”

সুধাময় কহিল, “আপনি সর্বজ্ঞ। আপনার নিকট প্রতারণা কবা বৃথা।”

বিনলানন্দ ভ্রুক্ণিত কবিয়া কহিলেন, “কই দেখি তোমার কুষ্ঠি।”

সুধাময় পকেট হইতে কোষ্ঠি বাহির করিয়া দিল। বিনলানন্দ কোষ্ঠি লইয়া গণনা আরম্ভ করিলেন। বিস্তৃত সূক্ষ্মভাবে গণনা করিতে লাগিলেন। দীর্ঘ সময়ের পব কোষ্ঠির গণনা শেষ হইলে, সুধাময়ের ললাটেব রেখা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। তাহার পব একখণ্ড কাগজে কি লিখিয়া একটা খামে মুড়িয়া সুধাময়ের হস্তে দিয়া কহিলেন, “বাইরে গিয়ে পড়ো।” তাহাব পর বেল বাজাইয়া দিলেন।

সুধাময় কহিল, “আমার একটা প্রশ্ন আছে।”

স্বামীজি নৃদু হাসিয়া কহিলেন, “তা হলে কাল এস। আধঘণ্টার স্থলে তোমার প্রায় ৪০ মিনিট হয়ে গিয়েছে। আমার আপত্তি না থাকতে পাবে, কিন্তু যাকে বসিয়ে রেখেছি তাব আপত্তি থাকতে পারে।”

সুধাময় কহিল, “দুমিনিটের বেশি লাগবে না—”

কিন্তু ততক্ষণে কক্ষে আব এক ব্যক্তি আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। স্বামীজি সুধাময়ের কথান উত্তর না দিয়া তাহার সহিত কথা আরম্ভ করিলেন।

তখন অগত্যা স্বামীজিকে অভিবাদন করিয়া সুধাময় বাহিরে ফুটপাতে আসিয়া দাঁড়াইল। গামখানা ছিড়িয়া কাগজ বাহিব করিয়া গ্যাসের আলোকে পাঠ করিল। তাহাতে লেখা ছিল, “আমার গণনায় কোন ভুল নাই— তোমার ধাবণায় ভুল।”

সেই খামের মধ্যে হইতে কালসপ বাহির হইয়া দংশন করিলেও বোধ হয় সুধাময় সেরূপ বিহ্বল হইত না। এই কয়েকটি অক্ষরের মধ্যে গুপ্তভাবে যে তীব্র বিষ সঞ্চিত ছিল, তাহার তাড়নায় সুধাময়ের সমস্ত দেহ ঝিম ঝিম করিয়া আসিল! গ্যাসেব উজ্জ্বল আলোক তাহার চক্ষে নিমেষের মধ্যে স্তিমিত হইয়া গেল এবং তাহার ভাবহীন অনুদ্ভিষ্ট দৃষ্টিব সমক্ষে রাজপথ এবং নিউমার্কেটের দৃশ্যাবলী স্বপ্নরাজ্যের অর্থবিহীন নিঃশব্দতায় কেবল মাত্র নড়িতে লাগিল! তাহাব সেই ভাব দেখিয়া সম্মুখস্থ ঠিকাগাড়ি হইতে দুইজন সহিস আসিয়া যখন “বাবু গাড়ি চাই, গাড়ি চাই” করিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল, তখন সুধাময়ের চেতনা অল্প ফিরিয়া আসিল এবং কিছু মনে মনে স্থির না কবিয়াই সহসা পশ্চিমদিক লক্ষ্য করিয়া সে চলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু পায়ে যেন কেহ দশ মণ পাথব বাঁধিয়া দিয়াছে, কোনমতেই পা চলিতে চাহে না।

চৌরঙ্গী রোড পার হইয়া, ট্রামের রাস্তা পার হইয়া, পুন্ড্রিগীর পশ দিয়া, মাঠ ভাঙ্গিয়া সুধাময় পশ্চিমদিকে চলিতে লাগিল। পথ আর শেষ হয় না। শীতকালের অন্ধকার রাত্রি— মাঠে লোকজনের ভিড় নাই, সেই নির্জন মাঠ ভাঙ্গিয়া সুধাময় কোথায় চলিয়াছিল, তাহা সে নিজেই জানে না। তাহার মনের মধ্যে যে উদ্দাম ঝটিকা গর্জন করিতেছিল, তাহার ভীষণতার মধ্যে তাহার সমস্ত অনুভূতি ডুবিয়া গিয়াছিল। অবশেষে দীর্ঘ সময় এবং দীর্ঘ পথ অতিবাহিত করিয়া, মাতালের মত টলিতে টলিতে সে যখন গঙ্গার ধারে আসিয়া

উপস্থিত হইল, তখন রাত্রি ৮টা বাজিয়া গিয়াছে। সম্মুখে একটা জেটিতে একটা মাত্রও লোক ছিল না। সুধাময় তাহার উপর গিয়া বসিল। পায়ের নীচে গঙ্গা বহিয়া যাইতেছিল, মাথার উপর আকাশে অসংখ্য তারকারাজি হাসিতেছিল এবং শীতের তীব্র উত্তবে বাতাস সজোরে বহিতেছিল। সেইরূপ অবস্থায় বসিয়া প্রায় দুই ঘণ্টা সুধাময় কত কি ভাবিল, কিন্তু মনেব অশান্তভাবের উপশম হইল না। বিমলানন্দ স্বামীর অজ্ঞাত জ্ঞান আজ তাহার সুখের মূলে যে নির্মমভাবে দংশন করিয়াছে, তাহা হইতে আর কোন ক্রমে নিস্তার নাই! আমেরিকাবাসী পাদবীর কথা সুধাময়ের মনে পড়িল। “অঙ্ক কষার ভুল হইতে পাবে, কিন্তু বিমলানন্দের গণনায় ভুল হইতে পারে না!”

অধীর হৃদয়ে সুধাময় সেখান হইতে উঠিয়া ষ্ট্যান্ডরোডে আসিয়া দাঁড়াইল। একটা খালি গাড়ি যাইতেছিল দেখিয়া তাহাতে চড়িয়া বসিল।

সুধাময় গৃহে পৌছিলে অরুণা কহিল, “কি কাণ্ড বল দেখি? সেই দুপুরবেলা বেরিয়েছ, আর এই দুপুর রাতে ফিবলে! আমাদের মনে কি ভাবনা হয় না?”

সুধাময় অস্পষ্ট স্বরে বিড় বিড় কবিয়া কি বলিয়া সরিয়া গেল। অরুণা পিছনে পিছনে গিয়া কহিল, “কি হয়েছে তোমার, মুখ অত ভার কেন? অসুখ করেনি ত?”

কথার উত্তর না দিয়া সুধাময় একটা ইঞ্জিনেয়াবে শয়ন করিল।

অরুণা কহিল, “গণককার গুণে বুঝি কোন মন্দ খবর দিয়েছে? তাই যদি দিয়ে থাকে তাতে মন খারাপ কবে কি হবে? ওদের সব কথাই মিথ্যা হয়।”

সুধাময় উচ্চকণ্ঠে কহিল, “যাও যাও! আমার সম্মুখ থেকে সরে যাও! বিরক্ত করো না!”

অরুণা এক মুহূর্ত নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পব ধীবে ধীরে সরিয়া গেল।

পরদিন প্রাতে করুণা তাহার জননীর মূর্তি লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। মুখ রক্তবর্ণ, চক্ষুদুটা ফুলিয়াছে এবং সমস্ত শরীরে যন্ত্রণা এবং অশান্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে।

“কি হয়েছে মা তোমার?”

“কিছু হয় নি মা।”

“তবে জিনিসপত্তব গুছছ কেন?”

অরুণার দুই চক্ষু হইতে রুদ্ধঅশ্রু ঝরঝর করিয়া ঝবিতে লাগিল। কাল রাত্রে যে ভীষণ অশ্রাব্য কথা শুনিয়া সে ভগবানের নিকট চিরবধিরতা প্রার্থনা করিয়াছিল, সেই শ্রবণ-পথে এই সুমধুর সহানুভূতির সুর প্রবেশ করিয়া অরুণাকে বিহ্বল করিয়া দিল।

জননী বদনায় করুণার চক্ষে জল ভরিয়া আসিল। কহিল, “মা তুমি কাঁদছ কেন? শাস্ত্র বল কি হয়েছে।”

অরুণা অশ্রু মুছিয়া কহিল, “করুণা, আমি কিছুদিনেব মত এ বাড়ি ছেড়ে যাব। তুমি লক্ষ্মীমায়ের মত তোমার বাবার খাওয়া পরা দেখো, সেবা যত্ন করো। আমি জিনিসপত্তর ওছিয়ে তোমাকে সব বুঝিয়ে দেব, আর তোমাকে চাবি দিয়ে যাব। তুমি এম্মার থেকে সব দেখবে শুনবে। বুঝলে ত?”

করুণা সজোরে মাথা নাড়িয়া কহিল, “আমি সে সব কথা শুনতে চাইনে, তুমি কেন যাচ্ছ বল।”

অরুণা কহিল, “ছেলেমানুষের সব কথা শুনতে নেই। এইটুকু জেনে রাখ, এখানে কোন কাবণে আমার থাকা চলবে না। তোরা মা যদি আর না ফেরে, হ্যাঁ করুণ, তুইও কি তোরা মাকে ভুলে যাবি?” অরুণা উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

করুণা কঁাদ কঁাদ স্বরে কহিল, “যাও, তুমি যদি ওসব কথা বলবে ত আমি বাবার কাছে গিয়ে জেনে আসব কি হয়েছে”— বলিয়া করুণা তাহার পিতার উদ্দেশে চলিল।

অরুণা ব্যস্ত হইয়া ডাকিল, “করুণ, ও করুণ! শুনে যাও।” কিন্তু করুণা ফিরিল না— চলিয়া গেল।

পাঁচ মিনিট পরে করুণা ফিরিয়া আসিল। চক্ষে তাহার অশ্রুচল, অভিমানে তাহার কণ্ঠ নিরুদ্ধ।

অরুণা তাহাকে সাদরে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, “করুণ, কি হয়েছে না?”

করুণা জননীর বক্ষে মুখ লুকাইয়া ফুলিতে লাগিল। অরুণা তাহার মাথায় সম্মেহে হাত বুলাইয়া তাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিল। তাহার পব কিছু পরে তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া দেখিল, উচ্ছ্বসিত অশ্রুর প্রবাহে করুণার মুখখানি ভাসিয়া গিয়াছে।

“কি হয়েছে করুণ?”

করুণা কহিল, “মা আমিও তোমার সঙ্গে যাব।”

“কেন মা?”

“বাবা আমার মুখ দেখবে না বলেছে।”

এত দুঃখেও, ঘৃণায় ও ক্রোধে অরুণার চক্ষু অগ্নিকর্ণিকার মত জ্বলিয়া উঠিল। কহিল, “যত দিন আমি না ফিবব, ছেড়ে থাকতে পাবে?”

“পারব।”

“আচ্ছা, তবে তুমিও চল। তবে মনে রেখো করুণ, দুদিন পরে এখানে ফেরবার জন্যে অধীর হলে চলবে না।”

করুণা তাহাতে স্বীকৃত হইয়া কহিল, “মা, তবে আমার জিনিস পত্তর ওছিয়ে নিই?”

অরুণা কহিল, “না না, সে হবে না। এখান থেকে কোন জিনিস নিয়ে যেতে পারবে না। পড়েছ ত, পরের দ্রব্য না বলে নিলে চুরি করা হয়।”

বেলা যখন নয়টা, তখন অরুণা কন্যাকে লইয়া সুধাময়ের নিকট উপস্থিত হইল। সুধাময় ইন্ডিয়েয়ারে শয়ন করিয়া, মাথামুণ্ডু কত কি ভাবিতেছিল। সারা রাত্রির অনিদ্রা ও উদ্বেজনা তাহার মূর্তি উদ্ভ্রান্ত হইয়াছিল।

অরুণা ধীরে অবচলিত কণ্ঠে কহিল, “আমাদের গাড়ি এসেছে।” তাহার পর চাবির ওচ্ছ চেয়ারের হাতলের উপর রাখিয়া কহিল, “এই চাবির রিং রইল— এতে সব চাবি আছে। গহনার বাস্ক লোহার সিন্দুকে রইল।” আর আমার কাছে সংসার খরচের যে নগদ টাকা ছিল, সে টাকা ও হিসাব দেবাজের মধ্যে রেখেছি।”

তাহার পর একটু থামিয়া কহিল, “করুণের আর আমার সেভিংস্ ব্যাঙ্কে পাশ-বুক্ লোহার সিন্দুকে রইল।”

তাহার পর স্বামীর প্রতি একবার গভীর মর্মস্পর্শী দৃষ্টিপাত করিয়া গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

করুণা ঘাড় বাঁকাইয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে প্রণাম করিল না। অভিমানে তাহার মন আচ্ছন্ন হইয়াছিল।

অরুণা কহিল, “এস করুণ, আর দেরী করা নয়।” শেষের কথাগুলি বলিতে অরুণার কণ্ঠ কাঁপিয়া গেল।— প্রাণপণে যে শক্তিব বলে সে এতক্ষণ নিজে সন্মরণ করিয়া রাখিয়াছিল, সহসা তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম করিল।

মাতা ও কন্যা উভয়ে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে ঘব হইতে বাহির হইয়া গেল।

সুধাময় কাঠের মত ইজিচেয়ারে নীরব নিষ্পন্দ হইয়া পড়িয়া রহিল। তাহাব অন্তরের নিভৃত প্রদেশ হইতে দুইটি সামান্য কথা বারম্বার উঠিতেছিল ‘শুনে যাও।’ কিন্তু যেন যাদুমন্ত্রবলে তাহার জিহ্বা অসাড় হইয়া গিয়াছিল। কোনরূপেই মুখ দিয়া বাহির হইল না। শুধু মনে হইল, কে যেন তাহার হৃদয়ের মধ্যে গলিত লৌহ ঢালিয়া দিয়া চলিয়া গেল। অবাক্ত অসহ্য যন্ত্রণায় হতচেতনের মত সুধাময় পড়িয়া রহিল। তাহাব পর কিছুক্ষণ পরে বাত্মপথে যখন ওম্‌গুন্ করিয়া গভীর মর্মভেদী শব্দে একটা গাড়ি চলিয়া যাওয়ার শব্দ শুনা গেল, তখন সুধাময় দুই হস্তে সজোরে বুকের দুই দিক টিপিয়া ধরিল।

অরুণা প্রথমে বউবাজারে তাহার এক দুবসম্পর্কীয় আত্মীয়ের বাড়ি গিয়া উঠিল। তাহার পর সেই দিনই তাহার পিতৃদত্ত একখানা অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া, তাহার এক আত্মীয়কে সঙ্গে লইয়া রাত্রের গাড়িতে তাহার ভ্রাতার নিকট লাহোর যাত্রা করিল।

॥ ৫ ॥

বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন মনে করিল, সুধাময়ের মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিয়াছে, নহিলে সহসা স্ত্রী কন্যা শ্যালকের নিকট পাঠাইয়া দিয়া দিবারাত্র জ্যোতিষচর্চা লইয়া সে উন্মত্ত হইবে কেন? শুধু আফিসের কাজটুকু ছাড়া আহাৰ নিদ্রা প্রায় পরিত্যাগ করিয়া সে অহর্নিশ জ্যোতিষের পিছনে লাগিয়াছে। ক্রান্তি নাই, আলস্য নাই, বিরক্তি নাই, দিবাব্যত্র সুধাময় বহুবিধ পুস্তকের মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করিয়া গণনা করিতেছে। বিলাত ও আমেরিকা হইতে এমন মেল আসিত না, যাহাতে তাহার পুস্তক না আসিত। এ সকল দেখিয়া লোকে মনে করিত সে নিশ্চয় পাগল হইবে। বিমলানন্দ স্বামী তাহার মনের মধ্যে যে কি আঙন জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছিল, তাহার সন্ধান ত কেহ জানিত না।

একটা কথা মনে করিয়া সুধাময় কিছুই স্থির করিতে পারিত না। বিমলানন্দের গণনায় ভুল হইতে পারে এ কথা সেদিন তাহার মনে স্থান পায় নাই বটে, কিন্তু তথাপি অরুণার নিকট সুধাময় যে প্রস্তাব করিয়াছিল, তাহাতে অরুণা কোনমতেই স্বীকৃত হইল না কেন? সুধাময় যখন বিমলানন্দের গণনার সত্যাসত্য পরীক্ষা করিবার জন্য বিমলানন্দেরই দ্বারা অরুণার হস্তরেখা গণনা করাইবার প্রস্তাব করে, তখন দৃপ্ততন্ম্রে জ্বলিয়া উঠিয়া অকণা করিয়াছিল, “আমাকে এত সামান্য মনে ক’রো না যে নিজেকে এরূপ ঘৃণিত ভাবে পরীক্ষায় ফেলে নিজের আত্মনর্যাদাকে অপমান করব! এর জন্য তুমি যদি আমাকে ত্যাগ কর, তাহাতেও আমি বাজি আছি।” অরুণা যে কেবল আত্মসম্মানেরই জ্ঞানে সে পরীক্ষায় সম্মত হয় নাই, সে কথা সুধাময় কল্পনা করিতে পারিত না।

এইরূপ ভাবে এক বৎসব কাটিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে একবার সুধাময় তাহার শ্যালকের নামে কিছু টাকা পাঠাইয়াছিল। কুপনে সুধাময় লিখিয়াছিল— ‘কর্তবোর অনুরোধে মাসহাব।’ কিন্তু সেই মনিঅর্ডার যখন পৃষ্ঠে তীব্র বিদূপ ও তিরস্কার বহন করিয়া ফেরত আসিল তখন হইতে সুধাময় সম্পূর্ণভাবে নীরব হইয়া গিয়াছিল।

সেদিন অফিস হইতে আসিয়া সুধাময় দেখিল খানে মোড়া একখানা চিঠি আসিয়াছে। ডাকমোহর লক্ষ্য করিয়া দেখিল লাহোরের ছাপ। একবার মনে হইল চিঠিখানা না খুলিয়া মনিঅর্ডার ফেরতের পাশ্টা জবাব দিলে হয়। কিন্তু কি ভাবিয়া খাম খানা ছিঁড়িয়া চিঠি বাহিব করিল। সুধাময় মনে যাহা অনুমান করিয়াছিল চিঠি খুলিয়া কিন্তু দেখিল তাহা নহে। সে চিঠি করুণার, অরুণার বা তাহার শ্যালকের নহে; একজন ইংরাজ ডাক্তারের। নিম্নে নাম স্বাক্ষর রহিয়াছে ই. এম. বেনেট। পত্রের মর্ম এইরূপ।

“আপনি বোধ হয় অবগত নহেন আপনার কন্যা মিস করুণা সাংঘাতিকভাবে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত। জীবনের আশা তাহার নাই বলিলেই চলে। তবে কোন অবস্থাতেই রোগীকে পরিত্যাগ করা উচিত নহে বলিয়া আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি; আপনি পত্রপাঠ আমার লিখিত মত ব্যবস্থা করিবেন, বিলম্ব করিবেন না। আপনার কন্যাব যে বিশেষ কারণে এবং বিশেষ প্রকারের ক্ষয়রোগ হইয়াছে বলিয়া আমি সন্দেহ করিতেছি তাহা কদাচিত্ কাহারও হইতে শুনা যায়। যদি আমার অনুমান সত্য হয় তাহা হইলে আমার অভিজ্ঞতায় এই প্রথম। কোন ডাক্তারী বইতে আমি ইহার উল্লেখ দেখিয়াছিলাম বলিয়া মনে পড়ে। আমার সন্দেহ হওয়ায় মিস করুণাকে রন্টজেন-রের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। তাহার শরীরের কোন একটা বিশেষ স্থলে একটা বিকৃতি আছে। সেই বিকৃতিই তাহার এই ক্ষয়রোগের মূল। এখন এই রোগের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, এ রোগ যেমন কদাচিত্ হইতে দেখা যায়, তেমন বংশানুগতভাবে ভিন্ন অন্যপ্রকারে প্রায় হয় না। অর্থাৎ বাহার এই বোগ হইবে বুঝিতে হইবে তাহার পিতার অথবা মাতার কাহারও এই রোগ নিশ্চয় ছিল। আপনার পত্নীকে রন্টজেন-রের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, তাহার কোন লক্ষণ নাই। আমার অনুমান সত্য হইলে আপনার শরীরে অল্পই হউক বা অধিকই হউক একটা নিদর্শন পাওয়া যাইবে। সেরূপ কিছু পাওয়া গেলে রোগ নির্ণয় সম্বন্ধে আমার আর কোন সন্দেহ থাকিবে না। বুঝি আপনার নিকট হইতেই আপনার কন্যা এই বিকৃতি লইয়া জন্মিয়াছিল। তাহাব পর মানসিক কষ্ট বা শারীরিক অসুস্থতা এমনই কোন কারণেব জন্য সেই বিকৃতি সহসা বাড়িয়া উঠিয়া আপনার কন্যাব স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়াছে, এবং তদনুযায়ী চিকিৎসা করিব। এই পত্রের সহিত ডাক্তারের অবগতিব জন্য একটা নোট লিখিয়া পাঠাইলাম। আপনি অবিলম্বে মেডিক্যাল কলেজের কোন অভিজ্ঞ ডাক্তারের দ্বারা আপনার দেহ পরীক্ষা করাইয়া আমাকে ফলাফল জানাইবেন। বিলম্ব করিবেন না, মনে রাখিবেন, আপনার কন্যার পক্ষে এখন একদিন এক বর্ষের অনুরূপ।”

পত্র পাঠ করিয়া সুধাময় কিছুক্ষণ দুই বাহুর মধ্যে মাথা ঝুঁজিয়া বসিয়া রহিল। এই মর্মান্তিক ঘটনার মধ্য হইতে যে নিদারুণ সত্য নিজেকে প্রকাশ করিবার উপক্রম করিতেছিল তাহা যদি ঘটিয়া যায় তাহা হইলে? তাহা হইলে জ্যোতিষ শাস্ত্রের সমস্ত বহিতে আঙন লাগাইয়া নিজেকে পুড়াইয়া মারিলেও উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইবে না! সুধাময় তখন ডাক্তারের পত্র লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। মেডিক্যাল কলেজের একজন বিশিষ্ট অধ্যাপকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরদিন প্রাতে তাহার পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া আসিল।

পরদিন প্রাতে ডাক্তার সুধাময়ের হস্তে পরীক্ষার রিপোর্ট দিয়া কহিলেন, “না, আমার কোন সন্দেহ নাই। আপনার নিকট হইতেই আপনার কন্যা এ রোগ সঞ্চয় করেছে।”

শুনিয়া সুধাময়ের হৃদয় নিস্পন্দ হইয়া আসিল। সে অধীবভাবে দ্বিগ্জাঙ্গা করিল, “আমি যদি ইঠাৎ কোন গুরুতব মনকষ্ট পাই আমার রোগও সাংঘাতিকভাবে বেড়ে যেতে পারে নাকি?”

ডাক্তার সুধাময়কে দুর্বলচিত্ত মনে করিয়া একটু হাসিয়া কহিলেন, “না, আপনি সর্বদা প্রফুল্লচিত্ত থাকিবেন।”

ডাক্তার রন্টজেন-রের দ্বারা সুধাময়ের ব্যাধিরই সন্ধান পাইয়াছিলেন, সেই ব্যাধির আরও নিম্নস্তরে যে গভীর মর্মান্তিক যন্ত্রণা নিহিত ছিল তাহার সন্ধান পান নাই।

এক বৎসর পূর্বে নিউমার্কেটের সম্মুখে সন্ধ্যার সময় গ্যাসের আলোক সুধাময়ের চক্ষে ততটা নিম্প্রভ মনে হয় নাই, যতটা আজ মেডিক্যাল কলেজ হইতে বাহির হইয়া দিবালোককে সে স্তিমিত দেখিল!

এই এক বৎসর কি অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে দিয়া সে কাটাইয়াছে! নিরানন্দ, স্নেহহীন, প্রেমহীন, জীবন মহাপাপের নির্মম প্রায়শ্চিত্ত প্রতিনিয়ত ধীরে ধীরে করিয়া লইতেছিল, আজ সহসা নিদারুণ ভাবে সেই প্রায়শ্চিত্ত উদ্‌যাপনের অবস্থায় উপনীত হইয়াছে! যাহা অসত্য, যাহা অসম্ভব, যাহা অস্বাভাবিক তাহারই উপর নির্ভর করিয়া সুধাময় যাহাকে অস্বীকার করিয়াছিল, এইরূপ মর্মান্তিক উপায়ে সে প্রমাণ করিতে বসিয়াছে যে সে সুধাময়ের পর নহে, সে তাহার নিতান্ত আপনার, সে তাহারই বক্ষের রক্তমাংসে গঠিত। শুধু তাহাই নহে, একই ব্যাধির ছাপে সেই রক্তমাংস চিহ্নিত!

সেই দিনই অফিসে ছুটি লইয়া রাত্রের ট্রেনে সুধাময় লাহোর যাত্রা করিল।

কিন্তু তিন দিনের দীর্ঘ পথ কষ্টে এবং উদ্বেগে অতিক্রম করিয়া সুধাময় যখন করুণাব রোগ-শয্যা পার্শ্বে উপনীত হইল তখন করুণার অভিমানক্রিষ্ট জীবনের দুঃখভোগের আর বেশি বাকী ছিল না। সকল ব্যাধিকে যাহা নিরাময় করে, সকল যন্ত্রণার যাহাতে অবসান হয়, সেই মৃত্যুর মধুর আবেশে করুণা তখন জীবনপারের স্বপ্ন দেখিতেছিল।

সুধাময়কে দেখিয়া তাহার মুখে মৃদু হাসি এবং চক্ষে অশ্রু দেখা দিল। তাহাতে যে কতখানি অভিমান মিশাইয়া ছিল তাহা সুধাময় মর্মে মর্মে অনুভব করিল।

তাহার পর?— তাহার পর দুই ঘণ্টা পরে যখন করুণাব ক্রান্ত নয়ন দুটি সুগভীর নিদ্রাভরে ধীরে ধীরে মুদিত হইয়া গেল তখন অবাক্ত অদ্ভুত বেদনায় সুধাময় ও অকণা সেই নীরব নিষ্পন্দ প্রাণহীন দেহকে জড়াইয়া ধবিয়া পরস্পর মিলিত হইল।

## দ্বিদল কমল

### বিভূতিভূষণ ভট্ট

এক রাজা ছিলেন, সেই রাজার দুয়ো সুয়ো কুয়ো প্রভৃতি ক'টি যে রানী ছিলেন জানি না, কিন্তু একটি যে পরমাসুন্দরী মেয়ে ছিল এ বিষয়ে কারো সন্দেহ কববার কোনো কারণ নেই। কারণ এই গল্পটি (গল্প নয়) তারই বিষয়ে লিখিত। এবং যা লিখিত তা নিশ্চয়ই শ্রুত। আবার যা শ্রুতি তা নিশ্চয় ধ্রুব সত্য। অতএব প্রমাণ হল যে এক রাজার এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। এ প্রমাণ যে অগ্রাহ্য করবে শ্রুতিকে বিশ্বাস না কবার দরুন এই আর্থের দেশ আর্থ্যবর্তে তার স্থান নেই,— সে হয় কিঞ্চিৎকায় যাক, না হয় সাগর ডিম্বিয়ে মকক গে।

এখন, সেই রাজকন্যাটি যখন পরমাসুন্দরী তখন কাজে কাজেই সেই মেয়ের উপযুক্ত বর জোটান দায় হয়ে উঠল— বাপের পক্ষে হোক না হোক গল্পলেখকের পক্ষে ত বটেই। কত দেশের কত বাজপুত্র এসে ঘুরে গেল, কত মন্ত্রিপুত্র, কোটালের পুত্র, সদাগরের পুত্র, এসে কত ঘড়যন্ত্র করে গেল। কত রাক্ষস খোঙ্কস্ বেঙ্গনা বেঙ্গমী কত পক্ষীরাজ বোড়া আর তালপত্র খাড়া রাজকন্যার দবজায় এসে ডিগবাজী খেলে, কিন্তু সেখানে প্রবেশ করতেই পারলে না।

কেন? এ ত তোমাদের দোষ! 'কেন' জিজ্ঞাসা কর কেন বাপু— যাবা 'কেন' জিজ্ঞাসা করে তাবা গল্প শুনবার উপযুক্তই নয়। যারা গল্প শুনতে 'কেন', জিজ্ঞাসা করবে তাদের সব কলেজে পাঠিয়ে দাও, সেখানে গিয়ে ক্রমাগত কেন কেন করুক গে।

যা হোক, রাজকন্যার বর ত আর জোটে না। কেন? আবার 'কেন'? দূর হোক, বাপু, তবে উত্তরই দিই,— কিন্তু খবরদার আর কাউকে বলো না। শোনো, কানে কানে বলি— মেয়েটি একটি স্বপ্ন দেখেছিল।

হাসছ? ভাবছ এই বুঝি একটা ভারী গোপন কথা! স্বপ্ন ত সবাই দেখে, তা আবার এত কানে কানে বলতে হবে নাকি?

ওহে তোমরা ছেলেমানুষ, জান না, এ এমন দেশ যেখানে এ সব কথা কানে কানে বলতে হয়, নইলে সব বিফল হয়। মন্ত্র-তন্ত্র ঝাড়-ফুক সমস্তই কানে কানে বলতে হয়, নইলে কুকুব বেড়াল শুনতে পেলেও যে, সব বেকাঁস হয়ে যায়। যদি বলবার দবকাব হয় 'ফুস্টী আব ফাস্টী ধানটার মধ্যে তুষ্টী' তবু কানে কানে বলতে হবে, নইলে সব মাটি। স্বপ্ন যে ফলবে না, বুঝছ না?

শোনো না, মেয়েটি একটি স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু এমন স্বপ্ন, যার জন্য ঐ অত বড় রাজার অত বড় রাজাটার ইয়া ইয়া টীকি থেকে আরম্ভ করে ধান গাছেব শীষ, নৌকার হাল, বলদের লাজ সমস্তই নড়ে উঠেছিল। কিন্তু কি স্বপ্ন বল দেখি?

পারলে না? পারবে কেন? একি যে সে স্বপ্ন? একি যার তার দেখা স্বপ্ন? এ যে এক পরমাসুন্দরী রাজকন্যার পরম সুন্দর মগজে ইঠাং দেখা দিয়েছিল। তোমাদের মগজে তা ধরা দেবে কেন?

তবে বলি শোনো, রাজকন্যা স্বপ্ন দেখলে, —একটি অদ্ভুত পদ্ম অসম্ভব জলে ভাসতে ভাসতে অকারণে তার বুকে এসে ঠেকল। রাজকন্যা পদ্মটি হাতে নিয়ে দেখে তার মোটে দুটি পাপড়ি। সোনার বরণ পাপড়ি দুটোর মধ্যখানে একটি মাত্র অপরাধ কেশর উর্ধ্বদিকে উঠেছে। আর পদ্মটির এমনি গুণ যে পদ্মটি হাতে নেবা মাত্র রাজকন্যা যেন অজ্ঞান হয়ে গিয়ে সেই পদ্মটির মধ্যে মিলিয়ে গেল। তার পর সেই কেশরটিব মধ্য দিয়ে কোথায় যে কোন আলোকপথে চলে গেল, সে কথা আর জেগে উঠে সে মনেই করতে পাবলে না।

তারপর, জেগে উঠে, এই যে কান্না জুড়ে দিলে তার আর বিরাম নেই। বালিস ভিজল, বিছানা ভিজল, এমন কি শেষে তার মা-বাপের মনও ভিজল পাক হয়ে গেল। তাঁরা প্রতিজ্ঞা করলেন, মেয়ের এই স্বপ্নলব্ধ দুই পাপড়ির পদ্ম যে এনে দেবে তার সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেবেন— অবশ্য অর্ধেক রাজত্ব ত যৌতুক আছেই।

এখন বল দেখি তোমরা সেই দুই পাপড়ির পদ্ম কোথাও দেখেছ? এতক্ষণ যে হাসছিলে, হাস দেখি এইবার? চালাকী!— একি যে সে স্বপ্ন?

যাক আর ভেবে কাজ নেই, কারণ ভেবে কোনো ফল নেই। এতো আর ইক্ষুল কলেক্ত ছাড়া নয় যে এক কথায় ঝুলি যাড়ে করে বেরিয়ে গন-কো-অপারেসনেব সব মীমাংসা সমাধান করে ফেলবে? বাপু, এ হচ্ছে দ্বিদল পদ্ম, এবং এক রাজকন্যাব মগজে গভিয়ে উঠেছে। একে কি সহজে পাওয়া যায়?

একে সহজে পাওয়া যায় না, তাই সেই রাজার রাজ্যেব মন্ত্রী হতে যন্ত্রী, সবকাব হতে কর্মকার সকলেব মাথা গবন হয়ে উঠল, কিন্তু এব সন্ধান কেউ নির্ণয় কবতে পারলেনা। সাবা রাজ্য ভরে একটা সন্দেহ একটা তর্ক একটা ভয়ের ঢেউ উঠলো— কিন্তু পদ্মটি কেউ মেলাতে পারলে না।

তখন রাজপুত্রবা বেরিয়ে গেলেন পক্ষিরাজে চড়ে, মন্ত্রি-পুত্রবা বাসে গেলেন মনু যান্ত্রবন্ধ্য পেড়ে, সদাগরের পুত্ররা ভাসলেন ময়ূরপংক্ষী সাজিয়ে, আব কোটালের পুত্রবা তালচুকতে লাগলেন তালপত্র খাঁড়া ঘষিয়ে মাজিয়ে। কত হাত চালান, নল চালান, কত উর্ধ্বপাতন, তির্যক পাতন, কত দূরবীক্ষণ অনুবীক্ষণ, কিছুতেই সেই দ্বিদল পদ্মটির আর খবর মেলেনা। কত রত্নদ্বীপ মণিদ্বীপের খবর মিলল, মণিবন্ধে রাজার ভাণ্ডাব ভাবে উঠল কিন্তু যার জনো সব বিফল সেইটাই মিললনা, তাই রাজকন্যাব চোখের জল আর থামল না। কত বাজপুত্র কত সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে, কত সোনার পাহাড় মুক্তোর ঝরণা রূপোর নদীর খবর নিয়ে এল, কিন্তু স্বপ্নের ফুলটি স্বপ্নতেই থেকে গেল। কত রাক্ষস খোক্ষস গন্ধর্ব কিন্নরব খবর নিয়ে রাজকন্যার কাছে তারা এল কিন্তু রাজকন্যাব চক্ষুদুটি জলে ভরেই রইল, কার সঙ্গে চার চক্ষে আর মিলনই হল না। কত সদাগরের পুত্র পদ্ম মহাপদ্ম খর্ব নিখবের খবর দিলে, কিন্তু রাজকন্যা মুখই তুলে চাইলে না। কত মন্ত্রি-পুত্রেরা চতুর্দল অষ্টদল সহস্রদলের বড় বড় শ্লোক শুনিয়া গেল কিন্তু সেই পদ্মপত্রাক্ষির নয়নপদ্মের দৃষ্টি কোন্ দুটি সোনার দলের আশায় যে মুদিত হয়ে রইল তা কেউ বলতেই পারলেনা। কোটালের পুত্ররা খাঁড়া ঢাল ঝাকালে 'ইয়া কবেঙ্গা' 'উয়া করেঙ্গা' 'মাবেঙ্গা' 'কাটেঙ্গা' 'কুকুর মেরে ফাঁসী যাস্গা' করলে কিন্তু স্বপ্নের পদ্ম স্বপ্নের আলোকেই বয়ে গেল। সে বুঝি আর বাইরে ধরা দেয় না! হায় হায় কি হবে? কে রাজকন্যার সেই স্বপ্নের ধন এনে দিয়ে রাজ্যরক্ষা করবে? সেই অরুণ রাক্ষা দ্বিদল কমলে একটি কেশর কে দেখাবি গো, কে দেখাবি?

রাজা ভরে এই শব্দ 'কে দেখাবি গো— কে আছিস।' সমস্ত রাজ্য নাথা নীচু করে বললো, কেউ না। লজ্জায় উত্তর হতে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম সমস্ত দেশের আকাশ বাতাস পর্যন্ত রাক্ষা হয়ে উঠল। এ দারুণ লজ্জা হতে কেউ কি এদের রক্ষা কবতে পারবে না?



হেন কালে এক রাখাল এসে হাজির হল। শুনে হাসছ? হাসগে— রাখাল কিন্তু এল। সে চরাচ্ছিল গরু— তার গায়ে ছিল একটা উড়ুনি, পরনে ছিল ধড়া, হাতে ছিল একটা বাঁশের বাঁশি। সে ছিল মাঠে— তার মুখে পড়েছিল প্রভাতসূর্যের আলো, তার বুকে এসে লেগেছিল দূরদূরান্তের হাওয়া। আর কানে এসে বেজেছিল একটা শব্দ— তার বাঁশির তাইরে নায়ের মধ্যে হঠাৎ জেগে উঠেছিল একটা শব্দ— আয়রে আয়। তাই সে এসেছে।

সে রাখাল, তাই সে অমনি ছুটে এসেছে, কোনো দ্বিধা করে নি— কোনো বাধা মার্মনি। কোনো শাস্ত্র শস্ত্র যন্ত্র তন্ত্রের পরামর্শ নয়নি। সে তার মাঠের হাওয়ার মত আলোর মত গানের মত স্বাধীন, তাই সে এসেছে। সে রাখাল, তাই রাজার সিংদরজার বাধা সে মানলে না, সিপাই সান্ধীদের দিকে সে চাইলে না, মন্ত্রী যন্ত্রীর শ্রোক সে শুনলে না— একেবারে রাজবাড়ির সাত মহল সাত দবঙা পার হয়ে সে রাজকন্যার সুমুখে এসে দাঁড়িয়ে বললে, ‘আমি এনিছি গো এনিছি, পদ্মের খবর এনিছি।’

রাজকন্যা মুখ তুলে চাইলে, অমনি চার চক্ষু মিলে গেল— জল মুখে রাজকন্যা হেসে বললে, ‘ও গো বীর এসেছ? এনেছ? কৈ দাও? কৈ আমার হৃদয় কমল?’

রাখাল বললে— ‘একটি দল তুমি আর একটি দল আমি— তোমার আমার এই সত্যিকার মিলন হতে যে ইচ্ছা কেশর— একটি মাত্র ইচ্ছা কেশর দেখা দিল সেই ইচ্ছেকে ধরে কোন লোকে যে আমরা যাব তাত’ কাউকে বলব না।’

আমার কথাটি— এঁা ফুরল না? আরো আছে নাকি? আচ্ছা তবে কি আছে তা তোমরাই বল? নটে গাছ মুড়ুল তবে আমার কথা ফুরবে না? তবে নাই ফুরোক, তবে যেন নাই ফুরোয়। তবে যেন এমন করে সাহস কবে বীরের মত বনের রাখাল আমার রাজকন্যাব কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলে, ‘আমি এসেছি গো এসেছি। আমি তোমায় ভালবেসেছি, সত্যি ভাল বেসেছি।’ আর সেই সত্যালোকের মানুষটির কথায় যেন আমার রাজকন্যার হৃদয় কমল ফুটে ওঠে। যেন সেই মনকমলের ইচ্ছেকেশর হলেদুলে বেড়ে উঠে এ লোক হতে আলোকপথে আমার রাজকন্যাকে আলোকপানে নিয়ে যায়। ওগো তোমরা আশীর্বাদ কর আমার রাজকুমারী যেন সেই রাখালকে পায় গো পায়— যার প্রেমের বাঁশির পাঁচন ছুঁইয়ে দিতেই লোহাব কপাট খুলে যায়, পাথরের দেয়াল পড়ে যায়, বাহির ভেতর এক হয়ে যায়, পাখি গায়, ফুল ফোটে, হাওয়া বয়, হাসি ছোটে, আনন্দে ভরপুর হয়ে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম গেয়ে ওঠে মেতে ওঠে।

বাস, আমার কথাটিও ফুরল না, নটে গাছটিও মুড়ুল না, হল ত?

## আলোয়া নিরুপমা দেবী

সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে। নব-নির্মিত বম্পাস টাউনে একটি অসমতল মাঠেব মধ্যস্থ একখানি “কুটারের” ছাতে ত্রিকূট দর্শন-ক্লাস্ত আমরা জনকয়েকে মাদুব পাড়িয়া গড়াইতেছিলাম। আজিকালিকার এই মাত্রাধিক্য বিনয়ের ফাসানে দেওঘরকে কেহ জিতিতে পারিবে না। আবাস—‘ভিলা’, বা ‘লজ’—দুই একখানা দেখা গেলেও অনেক প্রাসাদতুলা অট্টালিকাও এখানে ‘কুটার’ নামে অভিহিত। “বৈদ্যনাথধামে গৃহবাসী হইতে বোধ হয়, কাহারও কাহারও লজ্জা বোধ হয়, তাই অনেকে এখানে ঐরূপ এক একখানি ‘কুটার’ই বাঁধিয়াছেন এবং সেই “কুটারের” অভাগতবর্গও সুবেশা সঙ্গিনীগণ সমভিব্যাহারে স্থানে মশানে বিচরণ করিয়া কুটারবাসের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া থাকেন। বঙ্গের গৃহকোণাবদ্ধারা ও বাঙ্গালা হইতে দুই পা মাত্র অগ্রসর হইয়া, এখানের রাস্তাঘাটে এমন ভাবে বিচরণ কবেন যে, তাহা দেখিয়া তাঁহারা কোন কালেও যে অস্তঃপুরচাষিনী ছিলেন, এমন যেন বোধই হয় না।

সেকথা যাউক। পূর্বে ত্রিকূট, পশ্চিমে দিগ্‌ড়ীয়া, এবং দক্ষিণে অজ্ঞাতনামা একটা পাহাড় দেওঘরকে বেষ্টিত করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। (নন্দন পাহাড় বা তপোবন-শিখর ইহাদের নিকটে ধ্বংসের মধ্যেই নহে!) আকাশ নক্ষত্র-বিরল, ঈষৎ মেঘাচ্ছন্ন। গৃহবিরল বম্পাস টাউনের কয়েকটি গৃহ হইতে আলোক-শিখা সেই অন্ধকারময় প্রান্তরেব জমাট অন্ধকারকে স্থানে স্থানে যেন দ্বিগুণ ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছে। ভ্রমণকারী নরনাভীর দল তখন নিজ নিজ আবাসে ফিরিয়াছেন। কোথাও কোনও গৃহ হইতে গ্রামোফোনের নানা বসসম্বিত সঙ্গীত উঠিয়া উদ্দাম বায়ুপথে ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

দুইদিন হইতে পশ্চিমের দিগ্‌ড়ীয়া পাহাড়ে আগুন ধরিয়াছিল। সেরাহ্রে অগ্নি পাহাড়েব শিখরদেশ হইতে নামিয়া তাহার বিস্তীর্ণ কর্ণদেশেব একপ্রান্ত হইতে অপব প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া একগাছি উজ্জ্বল মালার ন্যায় জ্বলিতেছিল। আমরা মুন্ধনেহ্রে পর্বতের এই অপূর্ব দীপালি দেখিতে, সেই অগ্নি মনুষ্যহস্তদত্ত অথবা দাবানল হইতে পাবে কিনা, তাহারই বিষয়ে তর্কবিতর্ক করিতেছিলাম। এমন সময়ে সহসা কাস্টেয়ার্স এবং বম্পাস টাউনের মধ্যস্থিতা বালুতলবাই সন্ধীর্ণা শুদ্ধশবীবা “যমুনা-জোড়” নদীর তীবে একটা আলোক অস্বাভাবিক উজ্জ্বল্যেব সহিত দপদপ করিয়া জ্বলিয়া উঠায় সকলেব দৃষ্টি সেইদিকে আকৃষ্ট হইল। আলোকটি কয়েক মুহূর্ত্ত একভাবে জ্বলিয়া সহসা দক্ষিণ দিকে চলিতে আরম্ভ করিল এবং খানিক অগ্রসর হইয়াই দপ করিয়া নিবিয়া গেল। ক্ষণপরেই আবার দেখা গেল সেই আলোক বারমর্দিকে চলিয়া আসিয়াছে। এবং জ্বলিতে জ্বলিতে বিশৃঙ্খলভাবে একস্থান হইতে অন্যস্থানে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে।

সকলে একযোগে খলিয়া উঠিল, ‘আলোয়া’—‘আলোয়া’। আমরা আগ্রহেব সহিত সেই আলোকেব নিব্বাণ প্রজ্জ্বলন এবং ইতস্ততঃ সঞ্চরণ লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। আলোক জ্বলিতে

জ্বলিতে, যমুনা-জোড়ের তীরে তীরে পূর্বাভিনুখে চলিল এবং বহুদূর গিয়া আবার নিবিয়া গেল, কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরে দেখা গেল, বম্পাস টাউনের দক্ষিণস্থ “কান্‌হাইয়া জোড়” নামে ‘যমুনা-জোড়’ অপেক্ষাও সঙ্গীর্ণ একটি পর্বতপথবাহিনী নদীর তীরে তেমনই একটি আলোক জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং সেইরূপ ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। উত্তরেব যমুনা-জোড়-তীরের আলোক তখন নির্বাপিত। সকলেই মৃদুমন্দ বিস্ময়-ওজ্জ্বল আরম্ভ করিতেই পল্লীবাসী একজন বন্ধু বলিলেন, “ও তো ভুলোর আলো! ও তো মাঠে মাঠে অমনি একদিক থেকে আর একদিকে ছুটোছুটি ক’রেই বেড়ায়। ‘রাতবিরাত্’ বা রাত্তাঘাটে ওদের নাম ক’রলেও বিপদ ঘটে। যেমন অপদেবতাব নাম করলেই তাঁরা সেখানে অধিষ্ঠিত হন, তেমন রাত্তায় ভুলোর নাম করলে বা আলো ধ’রে চললে, মরণ ত’ নিশ্চিত! তা’ ছাড়া আবার ঘরে বসে বাত্রে ওর নাম করলে, কোন না কোন পথিক, সে বাতে ওব খপ্পরে পড়বেই!”— তাহার কথায় তখন আর আমাদের কান দিবার অবসর ছিল না। এখন শিক্ষিত বন্ধু কয়টির মধ্যে বিষম তর্ক বাধিয়া গিয়াছে। হাত-পা ওটাইয়া বয়োজ্যেষ্ঠ বিজ্ঞ বন্ধুর কোল ঘেসিয়া ওইয়া, থিয়জফিস্ট বন্ধু তাঁহাকে ধমকের উপর ধমক দিয়া নির্বাক করিয়া দিতেছেন। একই সময়ে দুই ধারের দুইটি নদীর তীরে উক্ত আলোক জ্বলিয়া উঠার অপরাধে তিনি আর তাহাকে কিছুতেই “আলোয়া” বলিতে দিবেন না,— এই তাঁহার পণ। বিজ্ঞ বন্ধুর তাহাতে আপত্তি দেখিয়া, তাঁহার রোখ আরও চড়িয়া উঠিতেছিল। বিজ্ঞ বলিতেছিলেন, “নিসর্গের মধ্যে এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার অনেক সময়ই ঘটে, আপাতদৃষ্টিতে যার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না! কে বলতে পারে যে, দুটো নদীর মুখে যোগ নেই! মাঝের মাঠটা ত খুব বেশী বড় নয়।” তাঁহার কথা তখন কে শোনে। ঐ আলোকটি যে ভৌতিক, ইহারই প্রমাণের জন্য সকলেই প্রায় একযোগে ও বিষয়ে যাহার যত অভিজ্ঞতা আছে, তাহার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলেন। থিয়জফিস্ট তো পরম বৈজ্ঞানিক ক্রুক্স ও মহামান্য ওয়ালাস্ হইতে আরম্ভ কবিয়া ক্ষীবোদবাবু, মণিলালবাবুর “অলৌকিক রহস্য” এবং ভূতুড়ে কাণ্ডের গল্প পর্য্যন্ত সে সভায় উপস্থিত করিলেন। আমাদের বিজ্ঞ এইবার শ্রোতাদের জন্য একটু উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, “এ গল্পগুলো কান্‌কের জন্য রাখলে হত না?” শ্রোতৃবর্গের একস্থানে তাল-পাকানোর গতিক দেখিয়া তিনি সকলের রাগে অনিদ্রা এবং দুঃস্থপ্নেব আশঙ্কা করিতেছিলেন। থিয়জফিস্ট ইতি মধ্যে নিকটে আলোক আনাইয়াছিলেন; এক্ষণে বাহিত বন্ধুবর্গের মধ্যে আপনাকে সুবক্ষিত দেখিয়া, বন্ধুর বাহুতে মাথাটিও তুলিয়া দিয়া বলিলেন, “কিসেব ভয়!” তাঁহাকে আঁটিতে না পাবিয়া জ্যেষ্ঠ বন্ধু বিনীত ভাবে বলিলেন, “না, ভয় আর কিসের? তবে এই গল্প-কলাব উত্তেজনা ফুরিয়ে গেলে, হযত সিঁড়িতে পা বাড়াতেও কষ্ট হবে, তার চেয়ে চল নীচে যাওয়া যাক।” তখন একথার সারবস্তা বুঝিয়া সকলে উঠিতে চাহিতেছিল, এমন সময়ে নীচে হইতে একব্যক্তি সংবাদ লইয়া আসিল, আমাদের ব্রিকুট দর্শনের সঙ্গী কাষ্টেয়ার্স-টাউনস্থিত বন্ধুবর্গ সম্প্রতি বেকালে হাওয়া খাইতে বাহির হইয়া হারাইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের চাকরেরা রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া এক্ষণে তাঁহাদের খুঁজিতে বাহির হইয়াছে এবং তাহাদের ভীতি-সমাচ্ছন্ন মুখে এতদ্ব্যুৎ প্রকাশ পাইল যে, তাহারাও সম্ভার সময় বাঙাল করিতে গিয়া পথ হারাইয়াছিল এবং অতিকষ্টে রাত্রি নয়টার সময় বাসা খুঁজিয়া পাইয়াছে বটে, কিন্তু মনিবদেব এখনও ফিরিতে না দেখিয়া, তাঁহাদের সম্বন্ধেও সেই আশঙ্কা কবিতেছে। পল্লীবাসী বন্ধু সগর্বে বলিলেন, “বাত্রে ‘ভুলো’র নাম করার ফল হাতে হাতে দেখলে ত’? তোমবা মান না কিন্তু আমরা এম্‌ন কতশত প্রত্যক্ষ ফল ফল্গুতে দেখোছ।”

“এতক্ষণ হয়ত তাঁরা বাসায় ফিরেছেন। কাল সকালে অতি অবশ্য তাঁদের পৌছানো খবর আমাদের দিয়ে যেও।”— (তাঁহারা সত্যি সেদিন সদলে পথ ভুলিয়াছিলেন এবং বহু কষ্টে রাত্রি দশটার সময় বাসায় উপস্থিত হন। কিন্তু তাঁহাদের আত্মীয় পুরুষ অভিভাবকটি সর্বাপেক্ষা মজা করিয়াছিলেন। তিনি কোনও কার্যানুরোধে একাই সে রাত্রে একদিকে যান এবং পথ ভুলিয়া একেবারে উইলিয়ামস্ টাউনে গিয়া হাজির হন। শেষে সেহান হইতে গাড়ী করিয়া রাত্রি বারোটার সময় গৃহে ফিরিয়া এই “প্রহসন প্রাপ্তিকে” তিনিই সর্বাপেক্ষা উপভোগ্য করিয়া তুলেন।— কিন্তু তাঁহারা কেহই ‘আলোয়া’র আলো দেখেন নাই, এটুকু এখানে বলা উচিত।) তাঁহাদের ‘করদের এই কথা বলিয়া বিদায় করিয়া দেওয়া হইল এবং ঘটনাচক্রে পল্লীবাসী বন্ধুর কথিত “ভুলোর আলো”র নামমাহাত্ম্য এইরূপে সদ্যপ্রমাণিত হওয়ায় অগত্যা বিরুদ্ধবাদীদের মস্তক নত করিতে হইল। তাঁহার আর গর্বের সীমা রহিল না।

আমাদের কবিরাজী এতক্ষণ ঝিমাইতেছিলেন। ডাকাডাকিতে তিনি চক্ষু চাহিয়া হস্তেব হস্তিতে সকলকে নিকটে বসিতে বলিলেন, তাঁহার রকমসকমে আবাব কি ব্যাপার না জানি ভাবিয়া সকলেই তাঁহার নিকটে নিঃশব্দে বসিয়া পড়িলাম। তিনি গভীর স্বরে বলিলেন, “ও আলোর তথ্য আবিষ্কার হইয়াছে; যদি কেউ এখন সাহস করে ঐ আলোটোর সম্মানে যেতে পার, তাহলে দেখতে পাও, যমুনা-ভেড়ের ধারে একজন সন্ন্যাসী একটা ধূনী জ্বলে বসে আছে, এবং মাঝে মাঝে জ্বলন্ত ধূনীর কাঠটা দপ্ দপ্ করে জ্বলিয়ে নদীর ধারে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে।”

বিশ্ময়ে আতঙ্কে শ্রোতৃবর্গ আমবা অত্যন্ত ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া পড়িলাম। বিজ্ঞ ঈশং মাত্র হাসিলেন— তাঁহার সেই হাসিটুকুতেই আমবা তাঁহার উপব চটিয়া উঠিলাম। এমন সময় হাসি।— তিনি বলিলেন, “তা তো এখন আমবা কেউ যেতে পারছি না, অতএব”—

থিয়জফিষ্ট ইহারই মধ্যে আবার তাঁহার ক্রোডেব নিকটস্থ স্থানটি দখল করিয়া (মত ও বিশ্বাস লইয়া সর্বদা বিজ্ঞের সহিত থিয়জফিষ্টের বিবাদ চলিলেও ভয় পাইলেই থিয়জফিষ্ট— অভিজ্ঞতা বয়স ও সাহসে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞ বন্ধুটির ক্রোডদেশটি সর্বাগ্রে অধিকার করিতেন।) এক্ষণে তাঁহার মুখ হইতে কথাটি কাড়িয়া লইয়া বলিলেন—

“তাতে কাজ নেই, তুমিই কি বলতে চাও বল!” ভয় পাইতে এবং গল্প শুনিতে, উভয়েই তিনি অগ্রগণ্য।

সকলের আতঙ্কে এবং আগ্রহে অচল অবস্থা লক্ষ্য করিয়া অগত্যা বিজ্ঞ বলিলেন, “যতক্ষণ নীচের লোকেবা এসে আমাদের টেনে নীচে নিয়ে না যায়, ততক্ষণ তবে তোমার ধূনীর গল্পই চলুক।”

কবি চক্ষু মুদ্রিয়া বলিতে আবস্ত করিলেন।

সে বর্ষদিনের কথা। দেওঘরের অধিকাংশ স্থানই তখন শাল-পলাশ-মহুয়া প্রভৃতি বৃক্ষে এবং ঘনবৃহৎ কটকময় গুল্মে একেবারে গভীর বনের পর্যায়ভুক্ত। এই অসমতল কঙ্করময় কঠিন ভূমির স্থানে স্থানের উচ্চতারেখা তখন ঐ নন্দন-পাহাড়ের বক্ষ স্পর্শ করিত। সেই গভীর বনমাধো এবং বৃক্ষবিরল অসমতল রক্ষ প্রান্তরে ঐ যথাতথা-উদ্ভূত সুকৃষ্ণবর্ণ পর্বতের ক্ষুদ্র সংক্বেগগুলা অথবা তাহাদের বহুদূরবিস্তৃত শিকড়গুলা বন্য মহিষ, হস্তী বা বনচর কোন বিকট পশুর ন্যায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া, দেবদর্শনাকাঙ্ক্ষী যাত্রিগণের ভীতি উৎপাদন করিত। প্রাচীন ‘পুরন্দর’ই তখন কেবলমাত্র দেওঘরের জনপদ। উইলিয়ামস্ সাহেব তখনও বন কাটাইয়া উইলিয়ামস্ টাউনের পত্তন করেন নাই, কাষ্টোয়ার্স বা বম্পাস টাউনের কল্পনাও তখন দেওঘর অধিবাসীবা স্বপ্নে দেখে নাই।

গভীর বন মধ্যবাহিনী ‘যমুনা-জোড়’ ও ‘কান্‌হাইয়া-জোড়’ ও তখন এইরূপ বালুকাবিশিষ্ট-শরীরা ছিল না। তাহা বা ‘দিগড়ীয়া’ পাহাড় হইতে নামিয়া আসিয়া সেই শ্যামল শালবনের নিম্নে অতি খর বেগেই বহিয়া যাইত। খাত এইরূপ সঙ্কীর্ণ ছিল বটে, কিন্তু জল অগভীর ছিল না। বিশেষ বর্ষায় যখন পাহাড়ের ‘চল’ নামিয়া নদীতে ‘বুহা’ আসিত, সে দিন সেই সঙ্কীর্ণ অখ্যাতনামী পার্বতীদ্বয়ের স্রোতবেগে পড়িলে, বোধ হয়, মত্তহস্তীও ভাসিয়া যাইত।

এই দেবঘরের পাঁচকোণ পূর্বে গভীর বনের মধ্যে ঐ ত্রিকূট পর্বতের ওহায় একজন সম্মাসী বাস করিতেন। সাধুরা তীর্থে বাস করিয়াও যেমন লোকচক্ষুর অগোচরেই থাকিতে ভালবাসেন, সম্মাসীও সেই উদ্দেশ্যে সেই নিঃশব্দ পর্বতওহায় থাকিতেন। তখন দেওবাবে বাঙ্গালী বাবুদের এত ছড়াছড়ি পড়ে নাই! যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের এত দুবস্ত সখ ছিল না যে, সেই বন ভাঙ্গিয়া ব্যাব্ৰভঙ্কের মুখে পড়িবার ভয় পাহাড়ে উঠিতে আসিবেন। দুব গ্রামস্থ অধিবাসীরা সেই পাহাড়ে “দেও” ছাড়া অন্য কেহ যে বাস করিতে পারে, এ বিশ্বাস করিত না। সেই লোকচক্ষুর অগোচরে সম্মাসী কতদিন হইতে যে সেখানে বাসস্থান করিতেছেন, তাহাও কেহ জানিত না; কেবল কয়েক বৎসর হইতে শিবচতুর্দশী কিংবা একপ কোন কোন দিবসে একজন সম্মাসীকে বৈদ্যনাথের পূজকেরা বনফুল হস্তে শিবমন্দিরে পূজার্থে উপস্থিত দেখিতে পাইত।

সেদিনও সম্মাসী বৈদ্যনাথের পূজাস্তে সেই বনপথ ধরিয়া নিজ বাসস্থান অভিমুখে ফিরিতেছিলেন। হস্তে একটি লোহিত বর্ণের অর্ধশুট শতদল। শ্যামল শালপত্রের ঠোঁটায় কতকগুলি পলাশ আকন্দ প্রভৃতি বনফুল তুলিয়া লইয়া গিয়া তিনি বৈদ্যনাথের পূজা করিয়াছিলেন; কিন্তু পূজাস্তে উঠিবাব সময় একজন পাণ্ডা শিবনির্ম্মলা ও প্রসাদ-স্বকপ “তাগী বাবা” ব হস্তে শিবসাগর উদ্ভূত একটি ক্ষুদ্র শতদল ও কিছু মিষ্টান্ন প্রসাদ তুলিয়া দিয়াছে। সম্মাসী মন্দিরের বাহিবে আসিয়া অন্যান্য দিনের ন্যায় সেই প্রসাদের কণামাত্র ধারণ করিয়া, বাকিটুকু কোন ব্যাধিগ্রস্ত ভিক্ষুর হস্তে দিয়াছেন। তখন দুবারোণা ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি ভিন্ন বৈদ্যনাথে এখনকার মত ভিক্ষুর পাল ছিল না। কিন্তু কি জানি কেন, তিনি ফুলটি সেদিন হস্তে লইয়াই চলিয়া আসিয়াছেন। গিরিতলস্থ বনভূমি সেদিন বসন্তের পূর্ণতা-বিহীন। সতেজ, সবল শ্যামবর্ণ শাল-শাম্মলী, পশাল-মধুক মেছয়াফুল ও বনপুষ্পের গন্ধে পবন সুবাসিত। পাখীর গানে যেন বনদেবীদেরই কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীত বলিয়া কণ্ঠের ভ্রম জন্মিতেছে। তাহাদের মঞ্জুরী ববে এব- অঞ্চল গন্ধে মাঝে মাঝে বন যেন শিহরিয়া উঠিতেছে। কোথাও কীচক-রক্ত প্রবিশ্ট বায়ু কিম্বেব ৫৭’পরী বংশীস্বরের অনুকরণ করিতেছে। বনা মহিষ, চমবীগাভী, কোথাও বা হরিণদল অদা যেন অধিকতর নির্ভয়ে— অধিকতর নিকির্ব্বোধ ভাবে— যুগ্মে যুগ্মে চরিয়া বেড়াইতেছে, পরস্পর পরস্পরকে নানারূপে স্নেহ জানাইতেছে। সম্মাসী দেখিতে দেখিতে যাইতেছেন। সেই তরুণ যৌবনের পঠিত কুমারসম্ভবের শ্লোকগুলো সহস্রা অদা তাঁহার মনের মধ্যে আপনা হইতে যেন বাজিয়া বাজিয়া উঠিতেছিল। বনস্থলীর এই বসন্ত সাগমকে যেন অদা তাঁহাব সেই অকাল-বসন্তোদয়ের দিনের মতই বোধ হইল। ঠিক যেন সেই দৃশ্য।

‘কাষ্ঠাগতস্নেহবসানুবিদ্ধং দ্বন্দ্বানি ভাবং ক্রিয়য়া বিবক্ৰঃ।।

মধুদ্বিরেফঃ কুসুমেকপাত্রে পপৌ প্রিয়াং স্বামনু-বর্তমানঃ।।

শৃঙ্গেন চ স্পর্শনির্ম্মলিতাক্ষীং মৃগীমকণ্ঠ্যত কৃষ্ণসারঃ।।

দদৌ বসাৎ পঙ্কজরেণুগন্ধি গজায় গণ্ডুষজলং করেণুঃ।।

অর্দ্ধোপভুক্তেন বিসেন জায়াং সম্ভাবয়ামাস রথাস্গনামা।।”

সন্ন্যাসী ক্রমশঃই অধিকতর বিমনা হইতেছিলেন। সহসা ত্রিকুটের উন্নত শৃঙ্গ দৃষ্টি পড়িবামাত্র তিনি মনের এই দুর্বলতায় লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া ভাবিলেন এ কি! এখনো কি তাঁহার অন্তরের কোন কোণে লুকাইয়া আছে। অথবা এ কাহারও ছলনা? সেই “অকালিকী মধু-প্রবৃত্তি”র দিনে মহাদেবের তপোবনবাসী তপস্বীদের মনও বুঝি অকাবণে এইরূপই সংক্ষুব্ধ হইয়াছিল। এইবার গর্বেষের হাসি হাসিয়া সন্ন্যাসী মনে মনে উচ্চারণ করিলেন— “কাহার ধ্যান ভঙ্গিতে তোমার এ আযোজন বসন্ত? এ আশ্রমের রক্ষী ত্রিকুটের উন্নত শিখর ঐ যে নন্দীর মতই মুখে দক্ষিণ অঙ্গুলী স্থাপন কবিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। এ চাপলা সংবরণ কর— নহিলে মুহূর্ত্তে ভস্ম হইয়া যাইবে। তোমার এ মায়ার ওখানে প্রবেশাধিকার নিষেধ।”

সহসা সন্ন্যাসীর গতি-রোধ হইল। দক্ষিণেব ডালপালাগুলো বড় জোরে নড়িয়া উঠায় কোনও হিংস্র জন্তু ভাবিয়া সন্ন্যাসী চকিত দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিলেন এবং পরমুহূর্ত্তেই বিস্মিত ও স্তব্ধ হইয়া পড়িলেন। এই দৃশ্যটি সম্পূর্ণ অচিন্ত্যপূর্ব্ব। দুই হস্তে সেই কণ্টকময় ঘন বনেব শাখা-প্রশাখা ঠেলিয়া একটি কিশোর বালকমূর্ত্তি সন্ন্যাসীর নিকটস্থ হইবার চেষ্টা করিতেছে। কণ্টকগুণ্ম ও বনলতার শ্যাম বাহুতে বালকের সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টিত, অর্দ্ধমলিন হরিদ্রাভ উত্তরীয়খানি এবং বাহু ও পৃষ্ঠদেশ— লম্বিত গুচ্ছ গুচ্ছ কুণ্ডিত কেশগুলি পর্য্যন্ত তাহার সম্পূর্ণভাবে অধিকার করিবার চেষ্টায় জড়াইয়া ধরিয়াছে। প্রভাত প্রস্ফুটিত তরুণ পদ্মের ন্যায় অনবদ্য সুন্দর মুখের উপর হরিণের ন্যায় তরল চক্ষু দুইটি ভয়চকিত, ইন্দ্ৰং আর্দ্রভাবযুক্ত। নবনীত অপেক্ষা সুকুমার বাহুলতা দুইখানির দ্বারা বন ঠেলিয়া অগ্রসব হইবার চেষ্টায় বালক সরল মৃগের মত বনলতায় অধিকতর জড়িত হইয়া পড়িতেছিল।

সন্ন্যাসী তখনও স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছেন। সেই বনের মধ্যে সহসা এই কিশোর বালককে দেখিয়া তাঁহার আবার কেমন মোহ আসিয়াছিল। ভাবিতেছিলেন, “এই মূর্ত্তিমান বসন্তের ন্যায় কে এ বালক? এ যে কোন দেবতা তাহাতে সন্দেহই নাই, নতুবা দেখিতে দেখিতে বিশ্বয়ের সঙ্গে এমন অহেতুকী আনন্দ— অননুভূতপূর্ব্ব সুখ অন্তরে কেন জাগিতেছে? দেবতা, কিন্তু কোন দেবতা তুমি? হে কিশোর! যার আগমনে বনস্থলীর এই উতরোল ভাব, এই চাঞ্চল্য, সেই কি তুমি! তোমায় কোন মন্ত্রে আবাহন করিয়া পাদ্যঅর্ঘ দিতে হইবে? কি কথা বলিতে হইবে?— কোন মন্ত্র সে?”

সহসা একটা স্বর কর্ণে প্রবেশ করায় সন্ন্যাসী আবার চকিত ভাবে চাহিলেন। স্বরটিও অশ্রুতপূর্ব্ব শ্রুতিসুখকর। বীণাবেণুর মত নহে তথাপি অধিকতর মোহময়। সেই স্বরের উৎপত্তিস্থান নির্দেশে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, যেন বায়ুবেগে সেই প্রভাত পদ্মের আরন্তিম পর্ণ দুইখানি কাঁপিতেছে এবং সেই তরল চক্ষু প্রশ্ণভরা চকিত দৃষ্টি! সেই সন্ন্যাসীর উপরই নিবদ্ধ।— “ইয়ে পাহাড়মে ক্যা মহারাজকে ডেরা হয়?”

বালককে তাঁহার নিকটস্থ হইবার চেষ্টায় অধিকতর বিপন্ন দেখিয়া, এইবার সন্ন্যাসীর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল, বাধা দিয়া বলিলেন— “আর অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিও না, কষ্ট পাইবে। স্থির হইয়া দাঁড়াও। তোমায় কেহ সাহায্য না করিলে এ কণ্টক-লতা-বৃদ্ধন হইতে মুক্তি পাইবে না!” সন্ন্যাসীর দিকে স্থিরদৃষ্টি করিয়া বালক নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইল। সন্ন্যাসী বালকের নিকটস্থ হইয়া অপর দিক হইতে সুকৌশলে বালককে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই লতা-পাশ-বেষ্টিত উত্তরীয়-জড়িত কিশোর কমণীয় দেখখানি, এবং কণ্টকাবতে আরন্ত মৃণালনিন্দিত বাহু দুইটি স্পর্শ করিতে তখনও যেন সন্ন্যাসীর বিভ্রম উপস্থিত হইতেছিল! তাহার সেই ঘনকৃষ্ণবলবস্ত্রিত কেশগুলি, যাহার মধ্যে সেই সুন্দর মুখখানি পদ্মের মতই ফুটিয়া আছে, বনলতার অত্যাচারে সেই বিপর্য্যস্ত কেশগুলিব আকৃষ্ণনের মধ্যে লতাচ্যুত যে ফুল কয়টি বাধিয়া গিয়া বালকের প্রতি বনেব প্রীতি ও

পূজার সাক্ষা দিতেছে, তাহা দেখিতে দেখিতে সম্মাসীর এখনও তাহাকে বিপন্ন বনদেব বলিয়াই মনে হইতেছিল।

কিছুক্ষণ চেষ্টার পর বালক মুক্ত হইল। অগ্রসর হইয়া শির নত করিয়া যুদ্ধকরে সম্মাসীকে প্রণাম করিল। “ঠাকুরজি! পাঁও লগে! আপ ইয়ে পাহাড় পর ডেরা রাখিন হেঁ?”— কি স্ধাময় মধুর স্বর? সম্মাসীব মনে হইতেছিল, কর্ণ যেন এমন সুখ আর কখনও পায় নাই। মনের সে ভাব দমন করিয়া সম্মাসী বালককে প্রতিপ্রশ্ন করিলেন— “এই পাহাড়ে যে কাহারও আবাস থাকিতে পারে, তাহা বালক কিরূপে জানিল? সেই বা কে? এ ভঙ্গলে কোথা হইতে সে আসিল?” বালক তাহার চক্ষু দুইটি সম্মাসীর দিকে স্থির করিয়া ধীরে ধীরে বিমুগ্ধ হিন্দীতে বলিতে লাগিল, কিছু দূর হইতে তাহার পর্বতের গায়ে একটা ধূম-রেখা লক্ষ্য করিয়া সেখানে কোন সাধু সম্মাসীর আশ্রমের আশা করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। সঙ্গে তাহার রুগ্ন দুর্বল পিতা। তাহার ‘হরদোয়াব’ (হরিদ্বার) হইতে পুরুষোত্তম দর্শনে যাইবার জন্য গৃহত্যাগ করিয়া অদ্য কয়েক মাস হইতে পথ চলিতেছিল। পথে পিতা রুগ্ন হইয়া পড়িলেন, তিনি এখন বৈদ্যনাথজীর ধামে পৌঁছিবাব জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন,— কিন্তু আব তাহার পথ চলিবার ক্ষমতা নাই, তিনি প্রায় মুমূর্ষু। আশ্রয় প্রাপ্তিৰ জন্য উভয়ে এই ধূম লক্ষ্য করিয়া পর্বতের নিকটে অগ্রসর হইতেছিল, এক্ষণে পিতার আর চলিবার শক্তি না থাকায় তাঁহাকে একস্থানে শোয়াইয়া বালকই আশ্রয়ানুসন্ধানে চলিয়াছে, পথমধ্যে ঠাকুরজীর সহিত সাক্ষাৎ।

সম্মাসী একটু দৃঃখের হাসি হাসিয়া বলিলেন, “অবোধ বালক! লোকালয়ের অনুসন্ধান না করিয়া এই ধূম লক্ষ্য করিয়া গভীর বনের মধ্যেই প্রবেশ করিয়াছ! ও ধূম তো পর্বতের দাবাগিও হইতে পাবিত?” বালক বলিল— “তাহাদের মনে এক একবার সে আশঙ্কা হইলেও ইহা ভিন্ন তাহাদের আর অন্য গতি ছিল না। কেননা কয়েক দণ্ড বেলা থাকিতেই তাহাবা এই বনে পথ হারাইয়াছে; এক্ষণে দিবা অবসানপ্রায়! লোকালয় প্রাপ্তির কোন পথ না পাইয়া অগত্যা তাহারা অনিশ্চিত আশায় এই দিকে অগ্রসর হওয়া ছাড়া, অন্য কোন উপায় দেখিতে পায় নাই। তাহার পিতাও বলিয়াছিল যে, পাহাড়ে সাধুমহাত্মারা বাস করিয়া থাকেন। স্বর্ষ্যকেশ পাহাড়ে এরূপ অনেক সাধু আছেন। যাহা হউক এক্ষণে পাহাড়ে কেহ না থাকিলেও আর দৃঃখ নাই, কেননা তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, সেই ধূম লক্ষ্য করিয়াই সে ঠাকুরজীর নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ঠাকুরজী নিশ্চয়ই তাহার রুগ্ন মুমূর্ষু পিতাকে রাত্রির মত একটু আশ্রয় দিবেন।” সম্মাসী সম্মেহে বালকের দিকে চাহিয়া বলিলেন— “তোমার পিতা কোথায়?” বালকের সুস্বপ্নের কথাগুলি এবং নিঃসঙ্কোচ সাহায্য প্রার্থনার সারল্যে বিপন্ন আর্ন্তভাবেব মধ্যেও তাহার এই সরলতায় সম্মাসী বালকের উপর কেমন একটা স্নেহ অনুভব করিলেন। তাহার অনন্যসাধারণ কিশোরকান্তি তো পূর্বেই তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল, এক্ষণে সে আকর্ষণে যেন অধিকতর শক্তি সংযোগ হইল, বালকের সাহায্য করিতে আগ্রহ ও ইচ্ছা হইতে লাগিল।

বালকের সঙ্গে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সম্মাসী এক রুগ্নকে বনমধ্যে শায়িত দেখিলেন। রুগ্ন মাঝে মাঝে যন্ত্রণাসূচক শব্দ করিতেছিল; এক্ষণে নিকটে মনুষ্যপদশব্দ বুঝিয়া ডাকিল, “পার্বতী!” বালক ছুটিয়া গিয়া পিতার মস্তক হস্তে তুলিয়া ধরিল এবং বলিতে লাগিল, “বাবা! আর কিছু, ডর্ নেহি হয়! ঠাকুরজী সে মূলাকাৎ হয়, উননে আভি তুম্‌কো দেখনে আতে হেঁ। তুম আচ্ছা হো যাওগে, পুরুষোত্তম কো দর্শন করোগে, আব্‌ কিছু ডর্ নেহি, ঠাকুরজী আগিহিন।”

বালকের অকৃত্রিম সারল্য এবং নির্ভরযুক্ত বাক্যে সম্মাসীর চক্ষু দ্বিগুণ স্নেহে সজল হইয়া উঠিল। তিনি রুগ্নের সম্মুখে দাঁড়াইবা-মাত্র রুগ্ন বিস্ময়িত নয়নে তাঁহার দিকে চাহিল।

চাহিয়া চাহিয়া অতি কষ্টে হস্ত দুইটি বন্ধাঞ্জলি করিল। যুথহস্তে ললাট স্পর্শ করিয়া মৃদু মৃদু বলিতে লাগিল, “বৈজু বাবা, মেরে জনম সফল হো গয়ি বাবা। পারবতী তুমকো বহুৎ ফুকারা। অব্ হামারে আরজ্ হিয়া যৌকি হামারা পারবতীকো তেরি চরণ পর উঠা লেও। হামারে লিয়ে মেরা কুছ হরজ নেই। মেরি জনম, মোগারং হো গিয়া বাবা। লেকিন্ পারবতী কো লিয়ে—”

সন্ন্যাসী সজল চক্ষে বালকেব দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “আর বিলম্ব করা উচিত নয়— সন্ধ্যা আগতপ্রায়। অন্ধকারে বনে পথ পাওয়া এবং পর্বতারোহণ উভয়ই দুরূহ। তাঁহার ঐ পর্বতেই ডেরা বটে কিন্তু পথ দুর্গম বা আশ্রম অত্যন্ত দূরে নয়! এই বেলা তিনি তাহার পিতাকে আশ্রমে লইয়া যাইতে চান।” বালক স্নানমুখে তাহার পিতা পর্বতে উঠিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ প্রকাশ করায় সন্ন্যাসী বলিলেন, “সে উপায় আমি করিতেছি, তুমি তোমাদের তল্লী যাহা কিছু আছে, লইয়া আমার সঙ্গে চল।” দীর্ঘোন্নত দেহ, বলশালী, অনতিক্রান্ত যৌবন সন্ন্যাসী, সেই রুগ্নকে অল্প আয়াসেই স্বন্ধের উপর তুলিয়া লইলেন। রুগ্ন নিজ মনে মৃদু মৃদু আপত্তি ও কুণ্ঠা প্রকাশ করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া ডাকিলেন, “এস পার্বতীপ্রসাদ!”— বালক স্বন্ধে তল্লী তুলিয়া লইয়া সহসা মৃত্তিকার পানে চাহিয়া বলিল, “আপনার পদ্মফুলটি!” রুগ্নকে স্বন্ধে লইবার সময় সন্ন্যাসী সেই শতদল ভূমিতে ফেলিয়া দিয়াছিলেন, এক্ষণে বালককে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া বলিলেন, “উহার কোন প্রয়োজন নাই, নিষ্প্রয়োজনীয় ভাবে পড়িয়া থাকুক।” “না। বৈদনাথজীর নির্মান্য নয় কি এটি?” সন্ন্যাসী সন্মতি-সূচক মস্তক হেলাইবা মাত্র বালক তল্লী রাখিয়া ফুলটি উঠাইয়া লইয়া মস্তকে ঠেকাইল। তৎপরে ত্রস্তে একবার তাহার গন্ধ-আত্মাণের সঙ্গে ‘আঃ’ শব্দ করিয়া ফুলটি কানের উপরে চুলের গুচ্ছের মধ্যে গুজিয়া দিল এবং তল্লী উঠাইয়া সন্ন্যাসীর পশ্চাদনুসরণ করিল। বালকের ফুলের উপর লোভ ও এই শিশুর মত ব্যবহার দেখিয়া, সন্ন্যাসী প্রথমে হাসিলেন; কিন্তু যখন সেই ঈষৎ মুদিতদল পদ্মপুষ্পটি বালকের কেশের উপর স্থান পাইল, তখন আর তিনি হাসিলেন না। স্নেহপূর্ণ নয়নে ফুলটির এই নূতন শোভা একবার দেখিয়া লইয়া, ভারস্বন্ধে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন।

কয়েক মাস অতীত হইয়া গিয়াছে। রুগ্ন লছমীপ্রসাদ সন্ন্যাসীব চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় আরোগ্য হইয়াছেন এবং পার্বত্য নির্ব্বারের জল ও স্বাস্থ্যকর বায়ু সেবনে ক্রমে সবল হইয়া উঠিতেছেন। সন্ন্যাসীকে ইহাদিগকে লইয়া অনেকটা ব্যস্ত থাকিতে হইতেছে। নিকটে লোকালয় নাই, কংগের বলকব পথ্যের জন্য তাঁহাকে প্রায়ই গ্রামাভিমুখে যাইতে হয়। লছমীপ্রসাদের অর্থের অভাব নাই। সন্ন্যাসীকে তাহাদের জন্য ভিক্ষা করিতে হয় না, তথাপি অতদূর হইতে প্রাত্যহিক খাদ্যসংগ্রহই এক কষ্টসাধ্য ব্যাপার, সন্ন্যাসী কিন্তু অবিবক্ত ভাবে নিজ কর্তব্য পালন করিয়া যাইতেছেন। ইহারা যে চিরদিন এখানে থাকিবে না, তাহা তিনি জানেন এবং তাহাদের জন্য এই শ্রম-স্বীকার তাঁহার কর্তব্যব্যবহী অঙ্গ বলিয়া তিনি মনে করেন। কিছুকাল হইল, তাঁহার একা গ্রাম হইতে খাদ্য বহিয়া আনার কষ্টের লাঘব হইয়াছে। পিতা একটু সুস্থ হওয়ার পর পার্বতীও তাঁহার সঙ্গে যায়; উভয়ে একেবারে কিছুদিনেব মত্ত আহাৰ্য্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া আসে। সে জন্য সর্বদা আর তাঁহাকে পর্বত হইতে অবতরণ করিতে হয় না।

একদিন বৈদনাথ দর্শন করিয়া আসার পর লছমীপ্রসাদের পুরুষোত্তম দর্শনের সাধ আবার প্রবল হইয়া উঠিল। সন্ন্যাসী বুঝাইলেন যে, এই সঙ্কল্প তাঁহাকে পুনরায় মৃত্যুমুখে ফেলিবে, কিন্তু বৃদ্ধ তাহাতে দমিল না। বলিল, মরিতে তো একদিন অবশ্যই হইবে, সে জন্য পুরুষোত্তম দর্শনের ইচ্ছা ত্যাগ করা উচিত নয়। যে প্রকার অবস্থা হইয়াছিল, কে



জানিত যে, তাহার কপালে তাঁহার ন্যায় সাধুর আশ্রয় লাভ এবং বৈদানাথ-দর্শন ঘটিবে। বাবা বৈদানাথ যখন মনুষ্যদেহ ধরিয়া তাহাকে রোগমুক্ত করিয়া স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দিয়াছেন, তখন কে জানে হয়ত পুরুষোত্তম দর্শনও তাহার ললাটে লেখা আছে। তাহাদের তো একদিকে যাইতে হইবে, ঠাকুরজীর তাহাদেব জন্য বহুত তক্লিব হইয়াছে, যদিও বাবার ইহা নিত্যকার্য্য তথাপি তাঁহার সাধনার বিঘ্ন করিয়া আর তাহাদেব থাকা উচিত নয়। সম্মাসী সে বিষয়ে আর কিছু না বলিয়া অন্য কথা তুলিলেন, 'সম্মুখে যোব বর্ষা। যদি তাঁহার পুরুষোত্তম যাইতে একান্তই ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে এই দুইমাস কাটাওয়া শরতের প্রাবল্যে যাত্রা করাই উচিত, নহিলে তিনি সে দূরন্ত পথের কতটুকু যাইতে পারিবেন বলা কঠিন। বৃদ্ধ, সম্মাসীর কথার সারবত্তা বুঝিয়া অগত্যা আরও দুইমাস সেই পর্বতেই অতিবাহিত করিতে স্বীকৃত হইলেন।

সম্মাসীর বালকের প্রতি সেই প্রথম দর্শনের অকারণ উদ্ভূত স্নেহ এই কয় মাসের অবিরত সাহচর্য্যে সুদৃঢ় বন্ধনেই পরিণত হইয়াছিল। বালকেরও তাহার উপর অগাধ নির্ভরতা এবং স্নেহাকাঙ্ক্ষা দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া সেই স্নেহপাশে সম্মাসীকে মেন অধিকতর জড়িত করিয়া তুলিতেছিল। বালকের পিতা তাঁহার পার্বতীর প্রতি এই স্নেহভাব লক্ষ্য করিয়া একদিন বলিল— 'ঠাকুরজীর নিকটে যদি পার্বতীকে বাখিয়া যাইতে পাইতাম, তাহা হইলে বুঝি নিশ্চিত হইয়া পুরুষোত্তমের চরণে গিয়া পড়িতে পারিতাম। আমিও বুঝিতেছি, সেখান হইতে আমি আর ফিরিতে পারিব না। ঠাকুরজী পার্বতীকে 'চেলা' করিয়া চিরদিন কাছে কাছে রাখিলে, তাহাব জন্য আর ভাবিতে হইত না। কিন্তু তাহা আমাদের ভাগ্যে ঘটাবাব উপায় নাই। ঠাকুরজী বিবাগী সম্মাসী— তাহাকে লইয়া কি করিবেন।' বৃদ্ধের নিঃশ্বাসটি যেন অন্তঃস্থল হইতেই পড়িল। সম্মাসী একটু হাসিলেন,—তাঁহার আবার চেলা? তাহাও আবার এই ব্র্যোদগ কি চতুর্দশবর্ষীয় বাল-কার্ত্তিকেয়-তুল্য কিশোরকুমার! তাঁহার এই বনবাসী নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গী হওয়া কি এ বালকের সাধা? কি সুখে কি জন্য সে চিরকালের নিমিত্ত এই পর্বতগুহায় কাটাইতে চাহিবে? তিনিই বা কোন্ প্রাণে তাহাকে রাখিতে চাহিবেন? বৃদ্ধ ও বালক যদি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় এই সঙ্কল্প করিত, তাহা হইলেও ইহাতে তাঁহার বাধা দেওয়া কর্তব্য। সেই নবজাত সুকোমল কাণ্ড্যত বৃক্ষটি এই ত্রিকূটের নীরস কঠিন প্রস্তরের মধ্যে আনিয়া বসাইয়া দিলে তাহাতে বৃক্ষ বা এই প্রস্তব কাহাব কোন্ সার্থকতা লাভ হইবে? তিনি জনসঙ্গত্যাগী সম্মাসী, এ বালকের সঙ্গে তাঁহারই বা কি প্রয়োজন?

তাঁহার আবাস-গৃহটি বালক ও বৃদ্ধ কর্তৃক অধিকৃত, তাই তিনি পর্বতের আরও একটু উচ্চতর স্থানে অন্য একটি গুহায় রাশ্রিয়াপন করিতেন বা ধ্যানাদি কার্য্যে নিঃসঙ্গ হইবার জন্য দিবসেও মাঝে মাঝে সেই স্থানে উঠিয়া আসিতেন। সেদিনও সম্মাসী উপরে উঠিয়া আসিয়া সেই গুহাসম্মুখস্থ শিলাখণ্ডে বসিয়া এই ভাবিতেছিলেন। এই বালককে নিকটে রাখিতে কেন এমন ইচ্ছা আসিতেছে? কেন মনে হইতেছে— সে চলিয়া গেলে আর তাঁহার কিছুই থাকিবে না। সম্মাসী শিহরিয়া উঠিলেন। স্নেহের মোহ এখনও তাঁহার অন্তরে এত অদমা? ভগবান্ শঙ্কর এই মমতাকে এই জনাই 'পাশ' বলিয়াছেন। সেই মমতা এখনও তাঁহার অন্তরে এত প্রবল? 'আর না,— এ পাশ শীঘ্র ছিন্ন হওয়াই তাঁহার পক্ষে মঙ্গলের।'

সেই প্রস্তরখণ্ড ঘেরিয়া ত্রিকূটের কঠিন নীরস হৃদযোথিতা স্নিগ্ধ স্নেহধারা, প্রস্তর হইতে প্রস্তরে কন্ কন্ বন্ বন্ শব্দে বহিয়া যাইতেছিল। উপল-ব্যথিত গতি নির্ঝরিনী সম্মাসীর পায়ের গোড়ায় ঝুরঝুর রবে, করুণ সুরে যেন কাঁদিয়া নামিতেছিল। সম্মাসী আকাশ পানে চাহিয়া দেখিলেন, স্তরে স্তরে মেঘ সেখানে পুঞ্জীকৃত হইয়া পর্বতের অঙ্গে তাহার ছায়া

ফেলিতেছে। আলোকমাত্র লতা-পাদপ সহসা কজ্জলাভা ধারণ করিয়াছে, উজ্জ্বল লৌহফলকের মত নির্ঝরিলীর স্বচ্ছ অঙ্গও দলিতাঞ্জন আভা হইয়া উঠিয়াছে। বুঝিলেন, এখনি শ্রাবণ গগন ভাসিয়া বৃষ্টি নামিবে। নিঃশ্বাস ফেলিয়া গুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইতেই দেখিলেন, সেই বৃহৎ শিলাখণ্ডের নিম্নে নির্ঝরেব জলে পা ডুবাইয়া পার্বতী উর্দ্ধমুখে চাহিয়া বসিয়া আছে। তাহাব সেই নির্ঝরিলীর-ধারাব ন্যায় স্বচ্ছ তরল বিশাল চক্ষুও মেঘের কৃষ্ণ ছায়া যেন কাজল পরাইয়া দিয়াছে। সম্মাসীর দৃষ্টি মিলিবামাত্র পার্বতী একটুখানি হাসিল, সে হাসিতেও পূর্বের ন্যায় উজ্জ্বলা বা কলতান নাই; সে হাসিতেও যেন আজ সেই মেঘের ছায়া পড়িয়াছে। পার্বতী আজ অন্য দিনের ন্যায় হরিশেব মত চপল গতিতে তাঁহার নিকটে ছুটিয়াও আসিল না দেখিয়া সম্মাসী তাহাকে নিকটে ডাকিলেন। ধীবমহুর গতিতে বালক উঠিয়া আসিয়া শিলার একপার্শ্বে পা বুলাইয়া বসিল। সম্মাসী বলিলেন, “ওখানে এতক্ষণ একা বসিয়াছিলে কেন? আমার নিকটে কেন এস নাই?”

বালক নতনোত্র বলিল, “আপনি তো ডাকেন নাই।”

“প্রত্যহ কি আমি ডাকিয়া থাকি?”

“না, কিন্তু আজ আসিতে কেমন ভয় করিতেছিল।”

“কেন পার্বতী?”

বালক একটু ইতস্ততঃ করিয়া আবার নতদৃষ্টি হইয়া বলিল, “আপনি আজ সারাদিনই আমাব সঙ্গে কথা করেন নাই, আর—”

“আর কি পার্বতী?”

“আর কখনই হইতেই আপনি যেন আমার উপর— ‘গোস্মা’ হইয়াছেন, তার কাছে ডাকেন না, ভাল করিয়া কথা—” বলিতে বলিতে অভিমানে বালকের স্বব বন্ধ হইয়া আসিল। সম্মাসী বেদনা পাইলেন— বালকের নিকট সরিয়া গিয়া, তাহাব মস্তকে হস্তস্পর্শ করিয়া বলিলেন, “না পার্বতী, তোমাব উপব তো রাগ করি নাই। মন ভাল ছিল না, একটু অনামনা ছিলাম, তাই তোমার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহিতে পারি নাই।” পার্বতীর অভিমান পড়িল না,— দ্বিগুণ গম্ভীর মুখে বলিল— “কিন্তু আমরা আর বেশীদিন এখানে থাকিব না— তাহা তো জানেন। তখন আপনার আর কাহারও সহিত কথা কহিতে হইবে না, একা একা বেশ অনামনেই তো থাকিতে পারিবেন।” অত্যন্ত বেদনাব স্থান স্পর্শ করিলে যেমন লোকের মুখ মুহূর্ত্তে বিবর্ণ হইয়া যায় সম্মাসীর মুখ সহসা তেমনি স্নান হইয়া গেল, বালক হ্রীড়াচ্ছলে তাহাব কোন্ বেদনার স্থান যে স্পর্শ করিয়াছে তাহা সে বালক, সে কি বুঝিবে। সম্মাসী মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন, “হ্যাঁ— তাহা জানি পার্বতী!” সম্মাসীর হস্ত ধীবে ধীরে বালকের মস্তক হইতে কখন যে স্থলিত হইয়া পড়িল, তাহা তিনি জানিতেও পারিলেন না। তিনি অনামনে সেই অন্ধকাবময় বন্যেব দিকে চাহিয়াছিলেন। পার্বতী তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সহসা ঈষৎ হাসিয়া ফেলিল। অন্ধকার গগন-বক্ষে সহসা বিদ্যুৎ স্ফুবণে সম্মাসী দৃষ্টি ফিবাইয়া তাহাব মুখের দিকে চাহিলেন। দৃষ্ট বালক তাহার সন্ধান যে অব্যর্থ লক্ষ্য হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। এইবার সে তাহাব স্বাভাবিক মধুর ঝঞ্ঝে বলিল— “ঠাকুবঙ্গী! এখান হইতে পুরষোত্তম যাইতে কত দিন লাগে?”

সম্মাসী একটু ভাবিয়া উত্তর দিলেন,— “তাহা তো ঠিক বলা যায় না। তবে তোমার পিতার যেকপ শরীর তাহাতে অন্য যাত্রী অপেক্ষা তাঁহার পক্ষে কিছু বেশী সময় লাগিবারই সম্ভাবনা।”

“ছয় মাস? ইহা অপেক্ষাও কি বেশী দিন লাগিবে?”

“না, উনি যদি সুস্থ থাকেন— শীতের প্রথমেও সেখানে পৌঁছিতে পাব।”

“ধরুন ঐ দুই মাস, তাহার পরে ফিরিতেও না হয় ছয় মাস। বাবা হয়ত দিনকতক সেখানে থাকিতেও চাহিবেন। ঐ আগামী শীতের পর বৎসরের শীতের মধ্যেই আমরা নিশ্চয় এখানে পৌঁছিতে পারি, নয় কি ঠাকুরজী?”

সন্ন্যাসী একবার একটু স্ফোভেব হাসি হাসিলেন। সরল বালক কাল ও ঘটনাস্রোতকে এখন হইতেই ইচ্ছার বন্ধনে বাঁধিতে চায়। জানে না যে মানুষ তাহার দাস মাত্র। তথাপি বালকের এই অযৌক্তিক অসম্ভাবিত ইচ্ছাতেও তাহার অন্তর কেমন যেন ঈষৎ সুখানুভব করিল। সেও তাহা হইলে এখানে অসুখে অনিচ্ছায় অবস্থাব গতিতে মাত্র পড়িয়া নাই, এখানে থাকিতে তাহার ভাল লাগিতেছে, নইলে কেন ফিরিতে চাহিবে? কিন্তু বালক সে, বোঝে না যে, তাহা হইবার নয়। চিন্তাকে আর অগ্রসর হইতে না দিয়া সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, “এখানে আসিয়া কি হইবে পার্বতী?”

“কেন, আমি আপনার ‘চেলা’ হইব।”

সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া এইবার গম্ভীর মুখে বলিলেন, “তোমার পিতা বলিয়াছেন তাহা সম্ভব নয়। তোমার এই তরুণ জীবন। অধ্যয়ন আদি এখনও কিছু হয় নাই, তোমার পিতা কোন উপযুক্ত গুরু হস্তে হয়ত তোমায় সমর্পণ করিবেন। বিদ্যাশিক্ষার পর তোমায় হয়ত বিবাহ করিয়া গৃহী হইতে হইবে। এই পর্বতবাসে তোমার তো কোন উপকাব নাই পার্বতী! এখানে আর কিছু দিন থাকিতে হইলেই হয়ত তোমার আর এস্থান ভাল লাগিত না। তোমাদের নাথ্য নব উন্মোচিত জীবনের বাসের উপযুক্ত স্থান এ তো নয়।” পার্বতী সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, — “কেন নয়? আমি এইখানেই থাকিব। পুরুষোত্তম হইতে আমি নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিব। আপনি আমার ওক হইবেন, আপনার কাছেই আমি অধ্যয়ন করিব।” সন্ন্যাসী হাসিলেন।— “হাসিলেন যে, ‘চেলা’কে গুরুই ত পাঠ দিয়া থাকেন। আমি হরদোয়ারে কত গুরু ও চেলা দেখিয়াছি।”

“তুমি আমার চেলা হইবে পার্বতী?”

“তাহাই ত বলিতেছি।”

“তুমি যাহাদেব কথা বলিতেছ, তাহা বা মহাত্ম বা পবনহংস। আমি নিঃসঙ্গ, সন্ন্যাসী! নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসীর ‘চেলা’ থাকিতে নাই।”

বালক যেন সে কথা কানেই লইল না। বলিল, “বৃষ্টি আসিতেছে, নীচে চলুন।” সন্ন্যাসী বলিলেন, “আমি এইখানেই থাকিব। অন্ধকার বাড়িতেছে, তুমি এইবেলা শীঘ্র যাও।” তখন হু হু শব্দে বায়ু আসিয়া বন্য পাদপাদিকে পর্বতের অঙ্গে আছড়াইয়া ফেলিয়া নির্ঝরগীর জনকে ইতস্ততঃ উৎক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতেছে, মেঘ ত্রিকূটের সর্বোন্নত শিখরে যেন লগ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ঝন্ঝন্ শব্দে বৃষ্টিও আসিয়া পড়িল। বালক সগর্বে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, “মনে করিবেন না যে, বৃষ্টি বা ঝড়ের ভয়ে আপনার গুহার মধ্যে আশ্রয় চাহিব, আমি ইহার মধ্যে ফিলিয়া যাইতে পারি।” সেই বৃষ্টিধা বা প্রাবৃত শিলাময় পথে বায়ুবেগে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত পাদপ ও লতা শাখা ধরিয়া বালক বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে পর্বত অঙ্গে অবতরণ করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী ডাকিলেন, “পার্বতী—পার্বতী! ফিরিয়া এসো।” বালক ফিরিল না, কিংবা বায়ুর শব্দে সে কথা তাহার কণ্ঠে প্রবেশ করিল না! সন্ন্যাসী দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া তাহাকে ধৃত করিলেন, “অবাধ্য বালক! বিপদের ভয় নাই?” প্রকৃতির সেই তুমুল বিশ্ববের মধ্যে তড়িৎপ্রভার মত হাসি দুরন্ত বালকের ওষ্ঠে খেলিয়া গেল— “আমরা যে আর বেশি দিন এখানে থাকিব না, তাহা কি আপনার মনে থাকে না?”— বালক ফিরিল না, পর্বত বাহিয়া নামিতে লাগিল, অগত্যা সন্ন্যাসী তাহার

সঙ্গেই চলিলেন। মুহূৰ্হুঃ তিনি তাহার পতন শঙ্কায় হস্তপ্রসারিত করিয়া বালককে ধরিতে যাইতেছিলেন কিন্তু সে গৰ্ব ও জয়ের হাসি হাসিয়া তাঁহার সে সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিতেছিল।

নিম্নস্তরে ওহার নিকটে পৌঁছিয়া বালক ভিতরে প্রবিষ্ট হইলে সম্মাসী একটা শিলার নিম্নে আশ্রয় লইয়া দাঁড়াইলেন। পৰ্ব্বতের সর্ব অঙ্গ বাহিয়া তখন নির্ঝরিতর আকারে মেঘ-গলিত জলস্রোত কল্ কল্ বর্ বর্ শব্দে নিম্নাভিমুখে ছুটিতেছিল। প্রবল বৃষ্টিপাতে বায়ুর প্রকোপ তখন কমিয়া গিয়াছে, বৃক্ষলতা সব স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যন মেঘ পাহাড়ের উপরে ধুমের আকাবে নামিয়া তাহার শিখরদেশে অনবরত জল ঢালিতেছে। সম্মাসী সম্মুখস্থিত ওহা-দ্বারে চাহিয়া দেখিলেন— বালক বোধ হয়, তাহার পিতার তিরস্কারে দ্বিগুণ অভ্যন্তরীণ অশ্রুকার করিয়া, সেইখানে বসিয়া সিন্ধু কেশগুলো লইয়া অঙ্গুলীতে জড়াইতে জড়াইতে এক-একবার অভ্যন্তরীণ ভরা দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিতেছে। অশ্রুকার আকাশে বিদ্যুৎ-স্ফুরণের মত তাহার কৃষ্ণ কেশের মধ্যে চলন্ত অঙ্গুলী প্রভা এবং সেই দৃষ্টি, অশ্রুকার ওহাব মধ্যে খেলিয়া বেড়াইতেছে। দেখিতে দেখিতে বালকের সেই অভ্যন্তরীণ যেন সেই বৃষ্টিধাবার সঙ্গে গলিয়া মিশিয়া জল হইয়া গেল। ধারা কমিয়া আসিয়াছে দেখিয়া সম্মাসীও আবার নিজ নির্দিষ্ট ওহায় উঠিয়া গেলেন।

শরতের প্রাভাতেই লক্ষ্মীপ্রসাদ পুরুষোত্তম যাত্রা করিলেন। অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির বিমল অশ্রু ফেলিতে ফেলিতে বৃদ্ধ সম্মাসীর নিকটে বিদায় লইলেন কিন্তু পাকবর্তীর একেবারে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব। উদ্বেজনীর কয়েকটা অস্বাভাবিক দীপ্তি তাহার মুখেচোখে যেন জ্বল জ্বল করিতেছে। যাত্রার জন্য সে পিতাকে পুনঃ পুনঃ সত্বর হইতে বলিতেছিল। বিদায়কালোচিত কৃতজ্ঞতা-সূচক অভিব্যক্তির বয়স যদিও তাহার হয় নাই, কিন্তু এইজন্য একটু বিষম ভাব কিংবা একফোঁটা অশ্রুও তাহার চক্ষে দেখিতে না পাইয়া, তাহার পিতা যেন সম্মাসীর কাছে লজ্জিত হইয়া পড়িল। সম্মাসী যে বালককে অনেকখানি ভালবাসিয়াছেন তাহা বৃদ্ধ বেশ জানিত, এক্ষণে পুত্রের এই বিসদৃশ ব্যবহাবে ক্ষুব্ধ ও দ্বিগুণ অসহিষ্ণুভাবে বৃদ্ধ সম্মাসীকে সহসা কি যেমন বলি বলি করিয়া বলিল— “উহাদের জাতই এইরূপ, উহারা বড় চঞ্চল, মেহের প্রকৃত সম্মান জানে না!”— সম্মাসী বৃদ্ধকে বাধা দিয়া সহাস্যমুখে বলিলেন, “বালক ও পাহাড়িয়া হরিণে কোন প্রভেদ নাই। উভয়েই ভাল না বাসিয়া উপায় নাই, উভয়েই মেহের পাত্র, কিন্তু উভয়েই বন্ধন মানে না, সেইজন্য দুঃখের কোন কাবণ নাই, উহাই উহাদের প্রকৃতি।” বালক এইবারে পিতাকে যেন চৌলিয়া লইয়া চলিল। সম্মাসী নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া বহিলেন। সম্মাসীর সঙ্গে বহুবাব নিম্নে গমনাগমন করিয়া পাকবর্তী বনপথ বেশ ভাল রূপেই চিনিত। পাকবর্তী নির্ঝরিতর মত চপল গতিতে পাকবর্তী বৃদ্ধের অগ্রে অগ্রে পৌঁটিলে স্বন্ধে ছুটিয়া চলিল, তাহার চঞ্চল কেশগুলোর ক্ষুদ্র মস্তক এবং বৃহৎ “মুরাঠা” বাঁধা বৃদ্ধের শির শীর্ষেই সম্মাসীর দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া গেল, পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া চাহিতে গিয়া, শিলাখণ্ডে “হোঁচোট” খাইয়াছিলেন, কিন্তু বালক একবারও পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিল না।

তাহারা দৃষ্টিবহির্ভূত হইলে সম্মাসী তাঁহার নবনির্দিষ্ট ওহায় উঠিয়া যাইবেন মনে কবিতেন, এমন সময়ে পুনর্ব্বার পদশব্দ হইল। এ পদশব্দ অদ্য ছয়মাস যে তাঁহার অত্যন্ত পরিচিত। সম্মাসীর দ্রুতবাহিত বক্ষস্পন্দনের সমতলেই সেই পদশব্দের শব্দ ও লয় হইতেছে, উর্দ্ধগতিতে হরিণীর মত সে-ই ছুটিয়া আসিতেছে।

সম্মাসী চেষ্টাব সহিত একটু হাসিয়া বলিলেন “ফিরিলে যে?” “একটি জিনিস ভুলিয়া ছিলাম!” পাকবর্তী তেমনি দ্রুতপদে ওহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তখনি আবার বাহিরে আসিল। হস্তে শুদ্ধপত্রের মত কি একটা দ্রব্য মুঠায় বাঁধা। সম্মাসী বলিলেন, “কি জিনিস?” সে

কথার উত্তর না দিয়া পার্বতী ওহার সম্মুখে যেন থমকিয়া দাঁড়াইল। একপার্শ্বে একটি অগ্নিযুক্ত কাষ্ঠ ধীরে ধীরে ধূমাইতেছিল, পার্বতী নিকটস্থ একখানা বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড টানিয়া সেই অগ্নিতে সংযোগ করিয়া দিতে দিতে অবিকৃত হাসিমুখে বলিল, “এই ধূম লক্ষ্য করিয়াই ত আমরা এইদিকে আশ্রমের খোঁজে আসিয়াছিলাম। আপনার ধূনীতে তো সর্বদাই আগুন থাকে, দেখিবেন যেন ইহার অগ্নি না নিভে! এক বৎসর কি দেড় বৎসর পরে যখন আসিব, তখন ‘ডেরা’ খুঁজিতে তাহা হইলে আর কষ্ট পাইতে হইবে না। এই ধূম দেখিতে পাইলেই পাহাড়ের পথ খুঁজিয়া পাইব। কেমন? এ কথাটি মনে রাখিবেন ত?— ইহার অসম্ভাব্যতার বিষয়ে শত উত্তর সম্মাসীর মনে উদয় হইলেও তিনি নীরবে শুধু ঘাড় নাড়িলেন, পার্বতী আর বাক্যবায় না করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল, মুহূর্ত সময়ও যেন তাহার নষ্ট করিলে চলিবে না।

ধীরে ধীরে কাঁপিতে কাঁপিতে সম্মাসী সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন। পর্বতের উপরে উঠিয়া তাহাদের গতিপথ লক্ষ্য কবিবাব যে ইচ্ছা কয়েক মুহূর্ত পূর্বে মনে জাগিয়াছিল, সে ইচ্ছা মুহূর্তে যেন স্পন্দনশক্তিহীন হইয়া তাঁহাকে বিকলাঙ্গ করিয়া দিল। সমস্ত শরীরে একটা কম্প, ভয়ানক শীত করিতেছে, অথচ কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া যে গুহামধ্যে প্রবেশ করিবেন, এমন ক্ষমতা নাই।

প্রদোষে যখন সম্মাসী তাঁহার উপরের গুহায় যাইতেছিলেন, তখন একবার নিম্নে চাহিয়া দেখিলেন, ছয়মাস পূর্বে এই পার্বত্য ভূমি যেমন নিস্তব্ধ গভীর মুখে অটল মহিমায দণ্ডায়মান থাকিত, আজ আর তেমন নাই! আজ তাহার রক্তে রক্তে যেন কাহার কুণ্ঠিত কেশযুক্ত ক্ষুদ্র মস্তক, শুভ্র সুকুমার সবলতা চকিতে খেলিয়া আবাব তখনই বনান্তরালে অদৃশ্য হইতেছে। সমস্ত পর্বত ভাঙ্গেই সে যেন মিশিয়া বহিয়াছে। অথচ ঐ যে পর্বত বক্ষে তাহার আবাস স্থলটি, কয়েক খণ্ড শিলায় আবদ্ধা ঐ যে নির্ঝাবিলী ধারা ও তাহার শিলাময় ঘাট, ওহাদ্বারের ঐ যে সোপান সমন্বিত বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড, ঐ যে বাল-অশ্বখটি যাহার সঙ্গে তাহার হস্তের শর্তচহু রহিয়াছে, উহারই অঙ্গে তাহার হবিদ্রাভ বস্ত্রখানি শুকাইত—শূন্য, সব শূন্য। নাই— সেখানে সে নাই, তবু কেন এমন ভ্রম হইতেছে? কেন মনে হইতেছে সে যায় নাই। বনের মধ্যে কোথায় লুকাইয়া আছে, এখনি তাঁহার বক্ষ স্পন্দনের সমতলে পা ফেলিতে ফেলিতে ছুটিয়া আসিবে! একি এ—ভ্রান্তি?

গভীর নিঃশ্বাস তাগ করিয়া সম্মাসী পর্বতনিম্নস্থ বনতলের প্রতি চাহিলেন, বনাচ্ছাদনে পথ দৃষ্ট হইবাব উপায় নাই, তথাপি বহুদিনের গতায়াতের অনুভবে সম্মাসী বনতল দিয়া সেইপথ যেখানে দূর প্রান্তরে মিশিয়াছে, সেইদিকে বহুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। কেহ নাই, কিছু নাই,— প্রান্তর মনুষ্যচহু বর্জিত।

প্রভাতে তাহারা যাত্রা করিয়াছে, এখন প্রদোষ। যাত্রার প্রথম উদ্ভেজনা ও উৎসাহে তাহারা এখন কতদূরই চলিয়া গিয়াছে! সম্মাসী অন্তগামী সূর্য্যের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, পর্বতের অন্তরালে ধীরে ধীরে তিনি মুখ লুকাইতেছেন। তাঁহার আবস্তিম্ব বর্ণেও অদ্য এ কি বিবর্ণতা!

তারাতদ্রমজ্জিতা রজনী সেই শিলাতলে উপবিষ্ট সম্মাসীর মস্তকের উপর দিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল, আবাব প্রভাত অরুণ ত্রিকূটের অঙ্গে আলোকধাবা মাখাইয়া উদ্ভিত হইলেন। নির্ঝর-স্নাত সম্মাসী উঠিয়া সূর্য্যের আবাহন করিলেন; মনে হইল, বনের মধ্যেও কে যেন লুকাইয়া লুকাইয়া অন্য দিনের মত সূর্য্যের বন্দনা গায়িতেছে। দুখানি কোমল বাহু উৎক্ষিপ্ত করিয়া আরক্তিম করতল পাতিয়া “এই সূর্য্য” বলিয়া সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিতেছে! সে কোথায়? নিম্নস্থ গুহাদ্বার হইতে তাহারই করসংযুক্ত বহির অস্পষ্ট ধূম এখনও একটু একটু উঠিতেছে। সম্মাসী ধ্যান করিতে গুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

যখন নামিয়া আসিলেন, তখন বেলা দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত। শূন্য হতশ্রী গুহার দ্বারে বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ডের ধ্বংসাবশিষ্ট ভস্মস্তূপ মাত্র পড়িয়া রহিয়াছে, ধূমরেখা নাই। সম্মাসীর অন্তরটি সহসা ধক্ করিয়া একটা গুরুস্পন্দন জানাইল। তবে কি অগ্নি নিবিয়া গিয়াছে? সে যে বলিয়া গিয়াছে— সেই বালকোচিত প্রার্থনা মন আর উচ্চারণ করিতে অগ্রসর হইল না, কিন্তু অন্য মনে সম্মাসী সেই ভস্মরাশি নাড়িয়া দেখিলেন, সামান্য একটু কাষ্ঠখণ্ডে ভস্মাচ্ছাদিত অবস্থায় অগ্নি তখনও জাগিয়া বহিয়াছে। অন্যমনেই সম্মাসী আর একখানা শুষ্ক গুড়ি-কাষ্ঠ টানিয়া লইয়া সেই অগ্নিতে সংযোগ করিয়া দিলেন।

তাহার পরে শরৎ-হেমন্ত-শীত-অতীত হইয়া আবার সেই বসন্ত পার্বত্য বনভূমিতে উপস্থিত হইল, কিন্তু কোথায় এবাব তাহার সেই রূপ! তাহার পত্নপুংপে কোথায় সে বাগ? কোথায় সে সুগন্ধ!

নিদাঘ কাটিয়া বর্ষা আসিয়া আবার পর্বত শিখবে দাঁড়াইল।

সম্মাসী সেই সদা প্রজ্বলিত ধূনীটি গুহার দ্বিধা অভ্যন্তরে টানিয়া লইলেন, দলধাবায় তাহার অগ্নি না নিবিয়া যায়।

বর্ষচক্র ঘুরাইয়া শরৎ-হেমন্ত ক্রমে শীত আসিল, উদ্বেগে এবং মানসিক উত্তেজনায় চাঞ্চল্যে সম্মাসী ক্রমেই যেন শীর্ণ হইতেছিলেন। প্রভাতে প্রদোষে দ্বিপ্রহবে প্রায় সর্বক্ষণই তিনি নিজ গুহা সম্মুখস্থ শিলাখণ্ডের উপরে বসিয়া প্রান্তর পানে চাহিয়া থাকিতেন আব নিম্নস্থ গুহা হইতে সেই দেড় বৎসরের অনির্বাক্ষণ অগ্নি ধূমরাশি দ্বি-ওণতর করিয়া শূন্যপথে প্রেরণ করিতে থাকিত। হায়, এ কি বাসনার ইন্ধন সে তাহাতে সংযোগ করিয়া দিয়া গিয়াছে, যাহাব প্রভাব সংক্রামক রোগের মত সম্মাসীর অন্তরের একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন জোর করিয়া নিত, তাঁহাকে সেই অগ্নির পোষণ বস্তু যোগাইতে বাধ্য করিয়াছে! সে আসিবে মনে করিতেও সম্মাসী অন্তরে যেন একটা কম্পন অনুভব করিতেন কিন্তু সে কম্পন আনন্দ কিংবা ভয়ের তাহা যেন তিনি সব সময় বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। তাহার নিঃসঙ্গ অনাসক্ত জীবনের উপরে সেই বালকের এই প্রচণ্ড প্রভাব লক্ষ্য করিয়া এক্ষণে তিনি যেন তাহাকে একটু ভয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন! এক একবার যেন মনে হয়, সে আর না আসিলেই মঙ্গল। শীত যতই বাড়িতে লাগিল, সম্মাসীর ততই মনে হইতে লাগিল, এইবার সে নিশ্চয়ই আসিতেছে, আজ কালই সে আসিবে, ততই তাহাব মনে এই ভয় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বাতাস একটু জোরে বহিলে কিংবা কোন শব্দ হইলেই মনে হইত, ঐ বুঝি সে আসিল, ঐ তাহাব পায়ের শব্দ, ঐ তাহার নিঃশ্বাস। উত্তেজনায় অশান্তিতে সম্মাসী দিন দিন শীর্ণ ও অসুস্থ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। এক একটা শান্ত প্রভাতে ধ্যানভঙ্গের পর তিনি আন্তরিক ভাবে প্রার্থনা করিতেন— আর যেন সে না আসে, বালক যেন তাহার সে ইচ্ছা ভুলিয়া যায়, কিন্তু সেই অনির্বাক্ষণ অগ্নিকুণ্ডের পানে চাহিলেই তিনি বুঝিতে পারিতেন, আসিবে— সে নিশ্চয় আসিবে। তাহার সেই অদম্য ইচ্ছার ধূনীতে কাষ্ঠ নিক্ষেপ না করিয়া তাঁহার গতান্তর নাই।

শীত অতীত হইয়া আবার বসন্ত আসিল, সে আসিল না। বুঝি সম্মাসীব প্রার্থনা সফল হইয়াছে, বালক তাহার সে ইচ্ছাকে ভুলিয়া গিয়াছে। এতদিন সে অব একটু বড়ও হইয়াছে, বুঝিয়াছে যে, সে সংকল্পটা নিতান্তই বালকোচিত। তাহাতে উভয় পক্ষেরই সম্পূর্ণ ক্ষতি। হয়ত ত্রিকূটের কথা তাহার তরুণ তরল মনে এখন আর উদয়ই হয় না? সম্মাসী স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সেটা যেন বুকু আটকাইয়া রহিল,—নাসাপথে স্নগ্ধসব হইল না।

বসন্তের পর গ্রীষ্ম আসিল। সম্মাসী দেখিলেন, বসন্তের নবীন সাজবে শুদ্ধ, দক্ষ করিয়া নিদাঘ রুদ্রপ্রতাপে নেত্রানল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রকৃতির শ্যামল আবরণ ও সেই পাষণহৃদয়োথিত মেহধারা শুদ্ধ বিশীর্ণ, লুপ্তকায় হইয়া পড়িতেছে।

আবার বর্ষা। দক্ষ দেহেব কালিনা ও ভস্ম, নিঃশেষে ধুইয়া মুছিয়া দিয়া আবার বনতল শ্যামশোভায় ভরিয়া গেল,— গিবিনির্ঝরিণী নবজীবন লাভ করিল। দক্ষ তাম্রবর্ণ দিগন্তের ঘন মেঘ তাহার মেহধারা-সিঞ্চ ও স্নিগ্ধ শ্যাম সজ্জল আভায় নিখিলের তপ্ত রুম্ব হৃদয়-নয়নকে শীতল করিয়া দিল। দেবতার কবচা ধাবাব মত ধাবায় ধারায় আশীর্বাদ বারি জগতের মস্তক ও বুকোব উপর পড়িতে লাগিল। সম্মাসী সংশযাপন্ন হইলেন। ক্ষণে ক্ষণে প্রকৃতির এ কি বিরোধী ভাব! এই যেন সে অনুতাপে ক্ষোভে হৃদয়স্থ সমস্ত কোমল প্রবৃত্তিকে দক্ষভস্ম করিয়াই ফেলিয়াছিল— আবার তাহার এ কি রূপান্তর! যাহাকে পুড়াইয়া ফেলিয়াছে, তাহাকেই আবার বাঁচাইতে এ কি অস্ত্র মেহাশ্র-নিষেক! কই এত অগ্নিতেও তাহার বক্ষে উপ্ত সেই মায়াব বীজকে সে তো ধ্বংস কবিতে পারে নাই। সে তো আবার নবজীবন পাইয়া তেমন ফলেফুলে সুশোভিত হইয়া উঠিতেছে, উঠিবে। তবে এ সবই তাহার ক্রীড়া মাত্র। হায প্রকৃতি! তোমার যাহা ক্রীড়া, দুর্বল মানবের পক্ষে তাহা যে একেবারেই প্রাণান্তকর। তাহারও অস্তুরেব ফল, ফুল, স্নেহ, আশা সব একদিন নিঃশেষ হইয়া যায়। অমনি কবিয়া পোড়ে,— কিন্তু কই, তোমার মত তো আব তাহারা বাঁচিয়া উঠে না। তাহার শেষ যে একেবারেই নিঃশেষ হওয়া।

বর্ষদিনেব নির্মেধ আকাশে সহসা সে দিন প্রবল মেঘ কবিয়া আসিয়া সম্মাসীর শুদ্ধ চক্ষু ও শীর্ণ দেহ ভাসাইয়া দিয়া তাঁহাকেও যেন প্রকৃতির মত শীতল করিল। শীর্ণতা ও অসুস্থতা গিয়া ক্রমে তিনি সবল হইতে লাগিলেন।

॥ ৩ ॥

রাত্রিতে খুব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। সম্মাসীর নিজ ওহা হইতে নামিয়া নিম্নস্থ ওহাব সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে তাঁহার বোধ হইল। রাত্রির প্রবল বৃষ্টিপাতে পূর্বদিন দত্ত কঠখণ্ডগুলি পুড়িয়া নিঃশেষে ভস্মবাশি ধুইয়া পহিয়া গিয়াছে। ধূনীর অগ্নি অদ্য একেবারে নিৰ্ব্বাপিত।

নিবিয়াছে?— অদ্য দুই বৎসর যাহাব প্রবল ইচ্ছাশক্তিকে সম্মাসী নিজেব অনিচ্ছায়ও সাগিকের ন্যায় সেই অগ্নি রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন— তাহার সন্ধি যোগাইয়া আসিয়াছেন। অদ্য দুই বৎসরের সেই বাসনার সঙ্কুচিত উত্তেজক অগ্নি-হোত আঙ নিবিয়াছে? তাঁহাকে স্বেদ্যয় নিম্ভুতি দিয়াছে। কেহ জোর করিয়া নিবায় নাই। আর এ মিথ্যা স্তোকেব প্রযোজন নাই বুঝিয়া প্রকৃতিই অদ্য তাঁহার প্রতি এই দয়া প্রকাশ করিয়াছেন। মুন্ডির গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া সম্মাসী অবশিষ্ট ভস্মগুলি একদিকে নিক্ষেপ করিলেন ও নির্ঝর হইতে কলসে করিয়া জল আনিয়া ওহাতল সম্পূর্ণরূপে ধৌত করিলেন। যেন তাঁহার স্মৃতি পর্যন্ত পর্বত গাত্র হইতে অদ্য তিনি ধুইয়া মুছিয়া দিলেন। তাঁহার মনে হইল, পর্বত অদ্য ভরত রাজার মত মৃগমেহাশ্রতার ফলযোগ স্বকপ কালবাপী জড়ড হইতে মুক্তিনাভ করিল। তাঁহার পাপই যদি হইয়া থাকে তো অদ্য তাহার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইয়াছে; এ ধূনীর আপনা হইতে নিৰ্ব্বাপিত তাহার প্রমাণ। সম্মাসী আজ বর্ষদিন পবে পূর্বের মত নিজের আশা, তৃষ্ণা, স্মৃতি-চিন্তাসীন, মায়াবন্ধহীন, নিঃসঙ্গ সম্মাসীত্বকেও যেন অনুভব করিলেন!—এতদিন ভয়ে তিনি সে ওহাব অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই।— মনে হইত, এখনি সে কোন্

নিভৃত স্থান হইতে “ঠাকুরজী” বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া জানু জড়াইয়া ধরিবে। অদ্য আর সে কথা মনে হইল না। সম্মাসী নিজের আসন দ্রব্যাদি সেই ওহায় বহিয়া আনিয়া পূর্বের মত স্থাপিত করিলেন এবং স্নানান্তে ধ্যানে বসিলেন।

ধ্যানভঙ্গের পর যখন উঠিলেন, তখন সূর্য্য পশ্চিম আকাশে গিরি অন্তরালে অন্তর্মিত। ওহার মধ্যে প্রায় অন্ধকার হইয়া উঠিয়াছে— বাহিরে প্রদোষের স্তিমিত আলোক। বর্ষদন তিনি এমন গভীর ভাবে ধ্যানমগ্ন হইতে পারেন নাই। শান্তিতত্ত্ব অন্তবে সম্মাসী ওহার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেই কোমল মৃদু আলোকে শিলাপটে পা বুলাইয়া বসিয়া ও কে! রক্ষ কেশের রাশি তাহার অঙ্গস্থ গৈরিক বসনের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সায়াহে আকাশতলে মেঘমনে যেন মূর্ত্তিমতী জ্যোতিষ্ময়ী প্রাবৃত্ত-সন্ধ্যা। সম্মাসীর পদশব্দে সে মুখ ফিরাইতেই সম্মাসীর বোধ হইল, সেই সন্ধ্যার ললাটে দুইটি অতি উজ্জ্বল বিশাল জ্যোতিষ্ক ফুটিয়া উঠিয়া, তাহার মধুরোজ্জ্বল রশ্মি-প্রভায় তাহার অস্তঃস্থল পর্য্যন্ত আলোকিত করিয়া তুলিল। বিস্ময়ে একটা অজ্ঞানিত পুলকে তাহার সমস্ত শরীর যেন স্তব্ধ ও কণ্টকিত হইয়া উঠিল—কি এ! কে এ! সান্ধ্য-রবিকরোজ্জ্বল চলন্ত সুবর্ণ মেঘখণ্ডের ন্যায় সে সম্মাসীর নিকটে আসিবামাত্র তাহার অধরোষ্ঠ হইতে একটা “প্রভা-তরল জ্যোতিঃ” ছটা ছুটিয়া আসিয়া সম্মাসীর চক্ষে লাগিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে সম্মাসী সমস্ত দেহমনে চমকিয়া উঠিলেন “কে এ! কাব এ হাসির বিদ্যুৎ বিভ্রম?”

“ঠাকুরজী!”

“কে তুমি? কে? তুমি কে?”

উত্তর না দিয়া সে সম্মাসীর চরণতলে নত হইল, এহার পরে সম্মুখে মুখ তুলিয়া দাঁড়াইতেই সম্মাসী চিনিলেন, হাঁ— সেই মুখই বটে। কিন্তু তবু এতো সে নয়। এই দুই বৎসরে তাহার একি বিস্ময়কর পরিবর্তন! সম্মাসী স্থলিতকণ্ঠে উচ্চারণ কবিলেন, “পার্বতী?— না,—তবে কে তুমি? পার্বতীবই মত, অথচ সে নও।— কে তুমি— তবে?” সে কথারও কোন উত্তর না দিয়া— সেই গৈরিক-বসনা সম্মাসীর পানে পুনর্বার দৃষ্টি স্থির কবিয়া বলিল— “কই আপনি ত ধূনী জ্বালিয়ে রাখেন নাই? আত্ম সমস্ত দিন আমি এই পাহাড়তলীতে পথ খুঁজিয়া কত কষ্ট পাইয়াছি।”

হাঁ সেইই বটে! এ যে পর্ব্বত-অঙ্গে তাহাব আগমনেব সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সমস্ত পার্বত্য প্রকৃতি, স্থিৰ ভাবে অদ্য দুই বৎসর পরে সেই স্বরসুধা পান কবিতোছে। পূর্ব্বের তরলতা লুপ্ত হইয়া একটি মধুর ম্লিঙ্কভাবে সে স্বর যেন এখন অধিকতর মোহময় হইয়া উঠিয়াছে। সন্ধ্যানিলসম্বলিত বনের ব্যগ্র বাহু তাহার হাবান ধনটিকে বক্ষে চাপিয়া লইবাব জনাই যেন ব্যগ্র হইয়া উঠিল। পর্ব্বতের অঙ্গেও এক শ্যাম-ম্লিঙ্ক স্নেহ বাষ্প ঘনীভূত হইয়া তাহার প্রাপ্ত নিধিকে যেন অঞ্চলে ঢাকিয়া লইতে চাহিল। হায়,—কাহাকে ধরিতে তাহাদের এই স্নেহ-ব্যগ্র বাহু প্রসারণ, এই বক্ষ-বিস্তার।— “আসিয়াছে, সে আসিয়াছে।” কাহার আগমনে নির্ঝবিলী এই আনন্দোচ্ছল কলধ্বনি! যাহাব আগমন প্রত্যাশায় তাহাবা অদ্য দুই বৎসর অন্তরে বাহিবে পথ চাহিয়া আছে, সে আজ আসিয়াছে বটে, কিন্তু তবু এ বুঝি সে নয়! সে যে বৃকে ধরিবার বস্তু— স্পর্শক্ষম রত্ন, আর এ কি? এ যে প্রজ্বলিত অনল-শিখা! তাহাব স্বর, তাহার মুখ, তাহার হাসি, তাহার নাম লইয়া আজ এ কে আসিল? এই ব্যগ্রবৃকে তাহাকে একবার টানিয়া শিরোব্রাজ লইবারও যে উপায় নাই; এ যে স্পর্শেরও অতীত। সম্মাসী ধীরে ধীরে সেই শিলাপটের উপর বসিয়া পড়িলেন। পার্বতীর অতীতদৃষ্ট বালক-মূর্ত্তির স্মৃতি এখনকার এই তরুণীর সঙ্গে মিলিয়া সম্মাসীর মনের মধ্যে উভয়ের সামঞ্জস্য বোধের একটা আলোক জ্বালিয়া দিল।



পার্বতী ক্ষণেক দাঁড়াইয়া থাকিয়া আপনা হইতেই নিঃশব্দে সম্মাসীর পায়ের নিকটে বসিয়া পড়িল। সম্মাসী সহসা সচকিত হইয়া সবিয়া বসিলেন, মৃদু স্বরে প্রশ্ন করিলেন— “তোমার পিতা?” —পার্বতী নতমুখে উত্তর দিল, “আজ ছয় মাস হইল, পুরীসমুদ্রের স্বর্গদ্বার-সৈকতে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।” সম্মাসী ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন,— “পার্বতী?— তাহা কি হইল?” তরুণী আবার তাঁহাব পানে দৃষ্টি স্থির করিয়া বলিল, “আপনি কি আমায় চিনিতে পারিতেছেন না, ঠাকুরজী!”

“না, কারণ, তুমি ত সে পার্বতী নও। তুমি ধনী ভ্রালিয়া না রাখার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলে,— দুই বৎসরের প্রজ্বলিত ধূনী এই পর্বত আভাই নিবাইয়া দিয়াছে। তুমি বোধ হয়, তখন এই বনতলেই ঘূবিতেছিলে। সেই পার্বতীর দেহ লইয়া অন্য একজন তাহার নিকটে আসিতেছে দেখিয়াই সে এ অগ্নিহোত্র নিবাইয়াছে। এ পার্বতীকে তাহাবা কেহই চিনে না।” সম্মাসীর এই প্রচ্ছন্ন তিবস্বাবে পার্বতী মস্তক নত করিল, কিন্তু উদ্ভব দিতে বিবত হইল না। “আমি আজ আসিয়া পৌছিয়াছি দেখিয়াও ত সে অনাবশ্যক অগ্নিটা নিবাইয়া দিতে পাবে।” পার্বতীর এ উদ্ভবে সম্মাসী চমকিত হইয়া উঠিলেন। “তাই কি? তাই কি তাঁহাব অন্তরও আজ এত শান্ত মিশ্র শুদ্ধ-বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল? আকর্ষণকারী অথবা আকৃষ্ট বস্তু নিকটে আসিয়াছে বলিয়াই কি এই নিশ্চিন্তভাব?”

পার্বতী বলিয়া যাউতেছিল, — “পিতা আমার জ্ঞানোন্মেষ হইতেই আমায় বালক সাজাইয়া বাখতেন, আমিও চিরদিন এ ভাবেই কাটাইয়া আসিয়াছি। তিনি প্রথমেই এ কথা আপনাকে জানান নাই বলিয়া পবে পাছে আপনি কিছু মনে করেন, এই আশঙ্কায় আর সে কথা আপনাকে বলিতে পারেন নাই। বিশেষ পথে বালিকা সঙ্গে লইয়া চলা অপেক্ষা আমায় বালকবেশে বাখিতেই তিনি ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু তাহাতে কি এমন অনায় হইয়াছে? আমি তখনও পার্বতী ছিলাম, এখনও তাহাই আছি। কেবল পিতা শেষে এ জন্য অনুতাপ করিয়াছিলেন বলিয়া আপনার সম্মুখে আর ছদ্মবেশে আসি নাই। আপনি ছদ্মবেশে মনে করিতেছেন বলিয়াই একথা বলিতেছি, নইলে আমি জানি, সেইই আমার চিরদিনের বেশ! সারা পথ আমি বালক সাজিয়াই আসিয়াছি। পিতা পুরুষোদ্ধমেব পথে অল্পদূর অগ্রসর হইয়াই পুনর্বর্ষ বয় হইয়া পড়িল। সেখানে পৌঁছিতে আমাদের প্রায় এক বৎসর লাগে। ছয়মাস হইল, তাঁহাব মৃত্যু হইয়াছে।”

“তাহার পরে?”

“তাহার পবে আর কি? শ্রদ্ধ সারিয়াই আমি বাহির হইয়া পড়ি।”

“কেন বাহির হইলে?”

“কেন বাহির হইলাম?” বিকশিত পদ্ম নেত্রে যেন বাথার তড়িৎ স্পর্শ করিল!—

“কেন? আপনার কাছে না আসিয়া তবে কোথায় যাইব?”

সম্মাসী মস্তক নত করিলেন, মৃদুস্বরে বলিলেন, “পিতা কি তোমার কোন ব্যবস্থা করিয়া যান নাই? সেখানে ত তোমরা প্রায় ছয়মাস ছিলে, সেখানে কাহারও সহিত কি তোমাদের পরিচয় হয় নাই? কাহাবও আশ্রয়ে কি তোমাকে রাখিয়া যান নাই?”

“রাখিয়া গিয়াছিলেন।”

“তবে? তাহারা কি তোমায় যত্ন করিয়া বাখিতে চেষ্টা করে নাই?”

“কেন করবে না? আমি সেখানে থাকিব না? আমি না থাকিলে তাহারা কি আমায় জোব করিয়া ধরিয়া রাখিতে পাবে?”

“কেন এমন কাজ করিলে?”

কিয়ৎক্ষণ নিৰ্বাক থাকিয়া পাকৰ্ৱতী উত্তৰ দিল, “বেশ কৰিয়াছি”। তাহাৰ ব্যথিত ক্ৰোধপূৰ্ণ স্বৰ শুনিয়া সন্ন্যাসী পাকৰ্ৱতীৰ পানে চাহিলেন, সন্ন্যাসীৰ অন্ধকাৰ বৃক্ষতলে ঘনতৰ হইতেছিল, মুখ দেখা গেল না! সন্ন্যাসী ধীৰে ধীৰে বলিতে লাগিলেন, “তোমাকে আমার নিকট রাখিবার যে উপায় নেই, তাহা ত তোমার পিতাৰ নুখেই শুনিয়াছ।”

“আমি সে কথা জানি না, আমি আপনাৰ ‘চেলা’ হইব, তাহাতো আপনাকে বলিয়া গিয়াছিলাম।”

“তুমি স্বীলোক!”

“হইলাম বা। কত সন্ন্যাসীৰ সন্ন্যাসিনী শিষ্যা কত?”

“কাজ বড়ই অনায়া কৰিয়াছ। তোমাকে আবার হয় পুৰুষোত্তমে, নয় পূৰ্ব বাসস্থান হরিদ্বারে ফিৰিয়া যাইতে হইবে।”

“এই সুদীৰ্ঘ পথ ভাঙ্গিয়া আবার আমি ততদূৰে ফিৰিয়া যাইব?”

“হাঁ!”

“যাইতে পাৰিব কেন?”

“তা তুমি পাৰিবে।”

“যদি না যাই?— তাড়াইয়া দিবেন, কেমন?”

সন্ন্যাসী একটু হাসিয়া অস্পষ্ট স্বৰে বলিলেন, “হাঁ।”

“আজই? এখনই কি? দেন্ তৰে—”

বলিতে বলিতে পাকৰ্ৱতী উঠিয়া দাঁড়াইল।

সন্ন্যাসীৰ বোধ হইল, যেন সেই কঠিন পৰ্ব্বত পৃষ্ঠ দ্বিগুণ কঠিন ও শুষ্ক হইয়া পড়িতেছে, নিৰ্বিৰণীৰ কলধ্বনি একেবারে নিঃশব্দ— বায়ুস্পন্দহীন। পূৰ্ব আকাশে অর্দ্ধোদিত চন্দ্র এবং গগনের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তারকাপুঞ্জও স্থির চক্ষে যেন এই ব্যাপাৰেৰ শেষ প্ৰতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। সন্ন্যাসী কথা কহিলেন, যেন বহুদূৰ হইতে রোদনধ্বনি ভাসিয়া আসাৰ মত সে শব্দ,— “তুমি বোধ হয় সমস্ত দিন কিছু খাও নাই?”

“তাহাতে কি! আমার এমন কতদিন যায়।”

“আজ তাহা উচিত নয়, কেন না এ আশ্রমে তুমি আজ অতিথি! পাকৰ্ৱতী! তোমাৰ বৰ্ণাৰ জলে স্নান কৰিয়া এস।”

“আপনি ব্যস্ত হইবেন না। আমার তেমন ক্ষুধা-বোধ হয় নাই।”

“আমাৰ কিন্তু হইয়াছে, পাকৰ্ৱতী! আমিও সমস্ত দিন কিছু খাই নাই। আজ ফলাহরণ কৰিতে পাৰি নাই কিন্তু আজ খাদ্য আছে। আমি আলোক জ্বালি, তুমি স্নান সাৰিয়া লও।”

সন্ন্যাসী ওহাৰ মধ্যে গিয়া কাঠে কাঠে বৰ্ষণে বহু চেটায় অগ্নি জ্বালিলেন। এ দুই বৎসৰ আৰ এ শ্ৰম স্বীকাৰ কৰিতে হয় নাই। আজ দুই বৎসৰ যাহাৰ হস্তপ্ৰজ্বলিত-অগ্নি এই ওহাৰ বুকুে তাহাৰ স্মৃতিৰ সঙ্গে দিবাৰাত্ৰ ধূমাইয়াছে, আজ তাহাৰই এখানে স্থান নাই, বুঝি তাহাকে এখানে প্ৰবেশ কৰিতে দিলেও প্ৰত্যবায় আছে। হয় প্ৰভু শঙ্কৰাচাৰ্য্য। যে নাবী জাতিৰ দোষেৰ কথা বলিতে তুমি “অচতুৰ্বদনো ব্ৰহ্মা” হইয়াছ, পাকৰ্ৱতী সেই জাতি? প্ৰাণিগণেৰ শৃঙ্খলস্বৰূপা, নৱকেৰ দ্বাৰকথিতা হেৰ নাৰী সন্ন্যাসীৰ পক্ষে বুঝি দয়াৰুও অযোগ্য সে।

সন্ন্যাসী বাহিৰে আসিয়া দেখিলেন, পাকৰ্ৱতী সেই এক ভাবেই দাঁড়াইয়া আছে— নড়ে নাই সৰে নাই। বুঝিলেন বালিকাৰ পক্ষে আঘাতটা অত্যন্ত গুৰুতৰ হইয়াছে। তাহাৰ এই দাবণ অধাবসায় ও পথকষ্টেৰ প্ৰথম সাফল্যলাভেৰ সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে এতটা আঘাত দেওয়া উচিত হয় নাই। আজই তাহাকে ফিৰিবাৰ কথা বলায় অত্যন্ত নিষ্ঠুৰতা প্ৰকাশ

হইয়াছে। এ কার্যটি তাঁহার সম্যাসধর্মের উপযোগী হইলেও যে মহান ধর্মের বশবর্তী হইয়া একদিন তিনি তাহাদের আশ্রয় দিয়াছিলেন, বর্ষদিন মেহযত্ন দেখাইয়াছিলেন, সেই মানবধর্মের উপযুক্ত হয় নাই। সে ধর্ম অদ্য নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ণ হইতেছে। আর আজ যদি সেই বালক পার্বতী এমন করিয়া ছুটিয়া আসিত, তাহা হইলে কি তিনি তাহাকে এমন কঠিন কথা বলিতে পারিতেন বা দূরে ঠেলিয়া দিতে পারিতেন! হয় কেন তাহা হইল না? কেন তাঁহার সেই সুখস্পর্শ-কিশোর চন্দ্রটি এমন জ্বলিত হৃতাশন রূপ ধারণ করিল? যাক্ সে খেদ, সে স্নেহবন্ধনও যে এইরূপে কাটিয়া গেল। সে ভালই হইল। কিন্তু তথাপি এত সেই পার্বতী, যাহার জন্য আজ দুই বৎসর—না, তাহাকে নিকটে রাখা হইবে না, তবে মিষ্ট কথায় অন্ততঃ আগামী কলা ইহা বুঝাইয়া দিলেও চলিত। আজ তাহাব দূরন্ত পথশ্রমাপনোদনের জন্য আতিথ্য স্বীকার স্নেহে ব্যবহার প্রদর্শনই কর্তব্য ছিল। সম্যাসী বলিলেন, “পার্বতী! মানে যাও।” পার্বতী নড়িল না—উদ্ভব দিল না! তখন কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া পূর্বের ন্যায় আদর মাখা কোমল কণ্ঠে সম্যাসী ডাকিলেন, “পারবতিয়া? কথা শুনিবে না?”

মূহূর্ত্তে পতনশীলা পার্বতী প্রবাহিনীর ন্যায় তীব্র বেগে পার্বতী তাঁহার নিকটে ছুটিয়া আসিল। দুই বৎসর পূর্বের ন্যায় অসঙ্কোচ ক্ষিপ্র হস্তে সম্যাসীর দুই হস্ত ধরিয়া ফেলিয়া আকর্ষণ করিতে করিতে এবং নিজেও পশ্চাতে হেলিয়া পড়িয়া পাছু হটিতে হটিতে বলিল, “বলুন—আমায় এই পাহাড়ে থাকিতে দিলেন? বলুন তাড়াইয়া দিবেন না? বলুন, নহিলে আমি কিছুই খাইব না। যাইব ত নাই, কিন্তু এইখানে ধরনা দিয়া পড়িয়া থাকিব, আপনায় কিছু খাইবনা। দেখিব আপনি কিভাবে অতিথি সংকার করেন? বলুন, শীঘ্র বলুন!” হস্ত নুত্ন কবিতা লইয়া সম্যাসী গুহাদ্বারে সরিয়া আসিলেন। বুঝিলেন, এ বালিকার বাক্য ও কার্যে কিছু মাত্র প্রভেদ নাই। বলিলেন, “এই সত্যে বদ্ধ না হইলে তুমি সত্যই আহার কবিবে না?”

“না।”

“আচ্ছা, তাহাই হউক। তুমি এই পর্বতেই থাক।”

আবার মুখের হাস্য বিজলী খেলাইয়া পার্বতী ঝরনার দিকে ছুটিয়া চলিয়া গেল, মানান্তে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল—সম্যাসী তখনও একভাবে গুহাদ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন। হাসিয়া বলিল, “এই বুঝি আপনাব অতিথি সংকার? সকন, আমি সব যোগাড় করিয়া লইতেছি।” সম্যাসী ব্রহ্মে পথ ছাড়িয়া দিলেন। গুহাস্থ আলোকও নিব্বাণোন্মুখ হইয়া আসিয়াছিল, এইবার ইন্ধন পাইয়া সে সতেজে জ্বলিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পরে পার্বতীর আহ্বানে সংজ্ঞালাভ করিয়া সম্যাসী গুহামধ্যে চাহিয়া দেখিলেন, আহাৰ্য্য প্রস্তুত। অপ্রতিভ ভাবে তিনি গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, “আমায় সাহায্যের জন্য ডাকিলে না কেন পার্বতী? এই পথশ্রম ও অনাহারের উপর তোমায় বড় কষ্ট দিলাম।” পার্বতী হাসিমুখে উত্তর দিল, “সারাদিন পথ হাঁটার পব এ রকম পরিশ্রম কি আমায় প্রায় প্রত্যহই করিতে হইত না! এখন আহারে বসুন, সমস্ত দিন খান নাই কেন? পাহাড়ে ত ফলজল ছিল।”—সে কথার উত্তর না দিয়া সম্যাসী বলিলেন, “পারবতিয়া। আমায় বাকি আতিথ্যটুকুও অন্ততঃ কবিতো দাও, তুমি অগ্রে খাও, বিশ্রাম কর, পরে আমি খাইব।” পার্বতী এবার দুই বৎসর পূর্বের মত উচ্চ হাস্যের কলধ্বনি তুলিয়া বলিল, “আপনার অতিথি সংকার প্রথম হইতেই তো খুব চমৎকার রন্ধনের হইয়াছে। এখন এটুকুতে আর দোষ স্পর্শিবে না। এতো আমার গুহায় আমায়, গৃহস্থালীতেই আপনি আজ আসিয়াছেন। এটিতে তো আমার গৃহস্থালীই ছিল।”

“আজ একদণ্ডের মধ্যে তুমি যতখানি গৃহিণীপনা প্রকাশ করিতেছ, দুই বৎসর পূর্বের পার্বতী এতখানি জানিত না! কথাবার্তায় ও অন্যান্য বিষয়ে তুমি এখনও সেই বালক পার্বতীই আছ বটে কিন্তু কার্যভাঃ”— বলিতে বলিতে সন্ন্যাসী থামিলেন। পার্বতীও একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া মুখ নীচু করিল। সেই নাবীদ্বের নবীন আভ্যাসিত মুখের উপরে ওহার দীপ্ত আলোক পড়িয়া যে অপূর্বশ্রী উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তাহা দেখিয়া সন্ন্যাসী পুনর্ব্বার স্তব্ধ হইয়া গেলেন। বুঝিলেন এই নারী যেখানে চরণপাত করিবে, সেইখানেই গৃহ আপনি গড়িয়া উঠিবে। হায় রমা! নিভ্র শ্রী-ভাণ্ডার শূন্য করিয়া এই অপূর্ব সম্পদকে কোথায় পাঠাইলে? এই সন্ন্যাসীর গুহায়? এ কি বিদ্রূপ তোমার? সন্ন্যাসীকে নিশ্চেষ্ট ভাবে দাঁড়িয়া থাকিতে দেখিয়া পার্বতী বলিল, — “কই বসুন!” “তুমি?” আবার সেই রূপ সলজ্জ সহাস্য মুখ নত করিয়া পার্বতী বলিল, — “এর পরে।” সন্ন্যাসী আর বাক্যব্যয় করিলেন না। নিঃশব্দে, দেবতাকে আহাৰ্য্য নিবেদন কবিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার মানস চক্ষু তখন বাল্য যৌবনের স্মৃতিময় গৃহের চিত্র নিঃশব্দে ফুটিয়া উঠিতেছিল। সেই গৃহে স্বর্ণসেবারতা স্নেহশীলা মাতা ও ভগিনীৰ প্রীতি। তাঁহাদের সেই অক্লান্ত কর্তব্য ও স্নেহসেবায় পূর্ণ কল্যাণ হস্তধেরা গৃহস্থালী। বাল্যের সেই স্মৃতি, তাহার পরে যৌবনের সেই কাব্যসাহিত্য অধ্যয়ন হইতে ক্রমে বেদশাস্ত্রাদি পাঠ, গৃহবাসে অনিচ্ছা। দ্বাদশ বৎসরব্যাপী ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান, পরে এই সন্ন্যাস, সেও আজি চারি পাঁচ বৎসরের কথা। হায় এত দিনের এই গৃহত্যাগের পর সেই “গৃহ”, অদ্য কোথা হইতে তাঁহার চক্ষের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।—

পার্বতী ওহার চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল, — নিভ্র মনে বলিল, “আপনাব আসন কমণ্ডলু আবার এই গুহাতে আনিয়াছেন, দেখিতেছি? উপরের গুহায় নইয়া যান্— নহিলে আমি কোথায় থাকিব?” সন্ন্যাসী কোন উত্তর দিলেন না। আহাবাস্তে তিনি ওহার বাহিরে আসিয়া শিলাতলে বসিলেন। বৃক্ষ শাখার ব্যবচ্ছেদ পদে শুভ্র জ্যোৎস্না আসিয়া শিলার কৃষ্ণ কর্কশ গাত্রে মায়ার অপূর্ব মোহজাল বিস্তার কবিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে পার্বতী ভোজনান্তে বাহিরে আসিয়া বলিল, “তবে আমি এই ওহার মধ্যেই থাকি? আপনি উপরের গুহায় যান্!”

“যাইতেছি। তুমি শ্রান্ত আছ, শোও গিয়া। কোন ভয় নাই।” “ভয়”—অবজ্ঞাব হাসিব সহিত মন্তক নাড়িয়া পার্বতী ওহার মধ্যে চলিয়া গেল। সন্ন্যাসী বুঝিলেন, তাহাকে ভয়ের কথা বলাই নিবুদ্ধিতা। যে বালিকা সেই সুদূর উড়িষ্যার শেষ প্রান্ত হইতে একা অসহায় অবস্থায় এতদূরে আসিতে পারিয়াছে, সেই বালিকার অসাধারণ শক্তির কথা মনে করিতে গিয়াই সন্ন্যাসী যেন শিহরিয়া উঠিলেন! এই অসামান্য নারীর অদম্য প্রভাব রোধ করা বুঝি সাধারণ শক্তির কার্য্য নয়। তাঁহার সেই বিংশবর্ষ হইতে অনুষ্ঠেয় ব্রহ্মচর্য্য এই ষোড়শবর্ষে কি এত খানি শক্তি লাভ করিয়াছে, যাহাতে এই সৌন্দর্যাগ্নিতেজস্বিনী শক্তিময়ী ষোড়শীর প্রভাব খর্ব্ব করিতে পারে? সেই ছন্দবশী কিশোরের প্রতি তাঁহার অনন্যসাধারণ আকর্ষণেই তাহার তো পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। আজ যেন সেই অকারণ উদ্ভূত অদ্ভুত স্নেহের তিনি প্রকৃত মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। তাহাব এই দুৰ্দম প্রতাপের কারণও বুঝিতে পারিলেন।

পলাইতেই হইবে। না পলাইয়া উপায় নাই। কিন্তু বালিকার কি গতি হইবে? সে হয়ত তাহার সম্ভাবিত সুখাত্ম্য ত্যাগ করিয়াই আসিয়াছে! চিন্তা আব অধিক দূর অগ্রসর হইল না। ওহামধ্যে হইতে সেই পদশব্দ। তেমনি করিয়া পা ফেলিতে ফেলিতে পার্বতী বাহিরে আসিল। “ওহার মধ্যে বড় গরম। খোলা আকাশের তলায় থাকিয়া স্বভাব মন্দ হইয়া গিয়াছে।”— বলিয়া পার্বতী সেই গুহাদ্বাবে গুইয়া পড়িল, তাহার রক্ষ কেশরাশি শৈবালের মত চারিদিক

আধার করিয়া ছড়িয়া পড়িয়া মধ্যস্থলে সুপ্ত পদ্মের মত মুখখানিকে ধরিয়া রহিল। সন্ন্যাসী চাহিয়া চাহিয়া বলিলেন, “পার্বতী! তোমার পিতা কি তোমার বিবাহের স্থির করেন নাই?”

পার্বতী একটু নাড়িয়া চড়িয়া চোখ বুজিয়াই উত্তর দিল, “আঃ আর্পণ এখনো তাহাই ভাবিতেছেন।— করিয়াছিলেন।”

“কাহার সহিত।”

“যাহাকে আমার ভাব দিয়াছিলেন, তাহার সহিত।”

“তুমি এইরূপে পলাইয়া আসায় ব্যথিত হইয়া, সে হয়ত তোমায কত খুজিতেছে।”  
“তাহাতে আমার কি!” পার্বতী পাশ ফিবিয়া গুইল, এবং দেখিতে দেখিতে গভীর ভাবে ঘুমাইয়া পড়িল।

এত নিকটে, এত নিকটে সে। সে অর্দ্ধস্বুট চন্দ্রালোকে কঠিন শিলার বক্ষে হস্ত ভ্রগতের কত প্রার্থী হৃদয়ে গমুলা রত্ন। সন্ন্যাসী ব নিঃশ্বাস যেন বৃক্কেব মধ্যে বাধিয়া যাইতেছিল। আপনার সেই প্রথম যৌবনে পাঠদশায় সদা ভ্রাগত কামনায স্মৃতি মনে পড়িতেছিল। যাহাদেব বর্ণনায কবি তাহার সমস্ত কল্পনা-ভাণ্ডার উড়াড় করিয়া বিশ্বের সম্মুখে ঢালিয়া দিয়াছেন, ববি কল্পনার সেই জীবন্ত প্রতিমা মেঘদূতের যক্ষপত্নী, রঘুবংশের ইন্দুমতী, শকুন্তলা, কুমাবসম্ভবের পার্বতী, অদ্য যেন এই প্রস্তরবক্ষে অনাদরে অপমানে সৃষ্টিতা হইতেছে।

ঘুমের ষোরে পার্বতী আবার পাশ ফিবিল, চুলগুলি মুখখানিকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলায় হয়ত কষ্ট হইতেছে। বৃদ্ধেব হ্রতি আদরেব গর্বেব সেই ভ্রমরনিদ্রিত কেশগুলি অযত্নে এমন ভটা বাধিয়া গিয়াছে। সন্ন্যাসী চমকিয়া উঠিলেন। চুলগুলি সযত্নে সবাইয়া দিতে, একটু ওছাইয়া ব্যথিতে মন যেন নিদ্রোহ করিয়াও অগ্রসর হইতে চায়!

সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বালিকার ভাগো যাহা হয় ইউক, তাঁহাকে যাইতেই হইবে। “জিতং জগৎ কেনং মনোতি যেন।” এ জগৎভয়ী “শূর” তাঁহাকে হইতেই হইবে।

## ॥ ৪ ॥

পাচ ভ্রোশ পথ হ্রতিবাহনাতে বর্ষা-বারিপূর্ণা খবরোতা “যন্নু জোড়ু”-কে একটা কাঠেব ভেলায় অতিক্রম করিয়া সন্ন্যাসী দেওঘরের পশ্চিম বনভূমে পৌছিলেন, এবং নিশ্বাস ভাগ করিয়া পশ্চাতে চাহিলেন। পূর্বে ব্রিকুটের তিনটি চূড়া মাত্র জাগিয়া আছে, বাকী সমস্ত দেহটা দূরত্ব হেতু লুপ্তদর্শন। নদীতীরস্থ বনের গভীরতা এবং নদীস্রোতের দূরন্ততায় সন্ন্যাসী কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া বৌদ্রতপ্ত শ্রান্ত দেহকে সেই বনমধ্যে লুকায়িত করিলেন, একটু অনুসন্ধানের পর কয়েকটা প্রস্তরখণ্ড নির্মিত এমন একটু স্থান পাইলেন, যেখানে রৌদ্রবৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবেন এবং বনের বাবচ্ছেদ পথে নদীতীর ও ব্রিকুট-শিখর বেশ দেখা যাইবে। সন্ন্যাসী দিনকতক ঐ স্থানেই আশ্রয় লইতে ইচ্ছুক হইয়া বনের ফল ও নদীর জল পান্যান্তে নিরাপদে রাত্রি যাপনেব জন্যে শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিলেন। এরূপ স্থানে যে হিংস্র জন্তুর আশঙ্কা আছে তাহা তিনি বেশ জানিতেন।

বাত্রি আসিল, কিন্তু অগ্নি জ্বালিতে যে ভয় হইতেছে। যদি ঐ আলোকছটা দেগিয়া কোথা হইতে সে এখানেও আসিয়া পড়ে। তাহা হইলে বুঝি আর তাহার রক্ষা নাই। কিন্তু এই কি তাঁহার মনোভয়? তাহাকে ভাগ করিয়া আসিয়াছেন বটে কিন্তু ঐ ব্রিকুট-শিখর কয়টি দেখিবার বাসনা ত কই তিনি ভাগ করিতে পারিলেন না। হায়! সেকি দূরন্ত অনির্ব্বাণ ধুনীই জ্বালিয়া দিয়াছে।

হিংস্র স্বাপদের আশঙ্কায় অগত্যা কতক রাত্রে অগ্নি জ্বালিয়া সম্যাসী বসিয়া রহিলেন। প্রত্যেক শব্দে, প্রত্যেক পত্র কম্পনে “এ সে আসিতেছে” ভাবিতে ভাবিতেই রাত্রি কাটিয়া গেল, সে আসিল না, সম্যাসীর ভয় একটু কমিল। এত নিকটে তিনি আছেন, তাহা সে আশ্বস্ত না করিতেও পারে, সম্যাসী এইকালে নিত প্রতিক্ষা রক্ষা করিলেন দোখিয়া অভিমানে সে ব্রিকট ছাড়িয়া পুরী অথবা নিতদেশে অভিমুখে চলিয়া যাইতেও পারে। কিন্তু তাহা যদি সে না যায় তাহাব দুরন্তপণ ও দুর্দম প্রকৃতিবশে যদি সে এ পর্বতেই পড়িয়া থাকে? তাহা হইলে কি হইবে? ব্রিকট-শিখর দিকে চাহিয়া এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই সম্যাসীর প্রভাত অতিবাহিত হইয়া গেল। সহসা পশ্চিমে চাহিয়া দেখিলেন, দিগন্ত অন্ধকার করিয়া দিগ্ভীয়া পাহাড়ের উপর যেন একদল কৃষ্ণহস্তী যুগবদ্ধ হইতেছে। তাহাদের বগ্নপ্রীড়ায় পর্বতের শাম অঙ্গে মুহুমুহঃ উদ্ভাসিত। ক্রমে সেই গগনহস্তিদল বায়ুবেগে দিকে দিকে চালিত হইয়া ব্রিকট, দিগ্ভীয়া প্রভৃতি পর্বতগুলিব মধ্যস্থিত প্রকাণ্ড আকাশের তলায় যেন একখানি কৃষ্ণবস্ত্র মেলিয়া ধবিল। তাহাদের গষ্ঠীর বৃহত্তেব সঙ্গে “হু হু” “বোঁ বোঁ” রবে বায়ুও যোগ দিয়া শিলাকোটব মধ্যগত সম্যাসীর কর্ণে যেন একটা ঘোর উন্মত্ত হাহাকাবের সৃষ্টি করিয়া তুলিল। মেঘ দেখিয়া এতক্ষণ তিনি একদৃষ্টে ব্রিকট পানে চাহিয়া ভাবিতেছিলেন, যদি সে ওখানে থাকে, তাহাব কি ভয় হইতেছে! কিসের ভয়। এই ত একটা বস্ত্রখণ্ডেব নিম্নেই উভয়ে রহিয়াছেন। মেঘের এই অপকণ চন্দ্রাতপ রচনায় তাঁহার মনেও যেন একটা সুখের বিদ্যুৎ খেলিতেছিল। মেঘের মাস্ত্রে বক্ষ দূর দূর কাঁপিয়া বলিতেছিল, “ভয় নাহি, আমি এই নিকটেই রহিয়াছি।” কিন্তু এখন বায়ুর সেই শব্দে তাঁহার মন অশান্ত হইয়া উঠিল, যেন মনে হইতেছিল নদীতীরে কে কাঁদিয়া বেডাইতেছে। ইহা যে, তাঁহার মনের ভ্রম মাত্র, তাহা বুঝিয়াও মন শান্ত হইতে চাহিল না।

বায়ু বার্থরোষে বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়াও মেঘকে স্থানভ্রষ্ট করিতে পারিল না। বিব্যাট সমাবোধে বৃষ্টি নামিয়া আসিল। অন্ধকারকে মুহুমুহঃ শব্দময় করিয়া তড়িময় ধারাবর্ষণে বনভূমিকে শোণিতবস্ত্র গৈরিকবািতে প্রাবিত করিয়া তুলিল। ভূমির সেই শোণিতময় শ্রোত, উচ্চ ভূমি হইতে শিলাবক্ষে প্রতিহত কলকম্বোল শব্দের সঙ্গে ফেনপুঞ্জ অঙ্গে মাখিয়া নিম্ন ‘খাদে’ পতিত হইতে লাগিল এবং খাদ উপচাইয়া আবার নদীবক্ষে গিয়া পড়িতে লাগল। তল-তল-তল! আকাশ হইতে ধাবার পব ধাবা অশান্ত ভাবে নামিয়া, ধবণীকে ডুবাইয়া ভাসাইয়া, গুধু অনিবার তলশ্রোত নিম্নভূমিতে গিয়া আছড়াইয়া পড়িতেছে।

সন্ধ্যা, বৃষ্টি তখন থামিয়া গিয়া মাঝে মাঝে এক আধ ফোঁটা পড়িতেছে মাত্র। তলতলশ্রুনা সর্বত্র সমান অন্ধকার, কেবল এক একবার বিদ্যুৎ বিকাশ ও মেঘের স্বনে পৃথিবীর অস্তিত্ব জানা যাইতেছে। বায়ু স্তব্ধ— নদী শোণিত তলপূর্ণা বৈতরণী, ক্ষিপ্ৰবেগশালিনী। সম্যাসী শিলাকোটব-সঙ্কীর্ণ শুষ্ক কার্ণে অগ্নি-সংযোগ করিলেন। আলোক জ্বালিয়া কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকাব পরে সহসা একটা বিদ্যুৎ-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দৃষ্টি নদীর অপর তীরে পতিত হইল! চকিতে তিনি দেখিলেন, নদীতীরে কে যেন ছুটিয়া আসিতেছে। এম কি? কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই অন্য একটা বিদ্যুতের আলোকে বুঝিলেন— এবারে এ ভ্রম নয়। সত্যই কেহ নদীতীরে আসিয়াছে। এমন সময়ে এমন স্থানে সে ভিন্ন আর কে হইতে পারে? সেই নিশ্চয়! এই আলোকাকৃষ্টা হইয়া হয়ত এখনি এখানে আসিবে। সম্যাসী সবয়ে ব্রহ্মে প্রস্থলিত অগ্নিকে নিবাইয়া ফেলিলেন। পরক্ষণেই মনে হইল, এ ভয় তাঁহার নিরর্থক।

সম্মুখে এই তরগীহীনা ক্ষুরধারা নদী— কাহার সাধা এ সময়ে ইহাব ডল স্পর্শ কবে। অতি সুরক্ষিত দুর্গেই তিনি বসিয়া আছেন। এই দুবস্ত নদীই তাঁহার অমিহস্তা প্রহরীণী।

নদীর অপবতীরে সহসা এ কি শব্দ? হাঁ সেই 'ত'! তাহারই এ কণ্ঠস্বর! এ ও সেই— উচ্চ আর্দ্রকণ্ঠে কি বলিতেছে! ভাষা ভাল বোঝা গেল না, কিন্তু 'আলোক' এইরূপ একটা শব্দ পুনঃপুনঃ সম্মাসীব কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। সম্মাসীব মনে হইল, সে যেন বলিতেছে— "আলোক জ্বাল, ওগো, জ্বাল আলোক আবার! কেন নিবাইলে? কোথাও কোন দিকে তুমি — আমায় আর একবার বুঝিতে দাও। আবার একবার আলোক জ্বাল।"

আবার বিদ্যুৎ বিকাশ! এ 'ত' নদীতীরে সেই দাঁড়াইয়া! আবার সেই আর্দ্রকণ্ঠস্বর, কিন্তু সেই আলোক শব্দটি বাতীত অনাভাষা কিছুই স্পষ্ট হইতেছে না। আবার সম্মাসীর মনে হইল, যেন সে চাঁৎকার করিয়া সেই কথাই বলিতেছে :—

"আলোক দেখাও, বুঝিতে দাও তুমি এখানেই আছ! আবার যদি পলাও, আমি এখনি গিয়া তোমায় ধরিব। আলোক দেখাও একবার—।"

সম্মাসী নিশ্চেষ্ট, ক্রমে যেন অঙ্গস্পন্দনশক্তি বহিত হইয়া পড়িতেছিলেন, চক্ষুও যেন বৃজিয়া আসিতেছে। মন, কেবল এক একবার গর্বাগ্নির শেষ স্মৃতিঙ্গ উদ্ভ্রষ্ট করিয়া মাথা নাড়িতেছিল, — "না— আলো জ্বালা হইবে না। জ্বালা হইতেই হইবে।" কিন্তু পরমুহূর্তেই অস্তরের অন্তঃস্থ হইতে আর একজন কে বলিতেছিল, "এখনও তোমাব জ্বালা হইবার সাধ? তোমার এই সুপ্ত বাসনাগুস্ত মেহপ্রেমের প্রতিঘাত-স্পন্দনময় হৃদয় লইয়া যৌবনের উদ্ভেজক খেলালে নানাশাস্ত্র আলোচনার ফলে ঝোঁকেব বশে তুমি যে এই কৃত্রিম সম্মাসপস্থা লইয়াছিলে— ইহাতে সেই মহাসম্মাসী মহাযোগীঃ প্রতারণিত হন নাই। তিনি তোমাব হৃদয় বুঝিয়াই সেই আঙাই বৎসব পূর্বে একদিন এই লোকদুর্লভ নির্মাল্যাটি যেন স্বেচ্ছায় আশীর্বাদ ধরূপেই তোমায় দিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, যে, ভোগ নহিলে তোমার দুর্বল মনে এই সাধনার উপযোগী বল সঞ্চিত হইবে না। যাহা দিনাম, মন্তকে ধারণ করিয়া তোমার অভ্যন্ত ক্ষুধিত তৃষিত আত্মাকে অগ্রে মেহ-প্রেম ভোগে ভুপ্ত করিয়া লও! দম্ব তাগ কর, দম্ব লইয়া আমাব নিকটে কেহ আসিতে পারে না। আত্মসমর্পণশীল বিনতশিব না হইলে আমাব নিকটে আসিবার উপায় নাই।"

দর্পোন্নত মস্তক তাঁহাব সে করুণা মস্তক পার্শ্বা লয় নাই, বাসনাব দ্বাবা প্রাণনিযত নিঃশর্ত হইয়াও পরাস্তের অপমান স্বীকার কবে নাই। সম্মাসী বুঝিতে পারিতেছিলেন, সেই বাসনাই এখন প্রবল অগ্নি-স্রোতের ন্যায় তাঁহাব চতুর্দিক ঘিরিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। আর পলাইবার উপায় নাই, এ অগ্নিতে তাঁহাকে ভস্ম হইতেই হইবে। এ যে জনহুল, বনপর্বত একযোগে চাঁৎকার করিয়া বলিতেছে,— "অনল জ্বাল, তোমাব এ আগুন পুড়িবেই হইবে।" তীর হইতে পুনর্ব্বার যেন শব্দ আসিল, "আলোক জ্বালিলে না?— পলাইতেছ? কোথায় পলাইবে? আমি এখনি গিয়া তোমায় ধরিব।"

বিনম্রের ন্যায় সম্মাসী নির্ব্বাপিত অগ্নিকে পুনঃ প্রজ্বলিত করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। কম্পিত হস্তের কার্য্য শীঘ্র সমাধা হয় না। সহসা একটা অনাপ্রকারেব শব্দ তাঁহার কর্ণে গেল, — যেন জলের প্রবল আত্মহুলন শব্দ। সে কি এই নদীগর্ভে— এই অলঙ্ঘ্য নদীস্রোতে ঝাপড়িয়া পড়িল? সম্মাসীও হস্ত এবাবে একেবারে যেন অবশ হইয়া আসিল। নদীগর্ভ হইতে আবার সেইরূপ অস্পষ্ট চাঁৎকার— "এখনো একবার আলোক দেখাইয়া বুঝিতে দাও, কোন

খানে তুমি আছ,— জ্বাল একবার আলোক।” বনতল সম্বরে চীৎকার করিল— “আলোক, আলোক, আলোক!”

পশ্চিমে ওকি ভৈরব গজ্জন? জলে ওকি উন্মত্ত কল্লোল শব্দ? পর্বত হইতে ‘বুহা’ নামিয়া, ‘যমুনা-ভোড়’-বক্ষে ‘বানের’ ন্যায় প্রমত্ত শ্রোতে ছুটিয়া আসিতেছে। সম্মাসী ক্ষিপ্রহস্তে দাহ্য কাষ্ঠে অগ্নিসংযোগ কবিয়া প্রজ্বলিত কাষ্ঠহস্তে উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া বাহির হইলেন।

প্রমত্ত নদী-বুহা-জল বেগে স্ফীত হইয়া, উভয় তীরের উন্নত ভূমি পর্যাণ্ত স্পর্শ করিয়া ঘোব রোলে ছুটিয়া চলিয়াছে। সেই কাষ্ঠদণ্ড আলোকরেখা সম্পাতে সেই ফুটন্ত রক্ত ধারার মত জল যেন বাষ্পের হাসি হাসিয়া ঘোর অন্ধকারের দিকে নিঃশব্দে ছুটিতেছে। কে কোথায়! কে আলোক দেখিবে? কে আলোক চাহিতেছিল,— কোথায় সে? সম্মাসী আলোক দণ্ড হস্তে সেই বক্ত-শ্রোতের মধ্যে লাফাইয়া পড়িলেন।

এই ত উত্তাল নদী-তরঙ্গ! এই ত তাহার অন্তরঙ্গীষ বেগ! ইহার মধ্যেও আলোক হস্তে তোমায় খুঁজিতেছি, এই আলোকে একবার তোমায় দেখিতে চাই! যে আলোক তুমি জ্বালাইয়াছ, তাহারই কিরণে একবার উভয়ে উভয়কে খুঁজিয়া লইতে দাও, খুঁজিয়া পাইতে দাও। কোথায় তুমি লুকাইবে, কোথায় পলাইবে? এই চির-প্রজ্বলিত অনির্বাক্য আলোকের সম্মুখে একদিন গ্রাহ্য তোমায় পড়িতেই হইবে। এ আলোকে উভয়ের উভয়কে এক দিন খুঁজিয়া পাইতেই হইবে যে!

হুহু ধূ! লুপ্ত জল-ধাবা, শুষ্ক নদীবক্ষ অফুরন্ত বালুকার বাশি! শুষ্ক রক্ষ ভূমির প্রাকৈষ্ঠপঞ্জরাহি কেবল চাহিয়া আছে। শূন্যে অলক্ষ্যে কাল-শ্রোত-মাত্র নিঃশব্দে বহিয়া চলিয়াছে।

পূর্বের ত্রিকূট ও পশ্চিমে দিগ্ভীয়ার অস্পষ্ট ছবি, মাঝখানের অবাধ আকাশে অন্ধকাবে অসংখ্য তারকা ফুটিয়া উঠিয়াছে। জ্বলিতেছে! সেই শুষ্ক নদীতীরেও ও সেই অনির্বাক্য ধূনী জ্বলিতেছে এবং সেই জ্বলন্ত আলোক চলন্ত ভাবে ইতস্ততঃ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে— “কোথায়, ওগো কোথায় তুমি।”

গল্প থামিয়া গেলেও কিছুক্ষণ আমরা স্তব্ধভাবে সেইখানেই বসিয়া বহিলাম। একজন কেবল একবার নদীতীর পানে চাহিয়া দেখিয়া, অশ্রুট স্ববে বলিল, “হাঁ, এখনও সমান ভাবেই জ্বলছে।”



## লতা উন্মীলা দেবী

॥ ১ ॥

লতা আজ আব এ সংসারে নাই। তাহার ক্ষুদ্র জীবনের করুণ ইতিহাসটুকু আজ আমি সকলেব নিকট উপস্থিত না করিয়া পারিলাম না। লতা অল্প সময়ের মধ্যেই আমার জীবনের সহিত এমন অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়াইয়া গিয়াছিল যে, আজও তাহার কথা স্মরণ হইলে আমার বুকের খানিক অংশ শূন্য বলিয়া মনে হয়।

শিশুকাল হইতেই লতার স্বভাবটি একটু অদ্ভুত বকমের ছিল। যে বয়সে ক্ষুদ্র শিশুগণ হাসিয়া খেলিয়া, নাচিয়া কুঁদিয়া, ঝগড়া মারামারি ও দৌরাড্যা করিয়া পাড়া মাথায় করে, সে বয়সেও লতা খেলাধুলা ছাড়িয়া নদীর পাড়ে গালে হাত দিয়া বসিয়া থাকিতেই ভালবাসিত।

ক্ষুদ্র নদীটি আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহাবই তীরে লতাপাতা ঘেরা তাহাদের ক্ষুদ্র গৃহখানি। গৃহে বৃদ্ধা বিধবা ঠাকুবমা ও বিধবা মাতা ভিন্ন আর কেহই ছিলেন না। লতার এক কাক্স ছিলেন, তিনি বিদেশে চাকুরী করিতেন। পর পর তিনটি মৃত সন্তান প্রসব করিবাব পর লতা জন্মিয়াছিল। জীবিত সন্তানের শুভাগমন উপলক্ষে যখন গৃহ আনন্দোৎসবে মগ্ন তখন সকল আনন্দ নিবানন্দে মগ্ন করিয়া তিন দিনের মধ্যে লতার পিতা দেহত্যাগ করিলেন। সেই অবধি সকলেই তাহাকে “অপয়া” অলক্ষণা নামে অভিহিত করিত, কেবল তাহাব সদা বিধবা দুঃখিনী মাতা তাহাকে দ্বিগুণ বলে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখ চুসন করিতেন। আহা! জন্মিয়া যে একদিনেব জন্যও পিতৃস্নেহ পাইল না তাহার মত অভাগিনী ভগতে কে আছে, মানুষে কোন প্রাণে তাহাকে দোষী কবে! পিতাব মৃত্যুর জন্য কি সে দায়ী? তাহার অভাবে অন্য কাহাবও অপেক্ষা কি তাহার ক্ষতি কিছু কম হইয়াছে, এই সব চিন্তার পব দুঃখিনী বিধবা চক্ষেব জলে ভাসিয়া লতাকে বুকে চাপিয়া ধরিতেন।

ক্ষুদ্র লতা একটু একটু করিয়া বাড়িতে লাগিল। ক্ষুদ্র শিশুর মুখে অদ্ভুত গাষ্টীর্ষ দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইত। কেহ কখনও লতাকে উচ্চ হাস্য করিতে শোনে নাই, তাহার সুন্দর মুখখানিতে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিতে না উঠিতেই তাহা ওষ্ঠপ্রান্তে মিলাইয়া যাইত। সে একা একা খেলিতেই ভালবাসিত, পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আসিয়া তাহার সহিত খেলা করিবাব জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত। মা যখন বলিতেন, যা না লতা ওদের সঙ্গে খেল্গে যা, তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও লতা উঠিত। সে মার কথায় অবাধ্য কখনও হইত না। কিন্তু পাড়াব শিশুরা যখন দেখিত লতাকে লইলে তাহাদের খেলা মোটেই জমে না তখন তাহাবা লতাকে ছাড়িয়া দিত, লতাও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিত।

সে প্রায়ই নদীতীরে বসিয়া গালে হাত দিয়া কি ভাবিত। ক্ষুদ্র নৌকাগুলি পাল তুলিয়া বাতাসের বেগে উড়িয়া যাইতেছে, দুধের মত সাদা হাঁসগুলি পালে পালে সারি সারি সাঁতার কাটিয়া চলিয়াছে। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীগুলি কলরব করিতে করিতে মাথার উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছে,— লতা বসিয়া এই সকল দেখিতে ভালবাসিত। পরপারের ঘনবিনাস্ত

বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য দিয়া অপরিসর রাস্তা, সেই রাস্তা দিয়া দলে দলে স্ত্রীলোকগণ কলসী কক্ষে জল তুলিতে ও মন করিতে আসিত। তাহারা জলে নামিয়া ঝাঁপা-ঝাঁপি করিত, হাসি গল্প, কলহ বিবাদ করিত, কেহ কেহ বা এ উহার গায়ে জল ছিটাইয়া দিয়া হাসিঠাট্টা করিতেছে। লতা বড় বড় চোখ দুটি বিস্ময়ে বিস্মারিত কবিয়া তাহাদের রকম সবল দেখিত। মাঝে মাঝে সে আচল কবিয়া ফুল তুলিয়া আনিত, জলে পা ডুবাইয়া ঘাটে বসিয়া ঠাকুরের জন্য মাল্য গাঁথিত, গাঁথিতে গাঁথিতে অর্ধগাঁথিত মাল্য তাহাব শিখিল হস্তচ্যুত হইয়া কখন যে পড়িয়া যাইত তাহা সে নিজেই জানিত না।

তাহার এই সকল ভাব দেখিয়া, পাড়ার স্ত্রীলোকগণ “বোকা মেয়ে” “হাবা মেয়ে” নামে তাহাকে অভিহিত করিত। সে তাহার ঠাকুরমার কাছে বড় ঘোষিত না। পুত্রশোকাতুরা বৃদ্ধা এই অলক্ষণা নাতিনীটিকেই তাহার পুত্রের মৃত্যুর একমাত্র কারণ জানিয়া, প্রথম ইহাতে তাহাব উপর বিরূপ হইয়াছিলেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সেই ভাবের পরিবর্তন হওয়ার কোন লক্ষণই দেখা গেল না লতা যদি অন্যান্য শিশুদিগের মত হাসির লহন তুলিয়া দুষ্টমা ও নানারূপ ফন্দি করিয়া তাহাব ঠাকুরমার চিত্ত জয় করিবার চেষ্টা করিত তাহা হইলে কি হইত বলা যায় না— কিন্তু লতারও সে বিষয়ে কোন চেষ্টা দেখা গেল না। তাহার ক্ষুণ্ণ শিশু প্রাণে এই নিকটতম আত্মীয়ের সম্বন্ধে একটা ভীতির ভাবই লক্ষিত হইত। তাহাকে অত্যধিক আদর যত্ন করিবার অপরাধে তাহার মাতার প্রতিও তাহার ঠাকুরমা বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। পঞ্চম স্বর সপ্তমে তুলিয়া তিনি যখন বধুব উদ্দেশে বলিতেন,— “বলি ইয়াগা বোমা! মেয়েব আন্দার এত কেন তোমার কি একটু লজ্জাও নেই বাছা! যে অপয়া মেয়েটা তোমার অমন দেবতাব মত স্নেহামীকে খেলে তাকেই আবাব এত যত্ন আদর, ধন্য যা হোক! কলিকালে কতই দেখব! আমাদের কালে হ’লে অমন অলক্ষুণে মেয়েব দিকে কেউ ফিরেও চাইত না।” তখন ক্ষুদ্র শিশু ঠাকুরমার কথাব অর্থগুলি না বুঝিলেও, মাতাব অঞ্চলের আড়াল হইতে বিস্ময় বিস্মারিত নেত্রে তাহাব বিরতিপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। স্বশ্রব কর্ণে বাক্যে বধুর শোকক্লিষ্ট হৃদয়ে বড়ই আঘাত লাগিত। সে কোন কথাব উত্তর দিত না, পাছে চক্ষে অশ্রু দেখিলে স্বশ্রু আবও বিবস্ত হন এই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি লতাকে কোলে তুলিয়া লইয়া কার্যান্তরে প্রস্থান করিত। হৃদয়ের বেদনা যোনির অসহনীয় হইত সেই দিন সে ঠাকুরের পদতলে লুপ্তিত হইয়া অশ্রুমোচন করিত। সন্তান নয়নে যুক্ত করে বলিত, “ঠাকুর! পিতৃহীনের পিতা তুমি, আমার এই পিতৃহীনা শিশুব মঙ্গল কর।”

ক্ষুদ্র লতা আর কিছু না হইলেও ইহা বুঝিত ঠাকুরমা তাহাব স্নেহময়ী মাতাকে তিরস্কাব করিতেছেন। তাই ঠাকুরমার প্রতি তাহার মন আরও বিরূপ হইয়া উঠিত।

লতার গাভীরেব বাধ ভাঙ্গিত তাহার মাতার নিকট। সমস্ত দিবসের পরিশ্রমের রাত্রে যখন তাহাদের ক্ষুদ্র শয্যাব উপব তাহাব মাতা তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইতেন তখন লতাব মনেব বাঁধন খুলিয়া যাইত। মাতার বুকে মুখ লুকাইয়া সে তাহার ক্ষুদ্র জীবনের, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখদুঃখেব কথাগুলি মায়ের কাছে বলিত। তাবপর নানারূপ প্রশ্ন করিয়া তাহাকে বিপর্যস্ত করিত।

॥ ২ ॥

এইরূপ লতা কৈশোরে পদার্পণ করিল। তাহার স্মৃটনোন্মুখ দেহে লাম্বা উথলিয়া পড়িত নির্নিমেষনেত্রে তাহাব প্রতি চাহিয়া চাহিয়া মাতা মনে মনে বলিতেন— “আজ তুমি কোথায় প্রভু! যে পাঁচদিনের শিশুকে আমার কোলে ফেলিয়া দিয়া গিয়াছিলে আজ তাহাকে দেখিলে যে তোমার হৃদয় গর্বে ও আনন্দে পূর্ণ হইত।”

দ্বাদশবর্ষীয়া লতা নিঃশব্দে গৃহকার্য কবে, ঠাকুরমার পূজার ফুল তোলে, গৃহকর্মে মাওণ সহায়তা করে, গোপীনাথের পূজার আয়োজন কবিয়া দেয়। এখনও তাহার বদনে গেম্‌নাই গাঠীয়, — নয়নে তেমনিই উদাস দৃষ্টি। তাহাব ঠাকুরমাও এখন তাহার উপর সদয়।

লতার বিবাহের বয়স উত্তীর্ণপ্রায়, কিন্তু বিবাহের চেষ্টা ও উদ্যোগ কবে কে? তাহাব খুল্লতাত বিদেশে থাকেন, দুই তিন বৎসর অন্তর বাড়ি আসেন। কনিষ্ঠ পুত্রবধূর সহিত বৃদ্ধা স্বশ্রীর কখনও বনাবনি হইত না, সতরাং পুত্রের কর্মস্থানে তিনি কখনও যাইতেন না। পুত্রও মাসে মাসে খরচের অর্থ প্রেরণ কবিয়াই নিশ্চিত থাকিতেন, মাতা ও বিধবা ভ্রাতৃবধূ এবং পিতৃহীনা লতাকে নিজের নিকট লইয়া যাইবার কোন চেষ্টাও করেন নাই। তিনি তাঁহার মুখরা স্ত্রীটিকে একটু ভয় কবিয়াই চলিতেন। আব বিশেষতঃ গৃহে বিগ্রহের সেবা তো বন্ধ করিলে চলে না। লতার মাতা ও পিতৃমহী তাঁহাব কাছে পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়া কোন উত্তর না পাইয়া, হতাশ হইয়া যখন প্রায় আত্মব নিরাগা হইয়াছিলেন তখন বিধি সূযোগ মিলাইয়া দিলেন।

প্রসাদপুত্রের জমিদার হবকাস্ত চৌধুরীও জ্যেষ্ঠপুত্র নির্মলকাস্ত এক বন্ধুর সহিত শিকারে আসিয়া একদিন দৈবক্রমে লতাকে দেখিয়া গেল। সদাম্মাতা মুক্তকেশী লতা তখন নদীতীরে পা ছড়াইয়া দিয়া গোপীনাথের পূজাব ভনা মালা গাঁথিতেছিল।

তিনদিন পর জমিদারগৃহ হইতে বিবাহের প্রস্তাব লইয়া যখন লোকজন আসিল, তখন লতার মাতা বন্ধনকার্যে ব্যাপ্তা ছিলেন। সংবাদ শুনিয়া হাতা বেড়ী ফেলিয়া দিয়া তিনি গোপীনাথের পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন। দুঃখিনীর একমাত্র স্নেহের অবলম্বন কি আজ সভাই বাজবাণী হইতে চলিল, পবলোক হইতে তাহাব দেবতা কি আজ সকলই জানিতে পারিতেছেন? তাহা না হইলে বুঝি তাহাব সুখ সম্পূর্ণ হইবে না।

জমিদার গৃহে বিবাহের সংবাদ শুনিয়া লতার কাকা ছুটি লইয়া আসিলেন। লতার কাকীমা কত যত্ন কবিয়া লতাকে সাজাইতে বসিয়া গেলেন। লতাদের পক্ষ হইতে না হইলেও, জমিদারের পক্ষ হইয়া মহাসমারোহে বিবাহ ব্যাপার সুসম্পন্ন হইয়া গেল। জমিদার মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কন্যাপক্ষে বায়ভাব স্নয়ং বহন করিলেন।

বিদায়ে পূর্বক্ষেণে জামাতাব হস্তে কন্যাব হস্ত তুলিয়া দিয়া লতাব মাতা ছল ছল চক্ষে যখন বলিলেন, — “দুঃখিনীর দুঃখের ধন তোমায় দিলাম বাবা! তাকে যত্ন করো— আর কি বলব” —

অশ্রুভলে তাঁহার কণ্ঠবোধ হইয়া গিয়াছিল। নির্মলকাস্ত তখন কোন কথা না কহিয়া, দুই হস্তে স্বশ্রীর পদধূলি লইয়া মস্তকে দিল। তাহার চক্ষুও তখন সিঁড়। আর লতা? লতা অবগুষ্ঠনের মধ্য হইতে মাতাব অশ্রুবিবর্ণ মুখের দিকে কাতর নেত্রে চাহিয়া ফুকাবিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

তাবপরে লতা বহু সমাদরে, ঢাক, ঢোল সানাই মুখবিত, আলোকমালায় সজ্জিত প্রকাণ্ড পুরীতে, পুরনারীর শঙ্খবোলমধ্যে শ্বশুরালয়ে গৃহীত হইল।

প্রাসঙ্গে পালকী লাগিতেই সহাস্যবদনা স্বশ্রুমাতা অগ্রসর হইয়া, “এস-এস আমাব মা লক্ষ্মী এস— আমার ঘর আলো করবে” — বলিয়া সাদরে তঁাহাকে বক্ষে টানিয়া লইলেন। স্ত্রী আচাব হইয়া গেল, জমিদারবাবু আসিয়া হীবকমণ্ডিত কণ্ঠহাব দিয়া বধূমাতার মুখ দর্শন করিলেন। আনন্দ গদ্‌ গদ্‌ কণ্ঠে বৃদ্ধ কহিলেন, — “আজ দশ বৎসর মা-হাবা হযোঁছে— আজ আবাব মা ফিরে পেলাম। কেনন মা— এই বুড় ছেলের মা হইতে পারবে তো?” লজ্জারক্ত নববধূ লতা অবনত মস্তক আবও অবনত করিল।

ফুলশয্যার রাত্রে স্বামী-স্ত্রীর প্রথম আলাপ হইল। ফুলশয্যার স্ত্রী-আচারাদি সমাপনান্তে আত্মীয়গণ গৃহ-তাগ করিলে পর শয্যাপ্রাপ্তে উপবিষ্টা, অবগুষ্ঠিতা লতার অবগুষ্ঠন উন্মোচন করিয়া দিয়া, নির্মল তাহার মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া সম্মুখে তাহার দিকে চাহিল। লতাও চকিতে একবার স্বামীর প্রতি চাহিয়া পুনরায় দৃষ্টি অবনত করিল। হাসিয়া নির্মল বলিল,— “কেমন লতা! আমাদের বাড়িতে এসে তোমার কোন কষ্ট নেই তো?” লতা বড় বোকা মেয়ে, স্বামীকে যে লজ্জা করিতে হয় তাহা সে একেবারেই জানিত না। বিস্মিত নেত্রে স্বামীর মুখে দিকে চাহিয়া, লতা বলিল,— কষ্ট কই কষ্ট কিছু নেই তো! তবে মার জন্য বড় মন কেমন করে— বলিতে বলিতে লতার বড় বড় চক্ষু দুটি জ্বলে ভরিয়া উঠিল। সাদরে তাহার অশ্রু মোচন করিয়া দিয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া নির্মল বলিল,—

“শীগারই তো মায়ের কাছে যাবে লতা! কেঁদনা ছিঃ— লক্ষ্মীটি। তুমি কাঁদলে আমাব বড় কষ্ট হয়।”

অষ্টমঙ্গলা হইয়া গেলে, লতা পুনরায় পিত্রালয়ে গেল, নির্মলও এবাব সঙ্গে গেল। সেদিন লতার বড় আনন্দ! মাতার বক্ষে ফিরিয়া আসিয়াছে— আবার সঙ্গে স্বামী! লতা এই কয়দিনেই স্বামী চিনিতে শিখিয়াছিল। বাঙ্গালীর মেয়ে বড় শীঘ্র স্বামীর মর্ম বুঝিতে শোখে। পক্ষকাল শ্বশুরবালায়ে থাকিয়া নির্মল বাড়ি ফিরিল। যাত্রাব পূর্বে লতাব নিকট বিদায় লইতে গিয়া, তাহাকে বাহুবেষ্টনে লইয়া, সাদরে তাহার মুখচুম্বন করিয়া যখন নির্মল বলিল,— “তবে যাই লতা! আর শীঘ্র দেখা বোধ হয় হবে না। আমি শীগারই কলকাতায় চলে যাব। বাবার ইচ্ছা এম. এ টা পাশ করা পর্যন্ত আর বাড়ি না আসি। আমিও মনে করি তাই ভাল। এই মুখখানার প্রলোভন বেশি। সে প্রলোভন আপাততঃ তাগ কব্বে না পাবলে পবীক্ষায় পাশ হওয়াব সম্ভাবনা নেই। আমায় ভুলো না লতা, চিঠি লিখো— আর আমাব বাবা ও মায়ের যত্ন কোর।” তখন স্বল্পভাষিণী লতা স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিল। নির্মল তাহাব অশ্রু মোচন করিয়া দিয়া তাহার ফুল্ল কুসুমতুল্য ওষ্ঠাধরে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিয়া গৃহ তাগ করিল। তার পর দুই বৎসর লতা কখনও পিত্রালয়ে কখনও শ্বশুরবালায়ে থাকিয়া একটি একটি করিয়া দিন গণিয়া স্বামীর প্রতিজ্ঞায় আশাপূর্ণ হৃদয়ে কাটাইয়া দিল।

প্রথম বৎসর নির্মল নিয়মিত পত্র লিখিত, দ্বিতীয় বৎসব পত্রবাবহাব কিঞ্চৎ শিথিল হইল। লতা বুঝিল পবীক্ষা নিকটবর্তী বলিয়া এই সংযম। সেও অনাবশ্যক প্রশ্নপূর্ণ পত্র লিখিয়া স্বামীকে বিরক্ত করিল না।

॥ ৩ ॥

দুই বৎসব পর এম. এ পাশ করিয়া নির্মলকান্ত হুগলী কলেজের প্রফেসরী পাইয়া গৃহে ফিরিল। জন্মদাবের পুত্র হইলেও সে নিম্নম্নী বসিয়া থাকিতে একেবারেই নারাজ। যেদিন দীর্ঘ দুই বৎসব পব নির্মলকান্ত গৃহে প্রত্যাগমন কবিল সেদিন লতা যে কি ভাবে সময় কাটাইল তাহা সে নিজেই জানিল না।

জন্মদারগৃহে বধূর গৃহকর্ম করিতে হয় না। তাস খেলিয়া গল্প করিয়াই তাহাদের সময় কাটাইবার কথা। কিন্তু গ্রামা বালিকা আজকালকার মেয়েদের মত সেয়ানা নষ্ট। সে শ্বশুর শ্বশুরীর সেবার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিল। স্বামীর অনুরোধ “বাবা মার যত্ন কোর” সে মাথায় পাতিয়া লইয়াছিল। তাহার নিপুণ হস্তের সেবা পাইয়া বৃদ্ধ জন্মদার একেবারে শিশুর মতই বধূর হস্তে নিজেকে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

তিনি যখন অস্ত্রপুরের দ্বারদেশে আসিয়া, “মা মণি!” বলিয়া ডাকিতেন, তখন সহস্র কার্বে আবদ্ধ থাকিলেও লতা সব ফেলিয়া আসিয়া শ্বশুরের সম্মুখে দাঁড়াইত। তিনিও আদর করিয়া তাহাকে নিকট টানিয়া লইয়া, “আজ তোমার এই লোভী ছেলের জন্য কি রোঁধেছ— মা?” কিম্বা “অমুক বাঞ্ছনটা রোঁধ মা মণি! ওটা তোমার হাতে যেমন হয় তেমন আর কারও হাতে হয় না।”— “আজ আমার পূজোর সাজ তুমি করনি— না মা? আমি আগেই জানি। আমার মায়ের হাতে কি অমন বিস্তী সাজ হ’তে পারে? আজ আমার ভাল করে পুজাই হয় নি। কাল থেকে সব কাজ ফেলে তুমি আমার পূজার সাজ করবে— কেমন মা মণি?” লতা অমন আনন্দোৎফুল্ল বদনে মৃদুস্বরে বলিত — হ্যাঁ।

লতা দরদ্রের গৃহে প্রতিপালিতা,—অল্প বয়সেই রন্ধনাদি গৃহকর্ম করিতে শিখিয়াছিল। সে প্রত্যহ স্বহস্তে বন্ধন করিয়া শ্বশুর ও সকলকে তৃপ্তিপূর্বক ভোজন করাইত। জমিদারের প্রকাণ্ড পুৰী, নিকট ও দূর সম্পর্কীয় বহুবিধ আত্মীয় স্বজনে পরিপূর্ণ থাকিত। লতা সাধামত তাঁহাদের সকলেরই পরিচর্যা করিত। তাঁহাবাও তাহার সেবায় প্রীত হইয়া তাহাকে “লক্ষ্মী—বৌ” নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

নির্মলকান্ত দীর্ঘ দুই বৎসর পর বাড়ি আসিতেছে, জমিদারগৃহে আজ আনন্দোৎসব। ভোর হইলেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জাল লইয়া জেলেরা আসিয়া পুকুরে জাল ফেলিল। জমিদার মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া বড় বড় কয়েকটি মাছ রাখিয়া অন্যান্য সব মাছ পুনর্বাধ ছাড়িয়া দেওয়াইলেন। জমিদার গৃহিনী স্বয়ং অদ্য বন্ধনশালায় উপস্থিত আসিয়া রন্ধনাদি তত্ত্বাবধান করিতেছেন, এবং “মা-লক্ষ্মি! এটা কব” “ওটা কর” বলিয়া লতাকে উপদেশ দিতেছেন। দীর্ঘকাল প্রবাসে থাকিয়া পুত্র গৃহে প্রত্যাগমন করিলে পর মাতার হৃদয়ে যে আনন্দের তবঙ্গ ওঠে, তাহার তুলনা এ ভগতে কোথায়? তিনি সকল কর্মে ব্যবহৃত থাকিলেও, শকটের শব্দ শুনিবার জন্য তাঁহাব কর্ণদ্বয় উদ্গীর্ব হইয়া আছে। মদন গোয়াল জমিদার বাড়ির বংশানুক্রমিক গোয়াল। ফরমাইসি দই লইয়া উঠানে প্রবেশ করিয়া বলিল, —

“মা ঠাকুরগ, দই এনেছি গো। এই দইখানা দাদাবাবুর জন্য ভিন্ন করে পেতেছি— তিনি মোর দই খেতে বড় ভালবাসে। আহা দুবছর দাদাবাবুর মুখ দেখিনি। তিনি কখন এসবে গো?”

সহাস্য বদনে গৃহিণী বলিলেন,—

“এই এল ব’লে। বেলা দশটার টেবেনে আসবার কথা— বাড়ি পৌঁছতে বোধ হয় এগাবটা হবে। তা দশটা বোধ হয় বাজে।” দূর্বসম্পর্কীয়া এক ভাগিনেয়বধূ বাঁটি পাতিয়া আনু কুটিতেছিলেন। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গৃহিণী বলিলেন, “বাসাবৌ! দই ক খানা ভাঁড়ারে তুলে রাখ বাছা। কামিনী মদনকে খানকষেক পুকুরের মাছ দিয়ে দাও তো মা!”

লতা ভাঁড়ার ঘরের এক কোণে বসিয়া শ্বাণ্ডীর নির্দেশমত, ঠাকুরের বালভোগেব ক্ষীণ ছানা মাখন ইত্যাদি সমস্ত দ্রব্যাদি গুছাইতেছিল। সে ধীরে ধীরে শ্বাণ্ডীর নিকটবর্তী হইয়া মৃদুস্বরে বলিল,—

“দু খানা দই নিরামিষ ঘরে দিয়ে এলে হয় না মা?”

শ্বাণ্ডীর হাসিয়া বলিলেন,—

“ঠিক বলেছ মা লক্ষ্মি! আমাব কি সব কথা ছাই এখন মনে থাকে? যাও তো মা, রান্সা বৌকে বলে এস। আর সন্দেশ বুঝি এখনও আসেনি, এরা যে কি করে, সময়মত কিছুই আর এদের দিয়ে হয় না।”

মৃদুস্বরে লতা বলিল,— “আমি দেখছি মা!” লতা সংবাদ লইয়া জানিল সন্দেশ বহুক্ষণ আসিয়াছে। সে দুই হাঁড়ি দই ও কিছু সন্দেশ নিজ হস্তে নিরামিষ ঘরে পৌছাইয়া দিয়া আসিয়া শ্বাণ্ডীকে জানাইল সন্দেশ আসিয়াছে। তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন।

লতাও নিশ্চিত হইয়া তখন তাহার নিয়মিত রন্ধনকার্যে নিযুক্ত হইল। আত্ম স্বামী প্রথম তাহার হাতের রান্না খাইবেন,— লতা কত রকম করিয়া কত বাঞ্ছন বঁধিল তবু তাহাব তৃপ্তি নাই। কেবলই মনে হইতেছে “এটা ভাল হয় নাই” “ওটা ভাল হয় নাই।” ফড় করিয়া স্বহস্তে রন্ধন করিয়া স্বামীকে খাওয়াইতে বড় সুখ। এ সুখের স্বাদ যে কখনও পায় নাই তাহার বড় দুঃখ। লতা রঁধিতে রঁধিতে এই কথাই ভাবিতেছিল।

এমন সময় বহির্বাটিতে কোলাহল উঠিল, “ছোট বাবু এসেছে, ছোট বাবু এসেছে।” লতার বুকের রক্ত দ্রুত চলিতে লাগিল, সে স্বামীর নিরাপদ প্রত্যাগমনের জন্য দেবহাব উদ্দেশে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। তারপর তার সমযটা যে কেমন করিয়া কাটিল তা সে গণিল না। নির্মলকান্ত আহারে বসিলে তাহার শ্বাণ্ডী যখন তাহাকে ডাকিয়া বলিলে— “মা লক্ষ্মি! তোমার রান্না তবকারী দিয়ে যাও,” তখন সহস্র চেষ্টায়ও সে উঠিতে পারিল না। তাহার পা দু খানা যেন অবশ হইয়া গিয়াছে। বামুন ঠাকরুণ আসিয়া ব্যঞ্জন পরিবেশন করিল। রাস্দাবৌ আসিয়া হাসিয়া বলিল, “তোমার কি হয়েছে নতুনাবৌ, উঠতে কি পারিস না, যা না ঐ ঘরের দরজাব ফাক দিয়ে একটু দেখে আয়। সে ঘরে এখন কেউ নেই। যা জন্ম সার্থক কবে আয়।” সে কোন উত্তর দিল না,— তাহার বাক্শক্তিও যেন কে অপহরণ করিয়া লইয়াছে। রাস্দাবৌ তাহার হাত ধরিয়া অনেক টানাটানি করিল,— অবশেষে বার্থমনোরথ হইয়া বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল।

আহারে বসিয়া নির্মলের চঞ্চল চক্ষু দুটি যেন কিসেব আশায় ব্যস্ত হইয়া এদিক এদিক করিতেছিল। কিন্তু চক্ষুর আশা পূর্ণ হইল না, নিরাশ হইয়া তাহা আবার ভাতের থালাব দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। ঠিক সেই সময়েই মাতা ডাকিলেন,— “মানলক্ষ্মি, তোমার বামা তরকারী দিয়ে যাও।” কিন্তু হায়! মানলক্ষ্মীর পবিতর্বে বামুন ঠাকরুণ গেল।

আহারান্তে আচমন করিয়া নির্মলকান্ত বলিল,— “আমি তবে এখন একটু বৈঠকখানায় যাই মা! অনেক লোক আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য বসে রয়েছে। বাবাব কি খাওয়া হয়নি?”

“না—তাব এখনও পূজা হয়নি। তুমি বেশিক্ষণ বাইরে থেকেনা বাবা। কাল বায়ে ঘুম হয়নি, আত্ম দুপুরে একটু ঘুমতে হবে।” ঈষৎ হাসিয়া নির্মল বলিল,— “আচ্ছা মা।”

বাহিবে যাইবাব সময়ও তাহার সোৎসুক দৃষ্টি সকলগুলি দরজাব আড়ালে একবাব করিয়া উঁকি মারিয়া গেল, কিন্তু বাহার সন্ধানে সে দৃষ্টি ফিবিতেছিল সে তখনও বামাঘবে এসাড় হইয়া বসিয়া আছে।

বামাদাসী যখন আসিয়া তাহাকে বলিল, “বলি হাঁগা বৌদি, অমন কবে পাথরের মত আব কতক্ষণ বসে থাকবে? মা যে তোমায় ডাক্তে লেগেছে— কতবাবুব খাওয়াব ঠাই হয়েছে”— তখন তাহার চমক ভাঙ্গিল। সে লজ্জিত হইয়া শশবাস্তে উঠিল,— শ্বণ্ডবের আহ্বারের দ্রব্যাদি লইয়া যখন সে আহ্বারের স্থানে উপস্থিত হইল তখনও তাহাব পা দুখানা থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। শ্বণ্ডর আহ্বারে বসিলে সে অভ্যাসমত পাখাহস্তে তাঁহাকে বাজ্ঞন করিতে বসিল। কিন্তু আত্ম সে বড়ই অন্যানন্দ, বাজ্ঞনী থাকিয়া থাকিয়া আটকাইয়া যাইতেছিল।

আহারান্তে নিত্যকাব মত শ্বাণ্ডীব পদসেবা করিবার জন্য তাহার গৃহে প্রবেশ করিলে তিনি বলিলেন,— “আত্ম আব দরকাব নেই মা, আত্ম ভূমি ববং তোমাব মা’র কাছে চিঠি লেখ গিয়ে— অনেক দিন তো চিঠি লেখনি।” লজ্জায় লতাব মুখখানা রাস্দা হইয়া উঠিল,— সে শ্বাণ্ডীবের কথার অর্থ বুঝিয়াছিল।

কম্পিত পদদ্বয় টানিতে টানিতে লতা তাহার গয়ন গৃহদ্বাবে উপস্থিত হইল। ঈষৎ মুক্ত দ্বারাভ্যন্তর দিয়া সে দেখিল স্বামী শয্যায় শয়ান। সে একটু ইতস্ততঃ করিয়া গৃহপ্রবেশ করিল। শয্যাপ্রান্তে নির্মল নির্মালিত নেত্রে শয়ান, দেখিয়া বোধ হইল নিদ্রিত। লতা অতি

সম্পূর্ণ গিয়া শয্যার অপর প্রান্তে চূপ করিয়া বসিয়া রহিল। সে এখন কি করিবে সিক বুঝিতে পাবিল না,— একটু অভিমানও যে না হইল তাহা নয়। সে অঞ্চলপ্রাপ্ত খুটিতে খুটিতে আকাশ পাতাল কত কি ভাবিতে লাগিল। সহসা শয্যা ঈষৎ নড়িয়া উঠিল,— পরক্ষণেই দুখানি বিশাল বাহুর কর্ণন বেঠনে সে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। আবেশ বিহীন লতাকে বুকে টানিয়া লইয়া, সমী চুম্বনের পব চুম্বনে সেই সুন্দর মুখখানা প্রাবিত কবিতা দিলেন। আনন্দে আর্মুর্ছিতপ্রায় লতা নির্মলিত নোত্রে সেই আনন্দ উপভোগ করিল।

॥ ৪ ॥

লতাকে যখন আমি প্রথম দোঁখ, তখন সে স্বামীর সহিত গুল্মীতে আসিয়াছে। পুত্রের অযত্ন হইবে বলিয়া জামিদার ও তাহার গৃহিনী বধুকে পুত্রের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আমার স্বামী গুল্মীতে ওকালতি করিতেন। নির্মলকান্ত তাহার সহপাঠী ছিলেন। তিনি বি. এ পাশ করিয়া বি. এল পড়েন ও নির্মলকান্ত এম এ পাশ করিয়া প্রফেসর হন। ইহাদের এই বন্ধুত্বের সূত্রে লতার সহিত আমার পরিচয় হয়। তাহার পূর্ববর্তী জীবনের আশেব সকল কথা আমি কতক লতার নিজমুখে এবং কতক লতার মাতার মুখে শুনিয়াছিলাম।

প্রথম পরিচয়েই আমি লতার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। তাহাকে দেখিলে মনে হইত সে যেন এ পৃথিবীর কেহ নয়,— তাহার সুন্দর মুখখানিতে এমনই একটি পরিব্র ভাব ছিল। তাহার মধ্যে এমন একটা অটন গাভীর ছিল, যে নিতান্ত লঘু প্রকৃতির মানুষও তাহার নিকট নত মস্তক হইত। অন্য দিকে তাহার প্রকৃতি শিশুর মত সরল ছিল। আমার স্বামী মাঝে মাঝে বলিতেন,— “নির্মলের স্ত্রী যেখান দিবে হেঁটে যায় সেখানটা যেন পরিগ্র হয় যায়।” সত্যি তাহাকে দেখিলে এরূপ মনে হইত।

শিশুকাল হইতেই আমার দৃষ্টি সকল বিষয়ে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল। আমি ক্রমে লতার অন্তরে পরিচয় পাইতে লাগিলাম। তাহার সমগ্র সন্দৃগের মধ্যে একটি গুণের অভাব দেখিয়া আমি প্রাণে বড় আঘাত পাইতাম। সেটি কি? সেটি মানুষের সকল প্রকার ক্ষুদ্র বৃহৎ দুর্বলতার প্রতি ক্ষমার অভাব। তাহার কোমল হৃদয় সেখানে পাষণেব ন্যায় কঠিন হইত। সে সেখানে বিচার যুক্তি ও কিছুই মানিত না। তাহার সহিত মাঝে মাঝে এই বিষয় লইয়া বাক্ বিতণ্ডা হইত। আমি বলিতাম—

“লতা! ক্ষমা জিনিসটা বড় সুন্দর, সে জিনিসটা আমাদের প্রাণকে বড় সুন্দর বড় উচ্চ করে। মানুষের দুর্বলতাকে ক্ষমা ক’রতে চেষ্টা কবাই উচিত।”

লতা বলিত,—

“কেন দাঁদ, ভগবান সকলকেই বিবেক বলে একটা জিনিস দিবেছেন। তা সত্ত্বেও যে বিপথে যাবে তাকে কেন ক্ষমা করব?”

আমি বলিলাম,—

“লতা, মানুষ কি অবহায় কি অভাবে কোন পথে যায় তা আমরা কি করে জানব। মানুষের জীবনে কত প্রতিকূল অবস্থা আসে, কত প্রলোভন আসে, বন্ধুত্বপে কত শত্রু আসে। অত্যন্ত সর্বলচিত্ত মানুষ না হ’লে সে সকল উপেক্ষা ক’বতে পারে না। ভেবে দেখ সে সময়ে যদি একজন মানুষকে তাব আদ্যায় ধ্বংস বন্ধুবান্ধব সকলেই তাগ করে তবে কি সে ক্রমেই নরকের পথেই অগ্রসর হয় না। আমার মনে হয় সে সময়ে তাকে তাব দুর্বলতা থেকে অতি সহজে তুলে নেওয়া যায়।”

লতা বলিত,—

“তুমি যা বলছ তা বুঝতে পারি কিন্তু পাপকে যদি কেবল ক্ষমাই ক’বব তবে পাপের সংহার কোথায়?”

আমি হাসিয়া বলিতাম,—

“লতা! আমি একথা বলছি না যে পাপের সংসর্গ মানুষ ত্যাগ ক’রবে না কিন্তু পাপকে ঘৃণা ক’রবে না। কিন্তু অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না ক’রে, ক্ষুদ্র বৃহৎ বিচার না ক’রে মানুষকে বিচার করা উচিত নয়। লতা! আমার বাবা অত্যন্ত নির্মল চরিত্রের লোক ছিলেন,— তাঁহার শিশুর মত সরলতা দেখে লোকে মুগ্ধ হয়ে যেত। কিন্তু মানুষের দুর্বলতা সম্বন্ধে তাঁর যে উদারতা ছিল, — তা আব কারো মধ্যে বড় দেখতে পাই না। তিনি বলতেন, — “মানুষের দুর্বলতাকে ক্ষমা ক’রে তাকে বুকে তুলে নিতে পারলে তাকে নরক থেকে উদ্ধার করা যায় কিন্তু তাকে ঘৃণা ক’বে দূরে সরে থাকলে সে আরও নীচে নেমে যায়। একথা কখনও ভুলো না রমা!” তাঁর সে সব অমূল্য উপদেশ কতটুকুই বা গ্রহণ ক’রতে পেরেছি। তবু যে দু একটা কথা বলি সে তাঁর সেই জ্ঞানসাগরের দু একটি বৃদ্ধ মাত্র।”

লতা আমার কথা বুঝিয়াও বুঝিত না। তার ঐ এক কথা ছিল,— “ওসব মুখেব কথা দিদি! কাজে কি কেউ তা পারে? কাল যদি তুমি শোন তোমার স্বামী একটা অত্যন্ত নীচ কার্য করেছেন তুমি কি তাকে এক কথায়ই ক্ষমা ক’রতে পারবে? তাহলে আর আত্মসম্মান বলে তিনিস এ সংসারে কোথায় রইল দিদি?”

লতার ঐ ভাবে আমি বড় ব্যথিত হইতাম। এবং ঐ ভদ্রা সে জীবনে বহুতর অশান্তি ভোগ করিবে এ বিশ্বাস আমার হৃদয়ে বদ্ধনুল হইয়াছিল। হায়! তখন কিন্তু স্বপ্নেও ভাবি নাই আমার ঐ ভবিষ্যদ্বাণী কি ভীষণভাবে সফল হইবে।

॥ ৫ ॥

দুই বৎসব পবেব কথা। আমাব মাতাব প্রাণসংশয় পীড়ার কথা শুনিয়া পিত্রালয়ে গিয়াছিলাম। আমাব ফ্রোড়ে তখন ছয় মাসেব একটি ক্ষুদ্র শিশু। মা আমার প্রায় আট মাস রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া স্বর্ণারোহণ কবিলেন। ইহার মধ্যে আর মাকে ছাড়িয়া যাইতে পারি নাই। হৃগলী হইতে স্বামীর নিয়মিত পত্রে সকলের সংবাদ পাইতাম। লতাও মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিত। পত্রগুলির প্রতি পংক্তিতে তাহার পরিপূর্ণ সুখেব আভাস ফুটিয়া উঠিত। আমি পত্রগুলি পড়িয়া বড়ই সুখী হইতাম। সত্য কথা বলিতে কি লতাকে আমি ছোট ভগিনীর মতই ভালবাসিতাম। আমার হৃগলী তাগের দুই মাস পর লতাব পত্রে একটি শুভ সংবাদ পাইয়া বড়ই প্রীত হইয়াছিলাম।

মা’ব আত্মাদি কার্য শেষ হইয়া গেলে, সুদীর্ঘ নয় মাস পবে গৃহে ফিরিলাম।

ওনিলাম লতাকে লইতে তাহার পিত্রালয় হইতে লোক আসিয়াছে। আগামী পবশু ভাল দিন। সে সেই দিনে রওনা হইবে। বৈকালে লতাকে দেখিতে গেলাম। লতাব মুখে এবার নতুন সৌন্দর্য দেখিলাম। তাহার অবস্থানুযায়ী জ্ঞান ও পাণ্ডুব মুখে একটি নতুন ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাই মাতৃহেব প্রথম নিদর্শন! আমাকে দেখিয়া লতা হাত ধরিয়া শয়নগৃহে লইয়া গেল। আমার পাশে বসিয়া, আমার গলা ধরিয়া সে কিছুক্ষণ নীববে রহিলে আমি হিজ্রাসা করিলাম,—

“বাপের বাড়ি যাচ্ছিস নাকি?”

মৃদু হাসিয়া লতা বলিল,—

“হ্যাঁ দিদি, মা নিতে লোক পাঠিয়েছেন। উনি প্রথমে দিতে চাননি,—কিন্তু স্বপ্নের স্বাভাবিকতা যেতে লিখেছেন। ওঁর একা একা বড় কষ্ট হবে। তোমাদের ওপর নির্ভর করেই যাচ্ছি, তোমরা খোঁজখবর নিও। আমারও যেতে মন সরছে না দিদি”— বলিয়া লতা হাসিয়া ফেলিল।



আমিও হাসিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম,—

“তাকি আর জানি না ভাই! তোরা আবার একজন আর একজনকে ছেড়ে থাকবি।  
তুই গেলে নির্মল বাবুকে কি করে সামলাব জানি না। লোকটা পাগল হয়ে না গেলে  
বাঁচি।”

সলজ্জ হাসি হাসিয়া লতা বলিল,—

“যাও দিদি, তুমি বড় দুষ্টু!”

রাত্রে গৃহে ফিরিলাম। লতা যাওয়ার পূর্বে আর একবার তাহাকে দেখা দিবার জন্য বার  
বার অনুরোধ করিল। খোকাকে ফ্রোড়ে লইয়া বার বার তাহার মুখ চুসন করিল। আমি  
তাহার পরদিন আবার যাইব বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিলাম।

পব দিন সন্ধ্যা সময়ে অন্যান্য গৃহকার্য শেষ করিয়া স্বশ্রমাতার জন্য যোগের সমস্ত  
ওছাইলাম। তাঁহার সন্ধ্যাহিক হইলে তাঁহাকে জন্যযোগ করাইয়া লতাব নিকট যাইব স্থি  
করিয়াছিলাম। তাহা হইলে একটু বেশিক্ষণ লতার নিকট বসিতে পারিব বলিয়াই ঐ বন্দোবস্ত  
করিয়াছিলাম। এমন সময়ে লতাদের বেয়াড়া ভদ্দু দৌড়িয়া আসিয়া বলিল, “আপনি শীগগির  
আসুন, মাঠের বড় বেয়ার।” আমি গুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। কি হইয়াছে ভজ্জকে ভাল  
করিয়া প্রশ্ন করিবার কথাও মনে হইল না,— স্বশ্রমাতার অনুমতি লইয়া তখনই লতাদের  
বাড়ি গেলাম। ভদ্দু আমাকে একেবারে লতার শয়নগৃহে লইয়া গেল। গিয়া দেখি লতার  
সংজ্ঞাহীন দেহ ধুলায় লুপ্ত। কিছুই বুঝিতে পারিলাম না,— ঝিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম।  
তাহার নিকট শুনিলাম প্রভাত হইতে লতা শুইয়া ছিল,— আহালাদি করে নাই। বৈকালেও  
বি আসিয়া তাহাকে তদবস্থায় দেখিল। বি গৃহকার্য করিতে লাগিল,— কিছুক্ষণ পব  
নির্মলকুমারকে গৃহপ্রবেশ করিতে দেখিয়া সে গৃহান্তরে প্রস্থান করিল। প্রায় অর্ধঘণ্টা পর সে  
কোন গুরু দ্রব্য পতনের শব্দ শুনিয়া দৌড়িয়া আসিল। বারান্দা দিয়া আসিতে আসিতে  
দেখিল নির্মল সদর দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। লতার গৃহে আসিয়া দেখিল  
অজ্ঞানাবস্থায় ভূতলে পতিত। সে অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছু করিতে কৃতকার্য না হইয়া  
আমাকে ডাকিতে লোক পাঠাইয়াছিল। ঝির কথায়ও বিশেষ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

আমার স্বামীকে সংবাদ দিবার জন্য ভজ্জকে পাঠাইয়া দিয়া, লতার ভুলুপ্ত মস্তক ফ্রোড়ে  
লইয়া বসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম।

॥ ৬ ॥

দীর্ঘকাল শুশ্রূষার পর লতা চক্ষুরশ্মিলন করিল। আমার মুখেব দিকে চাহিয়া দেখিল।  
তারপর দুই বাহু দ্বারা আমার গলদেশ আকর্ষণ করিয়া আমার মুখ নিজের মুখের উপর  
রাখিয়া,— “দিদি!” বলিয়া সে উচ্ছ্বসিত হইয়া কাদিয়া উঠিল।

আমি তাহাকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া বলিলাম, “কি হয়েছে লতা? অমন করছ  
কেন বোন?”

ফুলিয়া ফুলিয়া কাদিতে কাদিতে লতা বলিল,— “দিদি! উনি আমার ত্যাগ করেছেন—  
না-না দেবতার নামে মিথ্যা কথা বল্‌ব না। আমি হতভাগিনী ক্ষণিক মোহের বশে অন্ধ  
হয়ে পাগল হয়ে তাঁকে হারিয়েছি।”

একি শুনিলাম! আমার আশঙ্কা কি এত শীঘ্র এই ভাবে সত্যে পরিণত হইল? না— না  
অসম্ভব! এ যে একেবারেই অসম্ভব! আমি কি শুনিতে কি শুনিয়াছি। অতি কষ্টে নিজেকে  
স্বস্থর করিয়া লইয়া বলিলাম,—

“লতা, সব কথা বুঝিয়ে বল বোন, আমি যে কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।”

লতা উঠিয়া বসিল, দুই হস্তে চক্ষু মার্জনা করিয়া সে আমার মুখের দিকে চাহিল। তাহার সেই কাতর দৃষ্টি দেখিয়া আমি শিরিয়া উঠিলাম। লতা ধীরে ধীরে আমাকে সকল কথা বলিতে লাগিল। বলিতে বলিতে কখনও শূন্য নয়নে সে আমার প্রতি চাহিল, — কখনও অশ্রুভারে তাহাব কণ্ঠরোধ হইয়া যাইতে সে অশ্রু মার্জনা করিয়া পুনর্বার বলিয়া যাইতে লাগিল।

পরদিন পিত্রালয়ে চলিয়া যাইবে বলিয়া লতা সমস্ত দ্রব্যাদি যথাস্থানে গুছাইয়া রাখিতেছিল। নির্মলকান্তের আলমারী খাড়িয়া মুছিয়া তাহার কাপড়-চোপড়গুলিও গুছাইয়া রাখিয়া যাইবে মনস্থ করিয়া আলমারী খুলিল। কাপড়গুলি নাড়িতে চাড়িতে একখানা অর্ধছিন্ন পুরাতন পত্র তাহাব হস্তগত হইল। পত্রখানি নির্মলকুমারের নিকট একটি স্ত্রীলোকের লেখা। পত্রখানি পবে আমি সচক্ষে দেখিয়াছিলাম, তাহার মর্ম এইকপ,—

“নির্মল বাবু!

তুমি আর এস না কেন? কাল সন্ধ্যার সময় আস্বে বলে গেলে আর এলে না। আমি তোমার পথ চেয়ে বসে ছিলাম। তুমি আমায় ভাগ ক’রলে কেন? তোমার পায়ে পড়ি দেখা দিয়ে যেও।

ইতি তোমার হতভাগিনী  
বিনোদ”

পত্রখানিব তারিখ লতার বিবাহের ঠিক এক বৎসব পরেব।—

পত্রখানি পড়িয়া লতার আপদমস্তক কম্পিত হইতে লাগিল। এ কি! সে যে তাহাব স্বামিকে দেবতা ভ্রানে পূজা কবে! তবে এ কি? লতা যেন কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। পত্রখানা হাতে লইয়া সে কাষ্ঠপুত্রলিকার মত দাঁড়াইয়া রহিল। এই সময়ে হাসিতে হাসিতে নির্মল গৃহে প্রবেশ করিল। লতাকে এই ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সে বলিল,— “একি গো! অমন করে দাঁড়িয়ে বয়েছ কেন? তোমার সব গোছান হোল?”

লতা কোন কথা না বলিয়া, পত্রখানা নির্মলের পায়ে নিকট ফেলিয়া দিয়া, পাশ কাটিয়া, দ্রুতপদে আপনার শয়নগৃহে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পর নির্মল গৃহে প্রবেশ করিল,—লতা তখন শয্যা গ্রহণ করিয়াছে। নির্মল শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিল,—

“লতা আমার একটা কথা শোন, আমার দিকে চাও। সব কথা গুনলে তুমি বুঝাবে এতে তোমাব ভাগ ক’রবার কিছু নেই।”

লতা ফিবিব, কিন্তু স্বামীর বাহুপাশে কিছুতেই নিজেকে ধরা দিল না। বিশাল চক্ষু দুটি নির্মলের চক্ষুর প্রতি স্থাপিত করিয়া বলিল,— “কি বলবে? বলবার কিছু আছে কি? ব’লবার কিছু থাকলে অনেক আগে নিজেই বলতে।” নির্মল বলিল,—

“অনেক কথা বলবাব আছে। ধীরেন্দ্র নামে আমার সহপাঠী বন্ধুর নাম হয়তো আমার মুখে গুনেছ। ধীরেন্দ্র অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের একমাত্র ভরসাহুল ছিল, লেখাপড়ায়ও সে খুব ভাল ছিল। ইঠাৎ সে এই বিনোদিনীর কুহকে পাড়ে অধঃপাতের পথ পর্বিস্কার ক’রতে আবন্ত কবে। এমন কি তাকে বিয়ে ক’রবে বলেও নাকি স্থির করে। আমি দেখলাম এক ধীরেন্দ্রর সঙ্গে সমস্ত পবিবারটি যায়,— আমি আর স্থিৰ থাকতে পারলাম না। আমি তখন বিনোদিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কবে তাকে বোঝাবার চেষ্টা ক’রতে লাগলাম।”

লতার দিকে চাহিয়া নির্মল দেখিল লতা একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিল। নির্মল বলিতে লাগিল— “প্রথমে সে আমাকে বিদ্রূপ ক’রে উদ্ভিষ্ট দিল। আমি তবুও হাল ছাডলাম না। ধাবেনের অজ্ঞাতে মধ্যে মধ্যে বিনোদিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক’রতে যেতাম। কিছু দিন পর

দেখলাম বিনোদিনীর মন একটু একটু নরম হ'য়েছে। তারপর সে ধীরেনকে তাগ ক'রতে সম্মত হোল, আমি তাকে কিছু অর্থ দিতে গেলে সে তাহা প্রত্যাখ্যান ক'রলে দেখে বড় আশ্চর্য হ'লাম। আমার মনে একটা সন্দেহ উপস্থিত হোল— আমি সেদিন থেকে আব তাব কাছে যাই নি। তারপর সে এ চিঠিখানা লিখেছিল বটে কিন্তু লতা তোমাষ সত্তা বলছি, আমি সে চিঠি কোন উত্তর দিই নি বা তাব কাছে যাইনি। এখন সব বুঝলে তো।”

গুদকণ্ঠে লতা বলিল,— “না, একটা কথা এখনও বুঝি নি। কি সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তুমি আব যাও নি?”

একটু ইতস্ততঃ করিয়া নির্মল বলিল,—

“বিনোদিনী আমাকে একটু একটু ভালবাসতে আরম্ভ করেছে বলে সন্দেহ হ'য়েছিল।”

শিহরিয়া উঠিয়া দুই হস্তে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন কবিয়া লতা বলিল,—

“ছিঃ ছিঃ একথা আমার কাছে বলতে তোমাব একটু লজ্জা হোল না, একটা পতিতা স্ত্রীলোক তোমাকে চিঠি লিখতে সাহস পেয়েছে। আব তুমি সেই চিঠি যত কবে রেখে দিয়েছ। ধিক্ তোমাকে।”

বিস্মিত হইয়া নির্মল বলিল,— “পত্র যত কবে বেখেছি কে বললে? আমার তো ও পত্রের আন্তর ও মনে ছিল না। কি ক'বে কাপড় চোপড়ের সঙ্গে আলমারীতে স্থান পেয়েছিল তাও আমি জানি না।”

লতা আপন কথাই বলিয়া যাইতে লাগিল,—

“আমি যখন আমার প্রাণের সমস্ত পেম সঞ্চিত করে তোমার জন্য অর্থা সাজিয়ে তোমাব প্রতীক্ষায় বসে ছিলাম, তুমি এখন একটা পতিতা স্ত্রীলোককে নিয়ে প্রেমের খেলা খেলছিলে? ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা! কি ঘৃণা! এ আঘাত পাবার আগে আমার মরণ হোল না কেন?”

কাতল কণ্ঠে নির্মল বলিল,— “তুমি এ কি বলছ? লতা— লতা, আমি তো তোমাকে ছাড়া আর কাউকে জানি না। বন্ধুকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবাব জন্য তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ক'রতে হোত, তা নইলে সে আমাব কে?”

কঠিন কণ্ঠে পাষাণী লতা বলিল,— “কে তা আমি জানি না— তবে এটুকু জানি সে তোমার কেউ না হ'লে এ ঘটনা তুমি আমার কাছে গোপন ক'বতে না। নিজেই বলতে, জিজ্ঞাসাও ক'বতে হোত না।”

নির্মল বলিল,— “এই সব ঘটনাব পব ধীরেন আমায় হাতে ধরে অনুরোধ ক'রেছিল একথা যেন প্রকাশ না পায়। বন্ধুব কাছে কি ক'বে বিশ্বাসঘাতক হ'ব লতা! তাই ইচ্ছা সত্ত্বেও তোমার কাছে বলতে পারি নি। এ যে আমার নিজের কথা নয়,— পরের কথা বলবার যে আমার কোন অধিকার নেই। তুমি বুঝতে পারছ না লতা?”

দৃঢ় স্বরে লতা বলিল,— “না - আমি আর কিছু বুঝতে চাইনা,— যা বুঝছি তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।”

বাথিত স্বরে নির্মল বলিল,— “লতা! তুমি কি সেই লতা! এত কঠিন তুমি! উঃ ভাবিতেও পারি না। লতা, একটু বুঝতে চেষ্টা কর, না হলে আমাদের সুখ সূর্য্য অন্ত যেতে বেশি দেরী হবে না। কি আব বলব?”

লতা বলিতে লাগিল,—

“উনি চলে গেলেন। আমি গুয়ে গুয়ে অনেক ভাবতে চেষ্টা ক'বলাম কিন্তু কিছুতেই মনটাকে যেন স্থির ক'বতে পারলাম না। যতই ভাবি ততই যেন চিঠিখানা আমাব চোখেব

সামনে আনায় বিদ্রূপ ক'রে নাচতে লাগল। আর উঠতে ইচ্ছা হোল না, খেতে ইচ্ছে হোল না। উনি আত্মকার দিনটা আগেই ছুটি নিয়েছিলেন, স্নানাহার কবে— ভগবান জানেন কি খেলেন—উনি এই পাশের ঘরে গেলেন। মাঝে মাঝে পায়চারী ক'রে বেড়াতে লাগলেন—শব্দ কানে গেল। আমি বিছানায় পড়ে রইলাম। বিকালে উনি আবার এলেন,— বিছানাও পাশে এসে ডাকলেন, “লতা!” আমি চুপ ক'রে রইলাম। দিদি? আমি পাগল হয়েছিলাম, না হ'লে কি সেই আদরের ডাক উপেক্ষা ক'বতে পারতাম? কাতর কণ্ঠে তিনি বললেন,— “এখনও রাগ ক'রে থাকবে? সেই অটল বিশ্বাস এক মুহূর্তে এই ভীষণ অবিশ্বাসে কি ক'রে পরিণত হোল! এত কঠিন কি ক'রে হ'লে! লতা! একবার বুকে এস— একবার বল সব ভুলে গেছ। সব অন্ধকার ঘুচে যাক।” দিদি, পাষাণী আমি, নিষ্ঠুর আমি, নারী নামেও অযোগ্য আমি, তবু চুপ ক'রে রইলাম। তিনি বাহু প্রসারিত ক'রে আমায় বুকে টেনে নিতে এলেন,— আমি স'রে গেলাম। মানুষের আর কত সময়? আব একটা তুচ্ছ নারীর জন্য কেনই বা সহ্য ক'রবেন, দরদ্রের কুটীৰ থেকে ভুলে নিখে মাথার মণি ক'রেছিলেন,— আদর দিয়ে মাথায় তুলেছিলেন। সব কথা ভুলে গেলাম।

লতা কিছুক্ষণ নীবব থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল,—

উত্তেজিত কণ্ঠে তিনি বললেন,— “এত ঘৃণা! এত ক'রে বোঝালাম তবু বিশ্বাস হোল না? এত প্রেম এক মুহূর্তে ঘৃণায় পরিণত হোল একটা কল্পনাপ্রসূত কথা নিয়ে। তবে তাই হোক, আমি চললাম। আর তোমার সঙ্গে দেখা হ'বে কিনা জানি না। যদি ভগবান বক্ষা করেন ও তোমার ভুল তুমি বুঝতে পার তবেই দেখা হবে, নচেৎ নয়।” এই বলে তিনি টলুতে টলুতে দ্বাৰেব দিকে অগ্রসর হ'লেন। তখন আমার জ্ঞান ফিবিয়া আসিল। একি হইল! এই করিলাম! আমি কি পাগল হইয়াছি? সামান্য সন্দেহের বশবর্তী হইয়া দেবতার মত স্বামীকে অপমান করিলাম। এমনটা হইবে তাহা তো ভাবিতে পাবি নাই। আমি শয্যাভাগ করিয়া উঠিলাম, কাতর কণ্ঠে ডাকিলাম,— “ওগো, ফিরে এস! আমি সব ভুলে গেছি।” কিন্তু হায়, শূন্য ঘরে কথাগুলি প্রতিধ্বনিত হইয়া আমারই কানে ফিরিয়া আসিল। তিনি তৎপূর্বেই গৃহত্যাগ করিয়াছেন। ভাবিলাম তাঁর ঘরে গিয়া পায় ধরিয়া ফিরিয়া আনি, কিন্তু পা চলিল কই? অজ্ঞাত অমঙ্গল আশঙ্কায় আপাদমস্তক থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সমস্ত পৃথিবী চক্ষের সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিল,— পরক্ষণেই সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া গেলাম। দিদি! দিদি! তিনি কি আমায় ক্ষমা করিবেন না? একবার তাঁকে ডাক না দিদি, পায় ধরিয়া ক্ষমা চাই।”

আমি তাহাকে সাধামত আশ্বস্ত করিয়া বলিলাম,— “নির্মলবাবু এখন একটু বাইরে গেছেন, বোন, তিনি এলেই তোমার কাছে আসবেন। তোমায় ক্ষমা ক'রবেন বৈকি। তোমায় কত ভালবাসেন তাকি জান না?”

“জানি, দিদি, জানি— তাহা তো এত সাহস পেয়োছি।” লতার অশ্রুজলে ধরণী সিক্ত হইতে লাগিল। আমার স্বামী আসিলেন। তাহাকে নির্মলের সংবাদ লইবার জন্য পাঠাইয়া লতার নিকট আসিয়া বসিলেন। অনেক কষ্টে তাহাকে একটু দুগ্ধ পান কবাইলাম, সমস্ত দিন অনাহারে সে অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল,— দুগ্ধ পান করিবার অল্প পরে সে নিদ্রিত হইয়া পড়িল। আমি তাহার নিকট বসিয়া তাহার অঙ্গে হস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলাম।

শ্রাবণ মাস,— আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, মাঝে মাঝে সেই বিবট অন্ধকার ভেদ করিয়া বিদ্যুৎ হাসিতেছিল। আমি আমার হৃদয়ে বিরাট অন্ধকার লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পর লতা জাগিল, চক্ষুঃস্থানল করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,— “তিনি কি এসেছেন দিদি?”

আমি মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিলাম,— “না, এখনও আসেন নি, এই এলেন বলে।”

লতা একটি ক্ষুদ্র দীর্ঘ নিশ্বাস ভাগ করিল,— তাহার সেই নিশ্বাসে আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। হায়! সরলা বালিকার অদৃষ্টে কি আছে কে জানে? আমার স্বামী ফিরিয়া আসিলেন,— তিনি প্রথমেই স্টেশনে নির্মলের সংবাদ করিবার জন্য গিয়াছিলেন, সেখানে শুনিলেন নির্মল এলাহাবাদের টিকিট কিনিয়া পাঞ্জাব মেলে চাপিয়া চলিয়া গিয়াছে। আমি নাথায় হাত দিয়া বলিলাম, আমার স্বামী বলিলেন, “কিছু ব্যস্ত হোয়া না, আমি কাল নিজে এলাহাবাদ গিয়ে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসব।”

লতাকে আর কিছু জানাইলাম না,— বিপদের উপর বিপদ লতা তখন অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। কিছু জিজ্ঞাসা করিবার শক্তি আর তাহার নাই। আমি আর গৃহে ফিরিতে পারিলাম না। খোকাকে রাত্রে একটু দেখিবার কথা স্বামীকে বলিয়া দিয়া লতার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলাম। চিকিৎসক ও ধাত্রীর জন্য লোক পাঠাইলাম।

সমস্ত বাত্রি ক্রেশভোগের পব, উষার তরুণ আলোক যখন সবেমাত্র আকাশপ্রান্তে উর্কি দিয়াছে, সেই সময়ে লতা, অসময়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিল। লতার পুত্র ঠিক যেই মুহূর্তে এই পৃথিবীর সহিত তাহার সম্বন্ধ প্রথম স্থাপন করিল, ঠিক সেই মুহূর্তে একটি মালগাড়ির সহিত উর্ধ্বগামী পাঞ্জাব মেলের ভীষণ সংঘর্ষ হইয়া বহু যাত্রী প্রাণ হারাইল। পরদিন সংবাদপত্রে মৃতের তালিকায় সর্বপ্রথম নির্মলকান্ত রায়ের নাম প্রকাশিত হইল। লতার সব ফুরাইল। দুঃসম্বাদ পাইয়া লতার মাতা ছুটিয়া আসিলেন। শোকাক্ত জমিদার দম্পতির স্থানভাগের শক্তি লোপ পাইয়াছিল। লোক পাঠাইয়া তাঁহার বধুর তত্ত্বাবধান করিলেন। লতা ছিন্ন লতিকার মতই দিন দিন শুকাইয়া যাইতে লাগিল।

তারপর একদিন একমাসের ক্ষুদ্র শিশুটিকে মার কোলে তুলিয়া দিয়া, স্বপ্নের ও স্বপ্নমাতাকে প্রণাম করিয়া, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্যই যেন লতা পরলোকগত স্বামীর উদ্দেশে মহাযাত্রা করিল।

## নির্বাসিত

### ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

॥ ১ ॥

তাহার নাম ছিল বিধুভূষণ, কিন্তু গ্রামস্থ সকলে তাকে আদর করিয়া বিদ্যাভূষণ বলিয়া ডাকিত। কেননা বিদ্যার সহিত বিধুভূষণের এমন একটা অকৈতব প্রেম জন্মিয়াছিল যে বিংশবর্ষ অতিক্রম করিতে বসিয়াও সে গ্রামস্থ ছোট বিদ্যাকুটির অর্থাৎ ওরু মহাশয় গোলাম হাজ্বার পাঠশালার মায়া ছাড়িতে সমর্থ হইল না।

প্রতিবাসীরা যখন দেখিল বিধুর পাঠশালা মায়া আপনা আপনি ছাড়িয়াব নহে, তখন সকলে মিলিয়া একদিন এই বিদ্যালয়গামী নবজাত শিশু যুবকের পথ আড়ানিয়া দাড়াইল।

সেই দলের ভিতর সপুত্র রামধন চাটুযো, সপৌত্র হরিরাম খোয়াল, ও শশিষ্য পঞ্চানন তর্কনাথ উপস্থিত ছিলেন।

বিধুভূষণ রামধনের পুত্র রামরূপের হাতেখড়ি দিয়াছিল, দিন দুই চারি তালপত্রে ‘ক খ’ লিখাইয়াছিল। সেই বাক্যপ বি. এ পাশ করিয়া দুইদিন পূর্বে দেশে ফির্বয়াছে।

হরিরামের পৌত্র নিধিবামেরও ভাগ্যে, দুই একদিনেব জন। বিধুভূষণেব ছাত্র যটিয়াছিল। সে বালকও গত বৎসর মধ্যবাংলা পবীক্ষায় বুড়লাও কাঁবয়া এবৎসর প্রবেশিকা পবীক্ষাব জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

সুতরাং বিদ্যাভূষণের যশঃসৌরভ তাহার গ্রামের চারিপাশে দশবাবোখানা গ্রামমধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

যুবক বিদ্যাভূষণেব পাঠশালায় যাইতে লজ্জা বোধ হইত না বলিয়া, পাড়াপডশীল এ দৃশ্য দেখিতে যে লজ্জা বোধ হইবে না, একপ ত কোন কথা নাই! সকলেই ত আব বিদ্যাভূষণেব মত নির্লজ্জ নহে।

তাহারা প্রথমে বিধুর না বিন্দুবাসিনী দেবী ওবমে বিন্দি বাননীকে ভেলেকে পাঠশালায় পাঠাইতে নিষেধ করিলেন। বিন্দু তাহাদের কথা ব্যাখ্যল না। পবন্তু পুত্রেব দৈনন্দিন উন্নতিতে তাহাদের অভ্যর্দ্রোচিত ঈর্ষা দেখিয়া, সে যত পারিল তাহাদের আচরণের উপর তাঁর মন্তব্য প্রকাশ করিল। বিন্দু বুঝিয়াছিল, তাহাব পুত্র যদিও পাঠশালা হইতে বাহিব হইবে, সেদিন সে একটি ছোটখাটো চাগকা পিণ্ড ত হইয়া, এই ইংবাজিপড়া ছোঁড়াদিনের ঈর্ষান্বিত বাপওনার মুখে কানী লোঁপয়া দিবে।

কিন্তু ঈর্ষান্বিত বাপওলা বিদ্যাভূষণকে চাগকা হইবাব অবকাশ দিন না। তাহারা আজ তাহাব বিদ্যামন্দিব গমনের পথবোধ করিতে বন্ধপবিকর।

রামধন চাটুযো বিধুর বগল হইতে শিঙবোধ কথামালার পুঁটলিটা বাঁহব কাঁবয়া লইলেন, হাঁববাম কাঁড়িয়া লইলেন দোয়াতটা, আব তর্কনাথ পশ্চাৎ হইতে বিধুর বাহুশূলদয ধাঁবয়া, জোব করিয়া তাহাব মুখটা বাটার দিকে ফির্বাইয়া দিলেন। আর বলিলেন—

“আটকুড়িবে ছেলে! তোমার জন্য আমরা যে লোকের কাছে মুখ দেখাইতে পারিনা। আর যদি কোনও দিন তুমি পাঠশালার দিকে মুখ ফিরাও তাহা হইলে তোমার চাং খোড়া করিয়া দিব।”

পুস্তকের পুঁচিল ও মস্যাধার পথপার্শ্বের নালার বর্দমে নিষ্কিপ্ত হইল।

বাপার দেখিতে বহুলোক সেখানে সমবেত হইয়াছিল। গোবিন্দ গোলাওয়াল বলিল— “আমি ঠাকুরকে বহুদিন হইতে নিষেধ করিয়া আসিতেছি। আমার দোকানে একটা মুহুরীগরি পর্যন্ত দিতে স্বীকৃত হইয়াছি।”

চন্দ্র তবফদার বলিল— “আমার নাতি বলে, আমি বিদ্যাভূষণ ঠাকুরদাদাকে বোধোদয়ের পড়া বলিয়া দিই।”

পাকড়াশীদের ছেলে কেঁটাটা অর্মান টাক করিয়া বলিয়া উঠিল— সেদিন গুরুমহাশয় বিদ্যাভূষণ কাকাকে, ‘নীল-ডাউন’ করিয়া দিয়াছিলেন।

কেবল ওকমহাশয় গোলাম হাজরা সংবাদ পাইয়া বিজ্ঞদিগের এ অন্যায় কার্যের প্রতিবাদ করিতে ছুটিয়া আসিল। বিধুভূষণেব ছাত্র তাহার অনেক প্রকারের লাভ ছিল। ওরুভুত যুবক তাহার গৃহেব অনেক কাজ করিয়া দিত। আর বিন্দুবাসিনীর কাছে, পুত্রের অচিরে চাকরত্ব প্রাপ্তির আভাস দিয়া, তাহার মাঝে মাঝে চালটা, ডালটা, ওড়টা, নারিকেলটা লাভ হইত। কিন্তু প্রতিবাদ করিতে আসিয়া গোলামের ভাগ্যে বিজ্ঞগণের তিরস্কার ঘটিল।

পরদিন প্রভাতে বিন্দুবাসিনীর করুণ রোদনে পাড়ার নরনারী প্রবুদ্ধ হইয়া, কারণ জানিতে গিয়া বুঝিল, বিদ্যাভূষণ মনেব দুখে গ্রামত্যাগ করিয়াছে।

## ১২

বিন্দুবাসিনী বামধন চট্টোপাধ্যায়েব স্মৃতিকন্যা। তাহার পিতা তাহাকে এক কুশীনেব হাতে সমর্পণ করিয়া কুলমর্যাদা বক্ষা করিয়াছিলেন। স্বামী ‘বন্দোপাধ্যায়’ মহাশয়ের বিন্দুবাসিনী ছাড়া গ্রাভও অনেক স্ত্রী ছিল। যে সকল স্ত্রীর নিকট হইতে তাহার অর্থাগমেব সম্ভাবনা থাকিত, বন্দোপাধ্যায় মহাশয় বৎসবেব অধিকাংশ সময় তাহাদেবই গৃহে গতিবিধি করিতেন। কিন্তু পিতাব তেমন সম্মতি ছিল না। সুতরাং এই স্বামী বিয়োগ-বিধুরার ভাগ্যে কদাচিত্ স্বামিসন্দর্শনসুখ ঘটিত।

কিঞ্চিদধিক উনবিংশবর্ষ পূর্বে এই বহুবল্লভ ঠাকুরটি জায়াকুপিনী বিন্দুবাসিনীকে একটি আদ্যজ বহু দান করিয়া একেবারে নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। বিধুভূষণের আব পিতৃপরিচয় ভাগাটা ঘটিয়া উঠে নাই। বিন্দুবাসিনী বারো বৎসর পর্যন্ত স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিয়া, যুগশেষে হাতের লোহা ফেলিয়া, সিন্থের সিঁদুর মুছিয়া বিধবার বেশ ধারণ করিয়াছে।

বিন্দুর সংসারে এখন তাহার প্রিয়পুত্র বিধু ভিন্ন আর কেহ ছিল না। তাহার পিতার যৎকিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি ছিল, তাহাতেই মাতা ও পুত্রের কোনও প্রকারে দিনযাপন হইত। এই পুত্রই বিন্দুর একমাত্র অবলম্বন, একমাত্র আশা। সেই পুত্র পাড়ার বিজ্ঞজন কর্তৃক অপমানিত হইয়া দেশত্যাগ করিল, সুতরাং অভাগিনীর মনোবেদনাব আর সীমা বহিল না। সে প্রভাতে উঠিয়াই আত্মীয়গণেব নাম লইয়া রোদন করিতে লাগিল।

তর্কনার্থর স্ত্রী স্বামীকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন— “বুড়ো মিন্‌সে! তুমি দলেব সঙ্গে যোগ দিতে গেলে কেন?”

তর্কনার্থ মহাশয় সে সময় একটি ঝঁকায় মাঝে মাঝে টান দিতে দিতে আকাশেব কোন অকণতরঙ্গাকুলিত দৃশ্যের দর্শনলাভাশায় উর্ধ্বনেত্রে তন্ময়ত্ব অবলম্বন করিয়াছিলেন। নাস্ত্রাঙ্গীর প্রশ্নের যে কি উত্তর দিয়াছিলেন, বিন্দুবাসিনীর আত্মবিস্ময় ও আমাদেব বাঁধর কণ্ঠে তাহা প্রবেশলাভের সুবিধা পায় নাই।

বিধুভূষণের বুদ্ধি যাহাই হউক, কিন্তু সে শাস্ত্রপ্রকৃতির বালক বলিয়া গ্রামের ভিতরে তাহার একটা বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। শুধু তাই নয়, বিধু পরকে আপনার জ্ঞান করিয়া সর্বদাই তাহাদের সেবা-তৎপর ছিল। গ্রামবাসীদের মধ্যে কেহ কখন বিপদে পড়িলে বিধু ভিন্ন সে বিপদমুক্তির উপায় ছিলনা। রাত্রে কাহারও ডাক্তার ডাকিবার প্রয়োজন হইয়াছে, পল্লীগ্রামের গুম্ববস্থল বনামধ্যস্থ সন্ন্যাসসঙ্ঘল পথে সেই অন্ধকারময় রাত্রে গ্রামান্তরে কে যাইবে? যাইবে বিদ্যাভূষণ। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, বিধবার ক্ষুদ্র বালক খেলা করিতে বাহির হইয়াছে, তখনও পর্যন্ত ঘরে ফিরে নাই— কে তাহাকে খুজিতে যাইবে? যাইবে বিদ্যাভূষণ। কোন গৃহস্থকন্যার আজ হাটে যাইবার লোক নাই, বিদ্যাভূষণ তাহার জন্য জিনিস আনিতে হাটে চলিল। কেহ সদা প্রসূতা গাভীটির সন্ধান পাইতেছে না, বিদ্যাভূষণ তাহাকে খুজিয়া আনিল।

বই কাড়িয়া লইবার জন্য বিধু যে দেশতাগ করিবে এটা কেহই বুঝিতে পারে নাই। সুতরাং বিধুর অদর্শনে দুই একজনের আমোদ হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও, গ্রামস্থলোকেব অধিকাংশই দুঃখিত হইল। স্বয়ং তর্কনিধি মহাশয় ত অপ্রতিভ। মধ্যে মধ্যে গৃহিণীর তিরস্কার শুনিয়াও তাঁহাকে চুপ করিয়া থাকিতে হইত।

বিধুভূষণ গ্রামের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কুলীন। এইজন্য তর্কনিধি মহাশয় তাহাকে একমাত্র কন্যা ক্ষমাসুন্দরীকে দান করিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন। মেয়েটি তাঁহাব শেষ জীবনেব এবং আদরের,— বিবাহ দিয়া তাহাকে চোখের অন্তরাল না করিতে হয়, এইটাই তাঁহাব ইচ্ছা। অবশ্য ক্ষমাসুন্দরীর দানের কথা তিনি মনে মনেই রাখিয়াছিলেন। একদিন প্রসঙ্গ ক্রমে তিনি গৃহিণীর কাছে কথটা পাড়িয়াছিলেন মাত্র। সেই অবধি তর্কনিধিগৃহিণী অমদা দেবী বিধুভূষণকে কতকটা স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। এক এক দিন স্বামীর টোলে পড়িতে আসিয়া, যখন বিধু পাঠ ফেলিয়া, ক্ষমাসুন্দরীর খেলার ঘর রচনায় নিযুক্ত হইত, তখন ব্রাহ্মণকন্যার আনন্দের আর সীমা থাকিত না। তিনি কন্যা ও ভাবী জামাতার জন্মান্তবের দাম্পত্য জীবনের একটি ছবি দেখিতে পাইতেন। বিধুর নির্বাসনে তিনি মর্নহত হইয়া, নিত্য সময়ে অসময়ে স্বামীকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

কিন্তু তর্কনিধি মহাশয়ের বিধুর উপর ক্রোধ হইবার যথেষ্ট কাণ ছিল। তিনি বিধুকে মানুষ করিবার জন্য ভিতরে ভিতরে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। দিন কয়েক, তিনি তাহাকে পাঠশালা হইতে আনাইয়া নিজের টোলের ছাত্রবৃন্দের ভিতর বসাইয়া দিয়াছিলেন। মুঞ্চবোধের দুই একটা সূত্র তাহার কণ্ঠাধঃকৃত করিবার চেষ্টাও হইয়াছিল। কিন্তু তর্কনিধির শত চেষ্টায়ও বিধুর কোমল বসনা দিব্যকাঠিন্যযুক্ত— ‘সহর্গেধঃ’ ‘আদিগোচোর্ণু ব্রীঃ’ ‘দ্রোতীর্ষশচানু,’ প্রভৃতি ব্যোপদেব বাক্যের রস গ্রহণে সমর্থ হইল না। দরিদ্র রসনা বার দুই তিন দস্তাহত ও রক্তাক্ত হইয়া, তিনদিন নিরীহ যুবকের আহ্বারের ব্যাঘাত উৎপাদন করিল। সন্তানবৎসলা বিন্দুবাসিনী আবার তাহাকে গুরুমহাশয়ের আশ্রয়ে পাঠাইয়া দিল। তর্কনিধিও নিশ্চিন্ত হইয়া, তাহার পাঠশালা হইতে শুভ নিষ্কৃতিলাভ দিবসের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতে তাঁহার ক্ষমার এগার বৎসর পার হইয়া গেল, গ্রামে তাহার সঙ্গিনীদের মধ্যে কেহই আর অবিবাহিত রহিল না। ইতিমধ্যে রামধনের পুত্র তিনটা ইংরাজি পাশ করিয়া ফেলিল, হরিরামের পৌত্রও ইংরাজিতে লায়েক হইতে চলিল; তথাপি আঁটকুড়ির নন্দন বিধুভূষণ পাঠশালা হইতে বাহির হইল না। তর্কনিধি ক্রোধে বিধুর বিদ্যার্জনের পথদোধ করিতে রামধনের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিলেন।



বিধুর নির্বাসনে রামধন চট্টোপাধ্যায়ের একটু স্বার্থ ছিল। তর্কনিধিগৃহিণী কথা প্রসঙ্গে একদিন চট্টোপাধ্যায়-গৃহিণীর কাছে, ক্ষমার বিবাহ সম্বন্ধে স্বামীর অভিপ্রায়টা প্রকাশ করিয়াছিলেন। চট্টোপাধ্যায়পত্নী ক্ষমার মা'র নিবেদন সত্ত্বেও স্বামীকে সে কথাটা বলিয়া উদরাম্বানের (পেটফাঁপা রোগ) ও অগ্নিমাল্যের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। শুনিয়া চট্টোপাধ্যায়ের মনে ঈর্ষা জন্মিল।

তাহার কারণ তর্কনিধি মহাশয়ের বেশ দু'পয়সা সঙ্গতি ছিল। সেই সম্পত্তির অধিকারিণী ওই একমাত্র কন্যা। ক্ষমা দেখিতে যদিও ততটা সুন্দরী ছিলনা, কিন্তু হইলে কি হয়, তাহার স্মরণ মাত্রেই তর্কনিধির লোহার সিন্দুক ভেদ করিয়া আর একটা যে অপরূপ সৌন্দর্য মেয়েটার সর্বাস্তে ঢাকাই মসলিনের মত জড়াইয়া তাহাকে আরব্যোপন্যাসের পরী করিয়া তুলিয়াছিল, চাটুয্যে মহাশয় অনেক ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিলেন না, তাহার চেয়ে অঙ্গারার রূপ কত বেশি। ফলে চিন্তা করিতে করিতে, ত্রিদিবকামিনীদিগের হরিচন্দন পুষ্পরেণুসম্পৃক্তা শ্রী ক্ষমার রূপের কাছে মলিন হইয়া গেল। এমন সর্বলাবণ্যময়ী কন্যা, তাঁহার কন্দর্পকাস্তি সর্বগুণালঙ্কৃত রামরূপ বাবাজীবন বর্তমান থাকিতে কিনা শ্রীহীন গণ্ডমূখ বিধুভূষণের হাতে পড়িবে।

ক্ষমার দুঃখে তাঁহার প্রাণটা যেন গলিয়া গেল। আর অদূর ভবিষ্যতের এই পিতৃমাতৃহীনা বালিকার পিতৃপিতামহসম্বন্ধিত অর্থের অযথা ব্যয় তাঁহার কল্পনাচক্ষে জাগিয়া হৃদয়টাকে বড়ই প্রসীড়িত করিতে লাগিল।

কিন্তু তিনি কেমন করিয়া তর্কনিধির কাছে কথাটা পাড়েন। একে তিনি কুলীন, তাহার উপর ছেলের রূপগুণের কথা শুনিয়া কত দিগ্‌দেশ হইতে কত 'হট্টমালার' সম্বন্ধ কথা লইয়া কত ঘটক নিত্য তাঁহার কাছে যাতায়াত করিতেছে। সবার উপর কথাটা নিজে পাড়িলে বিবাহের পণপ্রাপ্তি সম্বন্ধে তাঁহার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। নিরুপায়ে চট্টোপাধ্যায় প্রিয়বন্ধু হরিরামের সাহায্যার্থী হইলেন।

তখন রামরূপ বি. এ পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, আর বোকা বিধুভূষণ তর্কনিধির টোলে বসিয়া, 'দুর্ভিষ্টসাদাস্তটোঃ' বাকাটা রসালবীজবৎ মুদিতনয়নে চর্চণ করিতেছে। এমন সময় হরিরাম রামরূপের দূরদেশ যাত্রার শুভদিন দেখাইবার ছলে তর্কনিধির কাছে উপস্থিত হইল।

তর্কনিধি তখন 'দাস্তটোঃ'—রূপ আঁটিটি বিদ্যাভূষণের সূক্ষ্ম গলছিদ্র মধ্যে প্রবিষ্ট করাইতে অসমর্থ হইয়া, ক্ষমার ভবিষ্যৎ ভাবিতে ভাবিতে অসার খলুসংসারের উপর চটিয়াছেন, এবং তাহাকে ধূস্রাচ্ছাদিত করিয়া লোকলোচনের অন্তরালে ফেলিবার জন্য ঈঁকা হাতে করিয়াছেন।

দু'টা একথা সেকথা—'তিথ্যমৃতযোগ' উদ্ভরে যোগিনী'—বারবেলা, কালবেলার পর, হরিরাম গামরূপের কথা পাড়িলেন। বলিলেন—“রামরূপ বি. এ. পাশ দিতে কলিকাতায় যাইবে, তাই তার বাপ আপনার কাছে যাত্রার দিনটা দেখাইতে পাঠাইয়াছেন।”

তর্কনিধি বাম হাতে ঈঁকা ধরিয়া, দক্ষিণ হাতে পাজি লইলেন। হরিরাম কথাটা শুনাইয়াও তর্কনিধির মুখে কোন ভাবপরিবর্তন লক্ষ্য করিলেন না। তর্কনিধি পাজির পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। কিন্তু যাত্রার শুভদিন বাহির করা দূরে থাকুক, সমস্ত পাজির ভিতরে তিনি একটা দিন পর্যন্ত খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। তিনি রামরূপ ও বিদ্যাভূষণের পার্থক্য উপলব্ধি

করিতে অসমর্থ হইয়া একমেবাদ্বিতীয়ং হইতে বিনির্গত এক বিরাট মায়া পাঁজির পাতে পাতে অঙ্কিত দেখিতেছিলেন।

তামাক টানিতে টানিতে হরিরাম বলিলেন— “আহা! রামরূপটি কেমন ছেলে!”

কেনও উত্তর পাইলেন না। দিন দেখায় তর্কনিধি বাস্তু ভাবিয়া ক্রিয়ৎক্ষণ অপেক্ষার পর হরিরাম আবার বলিলেন— “আহা কেমন ছেলে!”

তর্কনিধি বলিলেন— “বাঁদব।”

হরিরামের চক্ষু কপালে উঠিবার আয়োজন করিল। “সেকি তর্কনিধি! অমন সোনাব ছেলে বাঁদব।”

যাহাকে ভালবাসি তাব সহস্রদোষ থাকিলেও, যদি কেহ তাহার এক-আধটা কাল্পনিক গুণও সময় বুঝিয়া শুনাইয়া দেয়, তাকে বুঝি সব দিতে ইচ্ছা হয়। বিধুকে তর্কনিধি একটা আন্তরিক ভালবাসিতেন। তাই হরিরামের কথাটা বিধুর সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে মনে করিয়া তাহাব হাতে হুঁকাটা দিয়া বলিলেন—

“তোমরা সবাই বল সোনার ছেলে, কিন্তু আমি হতভাগের জন্য হাড়ে-হাড়ে জুলিয়া মরলাম। সাতদিনে একটা সূত্র উচ্চারণ কবাইতে পারিলাম না।”

হবিবামের খড়ে প্রাণ আসিল। হুঁকার একটা টানে আপাদমস্তক ধুমপূর্ণ করিয়া, তর্কনিধিকে সেটা ফিরাইয়া দিয়া, ধূমমিশ্রিত অর্ধোচ্চারিত বাক্যে তিনি বলিতে লাগিলেন— “আমি বিদ্যাভূষণেব কথা বলিতেছি না, রামরূপের কথা বলিতেছি।” তর্কনিধি তখন নিজের ভ্রম বুঝিলেন। তাহার অপ্রতিভ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু অশাস্ত্রীয় ক্রোধ হৃদয়ে পুনঃসঞ্চিত করিয়া বলিলেন— “ও দুইই সমান।”

হরি। কেমন করিয়া?

তর্ক। বিদ্যাভাষ না হইলে, বাদব না হইয়া কি হইবে?

হরি। সেকি তর্কনিধি মহাশয়! বালক এই বয়সে যে তিনটা পাশ করিয়া ফেলিল।

তর্ক। করিয়া ভূত হইল। সে আমাকে শিখাইতে আসে। আমি একদিন ছাত্রদেব জ্যোতিষশাস্ত্রের উপদেশ দিতেছি— সূর্য নিতা কেমন করিয়া ঘুরে বুঝাইতেছি— এমন সময় জ্যাঠা ছেলেটা কোথা হইতে আসিয়া আমাকে বলিল, পৃথিবী ঘুরিতেছে। কালকের ছেলে, সে তর্ক করিয়া আমাকে বুঝাইতে চায়। আরে মুর্খ। পৃথিবী যদি ঘুরিত, তাহা হইলে, এতদিনে তোঁর বাবাব তেঁওঁটে মাথার সঙ্গে তোঁর কঁচি মাথাব ঠেকের লেগে ঘি বাঁহির হইয়া পড়িত।

হবিবাম দ্বকীয় ঘটকালীর দিফলিত্তা বামধনকে জ্ঞাত করিলেন।

॥ ৬ ॥

বামরূপের বি. এ. পাশের খবর আসিয়াছে। বিদ্যাভূষণেব, টোল ছাড়িয়া পাঠশালায় আবার “প্রমোদন” হইয়াছে।

হবিরাম আবার তর্কনিধির কাছে যাতায়াত করিতেছেন, আর মাঝে মাঝে রামরূপ সম্বন্ধে একটা আধটা সুবিধামত কথা বলিতেছেন। একদিন তিনি বলিলেন, রামরূপকে জেলাব বড় সাহেব ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

তর্ক। বেশ।

হরি। তিনি বলেন, তোমাকে আমার এখানে একটা চাকরী দিতে ইচ্ছা করি।

তর্ক। খুব সদিচ্ছা।

হরি। কিন্তু রামরূপ চাকরি করিতে রাজ হইতেছে না।

তর্ক। কেন?

হরি। সে বলে, আমি একেবারে হাকিম হইব।

তর্ক। বটে!

হরি। কাজে-কাজেই সাহেব সেকহাণ্ড করিয়া তাহাকে বিদায় দিয়াছেন।

সেকহাণ্ডের অর্থ বুঝিয়া তর্কনিধি বলিলেন— “তাহাকে গঙ্গাজলে হাত ধুইতে বলিয়ো।

কেননা সাহেবেরা অখাদা খায়।”

সুতরাং সেবাবেও হরিবাম বড় সুবিধা করিতে পারিলেন না। আব একদিনের কথা—

হরি। পঁহিতাড়াব রাজার মেয়ের সঙ্গে বামকাপের বিবাহেব সম্বন্ধ হইতেছে।

তর্ক। গুনিয়া সুখী হইলাম।

হরি। মেয়ের বাপ একটা ভ্রমদারী দিবে বলিয়াছে।

তর্ক। আহ! বাঁচিয়া ভোগ করুক!

হরি। কিন্তু তাহাব বাপ রাজী হইতেছে না।

তর্ক। তাব দুর্বুদ্ধি।

হরি। মেয়েটি কালো।

তর্ক। রূপ নইয়া কি ধূইয়া খাইবে? তুমি তাহাকে রাজি হইতে বল।

হরি। বলিয়া দেখিয়াছি।

তর্ক। কথা শুনে না।

হরি। বলে, ছেলে কালো মেয়ে বে করিতে চায় না।

তর্ক। ও! আত্মকালিকার ছেলে, বাপেব পছন্দে তার পছন্দ হয় না। সাথে কি আর দেশে এত আফিমের দব চড়িয়াছে!

আফিমের সঙ্গে মেখে-পছন্দের কি সম্পর্ক বুঝিতে না পারিয়া, হরিরাম বলিল—

“আপনার ক্ষমাটি দিবা মেয়ে।” তর্কনিধি আনন্দের আবেগে হাসা করিলেন।

হরি। যথার্থ কথা বলিতে গেলে, এমন সুলক্ষণযুক্ত মেয়ে আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

তর্ক। তবু কয়দিন মা আমাব রোগা হইয়া গিয়াছে।

হরি। কেন— কোন অসুখ কবিয়াছে কি?

তর্ক। তাহো বুঝিতে পারিতেছি না।

হরি। বিবাহযোগ্য হইল— বিবাহ দিতেছেন না কেন?

এমন সময়ে ক্ষমা একটি সুন্দর খাঁচা হাতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তর্কনিধি জিজ্ঞাসা কবিলেন— “খাঁচা কে দিল রে?”

ক্ষমা বলিল— “বিধুদাদা তইবি কবিয়া দিয়াছে।”

তর্কনিধি অমন বলিয়া উঠিলেন— “হতভাগটার অশেষ গুণ। ক্ষমাব পুতুলের জন্য এমন সুন্দর ঘর করিয়া দিয়াছে, এমন খয়েরের বাগান রচিয়াছে যে, দেখিলে বিশ্বকর্মান্ব শিল্প বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু মা সরস্বতী কেন যে ছোঁড়াটার উপর বিরূপ ও’ বুঝিতে পারিলাম না।” হরিরাম বলিলেন— “বোধ হয় ছোকরা আরঙমে রাজমজুব ছিল।”

বিদ্যাভূষণ আরঙমে যাই থাকুক, সেদিনও হরিরাম কোন সুবিধা কবিতে পারিলেন না। তখন হতাশ হইয়া, তিনি বামধনের দৌতাকার্যে ইত্তফা দিলেন।

বামধনের জেদ বাড়িল। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, তর্কনিধির কাছে কিছুও যদি না পাই, তথাপি তাহাব কন্যার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিব।

তিনি নিজে যাইয়া তর্কনিধির কাছে প্রস্তাব করিলেন। প্রথম দুই চারিদিন কোনও উত্তর পাইলেন না। একদিন তর্কনিধি বলিলেন—“ভাবিয়া দেখি,” অপর একদিন বলিলেন—“আমি বেশি কিছু দিতে পারিব না।”

রামধন বলিলেন—“আপনি হরিতকী দক্ষিণা দিয়া কন্যা দান করিলে, তাই আমার যথেষ্ট হইবে।”

বাস্তবিক তর্কনিধি একদিন নিজচক্ষে দেখিলেন, রামধন পাঁচ হাজার টাকা পণ ও সেই সঙ্গে সুন্দরী কন্যাদানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতেছেন।

ব্রাহ্মণ এইবারে ফাঁপরে পড়িলেন। এবং মনের আবেগে বিদ্যাভূষণকে মনে মনে অজ্ঞপ্ত গালি দিলেন। তারপর গৃহিণীর কাছে আসিয়া বলিলেন—“বামরূপের সহিত ক্ষমাসুন্দরীর বিবাহ দিব।”

মেয়ে দেখিতে দেখিতে ডাগর হইয়া উঠিতেছে, সুতরাং অন্নদাসুন্দরী বিদ্যাভূষণের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ দুঃখ প্রকাশ করিলেন এইমাত্র,— বিবাহে ‘না’ বলিতে পারিলেন না।

বিদ্যাভূষণের নির্বাসনের একমাস পবে, একটা সুতহিবুক যোগে ক্ষমাসুন্দরীর সঙ্গে বামরূপের বিবাহ হইয়া গেল। বিধুভূষণের জননীর সেদিনকার সাক্ষ্য রোদন, বামধনের গৃহিণীর শঙ্কস্বপ্ননিতে নিমজ্জিত হইয়া গেল।

॥ ৭ ॥

ইহার পর পাঁচ বৎসর। এই পাঁচ বৎসবে রামরূপ এম. এ ও আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আর ক্ষমাসুন্দরী স্বশ্রুতগৃহে পিতৃগৃহে বার পঞ্চাশ যাতায়াত করিয়াছেন। তাহার কারণ, তর্কনিধির নিকট হইতে সুদ্ধমাত্র একটি হবিতকী দক্ষিণা লইয়া, চট্টোপাধ্যায় তাঁহার কন্যাটিকে পুত্রবধূহে গ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু হবিতকীটি কোন অবস্থাপন্ন হইবে, সেটা পাকা-দেখার সময় স্থির হয় নাই। সেইজন্য বিবাহের অব্যবহিত পূর্বে তিনি গৃহিণীর অনুরোধে একটি পক্ষ হবিতকীর দাবী করিয়া বসিলেন। কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ জাতিবুল বক্তব্য রাখিতে, বিদ্যাভূষণের অপমানের প্রায়শ্চিত্তরূপ যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য পঞ্চসহস্র রজতখণ্ড বৈবাহিককে দান করিয়াও পাঁচবৎসর মধ্যে পক্ষ হরিতকীর স্বর্ণমুক্ত হইতে পারিলেন না।

মধ্যে মধ্যে চট্টোপাধ্যায়-গৃহিণীর, পুত্রবধূটির উপর ভাগাদা পড়িত। আজ বৎস রামরূপ গাউন পরিয়া কলিকাতায় বড়লাট সাহেবের নিকট হইতে ডিপ্লোমা আনিতে যাইবে। তর্কনিধির পূর্বজন্মার্জিত ভাগ্যে জামাতার সে শোভা দেখিবার যদি সাধ থাকে ত এখনি একশত টাকা দান করুক। আব যদি না থাকে, তাহা হইলে তাহার কন্যাকে ঘরে লইয়া যাক। আমি আবার পুত্রের জন্য অন্য ভাগ্যবতীর অনুসন্ধান করি। আজ পুত্রকে হাকিম করিবার জন্য স্বয়ং রাজরাজেশ্বরীর নিকট হইতে সনন্দ আসিতেছে। সেই সনন্দ আনিতে হইলে, বাছাকে চতুর্দোলায় চাপিয়া বড়লাটের বাড়ি যাইতে হইবে, তাহাকে তর্কনিধির কন্যারই ভবিষ্যতের বাঁধা সুখ। সুতরাং এই অমূল্য পদমখানার সুখটি লাভ করিতে, পাতনের স্বরূপ যে কতকগুলি অকিঞ্চিৎকর রৌপ্যমুদ্রার প্রয়োজন হইবে, তাহা তর্কনিধি ভিন্ন অন্যো দিতে যাইবে কেন?

কাজেই মাঝে মাঝে ক্ষমাকে অর্থের প্রত্যাশায় পিতৃগৃহে যাইতে হইত।

বারম্বারের ভাগাদায় তর্কনিধির প্রাণ কঠাগত হইল। অথচ বিচারদণ্ড হাতে করিলে, বাজার কচি হাতের কবলীতে ব্যথা লাগিবে বলিয়া, বামরূপের হাকিম হওয়া হইল না। আর তেলুকোটে ওকালতী করিতে শিয়া, তাহার গলায় সর্পি বসিয়া, গেল বলিয়া তাহার

ওকালতীতেও সুবিধা হইল না। ভ্রজ সাহেব একদিন তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন— “তুমি ইন্সুল-মাস্টারির চেষ্টা কর। একটা তুচ্ছ অর্থহীন ফাঁকা কথা লইয়া মেয়েলি ঝগড়া করা তোমার নায় বীরপুরুষের কার্য নয়।”

সাহেবের আদেশ অমান্য করা ভ্রজতার সীমা বহির্ভূত বলিয়া, রামরূপ মাস্টারি করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ঘরে ফিরিল।

চট্টোপাধ্যায়-গৃহিণী বুঝিলেন, স্বামী না বুঝিয়া একটা অলক্ষণা কন্যা গৃহে আনিয়াছেন। সুতরাং এরূপ কন্যার বাপ ও মা— দুইজনেই যখন তাহার লক্ষণহীনতার জন্য দায়ী, তখন হয় তারা পুত্রের কোন একটা চাকরির ব্যবস্থা করুক, না হয় “বাগিজো বসতে লক্ষ্মী” শাস্ত্র বাকাটার সত্যতা প্রতিপাদনের জন্য, রামরূপকে কতকগুলি টাকা দিয়া যে কোন একটা কারবারে নিযুক্ত করুক।

তর্কনিধি বৈবাহিকার এই সংপ্রভাবে আপনাকে অনুগৃহীত বিবেচনা করিলেন। এবং বৎস রামরূপকে একদিন নিকটে পাইয়া বলিলেন, “বৎস! এখন তোমার জ্ঞানমাহাত্ম্যের পরিচয় পাইতেছি। এখন বুঝিতেছি, পৃথিবীই অহনিশি ঘুরিতেছে।”

॥ ৮ ॥

রামরূপ কিন্তু এ সত্য বাক্যের সারমর্ম গ্রহণে অসমর্থ হইল, এবং শ্বশুরের প্রতি কুপিত হইয়া, মায়ের কাছে সকল কথা প্রকাশ করিল, বলিল— “ও টুলো বানুনের সঙ্গে যদি আর সম্পর্ক রাখ, তাহা হইলে আমি দেশভাগী হইব।” চট্টোপাধ্যায়-গৃহিণী তাহার স্বামীকে বলিলেন— “যদি বাছার আমার আবার বিবাহ না দাও, তাহা হইলে গলায় দড়ি দিয়া মরিব।”

রামধন মনে মনে বুঝিলেন— “এ বড় মন্দ কথা নয়। অর্থোপার্জনের এমন সুগম পন্থা এতকাল বিস্মৃত হইয়াছিলাম কেন?”

দেশের দুর্ভাগ্য, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা, কন্যাকে পাত্রস্থা করিবার অবসর পাইলে অনেক সময়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া যায়। পুত্রের পুনর্বিবাহের কথা রামধনের মনে জাগিতে না জাগিতে, পাত্রীর সন্ধান মিলিয়া গেল। সন্ধানদাতা হরিরাম ঘোষাল। রামরূপের প্রথম বিবাহের দৌত্যকার্যে বিফলমানোরথ হইয়া, তর্কনিধির উপর তাহার ক্রোধ হইয়াছিল। সেই ক্রোধের ফলে, তিনি ক্ষমাসুন্দরীর সর্বনাশে প্রবৃত্ত হইলেন। পাত্রীর পিতার অবস্থা ভাল নয়। এইজন্য কন্যাটিকে বয়স্থা করিয়া, তিনি কোন বিপত্নীকের অপেক্ষা করিতেছিলেন। এখন এই সর্বগুণাধার সপত্নীকের সন্ধান পাইয়া, তিনি অনিশ্চিত বিপত্নীকের আশা পরিত্যাগ করিলেন এবং হরিরামের সঙ্গে মিশিয়া অভাগিনী ক্ষমার সর্বনাশে অগ্রসর হইলেন।

এ কথা তর্কনিধি ও অন্নদাসুন্দরীর কানে উঠিতে বাকি রহিল না। কন্যার দুঃখে মর্মপিড়িত হইয়া চট্টোপাধ্যায়ের কাছে ব্রাহ্মণ দম্পতি ছুটিয়া আসিলেন! কিন্তু ফল হইল না। কন্যা ক্ষমার এত বয়স পর্যন্ত পুত্রহীনতার দোহাই দিয়া, তিনি কুলধর্ম রক্ষায় সচেতন, — তর্কনিধির মিনতিতে কর্ণপাত করিলেন না। তর্কনিধি, কন্যাকে গৃহে লইয়া আসিলেন।

ক্ষমা এতকাল দেবতারও কাছে মনোভাব প্রকাশ করে নাই। বিদ্যাভ্রমণের নির্বাসনের পর হইতে এই এতকাল পর্যন্ত সে সুখী কি দুঃখী, অন্যের জানা দূরে থাক, তাহার পিতা মাতা পর্যন্তও জানিতে সমর্থ হন নাই। রামরূপের বিবাহের পর হইতে তর্কনিধির সংসারে এই যে এত ঝড় চলিয়া গিয়াছে, সে সকল ঝড়ের প্রকোপ কেবল ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী সহ্য

করিয়াছেন। অপমানে, শ্বশুর শ্বাশুড়ির তিরস্কারে, অর্থের জন্য নিতা পীড়নে— এমন কি দাঙ্কি স্বামীর হৃদয়হীনতায়— কিছুতেই তাহার মুষ্কেপ ছিল না। সমমমী প্রতিবাসী প্রতিবাসিনীরা তাহাকে বোকা মেয়ে বলিত।

একদিন ক্ষমাসুন্দরী অনামনে অস্তরের কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিল। অন্নদাসুন্দরী স্বামীকে বলিতেছিলেন— “জামাইকে বাবসায় করিতে টাকা দিলেই যদি বিবাহটা বন্ধ হয়, ত কিছু টাকাই দাওনা কেন?”

ক্ষমা অস্তুরাল হইতে কথা শুনিতেছিল। মায়ের কথা শুনিয়া, বাহিবে আসিয়া বলিল— “সর্বস্ব দিলেও তাহাদের মন পাইবে না, আমার যা হইবার তা হইয়াছে। তোমরা কেন বৃদ্ধ বয়সে ভিখারী হইবে?”

তর্কনিধি মর্মবেদনায় গালে হাত দিয়া নীববে অশ্রুবর্ষণ করিতেছিলেন। ক্ষমা বলিল— “কাদেন কেন বাবা! মূর্খের হাতে পড়িলে দুঃখে দিন যাইবে বলিয়া, আপনি পিণ্ডুতবে হাতে আমাকে দিয়াছিলেন। আমার অদৃষ্ট, তাহাতেও আমার দুঃখ ঘুচিল না।”

তর্কনিধি বলিলেন — “মা! নিরপরাধ ব্রাহ্মণসন্তানকে অপমানিত কবিয়া দেশ হইতে তাড়িয়াছি। এ আমার সেই মহাপাপের ফল।”

ক্ষমা বলিল— “আমাবও বোধ হয় তাই, ইহাদেব টাকা দেওয়া অপেক্ষা আপনি তাহার দবিদ্রা জননীকে টাকা দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করুন।”

অন্নদাসুন্দরী বলিলেন— “ঠিক কথা। ব্রাহ্মণের অভিশাপ লাগিয়াছে।”

ক্ষমা। সে ব্রাহ্মণ অভিশাপ দিবে না জানি। কিন্তু তার মায়ের দায়নি-ধাসে আমার সর্বনাশ হইতেছে।

বিস্মিতনেত্রে ব্রাহ্মণ, কন্যাব মুখেব পানে চাহিলেন। “মা। আমার সঙ্গে কাশাবাস করিতে পারবি?”

ক্ষমা। সে ত আমার সৌভাগ্য। অবগো বাস কবেন ত, আমি সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত আছি।

## ॥ ৯ ॥

পরদিন প্রাতঃকালে তর্কনিধি, অর্থদানে ও ক্ষমাপ্রার্থনায় বিধুর নির্বাসনের প্রায়শ্চিত্ত কবিত্তে গিয়া দেখেন, বিন্দু দ্বাব বন্ধ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তাহাব পাড়াব লোককে কেই তাব খবব দিতে পারিল না। দুই এক দিন তাহাব অপেক্ষা কবিয়া, যখন দেখিলেন বিন্দু আসিল না, তখন কন্যা ও স্ত্রীকে লইয়া ব্রাহ্মণ কাশীযাত্রা কবিলেন।

তার পরদিন বংস রামরূপের দ্বিতীয়বার বিবাহের সম্বন্ধেব শঙ্কাকনি হইল। স্থির হইল, একপক্ষ পবে বিবাহ হইবে। চট্রোপাধ্যায়ের যথেষ্ট প্রাপ্তি না হইলেও, নানা জাতীয় হিসাবে কন্যাব পিতাব নিকট হইতে, প্রায় দেড়হাজার টাকার দ্রব্য পাইবার সম্ভাবনা বহিল।

তৎপব দিন অনামনস্কে স্টেটসম্যানের বিজ্ঞাপন-স্তম্ভটা পবীক্ষা কবিত্তে গিয়া বানরূপ দেখিল, রাণীগঞ্জের নিকটবর্তী এক গ্রামে এক নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদেব জন্য একজন এম. এর প্রয়োজন। বেতন একশত টাকা।

অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া রামরূপ উক্ত গ্রামের উদ্দেশে একখানা দরখাস্ত নিক্ষেপ করিল। সপ্তাহমধ্যে টেলিগ্রামে প্রভাত্তর আসিল— “আবেদন গ্রাহ্য হইল, পত্রপাঠ রওনা হউন।” বিন্দুংগতিতে এ শুভসংবাদ চট্রোপাধ্যায়ের বাড়ি হইতে পাড়ায় পাড়ায় রাষ্ট্র হইল। সকলে বলিল— “কন্যা কি সুলক্ষণা।”

বাধা হইয়া চট্টোপাধ্যায়কে ভাবি বৈবাহিককে জানাইতে হইল,— “দিন কয়েকেব জনা বিবাহ স্থগিত থাকুক। কেননা এহাব সুলক্ষণা কন্যাব ওণে বানকপ বাবাজীবনের হাকিমাব মত একটা চাকৰি হুটিয়াছে। সেই পদ হইতেই বাবাজীবনের দুই দিন পৰে ভৃত্ত হইবাব সম্ভাবনা।”

॥ ১০ ॥

কৰ্মস্থানে যাঁহা অৰবি বানকপেব সুখে দিন কাটিয়া যাইতেছে। উত্তম আহাব, সুন্দব বাসস্থান — চাকৰে নিতা পৰিচৰ্যা কৰিতেছে— অথচ এক পয়সা খবচ নাই।

ইন্সুলেব সেক্টেচাৰি প্ৰতিদিন তত্ত্বাবধান কৰিতেছেন।

বানকপ পিতাকে লিখিলেন— “বডই সুখে আছি।”

পিতা লিখিলেন - “তাতো আছ, কিন্তু বিবাহেব কি? কন্যাব পিতা আসিয়া নিতা তাগাদা কৰিতেছে।”

বানকপ উত্তৰ দিলেন— “বিদ্যালয়েব মালিকেব সঙ্গে দেখা না কৰিয়া কিছু লিখিতে পাৰিতেছি না।”

‘তবে দেখা কৰ।’

“তিনি এখন কাশীতে — শীঘ্ৰই এখানে আসিবেন।”

পাঠক মনে বাঁখবেন, এ উত্তৰ প্ৰত্যুত্তৰ চিঠিতে চলিতেছে।

দিন কয়েক পৰে, পিতা পত্ৰ পাঠিলেন - “মালিক কাশী হইতে আসিয়াছেন। কিন্তু এহাব সহিত আমাব সাক্ষাৎ হয় নাই। তবে পত্ৰে তাহাব মনোভাব জানিয়া বুঝিযাছি যে ইন্সুলটি নুতন স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া তিনি এখন আমাকে ছাড়িয়া দিতে পাবেন না। ওবে একান্তই যদি আমাকে বিবাহ কৰিতে হয় তাহা হইলে তিনি এই স্থানেই বিবাহেব বন্দোবস্ত কৰিতে প্ৰস্তুত আছেন। এখানে আপনাদেব সামান্যমাত্ৰেও অসুবিধা হইবে না। আমাব মনীব যেমন ধনবান, তেমনি সদাশয়। গ্রামেব লোকও অতি ভদ্ৰ।”

॥ ১১ ॥

আজ সন্ধ্যাব পৰ বানকপেব সহিত মালিকেব সাক্ষাৎ হইবাব কথা। কাল ভাবীশ্বৰ কন্যাকে লইয়া সেই গ্রামে উপস্থিত হইবেন, সঙ্গে তাহাব পিতা ও উভয়পক্ষীয় দশ পনেবো জন লোক আসিবে। বানকপ উত্তম বেশভূষা কৰিয়া, মনীব প্ৰেৰিত লোকেব প্ৰতীক্ষায় পৰিয়া আছে, এমন সময় গোতান হাওয়া ওকমহাশয় গৃহমৰো প্ৰবিষ্ট হইল।

বান। একি ওকমহাশয়। আপনি এখানে?

গো। আমি তোমাকে তোমাব মনীবেব সঙ্গে সাক্ষাৎ কৰাইতে লইতে আসিয়াছি।

বান। আপনি এখানে কি সত্ৰে আসিয়াছেন?

গো। নিকটেই আমাব একটি ছাত্ৰ আছে আমি তাহাব কাছে আসিয়াছিলান আসিয়া গুলিলাম এখানে তোমাব বিবাহ হইতেছে। আমাব সমস্ত ছাত্ৰেব মৰো। তুমিই সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ পণ্ডিত — আমাব গৰ্বেব সামগ্ৰী। তোমাব বিবাহ আমি দেখিতে আসিব না?

বান। আমাব মনীবেব সহিত আপনাব আলাপ কিসে হইল?

গো। তাঁব স্বামী আমাব ছাত্ৰ।

বান। আমাব মনীব কি স্থানলোক?

গো। ক্ত্রীলোক।

রাম। তাঁহার সঙ্গে কেমন করিয়া দেখা করিব?  
গো। তাঁহার স্বামী নিকটে থাকিবেন।  
গুরুমহাশয়ের সঙ্গে রামরূপ মনীষ-দর্শনে চলিল।

॥ ১২ ॥

বামরূপের বাসা হইতে মনীষের বাড়ি পর্যন্ত সমস্ত পথটা— যে রামরূপকে দেখিল, সেই তাহাকে সম্যক অভিবাদন করিল। মনীষের বাড়ির সম্মুখে সুন্দর বাগান। সেই বাগানের মধ্য দিয়া অট্টালিকা প্রবেশের পথ। পথের দুই ধারে সারি সারি প্রস্তরমূর্তি। মূর্তির পরেই রেলিং। রেলিং-এর পরে পথের উভয় পার্শ্বে শিল্পকার্যময় তৃণগালিচার মধ্যে মধ্যে নানা জাতীয় আলেকথালিখিতবৎ পুষ্পবৃক্ষ। দৃশ্য দেখিয়া বামরূপ মুগ্ধ হইল। ফটকের উভয়পার্শ্বে, পথের মধ্যে স্থানে স্থানে এবং বহির্দ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতলে যাইবার সমস্ত সোপান পথে সুন্দর বেশ পরিয়া অনেক ভূতা দাঁড়াইয়াছিল। রামরূপ যেমন অগ্রসর হইতে লাগিল, অমনি সকলে সসম্মানে সেলাম করিতে লাগিল।

বাপার দেখিয়া রামরূপ বিস্ময়ে যদি আশ্চর্য্য হারা না হইত, তাহা হইলে মুহূর্তেব জনা তাহার মনে হইতে পারিত, —“আমিই এ অট্টালিকার মালিক।”

হাভরা-মহাশয় তাহাকে একটি সুন্দর গৃহের মধ্যে প্রবেশ করাইল, এইখানেই তাহাব মনীষের সহিত সাক্ষাৎ।

মনীষকে দেখিয়াই বিস্মিত যুবকের মাথা ঘুরিয়া গেল। একি আশ্চর্য্য বাপার! “ক্ষমা। তুমি এখানে?”

ক্ষমা। পতি-পরিত্যক্তা এরূপ স্থানে আসিবার যোগ্য না হইলেও ভাগ্যবশে এখানে আসিয়াছি।

রাম। আমি যাঁহার অধীনে চাকুরি করিতেছি, তিনি কই?

এবাবে গুরুমহাশয় ক্ষমার ইহা কথ্য করিলেন। “তিনি তোমার ওই সম্মুখে।”

ক্ষমা ধীরে ধীরে স্বামীর কাছে অগ্রসর হইয়া, তাহার হাতে একতাড়া কাগজ দিল। দিয়া বলিল— “এই সমস্ত দলিলে লিখিত সম্পত্তি আমার ভাবী-সপত্নীকে যৌতুক দিযো।”

রামরূপ দলিলে দৃষ্টিমাত্র নিক্ষেপ না করিয়াই, ক্ষমার পায়ে ধরিতে অগ্রসর হইল। ক্ষমা বুঝিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

রামরূপ বাষ্পগদগদ কণ্ঠে বলিল— ক্ষমা, এ নরাধম স্বামীকে ক্ষমা করিয়া নামেন সার্থকতা রক্ষা কর।

“তুমি ক্ষমার গুরু, তোমার উপর ক্রোধ করিবার ক্ষমার অধিকার কি?”

রামরূপ পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল— “কে আপনি?”

“আমি নির্বাসিত।”

এখন যদি তর্কনিধি আসিয়া রামরূপকে বলিতেন যে— “বৎস রামরূপ, পৃথিবীই ঘুরিতেছে,” তাহা হইলে বৎস রামরূপ বোধ হয় আর শ্বশুরের উপর ক্রোধ করিত না। পৃথিবী ঘোরার কথা রামরূপ কেতাবেই পড়িয়া বিশ্বাস করিয়াছিল; কিন্তু আজ সে গতিশীলা ধরার বিদ্যুৎবেগে আত্মপরিক্রমণ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া চেয়ারে বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল।

হাভরা বলিল— “বৎস রামরূপ! বিদ্যাবূষণ তোমার বয়ঃকোষ্ঠ। চেয়ার হইতে উঠিয়া তাহার পদধূলি গ্রহণ কর।”

ক্ষমা বলিল— “বিধুদাদা, তোমাকে একদিনে অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী করিয়াছেন।”



এখন এই বিদ্যাভূষণের ঐশ্বর্যপ্রাপ্তির ইতিহাসটা না বলিলে গল্পটা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। বিদ্যাভূষণ বাটী হইতে বাহির হইয়া, এক এক্সিকিউটিব ইনজিনিয়ার বাবুর পাচক কার্যে নিযুক্ত হয়। ইনজিনিয়ার বাবু সে সময় আসানসোলার কাছে দামোদারের উপর এক পুল তৈয়ার করিতেছিলেন। বিধুর পড়াশুনাটা সুবিধামত না হইলেও, বাল্যকাল হইতেই স্থাপত্য কার্যে তাহার একটা স্বাভাবিক দক্ষতা ছিল।

একদিন তাহার প্রভু এক সহকারী সাহেবের সঙ্গে মিলিয়া, পুল নির্মাণ কার্যের একটা বিষম সমস্যায় পড়িয়াছিলেন। বিধু সেই সমস্যাটা পূরণ করিয়া দিয়াছিল। সাহেবজাতি ওণগ্রাহী। তদন্তেই তিনি বিধুকে আপনার অধীনে একটা কন্ট্রাক্টারি কাজ দিলেন। আর একদিন সাহেবের অনুরোধে বিধু একটি ঘরের ধ্যান করিয়া সাহেবকে নিজশক্তির পরিচয় দিবার অবকাশ পায়। এই সদাশয় সাহেবের অনুগ্রহে বিধুভূষণ অল্পদিনের মধ্যেই একজন বড় কন্ট্রাক্টর হইয়া পড়িল।

বিধু এইস্থানে কিছু জমি সংগ্রহ করে। ভাগবশে তাহার ভিতরে পাথুরে কয়লার খনি বাহিব হইল। অর্থাৎ ভাগা বছর পাঁচেকের ভিতরেই বিধুকে লক্ষ্যটাকা আয়েব সম্পত্তি করিয়া দিল।

একদিন বিধুর দুই দুইটা কয়লার খনিতে নিত্য প্রায় পাঁচশত টাকার কয়লা উঠিতেছে।

বাটী হইতে বাহির হইয়া বিধু নাম গোপন করিয়াছিল। পাছে গ্রামের লোক জানিতে পারে, এইজন্য সে মাকে পর্যন্ত নিজের সন্ধান দেয় নাই। অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া বিধু অতি অল্পদিন হইল মাকে আনাইয়াছে।

ক্ষমাকে বিধু দশহাজাৰ টাকা আয়েব সম্পত্তি দান করিল। আর গোলাম হাজরা ওরুমহাশয়, পুত্রপৌত্রাদি লইয়া পায়েব উপর পা দিয়া বসিয়া খাইবাব সম্পত্তি প্রাপ্ত হইল।

বলা বাহুল্য, ক্ষমাসুন্দরী, রামকপ, গোলাম হাজরা, বিন্দুবাসিনী প্রভৃতি বহু আয়ীয়ের অনুরোধে, কন্যার বিপন্ন পিতাব মর্যাদা ও কুলবক্ষার্থ, করুণার্দ্ৰ বিধু নবাগত বালিকাকে আপনার পঞ্চবৎসরের উপার্জিত ঐশ্বৰ্যের অধিকারিণী করিয়া লইল।

## ঠানদিদি

নারেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

১

সকলে তাঁহাকে বলিত ঠানদিদি। তা'ছাড়া তার যে অন্য নাম ছিল, তাহা কেহ জানিত কি না সন্দেহ। ঠানদিদি বলিয়া তিনি বড়ী ছিলেন না। বয়স তাঁহাব বছর চমিশ, কিন্তু সমস্ত শরীরে তার একটা নিটোল সৌষ্ঠব ছিল— যাহা দিন-বাত বয়সকে টিটকারী দিত। তা'ব মাথা হইতে পা পর্যন্ত একটা অপূর্ব লাবণ্য ঢলঢল করিত, চক্ষে তাঁহাব বিজলী খেলিত অলঙ্কারহীন সহজ স্থিতি যৌবন তাঁহাকে যেন আগাগোড়া ছাইয়া শোভামণ্ডিত করিয়াছিল। তাঁহাব সৌন্দর্য মিনমিনে ধবনাব নয়, বেশ লম্বা-চওড়া, আগাগোড়া স্পষ্ট ও বৃহৎ, যেন গ্রেট অক্ষবে ছাপা একখানি অপূর্ব কাবাগ্রন্থ।

ঠানদিদি বিধবা, তাই তাঁহার গহনা নাই। তিনি মাছও খান না, সাদা কাপড়ও প্রায় পবেন। ইহা ছাড়া বৈধবোর অপব লক্ষণ তাঁহাব ভিতর নাই। অধবে তাদুলরাগ মাঝে মাঝে তাঁহাব না দেখা যাইত, এমন নহে। একাদশাতে ভাত খাইতেন না, কিন্তু যে ভোজনের আয়োজন হইত তাহাতে অভূতপূর্ব কোনও কাবণ ছিল না। আর সদা সর্বদা তিনি যেমন হাসিয়া গাহিয়া রঙ্গরসে মাতিয়া বেড়াইতেন, তাহা বৈধব্যের সনাতন আদর্শের সঙ্গে মোটেই খাপ খাইত না।

ঠানদিদির নিন্দাব অস্ত ছিল না। সতী-সাপ্ধারা তা'ব নাম করিলে আচমন করিতেন। অসতী বলিয়া তাঁ'ব অপবাদ ছিল— সে ত তুচ্ছ কথা। দু' একজন সেকলে বড়ী ইহাও বটাইয়া ছিলেন যে, তিনি আপন হাতে বিষ দিয়া স্বামীকে বধ করিয়াছেন। সে সম্বন্ধে ঠিক খবরটা কেহ বলিতে পারিত না, কেন না, সে বিষ বছরের কথা - আর তা'ব স্বামীর মৃত্যু ইহাছিল দূর্বদেশে তাঁ'ব কর্মস্থানে। এখন ঠানদিদি থাকেন পাড়াপায়ে।

এত বড় পাপিষ্ঠাকে কিন্তু গায়েব নোকে যে ঘৃণা করে, সে কথা তাহাদের বাবহাব দেখিয়া কেহ বুঝিতে পারিত না। ঠাকুবাবের দুষাবের কাছে তিনি আসিলে সবাই কোনও না কোনও অভিনায় তাঁহাকে অনাত্র পাঠাইয়া দিত, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কেহ বলিত না - ভূমি এখানে আসিও না। কোনও বাড়িতে নিমন্ত্রণেব বায়া বান্ধিতে কেহ তাঁহাকে ডাকিত না, কিন্তু মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে হইলে তাঁহাব সব বাড়িতেই ডাক পড়িত, কারণ, এই নিভৃত পল্লীতে কেহ তাঁ'ব মত নানা একমেব খাবাব তৈয়ার করিতে জানিত না। আর ঠাকুবাবা যাহাতে হাত দিতেন, তাহাই শোভন সুন্দর অমৃতত্বলা হইয়া উঠিত। সকল লোক শিল্পে তাঁহার বিশেষ দখল ছিল বলিয়া বালিকা হইতে বৃদ্ধা পর্যন্ত সকলে তাঁহাব শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। বোগে তার মত সৌবকা গ্রামে কেন দেশে কোথাও ছিল না। পাশ-কবা শুশ্রূষাকারিণী তাঁ'র কাছে লাগে না।

ঠানদিদি মিষ্টভাষিনী, পবোপকারিণী। তিনি বিশ বছর আগে যে দিন বিধবা হইয়া আঁবপুর গ্রামে পা দিয়াছিলেন, সে দিন হইতে তাঁহার জীবনের প্রতিমুহূর্ত কেবল দশভনেব

কাজে ব্যয় হইয়াছে। নিজের তাঁহার কিছু করিবার ছিল না, তবে সকলের সব কাজ সারিয়াও রোজ নিজের আহাবের পারিপাট্যের দিকে তিনি বিশেষ দৃষ্টি দিতেন। ব্রত উপবাস নিয়ম তিনি করিতেন না। কোনও ঠাকুরের কাছে তাঁহাকে কেউ গড় হইতে দেখে নাই, নিজেও দাক্ষা লন নাই।

এমন একটি অদ্ভুত মেয়েমানুষ যখন প্রথম গাঁয়ে আসিয়া বাসিল, তখন গ্রামের আবালবৃদ্ধ-বনিতা তাঁহার উপর মহা ক্ষিপ্ত। কিন্তু আশ্চর্য এই স্থিলোকটির ক্ষমতা। বৎসর না ফিরিতে সে সকলকে বশ করিয়া ফেলিল। বৃদ্ধ সুদর্শন ভট্টাচার্য একদিন তা'কে যা' নয় তাই বলিয়া গালি দিল, তা'র ঠাকুরদালান হইতে বিদায় করিয়া দিল। ঠানদিদি হাসিয়া বামা দাসীকে বলিলেন, “ঠাকুর বলেছেন ঠিক; দেবতাদের সঙ্গে আমার যে আদা-কাঁচকলা সম্পর্ক, তাঁ'তে ওঁদের ওদিকে আমার না খেঁষাই ভাল।” চন্দ্রবর্তী মহাশয়ের পত্নী প্রথম সাক্ষাতে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন, ঠানদিদি হাসিয়া বলিলেন, “দিদি, শেয়াল-কুকুরকে কি চোখ দিয়েও দেখতে নেই, নেহাৎ দু'ঘা মারতেও ওঁ দেখতে হয়।” মোটের উপর, কড়া কথা বা কটু ব্যবহার ধূল্যব মত ঝাড়িয়া ফেলিয়া তাঁ'র হাসিভাব মুখ ও বুকভাব সেবার অকাঙ্ক্ষা লইয়া যখন তিনি তাঁদের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন কেহ তাঁহাকে আব ঠেলিয়া রাখিতে পারিল না।

২

আমাব বিবাহ হইবার পূর্বে ঠানদিদি হইলেন আমাব প্রধান সখী। তিনি আমার মায়ের বয়সী, কিন্তু তার সঙ্গে সমানভাবে মিশিয়া হাস্য-পরিহাস করিতে আমাব কোনও দিন একটুকু দ্বিধা হয় নাই, বরং শৃঙখলাভির সঙ্কেচটা তাঁহার সহৃদয়-স্পর্শেই আমার কাটিয়াছিল। তিনি আমাব সহিত বহুসা করিতেন, কিন্তু ঠানদিদি সম্পর্কের আর দশজনের মত ছেবানামী বস। তাঁ'র অভ্যাস ছিল না। তাঁহার কথাবার্তা'র লঘুত্ব ভিত্তব এমন একটা আত্ম মাধুরী ছিল যে, সে কথায় মন পাওলা হইত, কিন্তু তাহাতে মন্য লাগত না, ক্রান্তি আসিত না।

কালে কালে আমি ঠানদিদির একেবারে অন্ধ উপাসক হইয়া পড়িলাম। তিনি আমার সখী ও সহচরীও বটে। আব আমাব সব বিষয়ের ওরও বটে, এমন কোনও কথা ছিল না – যা'তে তাঁ'র কথা বেদবাক্যের মত না মানিলাম। তাঁ'র চরিত্রের সঙ্গে তাঁ'র বিধবার অযোগ্য অনাচার আমি কিছুতেই মিলাইতে পারতাম না। একদিন পান সাংসাতে বসিয়াছি, তাকে একটা সাজিয়া দিলাম, তিনি খাছিলেন। আমি বলিলাম, “ঠানদি, তুমি পান খাও কেন?”

“ম'ব পোডাবমুখী, একটা পান খাঁদ বা হাতে ডুলে দিলি, তার আবার খেঁটা দিচ্ছিস্?” বলিয়া দ্বিধা হাস্যময় সুন্দর চক্ষু আমাব মুখে উপব রাখিলেন।

আমি বলিলাম, “ব'দ বাখ ঠানদি, আর তোমায় আমি ছাড়ছি না। তোমায় বলতেই হবে, তুমি এ সব অনাচার কর কেন?”

“যা কবতে নেই, তা' করলে কি হয়?”

“পাপ হয়।”

“পাপ করলে কি হয়?”

“কে জানে কি হয়, পাপ কবতে নেই, তাই জানি।”

“আমি জানি, পাপ করলে এরকম যায়, সেখানে খুব শাস্তি পায়।”

“এ কথা তুমি মান?”

“হাঁ, আবও মানি যে, বিধবা খাঁদ আচার নিয়ম মেনে, দেব দ্বিষ্টে ভক্তি রেখে, সমস্ত জীবন কঠোর ব্রহ্মচর্য করে, তবে তার পুণ্য হয়, সে স্বর্গে যায়, অনন্তকাল স্বামীর সহবাস করে।”

ঠানদিদির মুখে হাসিটা যেন একটু ঘোর হইয়া উঠিল।

আমি অবাক হইলাম, বলিলাম, “এত যদি মান, তবে নিষ্ঠা আচার-নিয়ম কর না কেন?”

“আমি স্বর্গে যেতে চাই নে বলে, আর স্বামীর ঘাড়ে আর চাপতে চাইনে বলে, নরকে পড়তে চাই বলে,—বুঝলি?”—বলিয়া ঠানদি আবার হাসিলেন।

আমি বলিলাম, “আবার ঠাট্টা? আজ তোমায় সভ্যকথা বলতেই হবে।”

“ঠাট্টা নয় দিদি, খাঁটি সত্য।”— ঠানদিদির চোখটা একটু ভরিয়া উঠিল।

এমন সময় আমার ছয় মাসের খোকাটি আসিয়া কখন পানের থালাটি ধরিয়া টান মারিয়াছে, আমি দেখিতে পাই নাই। দেখিতে দেখিতে সব ক’টি পান মাটিতে পড়িয়া গেল। আমি খোকার পিঠে একটা চড় মারিয়া বলিলাম, “মরণ হয় না, মুখপোড়া!”

ঠানদিদি অমনি “ষাট ষাট” বলিয়া ছেলেটিকে কোলে তুলিয়া লইলেন। মহাবাত্ত হইয়া তাহার মাথা হইতে পা পর্যন্ত হাত ব্লাইতে লাগিলেন। আমাকে বলিলেন, “বিমলা, এমন কাজটি আর করিস্ না, ভুলেও স্বপ্নেও যেন এমন অলক্ষণে কথা মনেও আনিস না, মুখেও আনিস না।”

আমার প্রাণে তখন বড় অনুশোচনা হইতেছিল, কিন্তু বলিলাম, “সাধে কি বলি ঠানদি, দেখ দিকিন্ পানগুলো কি করে দিলে?”

“হাঁরে পোড়ারমুখী, তুই তো কথাটা বলে দিয়েই খালাস, কথাটা গিয়ে কোন দেবতার কানে উঠে, মনে গাঁথা রইল, সে খবর তো তুই রাখিস না। ষাট ষাট বাছা ষাট ষাট।” ঠানদিদির চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

আমি কিছুক্ষণ কথা কহিলাম না, মনে মনে ঠাকুরদেবতার কাছে মাথা কুটিলাম, আমার বাছার যেন অকল্যাণ না হয়। অনেকক্ষণ দুজনে চুপ করিয়া রহিলাম, আকাশ-পাতাল কত কি ভাবিলাম, শেষে আমি বলিলাম, “হ্যাঁ ঠানদিদি, দেবতারা কি মানুষের কথা শুনে? তবে মানুষ যে দিন-রাত এত মানত করছে, কই, কার কি হচ্ছে?”

ঠানদিদি চোখেব জল মুছিতে মুছিতে গভীরভাবে বলিলেন “হ্যাঁ, তাঁরা মানুষের কথা শোনে, বাখেনও, কিন্তু সে কেবল তাদের শাস্তি দেবার জন্য। আমার মনের একটা বড় গোপন কথা শুনে তাঁরা আমায় কি শাস্তিই দিয়েছেন!”

ঠানদিদি দীর্ঘনিশ্বাস তাগ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, “দেখ বিমলা, তুই আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলি, আমি অনাচাবী কেন? সে কথা তোকে খুলে বলবো। কথা শুনলেই বুঝতে পারবি, ভগবান কেমন করে আমাদের কথা রাখেন?”

ঠানদিদি তাঁর জীবন-কাহিনী বলিলেন।

৩

### ঠানদিদির কথা

আমি যৌবনে বড় সুন্দরী ছিলাম। আমার স্বামীও পরম সুপুরুষ ছিলেন। স্বামী মজঃফরপুরে বড় চাকরী করতেন, তাঁর বিদ্যাবুদ্ধির বিশেষ খ্যাতি ছিল, মেয়েমহলে আমার খ্যাতি তাঁর চেয়ে কম ছিল না।

স্বামী আমাকে যেমন ভালবাসিতেন, তেমন বুঝি কোনও স্বামী কখনও কোনও স্ত্রীকে বাসেনি। আমিও তাঁকে খুব ভালবাসিতাম। সারাদিনরাত্রি আমার সব কাজ, সব চিন্তা কেবল আমার স্বামীকে খিরিয়া থাকিত। তিনি সে কথা জানিতেন, আর আমার ছোট ছোট সেবা ও ছোট ছোট কথায় যে চরিতার্থতা তাঁহার মুখে ফুটিয়া তাহাতে আমার হৃদয় গর্বে ফুলিয়া উঠিত। ভাবিতাম, আমার মত ভাগ্যবতী পৃথিবীতে আর আছে কি?

আমার বয়স যখন উনিশ, তখন আমার স্বামীর বয়স পঁচিশ। সেই সময় তাঁর একটা পদোন্নতি হইল, কাজও অনেক বাড়িয়া গেল। আগে যেমন দিন-রাত তাঁহাকে আমার কাছে পাইতাম, এখন আর তাঁহাকে তেমন পাই না। বাড়িতেও তিনি সদাসর্বদা কাজে এত ব্যস্ত থাকিতেন যে, তাঁহার সহিত কথাবার্তা ঘটিয়া উঠিত না।

এই সময় একদিন আমি জানালার ধারে বসিয়া আছি, দূরে রাস্তা দিয়া একটা নীলকর সাহেব যাইতেছে। এমন সময় স্বামী পিছনদিক্ হইতে আসিয়া বলিলেন, “কি গো সতি, এমন করে বুঝি বিরহ্যাপন করছ?”

আমি হাসিয়া বলিলাম, “কি রকম?” অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহাকে পাইয়া আমার সমস্ত শিরায় শিরায় নাচন উঠিয়াছিল, সে কথা তাঁর কাছে গোপন রাখিতে পারিলাম না।

তিনি বলিলেন, “বলি, ডেভিড সাহেবের সহিত কি প্রেমলাপ হইছিল?” বলিয়া তিনি আমার চিবুক টিপিয়া ধরিলেন।

“যাও” বলিয়া আমি মহা লাগ কঁবিয়া সবিয়া গেলাম। তিনি গলবস্ত্র হইয়া বলিলেন, “মাফ কিডয়ে মেন সাব, গোস্তাকী কিয়া।”

আমি হাসিয়া বলিলাম, “মাফ কবা গেল, কিন্তু এমন গোস্তাকী যেন আর না হয়।” কিন্তু এমন গোস্তাকী তাঁর প্রায় হইত।

এমন সময় আমার পিসতুতো দেবর শচীকান্ত আমাদের বাড়িতে আসিয়া উঠিল। সে তখন এম. এ. পড়িতেছে, শরীর কিছু খাপ হওয়ায় সে মঙ্গলবারপরে হাওয়া খাইতে আসিয়াছে। শচীকান্তের বয়স তখন একুশ, বাইশ। সুন্দর না হইলেও তাহার শরীরে সৌষ্ঠব ছিল, আর চক্ষু দুটি তা’র এক অপূর্ব প্রতিভাব আলোকে উজ্জ্বল ছিল। কথাবার্তায় সে অদ্বিতীয়। তা’র কথায় ও তা’র ভাবভঙ্গিতে এমন একটা মিষ্ট মোহের সৃষ্টি করিত যে, একবার বসিলে আর তা’র কথা ফেলিয়া কেহ উঠতে পারিত না।

শচীকান্ত হইল আমার অবসরের সঙ্গী, কর্মে সহচর। দিন-রাত সে কাছে কাছে থাকিত, দিন রাত তা’র মধুর কথা শুনিতাম, শুনিয়া তৃপ্ত হইত না।

একদিন দুপুরবেলায় আমাদের বাংলাব বাবান্দায় বসিয়া আমি জামা সেলাই করিতেছি, শচীকান্ত একখানি বই লইয়া বসিয়াছে। বই কোলে রাখিয়া শচী গল্প করিতে লাগিল, আমিও সেলাই কোলে রাখিয়া শুনিতে ও মাঝে মাঝে সায় দিতে লাগিলাম। বেলা তিনটা বাড়িয়া গেল, তাহাও পড়া অগ্রসব হইল না, আমার সেলাইও যেমন তেমন রহিল।

এমন সময় আমার স্বামী হঠাৎ অফিস হইতে ফিরিয়া আসিলেন। আমি অনামনস্বভাবে তাঁহা’র দিকে চাহিয়া বলিলাম, “বি. গো, এত শীগগির ফিরে এলে?”

“বড্ড মাথা ধবেছে” বলিয়া তিনি যবেব ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন। সে দিকে আমার মোটেই মন ছিল না বলিয়া সে কথা আমার কানেই গেল না। আমি শচীকান্তের কথা শুনিতে লাগিলাম। খানিক পরে তা’র কথাটা শেষ হইলে ঘরে গিয়া দেখিলাম, আমার স্বামী মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছেন।

আমি ব্যস্ত হইয়া বলিলাম, “বড্ড মাথা ধ’রেছে কি?” ঘরে আসিয়াই আমি অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিলাম; বুঝিয়াছিলাম যে, আমার বড় ভ্রুটি হইয়াছে,— তাঁর পিছু পিছু ঘরে না আসায়। তাঁর মাথার যন্ত্রণা আমার সেবার মত অন্য কোনও উপায়ে আরাম হইত না।

স্বামী গম্ভীরভাবে বলিলেন, “না—যাও।”

আমার নুকে’র ভিতর দুড়-দুড় কঁবিয়া উঠিল। আমি আর কথা কহিতে পারিলাম না। এক গ্লাস জলে ওডিকোলন ঢালিয়া আমি বলিলাম, “এসো, মাথাটা ধুইয়ে দিয়ে বাতাস করি।”

তিনি কিছু না বলিয়া আমার হাত হইতে গ্লাসটা লইয়া মাথা ধুইয়া ফেলিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। আমি নিতান্ত অপরাধীর মত চূপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম, আমার বুক স্টেলিয়া কি-য়েন-একটা উঠিতে লাগিল। খানিক বাদে আমি নিঃশব্দে পাখা লইয়া স্বামীর শিয়বে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিলাম। স্বামী কিছু বলিলেন না।

শটীকান্ত আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “দাদা, তোমার কি অসুখ ক’বেছে?”

স্বামীর মুখে একটা বিরক্তির চিহ্ন দেখিতে পাইলাম, কিন্তু তিনি চূপ করিয়া চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া রহিলেন। আমি শটীকান্তকে ইঙ্গিত করিয়া কথা কহিতে বারণ করিয়া সরিয়া যাইতে বলিলাম। তাহার মুখ হইতে মুখ ফিরাইয়া আমি দেখিলাম, স্বামী আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। আমি চাহিতেই চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। আমি বুঝিলাম, আমার মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিল, বুকের ভিতর কাঁপিতে লাগিল।

স্বামী ঘুমাইয়া পড়িলেন, আমি পাখা রাখিয়া আস্তে আস্তে বারান্দায় উঠিয়া গেলাম। সেখানে শটীকান্ত একথানা তন্তুপোষের উপর ব্রু কুণ্ডিত করিয়া বসিয়া কি যেন ভাবিতেছে।

আমি গিয়া বসিতেই তাহার মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল। তাহাতে আমার বুকের ভিতর যেন কেমন করিয়া উঠিল। আমি যেন একটু কাঁপিতে লাগিলাম। আস্তে আস্তে গিয়া সেই তন্তুপোষের উপরে বসিয়া পড়িলাম।

তার পর ক্রমে একথা ওকথা হইতে হইতে আমার সঙ্কুচিত ভাবটা কাটিয়া গেল, শটীকান্ত তাহার সেই প্রাণপশর্শী ভাবে কথা কহিতে আরম্ভ করিল, আমি আগ্রহের সহিত মস্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শুনিতে লাগিলাম। কথাটা অতি তুচ্ছ, তাহাদের কলেজের কোন প্রফেসরের বকেমন হাস্যকর বিশেষত্ব আছে, তাই সে বর্ণনা করিতেছিল। কিন্তু সে কথাগুলি এমন সরল কবিতা বলিত হাব তার গলার আওয়াজ এত আশ্চর্য মিষ্ট ছিল যে, যত তুচ্ছ কথা হোক না কেন, কান পাতিয়া শোনা ছাড়া উপায় ছিল না।

এমন করিয়া কতক্ষণ গেল, বুঝিতে পারিলাম না। যখন প্রায় সূর্যাস্ত হইতেছে, এমন সময় শটীকান্ত বলিল, “বৌদি, খালি কি কথা খাইয়েই আমায় রাখবে না কি? খাবার দাও।” আমি লজ্জিত হইয়া একটু হাসিয়া উঠিলাম। দেখিলাম, শটী একাগ্রচিত্তে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। আমার কান পর্যন্ত লাল হইয়া উঠিল, আমি লজ্জিত নবনবধুর মত ঈষৎ হাসিয়া চলিয়া গেলাম।

মিথ্যাকথা কহিব না। শটীর চোখের ভাষা আমি বুঝিয়াছিলাম। তাহাতে রাগ কবাই উচিত ছিল, কিন্তু আমি পোড়ারমুখী—তাহার উপর রাগ হইল না, লজ্জা পাইয়া আমি তাহার হৃদযেব কৃষ্ণা বাড়াইয়া দিলাম, হয় তো বা আশাও দিলাম।

ঘরের ভিতর আসিতেই দারুণ বেদনা অনুভব করিলাম। আমার চরিত্রের দুর্বলতা দেখিয়া নিজেকে শত শত ধিকার দিতে লাগিলাম। আমার কান্না পাইতে লাগিল। কেবল মনে হইতে লাগিল, শটী আমাদের এখানে আসিল কেন?

আকাশপাতাল ভাবিতে ভাবিতে খাবাবের থালা লইয়া শটীকান্তকে দিতে গেলাম, এবার আশ্চর্যের জন্য প্রস্তুত হইয়াই গেলাম—আর তাহাকে প্রশ্ন দেওয়া চলে না। আমি গম্ভীরভাবে খাবারের থালাটি রাখিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে সে বলিল, “ওরে বাপ রে, এ যে গন্ধমাদন পর্বত, এতগুলো আমি খাব কি কবে?”

আমি বলিলাম, “তার মানে আমি হনুমান? বলি, এমন কত গন্ধমাদন তোমার পেটে বোজ কতটা যায়, খবর রাখ কি?”

হায়, কোথায় গেল আমার গাম্ভীর্য, কোথায় গেল আমার আশ্চর্য্যকর আয়োজন!

সে বলিল, কিছুতেই সে এতগুলো খাইতে পারিবে না, এবং ধরিয়া বসিল, আমাকে তাহার সঙ্গে খাইতেই হইবে। আমি তাহার পীড়াপীড়ি এড়াইতে পারিলাম না। আমার এমন একটা অবস্থা হইয়াছিল যে, সে কিছু জোব করিয়া ধরিলে আমি “না” বলিতে পারিতাম না। নিতান্ত পীড়াপীড়িতে আমি একটা মিষ্টি তুলিয়া খাইলাম। সে বলিল, “ওতে হবে না, এই পানতুয়াটা নিতে হবে।” আমি অস্বীকার করায় সে আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া পানতুয়াটা হাতে গুজিয়া দিল। আমার শিরার ভিতর রক্ত হঠাৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল।

ঠিক সেই সময় স্বামী আসিয়া সম্মুখ দিয়া বারান্দায় ঢুকিলেন। আমার সমস্ত শরীর একবার যেন কাঁপিয়া উঠিল, তাহার মুখের দিতে চাহিতে সাহস হইল না।

তিনি যে কখন বিছানা হইতে উঠিয়া ভিতরের দিক দিয়া বাগানে বাহির হইয়া গিয়াছেন এবং কতক্ষণ যে সেখানে পায়চারী করিয়া আসিয়াছেন, তাহার আমি কোনও খবর রাখি নাই। খাবার আনিবার সময় ঘরে গিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তখন আমি এত তন্ময় হইয়াছিলাম যে, তাহার কথা মনেই হয় নাই এবং তিনি বিছানায় আছেন কি না, লক্ষ্য করি নাই।

আমি অত্যন্ত সঙ্কচিতভাবে ভাঙ্গা গলায় বহু কষ্টে বুকুর কাঁপুনি চাপিয়া বলিলাম, “কখন উঠলে তুমি?”

স্বামী হাসিয়া বলিলেন, “সে খবর নেবার তো অবসর হয়নি, দেওরটি নিয়েই বাস্ত আছ।” তার মুখ প্রশান্ত, কিন্তু যেন একটা ক্ষীণ বিষাদের ছায়ায় আবৃত।

এ কথায় আমি অসম্ভব লাল হইয়া উঠিলাম, পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত ভিতরে ভিতরে কাঁপিতে লাগিল। সর্বাস্থ যেন ঘামিয়া উঠল। ডেভিড সাহেবের কথায় তো কখনও এমন হয় নাই।

শটাকাস্তে যেন কেমন একটু অপ্রস্তুতভাবে খাবার খাইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, আমি কথঞ্চিৎ আত্মসংবরণ করিয়া বলিলাম, “মাথাটা ছেড়েছে কি?”

স্বামী বলিলেন, “হাঁ অনেকটা।”

আমি বলিলাম, “খাবার দেব কি?”

স্বামী হাসিয়া উত্তর করিলেন, “আমার কি আর খাবার দবকাব আছে? তোমাদের তো হয়ে গেল দেখছি। আমার তো একবার খবরও কবলে না?”

তাঁহার কথার ভাবে আমার মনের সঙ্কোচ অনেকটা কাটিয়া গেল। আমি তাড়াতাড়ি গিয়া তাঁর খাবার আনিয়া দিলাম এবং চা কবিয়া দিলাম। তাবপর কথায়-বার্তায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল, আমার মন অনেকটা পাতলা হইয়া আসিল।

8

রাত্রে শুইয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। আজকের ঘটনায় আমার স্পষ্ট জ্ঞান হইল যে, আমি একটা প্রবল শ্রোতে ভাসিয়া ছুটিয়াছি—এই শটীকাস্তের দিকে। আমার হৃদয় যে কত দূর চঞ্চল হইয়াছে, কি এক বিষম নেশায় আমাকে পাগল কবিয়া তুলিয়াছে, তাহা নিজের মনেব কাছে গোপন করিতে পারিলাম না। আমি মনে মনে নিজেকে তিব্বন্ধার কবিতো চেষ্টা করিলাম, কিন্তু মনের ভিতর সে তিব্বন্ধার পৌছিল না, শটীকাস্তের কথামাত্র প্রাণের ভিতর এমন একটা পুলকের ঢেউ উঠিল, তার সামনে সব যেন ভাসাইয়া লইয়া চলিল। ভগবানকে ডাকিয়া বলিলাম, “আমায এ বিপদ হইতে রক্ষা কর।” কিন্তু সে কথা মুখেই বহিল, প্রাণের ভিতর যে প্রাণ, সে বলিল, “এ সুখের নেশা যেন ভাঙ্গে না!” আপনার ভিতর এ বিরোধ লইয়া আমি পব পর সুখ ও দুঃখের বেদনায় একেবারে চুবমান হইবাব মত হইলাম। শেষে আমার সপ্ত স্বামীর পা দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলাম, কাঁদিতে

কাঁদিতে ঘুমাওয়া পড়িলাম। কাঁদিলাম দুঃখে—নিজের ভিতরকার এই যুদ্ধের অসহনীয় বেদনায়! কাঁদিলাম,—আমি ভাল হইতে চাহিতে পাবিলাম না বলিয়া! আর কাঁদিলাম সত্য দুঃখে,—আমার স্বামীর হৃদয়ের জ্বালা অনুভব করিয়া। বেচারার সমস্ত জীবন আমার হাতে সমর্পণ করিয়াছে, আমার বই কিছু জানে না, তার প্রাণে এ সন্দেহের বেদনা কি নিদারুণ, তাই ভাবিয়া কাঁদিলাম। আমার পোড়ার মুখ, আমি তার এ বেদনার কেন সৃষ্টি করিলাম।

কতক্ষণ এমনি করিয়া শুইয়াছিলাম জানি না। জাগিয়া দেখিলাম, স্বামী আমার মাথা বুকেব কাছে টানিয়া লইয়াছেন, তাঁহার বুক প্রবলবেগে আন্দোলিত হইতেছে। আমি জাগিতেই তিনি বলিলেন, “তোমার উপর আমি বড় অবিচার করিয়াছি! তোমার ভালবাসায় এক মুহূর্তের জন্যও সন্দেহ করিয়াছি। এটা বড় নিষ্ঠুরের কাজ হইয়াছে। তুমি আমায় ক্ষমা কর।”

আমি আমার কালানুখ তাঁর বুকের ভিতর লুকাইলাম।

পবদিন সকালে উঠিয়া আবার সেই সব কথা ভাবিতে লাগিলাম। আমার উঠিতে কিছু দেরী হইয়াছিল, স্বামী তখন শয্যা ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আমি বিছানায় বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম।

পূর্বব্যস্তের সে অনুশোচনার তীব্রতা এখন যেন আশ্চর্যরকম কাটিয়া গেল, বরং আমার মনশ্চাক্ষুর স্বপক্ষে নানা ওজর খুঁজিতে লাগিলাম। স্বামীর সন্দেহটা দূর হইয়াছে, তাহাতে অপূর্ব আনন্দপ্রসাদ লাভ করিলাম। মনটা আবার কেমন ভয়ানক চঞ্চল হইয়া উঠিল।

বিছানা হইতে উঠিয়া মুখ-হাত ধুইয়া খাবার করিতে গেলাম, চা’ করিলাম—সব অনামনস্বভাবে! আমার মনের ভিতর কেবল এক অপূর্ব মধুর সুর বাজিতেছিল। মাঝে মাঝে মনে হইতেছিল, এটা অন্যায়, কিন্তু তখন সে চিন্তাকে সরাইয়া দিয়া শাবাব মনোব আবেগ আপন পাথে ছুটিয়া চলিতে লাগিল, আমি সম্পূর্ণরূপে আনন্দহারা হইলাম। ক্রমে শটীকাস্ত কাছে আসিয়া জটিল, আমি সকল চিন্তা, সকল দুঃখ ভুলিয়া তাহা প্ৰীতি সাগরে হাবডুবু খাইতে লাগিলাম। আমাদের কথাবার্তা সবই অত্যন্ত তুচ্ছ বিষয়। কিন্তু আমি বুঝিলাম, তাহার মনের ভিতর কিসেব ডেউ খেলিয়া এই সব তুচ্ছ কথাব ভিতর দিয়া আপনার বসেব ধাবা মিলাইতেছে। সেও যে আমার মনোব কথা বুঝিল, তাহাতেও আমার কোনও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তবু আমাদের ভিতর সুধু একটা চোখেব পর্দাব অস্তবাল বহিয়া গেল।

আমার স্বামীর নিকট হইতে আমার মন যে কখন অলক্ষিতে সরিয়া গেল, তাহা আমি বুঝিতে পাবিলাম না, কিন্তু কিছুদিন নাথোই দেখিলাম, স্বামীর সঙ্গে আমার কাছে প্ৰীতিকর হওয়া দূরে থাকুক, যতক্ষণ তাঁহার কাছে থাকিতে হইত, ততক্ষণ যেন একটা বোঝা খাড়ে চাপিয়া থাকিত, তাঁহার নিকট হইতে মুক্তি পাইলে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিতাম। মাঝে মাঝে এমন কি, তাকে একটা আপদ বলিয়া মনে হইত। যখন আমরা দুজনে—আমি আব শটীকাস্ত বসিয়া বেশ গল্প শুনাইয়া লইয়াছি, সে সময় যদি তিনি আসিয়া বসিতেন বা আমাকে ডাকিতেন, তবে আমার মনটা যেন বিষ হইয়া উঠিত, মনে হইত, আপদ গেলে বাঁচি। কথটা মনে হইলেই কর্তব্যাবুদ্ধি বাধা দিত, মনে মনে বলিতাম, বড় অন্যায় করিতেছি! কিন্তু কর্তব্যাবুদ্ধির উপদ্রবটা ক্রমশঃই বেশি গা-সওয়া হইয়া উঠিতেছিল।

ইহার পর হইতে আমার স্বামীর মাথা-ধরাটা বড়ই বাড়িয়া উঠিল। প্রায়ই তিনি অফিস হইতে অসময়ে মাথা গরিয়া বাড়ি ফিরিতে লাগিলেন। আমি মনে মনে স্থির বুঝিলাম যে, ইহা কেবল আমাকে জ্বল কবিরাব ফন্দি, অসময়ে হঠাৎ বাড়ি আসিয়া দেখিতে চান, আমি আব শটীকাস্ত কি করিতেছি। এ কথা ভাবিতে আমার বড় রাগ হইত! এত অবিশ্বাস! আমি করিয়াছি কি? শটীকাস্তের সঙ্গে আমার সম্বন্ধে যে কিছুমাত্র অন্যায় কিছু আছে। এ সময়



আমি তাহা মনের কাছে কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহিতাম না, কেবল দিন-রাত নিজের কাছে নিজের সাফাই গাহিতাম, আর মনকে বুঝাইতাম, যে আমি কোনও দোষ করি নাই, আমাব স্বামীরই অনায়াস সন্দেহ!

দোষ আমার শরীর স্পর্শ করে নাই, কিন্তু আমার অন্তর যে স্বামীর নিকট সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী এবং শটীকান্তের উপর অনুরক্ত, এ কথা তখন ভাল করিয়া স্বীকার করিতে চাহিতাম না।

আমাব আরও রাগ হইত আমার অদৃষ্টের উপর। আমি কোনও দোষ করি নাই, কিন্তু এমন অদৃষ্টের ফের যে, যখন হঠাৎ আমার স্বামী আসিয়া পড়িতেন, ঠিক সেই সময়ই তিনি আমাদিগকে এমন একটা অবস্থায় দেখিতেন—যাহাতে হঠাৎ লোকে সন্দেহ করিতে পারে। একদিন আমরা বাগানে বেড়াইতেছি, শটী আমার পশ্চাতে পশ্চাতে কপিফেরের খাইল দিয়া হাঁটিয়া আসিতেছে। হঠাৎ আমি পা হড়কাইয়া পড়িবার মত হইলে শটী পিছন হইতে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া ফেলিল, “আমার চুল খুলিয়া তাহার পিঠের উপর দিয়া ঝুলিয়া পড়িল। আমি সামলাইয়া উঠিয়া দেখিলাম, আমার স্বামী ঠিক তখন অফিস হইতে ফিবিয়া আসিলেন। আমাব সহিত দেখাদেখি হইতেই মুখ ফিবিয়া গম্ভীরভাবে চলিয়া গেলেন। আব একদিন আমরা পাশাপাশি দুইখানা চেযাবে বসিয়া কথা কহিতেছি, একটা মশা আসিয়া আমার চোখের পাশে বসিল, শটী যেই মশাটা মাঝিবার জন্য একটা থালায় দিয়াছে, অমনি স্বামী আঁতঃ উপস্থিত। আমবা দুজনেই মঃ অপ্রস্তুত হইয়া ভেবাচেকা খাইয়া গেলাম। শটী বলিল, “পারলাম না, মশাটা উড়ে গেল।” কথাটা সত্য হইলেও কেমন ফাঁকা ফাঁকা শুনিল—যেন একটা বাঃঃ ওজব। এমনি প্রায় রোজ একটা-না-একটা কিছু হইত—যা বাস্তবিক একটু দোষের নয়, কিন্তু যা দেখিয়া স্বামী নিশ্চয় একটা ভয়ানক অনায়াস কিছু মনে কবিতেন। আব তাতে আমরা দুজনেই সাহায্য করিতাম,—আমাদের ব্যবহার দ্বারা। এই রকম অবস্থায় স্বামী আমাদের দেখিলেই দুজনেই যেন কেমনতর হইয়া যাইতাম—মুখ, চোখ, কান লাল হইয়া উঠিত, হয় তো এমন একটা কথা, এমন একটা অযাচিত ব্যাখ্যা দিতাম, যাহাতে সন্দেহ বাড়িত বই কমিত না।

আসল কথা এই যে, আমরা তিন জনেই পরস্পরের মনের ভাব খুব স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়াছিলাম, কিন্তু যেন বুঝি নাই, এমনি ভান কবিয়া সবাই সবার সঙ্গে লুকোচুরি খেলিতেছিলাম—তাই আমাদের এ বিপত্তি।

আমার যে অনুশোচনা না হইত, এমন নহে, কখনও কখনও নিরিবিলিতে কাঁদিয়া চক্ষু ভাসাইতাম; কিন্তু এই সকল সময়ে যখন স্বামীর অভিযোগপূর্ণ দৃষ্টি দেখিতাম, তখন যেন আমার হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। মনকে কেবলি বুঝাইতাম, তিনি আমাকে অনায়াসরূপে সন্দেহ করিতেছেন। হৃদয় তাঁহার উপর বিযাক্ত হইয়া উঠিত; এক এক সময় মনে হইত, যে আমার উপর এমন অনায়াস সন্দেহ করে, এক মুহূর্তও আর তাঁহার সহিত যেন বাস করিতে না হয়।

একদিন আমি বাড়ির ভিতর কাজ সারিয়া বাবান্দায় আসিতেছি, দ্বারের কাছে আসিয়া শুনিতে পাইলাম, দুই ভাইয়ে কি কথা হইতেছে। আমি অগ্রসর না হইয়া কান পাতিয়া রহিলাম। কথা হইতেছিল—শটীকান্তের পড়া-শুনা সম্বন্ধে। স্বামী বলিলেন, “তোরা আব এবার একজামিন দেওয়া হবে না। এখানে থেকে যা পড়ছিস, তাতে তো থার্ড ক্লাশও হইবার সম্ভাবনা নাই।”

শটীকান্ত কতকটা বিরত, কতকটা উত্তপ্ত হইয়া উত্তর কবিল, “এ পর্যন্ত তো কোনও একজামিনে ফাস্ট ক্লাশের নীচে হইনি, একটু দেখই না, এবার কি হয়, তাব পর বলো।”

স্বামী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “আচ্ছা, দেখা যাক।” তার পর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, একটু কাসিয়া বলিলেন, “আমি বলি, এই সময় একটু চেষ্টা চরিত্র কর। কলকাতায় গিয়ে এ দু’মাস প’ড়ে যাতে ভাল হতে পারিস্ তা’র চেষ্টা দেখ।”

কথাটা শুনিয়া আমার পা হইতে মাথা পর্যন্ত জুলিয়া উঠিল। আমি বুঝিলাম, শটীকান্তকে কলিকাতায় পাঠাইবার গরজের কারণ আমি। পড়া-শুনায় শটীকান্ত খারাপ হইতে পারে, এ কল্পনাও আমার কখনও আসে নাই, কাজেই সেটা সম্পূর্ণ বাজে কথা বলিয়া উড়াইয়া দিলাম। এ সব যে কেবল শটীকান্তকে আমাব নিকট হইতে দূর করিবার ফিকির, সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহমাত্র রহিল না। আমি অক্ষম রোষে আপনি পুড়িতে লাগিলাম। বারান্দায় না গিয়া ঘরের ভিতর বিছানার উপর বসিয়া পড়িলাম।

এখন ভাবিতে আশ্চর্য বোধ হয়, তখন আমার বোধ হইতেছিল, যেন স্বামী আমার জন্ম জন্মান্তরের শত্রু। অপमानে আমার হৃদয় জর্জরিত হইতেছিল। ভাবিতেছিলাম, ‘হায়! এ অপমানের হাত হইতে উদ্ধার হইবার কোনও উপায় নাই কি?’ কত অসম্ভব কল্পনা আমার মাথায় আসিতে লাগিল। স্বামীর গৃহতাগ করিয়া স্বাধীন হওয়া একটা কল্পনাগ্রিয় দুরাশার মত আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। বৈধবোর কল্পনাও প্রীতিকর বোধ হইল। সঙ্গে সঙ্গে, লজ্জার কথা বলিব কি, শটীকান্ত আমার সেই পতিবিহীন জীবনের সহিত বিভূড়িত হইয়া গেল। বিধবাবিবাহ, দেবরের সহিত পরিণয় প্রভৃতি কত কল্পনা আমাব যেন সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে মনের উপর দিয়া ছবির মত ভাসিয়া গেল— সে কল্পনায় আমি একটা অমানুষিক আনন্দের কম্পন শরীরেব ভিতর অনুভব করিলাম।

পরক্ষণেই মনকে সংযত করিলাম, কল্পনার মূঢ়তা ও নিষ্ঠুরতা উপলব্ধি করিয়া নিঃশব্দে একটু তিরস্কার করিলাম। কিন্তু আমার এই তুচ্ছ মুহূর্তের অসাবধান প্রচ্ছন্ন কামনা দেবতার হৃদয়ে ছাপ মারিয়া দিল, তিনি আমার এই দুর্দান্ত কামনা পূর্ণ করিয়া আমার চবম শাস্তির বিধান করিলেন।

আমার স্বামীর মাথা-ধরাটা একটু বেশি হইতেছিল। আমি মনে করিয়াছিলাম, সেটা সুখ আমাদের ভ্রম করিবার একটা অছিলামাত্র। কিন্তু শীঘ্রই দেখিলাম, আমার অভিযোগ মিথ্যা। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শরীরে আশ্চর্য রকম রোগা হইয়া যাইতেছিল, কিন্তু আমার অন্ধ নয়নে তখন সেটা পড়ে নাই। একদিন তিনি অফিস হইতে খুব বেশি মাথা-ধরা লইয়া ফির্বিলেন। কিছুক্ষণ গুঞ্জন পব তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। আমি নিশ্চিত হইয়া উঠিয়া গেলাম। প্রায় আধঘণ্টা পর আসিয়া দেখি, তিনি তের্মনি পড়িয়া আছেন, গায় হাত দিতে দেখিলাম, ভয়ানক ছব। আমি খাবমিটার আনিয়া সাবধানে তাহা লাগাইলাম। জ্বর ১০৬ ডিগ্রী বঃ উপর। দেখিয়া পা হইতে মাথা পর্যন্ত যেন মুহূর্তের জন্য অসাড় হইয়া গেল, আমি ছুটিয়া শটীকান্তকে ডাক্তার ডাকিতে বলিলাম।

ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, তাঁহার ঘুম হয় নাই, মস্তিষ্কের হৃড়তা উপস্থিত হইয়াছে। ঔষধ আনিতে দিয়া তিনি গুঞ্জন বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। তাবপর ঔষধ আসিলে এক দাগ খাইয়াই তিনি বলিলেন, “একবার ডাক্তার সাহেবকে ডাকাও, অবস্থা গুরুতর বোধ হইতেছে।”

আমার তখন বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়িলাম, গত দুই মাসের সমস্ত ঘটনা অস্বাভাবিক দ্রুততার সহিত মনের ভিতর ঘুরিয়া ফিরিয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহার উপর যত অবিচার অত্যাচার করিয়াছি, তাহা মনে হইয়া আমাকে ক্షমাযাত করিতে লাগিল। আর সর্বোপরি তাঁর সমস্ত হৃদয়ভরা স্বার্থ-বিসর্জিত ভালবাসার যে অপমান করিয়াছি, তাহাকে যে মিথ্যা স্নেহ দেখাইয়া বঞ্চনা করিয়াছি, সেই সব কথা মনে ভাবিতে যেন আমাব

মাথার নাড়ীগুলি ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। ভাবিলাম, এমন বানরীক কণ্ঠে ভগবান কেন এ মুক্তাহার খুলিয়াছিলেন!

ডাক্তারবাবু আমার স্বামীর বন্ধু। তিনি বলিলেন, “স্থির হন মা। এ সময় আপনি অস্থির হলে কে কি করবে বলুন।”

কথাটা শুনিয়া আমার চমক ভাঙ্গিল। এক মুহূর্তে যেন আমার ভাবপ্রবাহ জমাট বাঁধিয়া গেল। স্থির হইয়া বসিয়া আমি স্বামীর শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম। ডাক্তার সাহেব আসিলেন, আরও দুই জন ডাক্তার আসিলেন, তাঁহারা কলিকাতায় ঔষধাদির জন্য টেলিগ্রাম করিয়া যথাসাধ্য যত্ন করিতে লাগিলেন। একজন ডাক্তার সর্বদাই বাড়িতে থাকিতেন।

কিছুতেই কিছু হইল না। স্বামী আর চক্ষু মেলিলেন না। তৃতীয় দিনে তিনি এই কৃতঘ্ন পাপিষ্ঠাকে ত্যাগ করিয়া গেলেন, আমি মূর্ছিত হইয়া শটীকাস্তের পায়ের তলায় পড়িয়া গেলাম।

মূর্ছিত হইয়া আমি ছয় দিন ছিলাম। ক্রমে শটীকাস্তের অক্লান্ত যত্ন ও পরিশ্রমে আমি সুস্থ হইয়া উঠিলাম। ক্রমে আবার সব কথা ভাবিবার শক্তি হইল।

স্বামীর মৃত্যুর পর ছয় মাস আমি মন্তঃফবপূরে ছিলাম। শটীকাস্ত সঙ্গে ছিল, সে তাহার সমস্ত জীবন আমার সেবায় উৎসর্গ করিয়াছিল। আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে, যে প্রেমের বীজ আমি তাহার হৃদয়ে নিরু হাতে বপন করিয়াছিলাম, তাহা পত্রে পুষ্পে সুন্দর হইয়া তাহার সমস্ত জীবন ওতপ্রোতভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছে।

এত বড় পাপিষ্ঠা আমি যে, তখনো আমার হৃদয় হইতে তাহার লালসা দূর হয় নাই। আমি তখনও তাহার কথায় তৃপ্ত, তাহার দর্শনে পুলকিত এবং তাহার কদাচিৎ স্পর্শে মুগ্ধ হইতাম। চাবুক মারিয়া আমি মনকে ফিরাইতাম, কিন্তু ফিরাইতে বেদনায় প্রাণ ফাটিয়া যাইত।

আমি নিজেকে কষ্টে সংযত করিতাম, কিন্তু তাহার হৃদয়ে কোনও আঘাত দিতে পারিতাম না। সে যদিও কোনও দিন একটি কথা বলে নাই, তবু তাহার হৃদয় পবতে পবতে আমার নিকট খোলা হইয়া গিয়াছিল। তাই কিম্বে তাহার আকাঙ্ক্ষা, কোথায় তাহার বেদনা, তা’ আমি না বলিলেও বুঝিতে পারিতাম। তাই আমি তাহাকে নিবাস করিতে— তাহার হৃদয়ে বাসা দিতে পারিতাম না। সে যখন আমার কাছে আসিয়া বসিত, তাহাকে ফিরাইতে পারিতাম না, আমার মুখের কথা শুনিয়া সে কৃতার্থ হইত, তাহাতে আমি তাহাকে বঞ্চিত করিতে পারিতাম না, আমার সেবায় সে সুখ পাইত, সে সেবা হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করা আমার অসাধ্য ছিল। তাই মনের সঙ্গে যতই কেন যুদ্ধ করি না, তাহাকে প্রশ্রয় না দিয়া পারিতাম না।

ছয় মাস পরে আমার স্বামীর জীবন-বীমার পঞ্চাশ হাজার টাকা আসিয়া পৌছিল। শটীকাস্তই চেষ্টা করিয়া টাকাটা বাহির করিয়া দিয়াছিল, চেকখানা আসিতেই একটু কাঁপিতে কাঁপিতে সে তাহা আমার নিকট দিয়া গেল। আমার বুক ফাটিয়া পড়িতে লাগিল, চেকখানা হাতে করিতে আমার যেন সমস্ত শরীর পুড়িয়া যাইতে লাগিল— সে যে আমার স্বামীর রক্ত— আমার বঞ্চনালব্ধ কলঙ্কের যৌতুক। এই কথাটাই বার বার আমার বুকের ভিতর আঘাত করিতে লাগিল যে, আমি আমার স্বামীকে আজীবন কি নিষ্ঠুর স্বর্ণনা করিয়া আসিয়াছি। আমি তাঁহাকে ভালবাসি নাই, ভালবাসার ভান করিয়াছি; আমার ঝুঁটা মুক্তা দিয়া তাঁর হৃদয়ের অনুল্লা সম্পদ ঠকাইয়া লইয়াছি। এই পঞ্চাশ হাজার টাকা আমার সেই জীবনব্যাপী বঞ্চনার শেষ উপার্জন!

শটীকান্ত আমার কাছে নীরবে দাঁড়াইয়া ছিল। তার চক্ষু দেখিয়া বুঝিলাম—তার মনের কথা। তার প্রাণ চাহিতেছিল আমাকে বৃকের ভিতর টানিয়া লইয়া তার অসীম প্রীতি দিয়া আমার দুঃখ নিঃশেষ করিয়া মুছিয়া দিতে। তার বুকভরা ভালবাসা লইয়া সে আমার দুয়ারে আসিয়াছে—আমাকে সুখ দান করিয়া যাইতে। মুহূর্তের জন্য এই চিন্তায় আমার মনে যেন একটা চরিতার্থতার ছায়া পড়িল! কিন্তু সেই চেকখানার দিকে দৃষ্টি পড়িল। হঠাৎ আমার কর্তব্য স্পষ্ট হইয়া চক্ষের উপর ফুটিয়া উঠিল। কে যেন আমার ভিতর বলিয়া উঠিল—“ছি, আবার ঠকাবি!” আমার স্বামীকে আমি যে নিদারুণ প্রবঞ্চনা করিয়াছি, আমার মনে হইল যেন, এই যুবককেও আমার সেই পৈশাচিক বঞ্চনার আবর্তে ফেলিতে বসিয়াছি। আমি বলিলাম, আর না, আজ এ বঞ্চনা শেষ করিয়া দিতে হইবে।”

আমি মুখ তুলিয়া বলিলাম, “শটীকান্ত, তুমি আমাকে ভালবাস!” শটীকান্তের সমস্ত শরীর হঠাৎ একবার কাঁপিয়া উঠিল। সে একেবারে ফাকাশে হইয়া গেল, পর-মুহূর্তে তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল, সে মাটির দিকে চাহিয়া চূপ করিয়া বহিল।

আমি বলিলাম, “আমি জানি, তুমি আমার ভালবাস। এমন কি, আমারও মনে হয়েছে যে, শত চেষ্টা সত্ত্বেও আমি যেন তোমাকে সমস্ত প্রাণ-মন দিয়ে ভাল না বেসে, আমার সমস্ত জীবন দিয়ে তোমাকে আকাঙ্ক্ষা না করি পারিনি। কিন্তু আজ সে ভুল ভেঙ্গেছে, আমি জেনেছি যে, আমি নিজেকে ঠকিয়েছি, তোমাকে নিষ্ঠুরভাবে ঠকিয়েছি, তোমার দাঁদকে আমি আজীবন ঠকিয়ে এসেছি, যখন তাঁর চোখ ফুটলো, তিনি দেখতে পেলেন যে, কি নিষ্ঠুরভাবে তাঁর সর্বস্ব আমি ঠকিয়ে নিয়েছি, তখন আর তাঁর শরীর তাঁকে বহন কবতে পারলে না; সর্বভাগী মহাপুরুষ তিনি এই পাপিষ্ঠাকে সর্বস্ব দান করবে স্বর্গে গেলেন। এত বড় মহাপুরুষকে খেয়েও যদি আমার ক্ষুধা না মেটে, আবার তোমাকে যদি আমি আমার বঞ্চনার আবর্তে ডুবাই, তবে বলতে হবে যে, আমি দুনিয়ার সেরা পিশাচী। আমি তা পাববো না। তুমি আমাকে ত্যাগ কর। তোমাকে দেখলে আমার লোভ হয়, তুমি আমার কাছে আর এসো না। আমাকে ভুলে যাও। আমার গা ছুঁয়ে শপথ কর, আমার কথা রাখবে?”

শটীকান্ত দাঁতে নখ কাটিতেছিল, তার মুখের প্রত্যেক শিরা উপশিরা ফুলিয়া উঠিতেছিল, সে নিপুণ ভাস্করের খোদাই-করা বেদনার একখানি মূর্তির মত নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

আমি একবার মুন্ধনেত্র তাহাকে দেখিলাম। তারপর উঠিয়া তাহার গায়ে হাত দিয়া বলিলাম, “বল, আমার কথা রাখবে?”

এইবার সে কাঁদিয়া ফেলিল। চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল, “আচ্ছা, তোমার কথাই থাকবে।”

সে চলিয়া গেল। আমি সেইখানে মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি খাইতে লাগিলাম, বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সে দুঃখ আমি কাহাকে জানাইব? দুঃখীর আশ্রয়, তার চিরদিনের শান্তিদাতা ভগবান, তাঁর কাছে আমি আমার এ দুঃখ কোন লজ্জায় জানাইব? তাই কেবল বুক চাপিয়া মাটিতে পড়িয়া গড়াইতে লাগিলাম।

তাব পর আর তাকে দেখি নাই। সে কেবল একখানা চিঠি লিখিয়াছিল; তাহাতে বলিয়াছিল যে, আমার চোখের সামনে সে দেখা দিবে না, কিন্তু এতদিন সে যেমন নীরবে প্রত্যক্ষ প্রতিমার গোপন পূজা করিয়া আসিয়াছে, চিরদিন সে তেমনি করিবে। এ বিষয়ে আমার অনুরোধ সে রাখিতে পারিবে না।

সে চিঠির উত্তর আমি দেই নাই, কিন্তু অনেক দিন সে চিঠিখানা বৃকে করিয়া রাখিয়াছিলাম। শেষে ভারিলাম, চিঠিখানি বাঁখিয়া, যে রঙে আমার অধিকার নাই, তাহা চুরি করিতেছি। তাই তাহা ভস্মসাৎ করিয়াছি।

আজ পর্যন্ত আমি শচীকান্তকে ভুলিতে পারি নাই। আজও তার স্মৃতি আমার বৃদ্ধ হৃদয়কে সরস করিয়া তুলে। অনেক চেষ্টা করিয়াও এখন পর্যন্ত স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসিনী বাঁহিয়া গিয়াছি।

প্রথম কিছুদিন কঠোর ব্রহ্মচর্য করিয়াছিলাম। দেখিলাম, তাহাতে আমার কোনও ক্রেশ হয় না। পরে ভাবিলাম, হৃদয়ে স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসিনী হইয়া বাঁহিরে একটা মিথ্যা ক্রেশহীন কণ্টের আড়ম্বর রাখিয়া লোকের প্রশংসা বা সম্মান ঠকাইয়া লইবাব আর কোনও অধিকার নাই। এহা ছাড়া ব্রহ্মচর্য করিয়া আমার পাপেব বোঝা কমাইয়া, আমার শাস্তি হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিব কেন? যে পাপিষ্ঠা আমি, অনন্ত নবক আমার যোগ্য। ব্রহ্মচর্যে সে যন্ত্রণা তিলমাত্র কমে, এমন ইচ্ছা আমি করিতে পারি না।

\* \* \* \* \*

চান্দার্দী থামিলেন, দেখিলেন, আমার চোখে জল। বলিলেন, “চোখের জলের এমন অপবায় কবিস না বোন। আমার মত পাপিষ্ঠাকে ঘৃণা করতে শেখ। লোকে যদি আমার ঘৃণা কবে, আমি তাতে তৃপ্ত লাভ করি। লোকেব সম্মানে বা স্নেহে আমার আতঙ্ক হয়, মনে হয়, সাদা জীবন কি কেবল ঠকাইই করিব? আমার যাহা প্রাপ্য নয়, তা কি আমি কেবলি লোকের কাছে ঠকাইয়া লইব?”

## নামৈব কেবলম্

### সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

এক

বিরূপাক্ষ আজ চার বৎসর থিয়েটারে ঢুকিয়াছে। এই চার বৎসর ধরিয়া নিতা সন্ধ্যায় সে থিয়েটারে হাজিরা দেয়, একদিনও কামাই নাই। ঝড়-জল, রোগ-শোক— তবু ঠিক হাজিরা দিয়া আসিতেছে। মানেজারবাবু ইহাতে গুরু করিয়া নট-নটী, ড্রেসার, প্রম্পটার— সকলের ছোট-বড় সকল ফাইফরমাশ খাটিতে কখনো কার্পণ্য করে না। এমন তপস্যা সকলের মুনি-ঋষিরা কবিয়াছেন কিনা থিয়েটারে এত পৌরাণিক নাটক দেখিয়াও তার মনে সন্দেহ জাগে। তবু আজ পর্যন্ত কোন নাটকে সে পার্ট পায় নাই—না সবাক, না নির্বাক। না পাইলেও তার ধৈর্য অটুট।

তবে এত দিনের সাধনায় সে এইটুকু বুঝিয়াছে, মানেজারবাবুব যত দাপট থিয়েটারে, পার্ট দিবার মালিক এখানে ঐ প্রম্পটার। প্রম্পটারকে সে বহুভাবে সেবা করিয়াছে। প্রম্পটার একেবারে বেইমান নয়, তাকে পার্ট দিয়াছিল, কিন্তু বিরূপাক্ষ সে পার্ট রাখিতে পারে নাই। পার্ট মুখস্থ করিয়া রাত্রে পরচুলা আঁটিয়া সাজ-ঘরের কর্তাব কাছে সে গিয়া দাঁড়াইয়াছে, দূতের পোষাক চাই! সাজঘরের কর্তা তার মুখ ইহাতে আঁটা দাড়িগোফ খসাইয়া নইয়া তাকে ভাবাব দিয়াছে, দূত সাজবে হারান, আমি তাকে কথা দিয়েছি।

করণ মিনতি-বচনে বিরূপাক্ষ বলিল—পার্ট আমি মুখস্থ করেছি।

সাজ-ঘরের কর্তা প্রশ্ন করিল—কদিন থিয়েটারে আসছ?

বিরূপাক্ষ ভাবাব দিল—চাব বছর।

সাজঘরের কর্তা কহিল—হারান আসছে ছ'সাত বছর!

সুতরাং তার দাবি আরও বড়। কাজেই দাড়ি-গোফ ছাড়িয়া মুখ চুন কাঁবয়া বেচারি উইংসেব ধারে আসিয়া দাঁড়াইল।

তারপর ইহাতে দু'বেলা থিয়েটারে হাজির গুরু করিয়াছে। সম্প্রতি সুযোগ মিলিয়া গেল। মানেজারবাবুর পায়ের গাঁট ফুলিয়া তিনি ব্যথায় কাতর। বিরূপাক্ষ তাঁর পায়ের মালিশ লাগাইয়া দিল। ব্যথা দু-চাব দিনে সারিয়া গেল। কাজেই বিরূপাক্ষ সেবার বহরে তৃপ্ত কবিত্তে পারিল মানেজারকে। দেবতা প্রসন্ন হইলেন। নূতন নাটক 'হরদমসিং'-এর মহলা চলিতেছিল। সে নাটকে বিরূপাক্ষ পার্ট পাইল। পার্ট দূতের; দুটো দৃশ্যে নামিতে ইহবে। এটি একদম নির্বাক নয়। তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে ঢুকিয়া বলিবে—“মহারাজ!” আবার চতুর্থ অঙ্কের সপ্তম দৃশ্যে বলিবে—“যো হুকুম” ইহাতে সে ভারী খুশি—দর্শকের সামনে দাঁড়াইতে পারিবে—সে গ্র্যান্টর—অভিনেতা! তার উপর প্রথম অভিনয় রত্ননীব যে বড় প্রাকার্ড পথের দেওয়ালে আঁটা ইহবে, তাহাতে ছোট বড় সকল অভিনেতার নাম ছাপা ইহবে—মানেজারবাবু হুকুম দিয়াছেন—পথের পাথকের চোখে তার নামটাও জুলজুলে অক্ষরে...আঃ! ছোটুর সঙ্গে দেখা ইহাতে বিরূপাক্ষ কহিল—যাচ্ছে তো ফার্স্ট নাইটে—হরদমসিং দেখতে?

ছোটু কহিল—পয়সা কোথায় পাবে?

বিরূপাক্ষ কহিল—আটগুণা পয়সা তো।

ছোটু কহিল—তাতে এক সের গম কেনা যাবে।

ছোটু চলিয়া গেল। নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিরূপাক্ষ ভাবিল, গর্দভ!

## দুই

শনিবারে মহাসমারোহে প্রথম অভিনয় রহন্য!

গুরুবাব বৈকালের কথা বলিতেছি।

বিরূপাক্ষ থাকে কালিঘাটে। বেলা তখন চারিটা বাজিয়াছে। পথে পথে ঘুরিয়া বিরূপাক্ষ দেখিল, এধারেব দেওয়ালে এখনও প্লাকার্ড পড়ে নাই। রাগে তার গা জ্বলিয়া উঠিল। সে বাসে চড়িয়া বসিল।

পূর্ণ থিয়েটারের সামনে পানের দোকান। বাস থামিতে পথের পানে উঁকি মারিয়া চাহিতে বিরূপাক্ষ দেখে, পানের দোকানের সামনে দাড়াইয়া ভজু বিড়ি ধরাইতেছে। বিরূপাক্ষ হাঁকিল—ভজু।

ভজু ফিরিয়া চাহিল! বিরূপাক্ষ কহিল—কাল যাচ্ছে তো?

ভজু কহিল—কোথায়?

বিরূপাক্ষ কহিল—আমাদের থিয়েটারে। নতুন প্লে—আমিও নামাছ একটা প্রিন্সিপাল পার্টে। ভজু তাব পানে চাহিয়া রহিল। কণ্ঠান্তর হাঁকিল শ্যামবাজার..শ্যামবাজার..শ্যামবাজার।

বাস ছাড়িল। বাসে যাত্রীর বেশ ভিড়। বিরূপাক্ষ সহযাত্রীদের পানে চাহিল—এত বড় পর্বচযটা উচ্চ রবে ভজুকে দিয়াছে। তারপর.

কিন্তু সহযাত্রীর দলে উৎসাহ নাই, আগ্রহ নাই, চাঞ্চলা নাই। পথের পানে হাঁ করিয়া কেহ নিঃশব্দে বসিয়া আছে, কেহ বা তিস্ত মনে মন্দা বাজারের কথা পাড়িয়াছে। অভিনয় এত বড় আর্ট, যে আর্টে প্রতিভা পরিচয় মেলে, সে সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন। তাদের সঙ্গে একত্রে বসিয়া বিরূপাক্ষ চলিয়াছে—বাপলাব ভবিষ্যৎ আর্ভিং। কে বলিতে পারে, তেনন স্যোগ পাইলে বিরূপাক্ষ কি নাট্য-প্রতিভা না দেখাইতে পাবে! সেই বিরূপাক্ষের পানে কেহ চাহিয়া দেখে না।

সে কে! সে কোথায় চলিয়াছে! কেন চলিয়াছে।

তাব মনে হইল, এই বিনুত যাত্রীগুলোর মাথায় চড় মাঝিয়া তাদের চেতনা জাগাইয়া। সে বলে—আমি। আমি তোমাদের সঙ্গে চলিয়াছি... তোমাদের আর্ভিং...

কিন্তু না, ইহাদের কোন আশা নাই।

বাজারের সামনে একখানা প্লাকার্ড নজরে পড়িল। ঐ যে ঐ.. রাজা, রাণী, সেনাপতি, রাজকন্যা। তাদের নামের তলায় সিঁদুরের মত চকচকে লাল বঙে লেখা .

আরো নামিবেন বিভিন্ন ভূমিকায়

শশধর দত্ত ত্রিলোচন মল্লিক হারাধন পুঁতিতুণ্ড

শিবচন্দ্র পরামাণিক গণেশচন্দ্র দাস পটলচাঁদ

তেওয়ারী রোহিনীকান্ত সাকরাইল অটলনাথ

সিংহ বিরূপাক্ষ বদ্যোপাধ্যায়।

কমা নাই, সের্নিকোলন নাই, ড্যাশ নাই, ফুটকি নাই—যেন নামের দেওয়ালি! পথে লোক চলিয়াছে—রঙচঙে প্রাকার্ডখানার পানে কেহ চাহিয়া দেখে না! এই যে নূতন নাটক খোলা হইতেছে—বান্দনার স্টেজ, বান্দনার নাটো-সাহিত্য যে নাটকের কল্যাণে দু'তিন ধাপ উঁচুতে উঠিবে, তার সম্বন্ধে একটা লোকেরও কৌতূহল, আগ্রহ নাই। সাথে কি কর্ণ বলিয়াছেন—“ভূতলে বান্দালী অধম জ্ঞাপ্তি।”

এলগিন রোডের মোড়ে দু'জন তরুণ যুবা বাসে চড়িল। তারা বসিল ঠিক বিরূপাক্ষের সামনে। তাদের মধ্যে কথা চলিয়াছিল..

একজন বলিতেছিল—থিয়েটার আমার ভালো লাগে না। তার চেয়ে চলো বারোস্কোপে...ঐ, রাজী আছি।

সঙ্গী বলিল—না, না, নতুন বই খুলেছে যুগান্তরকারী নাটক!

১নং বলিল—সে ওবা যে বই খোলে তার সম্বন্ধে বলে।

২নং বলিল—তবু..

বিরূপাক্ষের মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। সমঝদার নিলিয়াছে!

নূতন নাটকের কথা বলিতেছে। নিশ্চয় ‘হরদমসিং’য়ের কথা।

১নং বলিল—কোথায় যেতে চাও, শুনি...

২নং বলিল—এ্যাড্রিয়াটিকে। ‘গোলাপী গাণ্ডারী’ হচ্ছে।

বিরূপাক্ষের মন টলিল—রাগে। হতভাগা! সে আবার বই! না! দুনিয়া যেন বিদ্রোহ করিয়াছে! ভুলিয়াও তাদের ভাইগাণ্ডিক থিয়েটারের নাম কেহ করে না।

প্রথম অভিনয় রক্তনীর একখানা হ্যাণ্ডবিল ছিল বিরূপাক্ষের পকেটে! সেখানা বাহিব করিয়া মনোযোগ সহকারে পড়িবার প্রবাস পাইল।

পাশের সহযাত্রীটি ঝুঁকিয়া প্রশ্ন করিল—কোন থিয়েটারের বিজ্ঞাপন, মশায়?

বিরূপাক্ষ প্রসন্ন স্বরে কহিল—ভাইগাণ্ডিকে নতুন নাটক খুলছে—‘হরদমসিং’-তার।

লোকটা কহিল—ও! তারপর মাঠের দিকে ফিবিয়া চাইল।

সামনের সেই তরুণ সহযাত্রীরা বলিতেছিল—কি সুখে মানুষ থিয়েটারে যাবে বলো! সেই থোড় বড়ি খাড়া। মাঝাতার হামলের মামুলি বাপার।

মন্তব্য গুলিয়া বিরূপাক্ষ মুষড়াইয়া এতটুকু হইয়া গেল!

## তিন

বহুভালারের মোড়ে বাস থামিলে পথের পানে চাহিয়া সে দেখে, ভাইগাণ্ডিকের বড প্রাকার্ডেব উপর একটা গোলাপী দস্তমর্জনের প্রাকার্ড মারিতেছে। রাগে তার গা জুলিয়া গেল। একে তো থিয়েটারের উপর লোকের প্রচণ্ড বিরাগ, তার উপর থিয়েটারের বিজ্ঞাপনটাকে অবধি ঢাকা দিবার এ কি দুরভিসন্ধি!

বাস হইতে সে নামিয়া পড়িল, নামিয়া লোকটার মই ধরিয়া নাড়া দিল।

সে কহিল—কি কোরেন, বাবু?

বিরূপাক্ষ কহিল—আমাদের প্রাকার্ডের উপর প্রাকার্ড মারচিস কেন?

সে কহিল—দেওয়াল কি ইজ্জবা লিয়েছেন?

কথাটা সত্য। সকলেরই তো ভিক্ষার চাউল।

চারিদিক হইতে ততক্ষণে লোক আসিয়া ভিড় জমাইয়াছে। তারা প্রশ্ন করিল—বাপার কি?



প্রাকার্ড ওয়াল নালিশ করিল, যাহা ঘটিয়াছে। লোকওলা হাসিয়া কহিল—পাগল না কি! বেচাবাকে সরিয়া পড়িতে হইল। বুঝিল, এই জনাই থিয়েটারে ভিড় করিতেছে। লোকে প্রাকার্ড দেখিয়া জানিবে, কি শ্রে হইবে। সেদিকে এমন অত্যাচার চলিলে...

বাসেরও দেখা নাই। যদি বা একটা আসিল তাহাতে কি ভিড়! বসিয়া দাঁড়াইয়া বুলিয়া লোক চলিতেছে। কণাকটারকে দেখা যায় না। ভিড়ের মধ্য হইতে শুধু একটা স্বর জাগিতেছে—খালি গাড়ী..

বাসের আশা ত্যাগ করিয়া সে হাঁটিতে গুৰু করিল। কটা পয়সা বাঁচিবে—তা ছাড়া পার্ত তো এব সেই তৃতীয় অঙ্কে।

কলুটোলাব মোড়ে পিছ হইতে কে ডাকিল—বিরু... ..

বিরুপাক্ষ চাহিয়া দেখে, জীর্ণ মলিনবেশধারী এক যুবা। তাব ঘাড়ে মই ও একবাশ প্রাকার্ড।

বিরুপাক্ষ চিনিল, হাবুল। তার সঙ্গে এক ক্রাশে পড়িত। পড়া মানে, ক্রাসেব রেজিস্টারে নামটা ছিল। বই বেচিয়া হাবুল সিগারেট-বিড়ি ফুকিয়া বেড়াইত। বেপবোয়া স্বাধীনতায় শৈশব কাটাইয়া এখন প্রাকার্ড মাঝব কাত্ত ধবিয়াছে।

চিনিলেও সে পবিচয়ে আমল দেওয়া চলে না! চোখে বিষ্ময়ের ভঙ্গী ফুটাইয়া বিরুপাক্ষ সবিয়া পড়িতেছিল, হাবুল কহিল—চিনতে পারলে না? আমি হাবুল।

হাবুল। বিরুপাক্ষ যেন আকাশ হইতে পড়িয়াছে। এমন ভাব দেখাইল।

হাবুল কহিল—তুমি তো বিরু! বিরুপাক্ষ!

বিরুপাক্ষ কোন জবাব দিল না, চোখ তুলিয়া দেওয়ালের পানে চাহিল। এই দেওয়ালে হাবুল সদা প্রাকার্ড মাঝিয়াছে। জাইগান্টিক প্রাকার্ড।

এক। প্রাকার্ড এমন ভাবে আঁটিয়াছে যে, ওলায় তাব নামটা কাহারো চোখে পড়ে না।

সে কহিল—তুমি এ প্রাকার্ড মেবেছো?

হাবুল হাসিয়া কহিল—হ্যাঁ।

বিরুপাক্ষ কহিল—এ কি আটা হয়েছে! নিচেকাব নাম তো কারো চোখে পড়বে না! হাবুলকে সে দেখাইল ক্রটি কোন্খানে।

হাবুল দেখিল, দেখিয়া হাসিল, হাসিয়া কহিল—এ বিরুপাক্ষ বন্দোপাধ্যায় তুমি?

বিরুপাক্ষ কহিল—হ্যাঁ। নাম ছাপা হয়েছে—তাতে পয়সা খরচও হয়েছে। খানিকটা নাম লুকানো রাখবাব জন্য এ পয়সা খবচ করা হয়নি!

হাবুল কহিল—এত যদি লাগে, নিজের নামের প্রাকার্ড নিজে সাঁটিতে পারো না? বিরুপাক্ষ কহিল—মুখে ভারী লম্বা কথা দেখছি! কাজ করো ত প্রাকার্ড আঁটার।

হাবুল ঝাঙালো স্বরে কহিল—এই কাজে তুষ্ট হয়ে পয়সা দিচ্ছে তো! তোমাব মতো এপ্রেটিস নই। বিনে মাইনের চাকরি করি না।

কথাটা তগু লোহার মত অসহ্য ঠেকিল। কিন্তু পথে উহার সহিত তর্ক বাদানুবাদ ভালো দেখাইবে না। রাগে জ্বলিয়া সে কহিল—আচ্ছা, আমি আন্ত রিপোর্ট করছি। Impertinence এর প্রতিকার হয় কি না দেখি।

হাসিয়া হাবুল কহিল—করো! তোমার যা সাধ্য থাকে, করো! আমরা যা করবাব করবো। হাবুল চলিয়া গেল। বিরুপাক্ষ বিরক্ত চিত্তে একটা চলন্ত ট্রামের পিছনে চড়িল।

## চাব

রাত্রে রিহাসালের পর বাড়ী ফিরিবার সময় সে দেখে, থিয়েটারের ফটকে যে প্লাকার্ড পড়িয়াছে, তাহাতেও তার নামটা চাপা পড়িয়াছে। অসহ্য ব্যথায় বুক টনটনিয়া উঠিল। কিন্তু উপায় কি?

পরেব সকালে বড় রাস্তায় আসিয়া বিরূপাক্ষ দেখে, চৌমাথার দেওয়ালে রাজ্যের প্লাকার্ড পড়িয়াছে— জাইগান্টিকের প্লাকার্ডও আছে, তবে শেষ দিকটা চাপা দিয়া এক কদর্য প্লাকার্ড আঁটা—

আর ভয় নাই।

এক শিশি টাকারি তৈল ব্যবহার করুন।

টাক সারিবে।

এরিয়ান কেমিক্যাল ওয়ার্কস, সালকিয়া

বেলা নটায় জগুবাবুর বাজারের সামনে হাবুলের সঙ্গে আবার দেখা। জাইগান্টিক থিয়েটারের প্লাকার্ডের উপর সে টাকারি তৈলেব বিজ্ঞাপন আঁটিতেছিল। শয়তান! শয়তান! ছোটলোক! ইতর! পাজী!

মুখে সে কিছু বলিল না। হাবুল তাকে দেখিল, দেখিয়া হাসিল, তাবপর ঘাড়ে মই লইয়া চলিয়া গেল।

বিরূপাক্ষের পায়ের নীচে মাটি দুলিতেছিল। তাব জীবনে এই প্রথম সুযোগ—ভবিষ্যতেব রঙীন স্বপ্ন আজ যখন সবেমাত্র আশার সম্ভাবনা জাগাইয়া তুলিয়াছে..হায়রে, নিমেষেব ভুলে এত বড় হিংসার তলে সে সম্ভাবনা গোপন গহনে রহিয়া গেল।

## পয়োমুখম

জগদীশ গুপ্ত

কলাপ সমাপ্ত হইয়া গেছে, মুক্তবোধ আরম্ভ হইয়াছে।

ভূতনাথের কথা বলিতেছি—

ভূতনাথ আয়ুর্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন কবিতেছে, কিন্তু কলাপই বলুন, মুক্তবোধই বলুন, পাঠে তেমন ভক্তি কি আগ্রহ তার নাই।...মাঝে মাঝে সে ঠোট উন্টাইয়া মুখ বিস্তীর্ণ করিয়া ব্যাকরণের দিকে চাহিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকে।...

ভূতনাথের পিতা কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণকান্ত সেনশর্মা কর্ণভূষণ মহাশয় স্বয়ং পুত্রকে শিক্ষাদান করিতেছেন।

কিন্তু আবশ্যে একটি বিলম্ব ঘটিয়া গেছে—

ভূতনাথের বয়স গত অগ্রহায়ণে অষ্টাদশ উত্তীর্ণ হইয়া উনবিংশে পদার্পণ করিয়াছে।

...সন ১৩০১ সালে তার জন্ম।

ভূতনাথের মেধা কোনোদিনই তাব নিজের অলঙ্কারেব কি গুরুবর্গের অহঙ্কারের বস্ত্র হইয়া ওঠে নাই।—

তা না হোক...

মেধা মানবজাতির পৈত্রিক সম্পত্তি নয়, আর, ভগবান গৃহ-বিবাদে সালিশী কবিতেও বসেন নাই যে, মামলা বাঁচাইতে ভাণ্ডারের সমস্ত মেধা সবাইকে নিজের তৌলে সমান করিয়া ন্যাপিয়া দিবেন। কিন্তু মেধা না থাকার পিছুটানটা যাহার দ্বারা কাটাইয়া উঠিয়া মানুষের গতি-বেগ আব হৃদয়াবেগ সম্মুখের দিকে বাড়ে সেই অধাবসায়ও ভূতনাথের নাই বলিলে অযথা বেশী বলা হয় না।

...তাই যোলো-সতর বৎসর পর্যন্ত বিদ্যালয়ে তানানানা করিয়া কাটাইয়া সর্বাপেক্ষা সহজ বিদ্যা আয়ুর্বেদ গ্রাহ্য কবিতে বদ্ধপবিকর সে নিশ্চয়ই হয় নাই—সম্মত হইয়াছে।

শুভসা শীঘ্রম্—

সেইদিনই কাঠের সিঁদুক খুলিয়া কৃষ্ণকান্ত কলাপ আর মুক্তবোধ বাহির করিয়া রৌদ্রে দিলেন।

ভূতনাথ বই দু'খানাকে চিনিত —

তাহাদিকে উঠানের রৌদ্রে পিড়ির উপর স্থাপিত দেখিয়া সে আর যাহাই হউক খুসী হইল না।—

....বই দু'খানির দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ভূতনাথ ফস করিয়া যে কথাটি বলিয়া ফেলিল, তার মান কেহ রাখিল না।....

কথাটা কানে যাইবার পব কৃষ্ণকান্ত বত্র-দৃষ্টিতে একবার ভূতনাথের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন—

ভূতনাথ সব্বিয়া গেলেই গৃহিণীকে গল্পটা শুনাইয়া দিবেন।...

এবং সে অবসর তখনই মিলিল।...

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, —তোমার ছেলের বুদ্ধি শেষ পর্যন্ত বন্দ দিয়ে টানাতে হবে দেখাছ—  
ঠিক সেইরকম।—বলিয়া গম্ভীর হইয়া গেলেন।

মাতঙ্গিনী বলিলেন,—কি রকম?

—এক ছোঁড়াকে পাঠিয়েছে—

—কে?

—কোনো গেবস্ত। একটা গল্প বলছি। পাঠিয়েছে দোকানে এক পয়সার বাতাসা আনতে।  
দোকানী দিলে, ছোঁড়া ওণে বললে, —মোটো পাঁচখানা? দোকানী ক্ষেপে উঠে বললে—  
পাঁচখানা নয় ত' কি পাঁচখানা দেবে? ঘিয়ের দর জানিস আত্মকাল?... ছোঁড়া লজ্জা পেয়ে  
চলে এল।.. বাড়ীতে বললে, —কিরে, মোটে পাঁচখানা বাতাসা এনেছিস এক পয়সায়?  
ছোঁড়া বললে—তাই দিলে, মা। বললুম, তা দোকানী ভেড়ে উঠল, বললে—ঘিয়ের দর  
জানিস আত্মকাল?... শুনে গিন্নির হাত গালে উঠে গেল, অবাক হয়ে বললেন,—কি বজ্জাত  
দোকানী গো! ঘিয়ের দর বেড়েছে তাতে বাতাসার কি?... বলিয়া তুমুল শব্দে খানিকটা  
হাসিয়া লইয়া কৃষ্ণকান্ত বলিলেন,—তোমার ভৃত্যের বুদ্ধি সেই ছোঁড়ার মত, কার্যকাৰণ  
সম্বন্ধ-জ্ঞান একেবারে নেই।

কিন্তু মাতঙ্গিনী হাসিতে পারিলেন না—

পুত্রের অজ্ঞানতাব উদ্দেশ্যে স্বামীর এই বিদ্রুপে বিমর্ষ হইয়া কহিলেন,—কি, কবেছে কি?  
—বলছে, পড়ব কবেরঙ্গী, তাতে ব্যাকরণের কি দরকার!

কৃষ্ণকান্ত না হাসিয়া বলিলেন, —আযুর্বেদশাস্ত্র খাটি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ব্যাকরণের  
পব সাহিত্য, কাব্য, অলঙ্কার, নাট্য প্রভৃতি, তাবপব শাস্ত্র—

ভূতনাথ মনে মনে বলিল—কচু।

কৃষ্ণকান্ত অন্তর্যামী নন—ভূতনাথের কচুর কথাটা টেরও পাইলেন না, বলিতে  
লাগিলেন, —কাজেই সংস্কৃত হৃদয়ঙ্গম করতে হলে ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি হওয়া আগে  
দবকাব। ইত্যাদি।

দরকারী কথার কত ভাগেব কত ভাগ তার কানে গেল তাহা ভূতনাথ নিজেই জানিতে  
পারিল না।—বাড়ি ওঁজিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কৃষ্ণকান্তের মুখের শব্দ হইতেই সেদিককাব কর্তব্য  
শেষ হইয়াছে মনে করিয়া সে আপন কাজে গেল।...

কিন্তু ভূতনাথ মাঝে মাঝে মাবের কাছে নালিশ করে,—এ-গাছে পাতা, ও-গাছেব মূল,  
এ-টার ছাল, ও-টার কুঁড়ি, এই নিয়ে ত'কবেরঙ্গের কারবার, তা করতে নুন্ধবোধ পড়ে কি  
হবে?—বলিতে বলিতে অত্যন্ত মানসিক শ্রান্তির লক্ষণগুলি তাব সর্বশরীবে প্রকাশ পায়।

মাতঙ্গিনী বলেন,—আমি ত কিছু জানিনে রে।...

যাহা ইউক, শাস্ত্রাধ্যয়নের উপক্রমণিকা অনাসক্ত গয়ংগচ্ছভাবে চলিতে লাগিল,—  
এবং পবিত্র শাস্ত্রসৌধের প্রথম সোপানে দাঁড়াইয়া জীবনের এমন একটা দরকারী কাজ শেষ  
করিয়া আনিল যাহার ফল প্রতিফল দুটোই নিরেট।...দুস্তর কলাপের প্রস্তর চর্চণের চাইতে  
তার টের সংক্ষিপ্ত ও সরস,—

উদ্দেশ্য ও উচ্চদরের—

ওধু সনাতন শাস্ত্রীয় প্রথায় নরকনিবারক পুত্রলাভ ।...ভূতনাথ বিবাহ করিল; তখন তাহার  
বয়স সতের বৎসর কয়েকমাস মাত্র—

স্ত্রী মণিমালিকা ন' বছরের—

পণ সর্বসাকুল্যে সাতশত টাকা মাত্র।

কলাপের সঙ্গে পাত্রের নিষ্ঠাহীন আলাপচারীতে পরের ঘরের অতর্কিত টাকা আদায়  
হয় না... ..

বিবাহের পূর্বে কৃষ্ণকান্ত কিঞ্চৎ বিষয়বুদ্ধির আশ্রয় লইলেন....বৈবাহিকমহলে প্রচার  
করিয়া দিলেন, ভূতনাথ কলিকাতার বিখ্যাত প্রবীণ কবিরাহু শ্রীগোলককৃষ্ণ দত্তওপ্ত মহাশয়ের  
প্রিয়তম ছাত্র ব্যাকরণ ও সাহিত্য প্রভৃতি সমাপ্ত করিয়া মূলশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছে। আরো  
বলিলেন,—দু'তিনটি পাশকবা ছেলের মূল্য এখন মাসিক বিশ বাইশ টাকার অধিক নয়,  
আয়ুর্বোধের দিকে দেশের নাড়ী টান যথার্থই ফিরিয়াছে; সুতবাৎ পশার দাঁড়াইয়া যাইতে  
বিলম্ব হইবে না, দু'তিন বছরেই—ইত্যাদি। .

তাই সাতশত টাকা পণ।

কৃষ্ণকান্ত নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ভূতনাথকে দিয়া ঔষধ প্রস্তুত করান—তৈল, ঘৃত,  
রসায়ন, অরিষ্ট, আসব ..বিবিধ রোগাধিকারের শাস্ত্রোক্ত বিবিধ ঔষধ। কৃষ্ণকান্ত কাছে-  
কিনারায় যখন রোগী দেখিতে যান তখন ভূতনাথকে সঙ্গে লইয়া যান।...পথে আসিতে  
আসিতে বুঝাইয়া দেন—রোগলক্ষণ, কোন বসাদিকা কোন রোগের হেতু, কী ভাবে তাব  
বিস্তৃতি ও নিবৃত্তি। . পিত্ত, শ্লেষ্মা, বায়ুব কোনটা কুপিত হইয়া এই রোগীর রোগ কিভাবে  
জটিল করিয়া তুলিয়াছে। .এমন সব ভূয়োদর্শনের কথা।—

ভূতনাথ গাছগাছড়া, ফলমূল কিছু-কিছু চিনিয়াছে, তাহাদের গুণাবলী ও প্রয়োগবৈচিত্র্যের  
সঙ্গে ও কিছু কিছু পরিচয় ঘটিতেছে। .

মণি ছোটটি—

স্বামীব সঙ্গে তার ভাব হইয়াছে।

ভূতনাথ মণিকে বাগাব, কাঁদায়, আবাব খিল খিল করিয়া হাসায়ও। ....মাঝে মাঝে মণি  
যখন বাপের বাড়ীর কথা ভাবিয়া মুখ ভার করিয়া থাকে তখন তাকে আডালে ডাকিয়া  
লইয়া সদুপদেশও দেয়, বলে, এই তোমার আপন বাড়ী।

কিন্তু অবুঝ মণি হঠাৎ অতটা উদার হইয়া উঠিতে পারে না;—বলে,—ধেং। এ ত  
তোমাদের বাড়ী। আমাদের বাড়ী—

ভূতনাথ বলে—তা বটে। কিন্তু তুমি যখন বড় হবে তখন বুঝবে, সে-বাড়ী তোমার  
দাদা-বৌদির, এই বাড়ীই তোমার, তারপর ছেলেপিলে হলে—

মণি এবাব লজ্জা পাইয়া হাসে....

বলে,—ধেং।

মণির দু'বারকার দুটি ভর্ৎসনার কত তফাৎ ভূতনাথ, তা বোঝে—

খুসী হইয়া উঠিয়া যায়।

ভূতনাথের ছোট ভাই দেবনাথ ঘরে ঢুকিয়া বলে,— তুমি বৌদি না ছাই। বলিয়া বুড়ো  
আঙ্গুল দেখায়।

মণি কথা কহে না।

দেবনাথ বলে,—বললুম, দুটো আম ছাড়াও, নুন-লঙ্কা মেখে খাই; তখন কথাই কওয়া হল না। এখন দাদার সঙ্গে দেখা হয়েছে আর সোয়ামের হাসি হচ্ছে। এই বয়সেই শিখেছ ঢের।...

মণির কিন্তু মনেও আসে না যে, এই বয়সে দেবনাথও শিখিয়াছে ঢের।

—বেশ, বেশ, চলো দিচ্ছিগে। বলিয়া মণি লাফাইয়া ওঠে।

মণির ভ্রুর হইল—

উজ্জ্বল মণি জ্ঞান হইয়া গেল।...

কৃষ্ণকান্ত নাতী দেখিয়া বড়ি দিলেন; তাহাতে ভ্রুর ছাড়িল বটে, কিন্তু প্রাণরক্ষা হইল না...

শেষরাত্রি হইতে হঠাৎ ভেদ আরম্ভ হইয়া বেলা দুটার সময় মণির নাতী ছাড়িয়া গেল। .  
সীথিভরা সিঁদুর লইয়া লালপেড়ে সাড়ী পরিয়া, আলতায় পা রঞ্জিত করিয়া খেলার পুতুল  
একরকমি মণি কাঠের আওনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।—

মার্তসিনী চোখের জল মুছিয়া স্বামীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন— ই্যা গা,  
এক ফোঁটা ওষুধও ত' দিলে না....

কৃষ্ণকান্ত বড় বিস্ত্র; তাই গৃহিণীর দিকে চাহিয়া ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন, —দিলেও ফল  
হত না, বুঝেই দিইনি। যম যে ব্যাধি পাঠায় তাকে আমরা দেখেই চিনি—

আয়ুর্বেদের এই চরম দিব্যদৃষ্টির বিষয় মার্তসিনী কৃষ্ণকান্তের এতদিনের স্ত্রী হইয়াও  
বিন্দুবিসর্গও ভানিতেন না।...চোখে আঁচল দিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

মণির স্মৃতি মুছবার নয়....

এখনো যেন সে মাটিতে আঁচল লুটাইয়া উঠানময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ..

‘মা মা’ বলিয়া আপন পেটের মেয়েটির মত অনুক্ষণ সে পায় পায় ঘুরিত।.... সে যে  
ছেলেমানুষ ইহা কেমন করিয়া ভুলিয়া যাইয়া তিনি মণির কাজের ভুল ধরিয়া ধমক  
দিহেন। মণির মুখখানি বিষম হইয়া উঠিত....এই জ্ঞান, এই উজ্জ্বল ...পবক্ষণেই ‘মা’ বলিয়া  
যয়া আসিত ..

মার্তসিনীর বুক ফাট ফাট করে।—

তু তনাথও কঁাদিল বিস্তর, কলাপ কিছুদিন রোগীব প্রলাপের মত অসহ্য হইয়া রহিল।.

সংসারে শোকতাপ আছেই—

আবার ‘ভগবদেচ্ছায়’ মানুষ শোকতাপ ভুলিতেও পারে।.....দিন দিন দূরত্ব বাড়িতে  
বাড়িতে মণিব শোক কৃষ্ণকান্তের ‘ভগবদেচ্ছায়’ গৃহ হইতে একেবারে নিতান্ত হইয়া গেল।.

ভূতনাথ পুনরায় কলাপে মন দিল।—

কৃষ্ণকান্ত ভূতনাথের পুনবায় বিবাহ দিলেন, বলিলেন,—স্বয়ং শিব দুবাব বিবাহ  
করিয়াছিলেন।. কিন্তু অশৌচনুষ্ঠির পব অষ্টাহের মধ্যে শিবের পাত্রী হিব হইয়া গিয়াছিল  
কি না তাহা তিনি উল্লেখ করিলেন না।—

এবার পণ পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা...কিছু লোকসান গেল।

মণি মরিয়া পাত্রীহিসাবে ভূতনাথের জীবনে খাদ মিশাইয়া দিয়া গেছে, বৈবাহিক মূল্যে  
কিছু লাগেন হইয়াছে, তটি কৃষ্ণকান্তের দুইশত টাকা —

কিন্তু নোটটি এবার আরো ভাল .

চমৎকার একটা সুহসিত প্রসন্ন লক্ষ্মীশ্রী অনুপমার মুখপদ্মে বিরাজ করিতেছে—

যেন “বালাকিসিন্দুরশোভিত” উষা,... সেইদিকে চাহিয়া মার্তসিনীর চোখের পলক পড়িতে চাহে না...অনুপমা স্বস্তির দৃষ্টির অর্থ বুঝিয়া মুখ ফিরাইয়া হাসে।—

মার্তসিনী খুরিয়া ফিবিয়া আসিয়া বধূর মুখের উপর একবার করিয়া চোখ বুলাইয়া লইয়া যান . যেন তাঁর চতুর্দিকেই খর বৌদ্ধ..তাব ঝাঁঝে চক্ষু পাড়িত হইয়া ওঠে তাই বধূর রূপেব শীতাজ্ঞান তিনি বারম্বার চোখে মাখাইয়া লইয়া যান।

কিন্তু অদৃষ্টে তাঁর দুঃখ লেখা ছিল—

তাঁই একদিন আহ্লাদে গদগদ হইয়া মার্তসিনী মনের কথাটাই বধূকে বলিতে গেলেন, কিন্তু কথাটা সুস্পষ্ট না হওয়ায় ফল উল্টা দাঁড়িয়া গেল। ...

বৌমাঝ খাসকামরায় যাইয়া মার্তসিনী হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—বৌমা, তোমার আর বাপেব বাড়ী যাওয়া হবে না বাপু।

—অর্থাৎ তোমার ঐ মুখখানিকে আব চোখের আড়াল করব্বিনে. .

কিন্তু বৌমা অত্যাশ্রয়িনী নয়।—

শাওউব অভিনাশ শুনিয়া অনুপমা তার অনুপম চক্ষু দুটি ভূনিয়া সোজা মার্তসিনীকে দিকে চাহিল এবং মার্তসিনীর আশা-আকাঙ্ক্ষা-আহ্লাদ ঘূর্ণাবায়ু মত আবর্তিত হইতে হইতে কোথায় যে মিলিইয়া গেল তার চিহ্নও বহিল না। . সে দৃষ্টির অর্থ যে কি. . প্রাণভবা কিন্তু অপ্রকাশিত আশাব পারেই এ যে কত কঠিন নিরাশ্বাস. . উগ্র মনের কতখানি উত্তাপ যে ঐ মুখখানির স্নিগ্ধ আবরণ ছাপাইয়া নিঃস্পন্দক দৃষ্টির পথ ধরিয়া বাহিল হইয়া আসিয়াছে ..তাহা শুধু অনুভব করে মানুষের অস্পষ্টপ্রমাণ প্রাণপুত্তলী।—

মার্তসিনী প্রাণ বধূব সেই দৃষ্টির অগ্নিবর্ষণেব সম্মুখে দাড়াইয়া থবথব করিয়া কার্পতে লাগিল ..

মার্তসিনী সামলাইয়া লইয়া বলিলেন,—কিন্তু মনে করো না, মা, তোমার মুখখানি -- কথা কথটি উচ্চারিত হইয়াই অশ্রু-বেদনায় তাঁর কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়া গেল।

একান্ত আপনাব জ্ঞানে নূতন বধূব প্রতি এই তাঁর প্রথম অসঙ্কোচ মূল্যপ্রাণ সম্ভাষণ।

বুকভবা সোহাগেব আনো কত কথা বলিবাব ছিল—

পাষাণী এহা বলিতে দিল না।

মার্তসিনীর মনে হইল, আশাভঙ্গের এই বাথাটা তিনি ভ্রমাস্তবেও ভুলিতে পারিবেন না। ...কিন্তু ভুলিলেন, এবং ভুলিতে তাহাকে ভ্রমাস্তরে পৌছিতে হইল না।...দিন তিনোকেব মধ্যেই তাহাব মাতৃহৃদয় অজ্ঞান সম্ভানেব স্কন্ধিন অপ্রবোধ মার্জনা করিয়া তাহাকে পুনরায় তার উদাব হৃদয়ে বরণ করিয়া লইল।—

ভূতনাথ কলাপ সমাধা করিয়া এখন মুগ্ধবোধ আবস্ত করিয়াছে। . পিত, বায়ু, কথ— ইহাদেব কোনটাব প্রাবলা কোন্ নাড়ীতে প্রকট হয় পিতাব উপদেশে তাহাও সে অল্প অল্প হৃদযন্ত্রণ করিতে পারিয়াছে।—

কিন্তু অনুপমা নাক সিট্কাই --

বলে,—কববেস্তী পড়ে কি হবে শুনি ?

ভূতনাথ বলে—কবরের লী ত' আজকাল বেশ মানের কাজ হয়েছে। পয়সাও—

—তা জানি। কলকাতায় গিয়ে বসতে পারবে?

ভূতনাথ যেন অপ্রস্তুতে পড়ে, বলে—দেশেও ত' বেশ পয়সা আছে।

—আমাদের সেই বনমালী কবরের জের মত কবরের হবে ত' তার ত' নেংটি ঘোচে না। আমবা থাকে বলি বোকরের মশায়।—বলিয়া অনুপমা খিল খিল করিয়া হাসে।

ভূতনাথ মর্মাহত হয়—

কবিবাজীকে সে নিজেও বড় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে না, ভ্রঙ্গল কাটা আর গুনো কাঁচা ভ্রঙ্গাল ভেঙে করা কবিবাজী যে হালফাসনের খুব বড় একটা গর্বের জিনিষ ইহাও সে মনে কবে না, তবু কবিবাজী সে হইবে..... অদৃষ্টের লিখন তাই—

তাই নিজের স্ত্রীর মুখে সেই কবিবাজীর প্রতিই অপার অবজ্ঞার কথা গুনিয়া সে সত্যাকার ক্রোশই পায়।

কিন্তু অনুপমা মার্ণ নয়—

অনুপমাকে ধমক দিলে ধমকের প্রতিধ্বনি যাহা সঙ্গে সঙ্গে ফিবিয়া আসিবে তাহা মূলধ্বনিকে বহু নিম্নে রাখিয়াই আসিবে তাহা সে বেশ জানে।.....

অনুপমা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া থাকে, ভূতনাথ চলিয়া আসিতে পা তোলে। . অনুপমা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে,—তোমার নাম রেখেছিল কে?

—বাবা রেখেছিলেন।

—নামের মানে ত' মহাদেব, নয়? বলিয়া অনুপমা হাসিয়া আকুল হইয়া ২/ । ..

সম্মুখে হাসির মুক্তধারা—

উদ্ভিন্ন নিটোল যৌবন—

মুক্তাশালার মত দস্তপাঁতি—

আরক্ত গণ্ডতট—

ফুল্ল অধরপুট.....

কিন্তু ভূতনাথ ঘামিয়া অস্থির হইয়া ওঠে।....

ঠিক সে ধরিতে পাবে না, কিন্তু তাহার মনের দৃঘাবে কেমন একটা দুঃসংবাদ আসিয়া পৌছায়..... অস্তবের অতি সুকোমল স্থানে সুতীক্ষ্ণ কাঁটার মত একটা ব্যথা ফোটে.. কাহার প্রচ্ছন্ন কায়াব নিষ্ঠূব একটা কালো ছায়া বুক ভুড়িয়া পড়ে.. চাবিদিক অশ্রু-বলয়ে মলিন হইয়া ওঠে...

ভূতনাথ উঠিয়া পড়ে; ধরা গলায় বলে,—আসি এখন।

অনুপমা বলে,—দস্তচূর্ণ পাকে চড়িয়ে এসেছ বুঝি? তা এস।

মাতঙ্গিনী ছেলের কাতর মুখ দেখেন—

তার সর্বস্ত্র মাড়হৃদয়ের কাছে ভিতরেব অনন্ত দুঃখের বার্তাটি ষোলো আনাই আসে....

মনটি তার লুটাইয়া লুটাইয়া ভগবানের পা ধরিতে ছোটে....

কৃষ্ণকান্ত একদিন প্রকাণ্ড এক টাকার তোড়া সিঙ্কুকে তুলিয়া মাতঙ্গিনীকে ডাকিয়া বলিলেন,—বৌমাকে বিশেষ যত্ন-আত্তি করো। গুঁর লক্ষ্মীর অংশ প্রবল।

মাতঙ্গিনী টাকার তোড়াটা দেখেন নাই, হঠাৎ কথাটা বুঝিতে না পারিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন,—এবার পাটে দু'হাজার টাকা মুনোফা হয়েছে।....তার তখনকার তৃপ্তিকু উপভোগের জিনিষ—



দেবনাথ সেখানে উপস্থিত ছিল; মার্ভাসনৌ কিছু বালবার পূর্বেই সে বালিয়া উঠল,— মণি-বৌই ছিল ভাল; এ একটা কি এনেছ দাদাকে বিয়ে দিয়ে। ভুরু তুলেই আছে ! দেমা— কৃষ্ণকান্তের হাতের এক চড় খাইয়া দেবনাথের অনধিকারচর্চা বন্ধ হইয়া গেল। পুত্রবধূতে লক্ষ্মীর অংশ প্রবল হইলেও কৃষ্ণকান্তের মুনাকার টাকা পর বৎসরই এ পাটের টানেই বাহির হইয়া গেল।....

অনুপমার ছুর হইয়াছে—

ছুর অল্পই....

কিন্তু অনুপমা লাথি ছুড়িয়া, কিল ছুড়িয়া, কাঁদিয়া, বায়না লইয়া, বাটা আছড়াইয়া, টেব, পথা ফেলিয়া দিয়া এমন কাণ্ড বাধাইয়া তুলিল যেন লজ্জা-সবন আর সহিব্যুতা বালিয়া সংসারে কোন জিনিসই নাই।... তাহার কাছে ধমক না খাইল এমন লোক নাই.. মার্ভাসনৌ পথা দিতে আসিয়া অকথ্য অপমানিত হইয়া গেলেন... ভূতনাথ চড় খাইতে খাইতে বাঁচিয়া গেল. ... দেবনাথের দিকে ত' সে পা-ই তুলিল।—

যাহা হউক, বহু তাণ্ডব কাণ্ড দেখাইয়া ছুর ছাড়িয়াছে, অনুপমা অল্পপথা করিয়াছে. কিন্তু সেইদিনই ভোররাতে ভেদ আরম্ভ হইয়া বিকাল নাগাদ তার ধাতু বসিয়া গেল। . অনুপমা মণিমাণিক্যের অনুগমন করিল।

মণি মরিয়াছিল, বৈশাখের কাঁচা আম খাইয়া, অনুপমা মরিল, অজীর্ণবোগের উপর ত্রিদ্বশে অর্তিরন্ত ওরুপাক দ্রব্য উদবহু করিয়া।... মার্ভাসনৌ কাঁদিলেন, ভূতনাথ কাঁদিল, দেবনাথও কাঁদিল. কৃষ্ণকান্ত প্রতীবিশগণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বারম্বার চক্ষু মার্ভাসনৌ করিয়া শোক-চিহ্ন গোপন করিতে লাগিলেন; বলিলেন,— বড় জেদী একগুঁয়ে মেয়ে ছিল, ভাই....

ভূতনাথ নূতনতর একটা আঘাত পাইল, মণির মৃত্যুতে যাহা সে পায় নাই।

মণি তাব যৌবনের সহচরী হইয়া উঠে নাই ... সে ছিল খেলার সামগ্রী, মেহের জিনিস, মিষ্ট দৌবাঘোর পাঠী।—

অনুপমার নিকপম রূপ-দীপালির চতুর্দিকে যৌবনের যে রাস-আয়োজন দিন দিন অপর্যাপ্ত নিবিড় হইয়া উঠিতেছিল, তাহারই আবেদন তাহার বৃকে রক্তে দুর্নিবান জাগরণ আনিয়া দিয়া গেছে।.... অনুপমার সমস্ত অকাবণ নির্মমতা অতৃপ্ত তৃষ্ণার খবতাপে বাষ্প হইয়া দেখিতে দেখিতে ভূতনাথের মনোরাজ্য হইতে অদৃশ্য হইয়া যাইত. ... চক্ষুর সম্মুখে তুলিতে থাকিত তার দেহখানা— ইন্দ্রজালের আলোকোৎসবের মত রূপ, আর চির-বিনসিত বসন্তের কুসুমোৎসবের মত যৌবন . তাহাদের অভাবে ভূতনাথের ভূত, ভবিষ্যৎ আব বতমানের দিগন্ত পর্যন্ত একেবারে রক্ষ গুহ কৰ্কশ হইয়া গেছে।...

ভূতনাথের কলাপ, মুদ্বাবোধ এবং পরবর্তী অন্যান্য গ্রন্থ তাড়াতাড়ি কাজ সাবিয়া আনানারীতে যাইয়া উঠিয়াছে।... এখন সে পুরাপুরি একজন কবিরাষ্ট্র।—

কিন্তু বিবাহে তার আর ইচ্ছা নাই।—

কৃষ্ণকান্ত পুত্রের আচরণে দিন-দিন অসহিব্যু হইয়া উঠিতেছেন, এইভাবে আর কিছুদিন চলিলেই সংসারের উপর তাঁহার আর কিছুমাত্র মার্ভাসনৌর ভাব থাকিবে না— এ ভয়ও তিনি স্পষ্টই দেখাইয়া বেড়াইতেছেন।...

স্ট্রীই হইয়াছে আত্মকালকার লোকের যেন মহাশ্রুর সেরা, একটির নিপাতেই সে-সম্পর্কে আর কাহাকেও যেন গ্রহণ করা যাইতে পারে না।...

আগেকারটা— সেটা খর্ববোর মতোই নয়।

..চলাচলম্ ইদং সর্বম্— মরিবে ত' সবাই, দু'দিন আগে, দু'দিন পরে। মূর্থ আর বলে কাকে!.. স্ত্রী মারা গেলে তার ধ্যানেই যাবজ্জীবন কাটাইয়া দিতে হইবে— ইহা কোন শাস্ত্রের কথা!.. এই সৌখীন সন্মাসেব ভাণ আধুনিকতার ফল, যেমন ব্যাপক, তেমনই অসংখ্য।.. মানুষ মরে বলিয়াই ত' পৃথিবীতে মানুষের স্থান হয়: নতুবা এতদিন মানুষকে দলে দলে যাইয়া সমগ্র বাপাইয়া পড়িতে হইত!...

কিন্তু ভূতনাথ একেবারে নিঃস্পৃহ।

ধিকারে, ভরসনায়, অভিযোগে, অনুযোগে, দোহাইয়ে, অনুজ্ঞায়, অনুরায়ে কৃষ্ণকান্ত ভূতনাথকে ঘন ঘন নাস্তানাবুদ করিয়া ছাড়িয়া দিতে লাগিলেন।—

প্রত্যন্তরে ভূতনাথ বলে, — বাবা, আমার মার্জনা করুন, বিবাহে আর আমার রুচি নেই; বরং দেবনাথকে ধবন, সেই সকল বিষয়ে আপনাদের সাধ পূর্ণ করবে।..

কৃষ্ণকান্তকে এ-সব কথা বলা বাৎসল্য, কাহার দ্বারা তাঁহাদের সাধ আশা পূর্ণ হইবে তাহা তিনি পৰিষ্কার জানেন।... তবে কথা এই যে, ভূতনাথকে ছাড়িয়া দিয়া দেবনাথকে ধরিতে তাঁর আপাততঃ তেমন আগ্রহ নাই— নানা কারণে।.. দেবনাথের বিবাহের পরেই ভূতনাথের বিবাহোদ্যম এ-ক্ষেত্রে সৃক্ষতঃ দৃষ্টিকটু না হইলেও, ভূতনাথই অবশেষে আপাততঃ এই আত্মবিক্রম কাবণটা দেখাইয়া যখন তখন বিবন্ধ দিকে ভোর করিতে পারিবে।..

তারপর, এই কাবণেই, পাত্রের বয়স খুবই অল্প হইলেও, কন্যার দিক হইতে বয়স সম্বন্ধেই সন্দেহের একটা কথা উঠিতে পারে। দুইটি স্ত্রী মাঝে গিয়াছে, তাবপব কনিষ্ঠের বিবাহ হইয়া গেছে, তারপর জ্যেষ্ঠের জন্য এই উদ্যোগ.. বয়স বেশী না হইয়াই যায় না, এই সূত্র ধরিয়া পণকে আরো খাটো কবিরাম জন্য একটা টানাটানি চলিতে পারিবে।..

সূত্রবাং কৃষ্ণকান্ত প্রকাশ্যে বলিলেন,— জ্যেষ্ঠ অকৃতদার অর্থাৎ বিপড়াক অবস্থায় থাকতে কনিষ্ঠের বিবাহসংস্কার শাস্ত্র এবং লোকাচার দুইয়েরই বিরোধী প্রচণ্ড অকল্যাণকর একটা ব্যাপার।—

তারপর বলিলেন,— এ ত' নির্বোধেও জানে।

দ্বিতীয়তঃ ভূতনাথের গর্ভধারণার স্বাস্থ্য আত্মকাল ক্রমশঃই যেরূপ দ্রুতবেগে খারাপের দিকে যাইতেছে, তাহাতে তাঁহাকে এইবেলা একটা সহকারী না দিলে তাঁর মৃত্যু ঘটিতেও পারে।

তৃতীয়তঃ, শ্মশানবৈরাগ্য যৌবনের অপরিহার্য একটা ধর্ম হইলেও, সেইটাকেই তাঁরনে স্থায়ী কবিয়া নইয়া প্রাণপণে তাহাকে পালন করিয়া যাইতে হইবে এ ব্যবস্থা গো-মুখেও দিবে না।...

চতুর্থতঃ— যাক, উহারাই কি সাথেই নহে?

মাতঙ্গিনী কিছু বলেন না।

যম তাহাকে দু' দু'বার দাগা দিয়াছে—

তাঁর বধু-জীবন আর মাতৃ-জীবনের চির-লালিত আকাঙ্ক্ষাটি সেই নিষ্ঠুর উপড়াইয়া নইয়া পায়ে দলিয়া দিয়াছে.. সেই বিবর্ণ অকালে হৃদয়চ্যুত প্রিয়তম বস্তুটিব দিকে চাহিয়া তাঁর বুক কাঁপে। নিঃশব্দ ক্রেশ ভুলিয়া তিনি পুত্রের কথাই ভাবেন... সে ঝুঁঝি অসুখী হইবে।..

সেদিকে নিস্তার পাইয়াও ভূতনাথ পিতৃদেবের অবিশ্রান্ত তাড়নায় মরিয়া হইয়াই একদিন বলিয়া দিল, — যা ইচ্ছে কখন...

বলিয়া সে বোধ হয় কাঁদিতেই উঠিয়া গেল।

উল্লাসের বিস্তৃত হাসিতে কৃষ্ণকান্তের মুখমণ্ডল ভরিয়া উঠিল।—

পণ ও পাত্রী ঠিকই ছিল—

দু' দশদিন অগ্রপশ্চাৎ কৃষ্ণকান্ত দু'টিকেই ঘরে তুলিলেন। .

পণ আটশত টাকা।

ভূতনাথের বৈবাহিক জীবনে আরো খানিকটা খাদ মিশিলেও, পাত্রীর রং ময়লা বলিয়া খাদের কথা ও-পক্ষকে কৃষ্ণকান্ত বিন্দুমাত্রও তুলিতে দিলেন না।—

বীণাপাণির রং সুবিধার নয়, কালোই। সুবিধার মধ্যে তার চক্ষু দু'টি আব ভূয়গল; ভুরু দু'টি টানা টানা, চক্ষু দু'টি আবেশে ভরা।—

মাতঙ্গিনীর নিজেব সুখদুঃখ কোনোদিনই তাঁব অস্ত্রবের এবাস্ত নিঃস্ব জিনিষ হইয়া উঠিতে পারে নাই... জলের উপব পদ্মপত্র যেমন ভাসে তেমনি করিয়া মাতঙ্গিনীব সর্বাস্তঃকরণ সংসার-পাথারের বকের উপব ভাসিয়া বেড়ায়...পাথারে যা লাগিলেই তাঁব বুক দুলিয়া উঠে।—

মাতঙ্গিনী চোখে জল আসিতে দিলেন না—

স্বামী তুণ হইবেন,

পুত্র প্রীত হইবে,

অহ্মানবদনে তাই তিনি বীণাপাণিকে তেমনি সোহাগে বরণ করিয়া লইলেন, এবং তাঁহারই হৃদয়ের গাঢ় রসে নববধু নূতন ভূমিতে পল্লবিত হইয়া উঠিতে লাগিল।..

কৃষ্ণকান্ত বলেন, — বৌ কেমন হয়েছে গো?

মাতঙ্গিনী বলেন, লক্ষ্মীটি।

কৃষ্ণকান্তের মনে পড়ে— বিগত দু'টির সম্পর্কেও মাতঙ্গিনী ধনধান্যদায়িনী ঐ দেবীটিরই নামোচ্চারণ করিয়াছিলেন।.. একটা গল্প তাঁব মনে পড়িয়া যায়—

কোথাকার এক তাঁতি...

কিন্তু গল্পটি তার বলা হয় না.. মাতঙ্গিনীব দীর্ঘনিঃশ্বাসের ছোট্ট একটি অস্বুট শব্দ তাঁর কানে আসে।—

দেবনাথ বলে, — এই বৌদিই আসল বৌদি। আগের দু'টো ভালো ছিল না।.. একটু থামিয়া আবার বলে,— প্রথমটা ছিল নেহাৎ ছোট, গরজ বুঝত না। তারপরেরটা ছিল বদমেজাজী। এইটে বেশ...

মাতঙ্গিনীর প্রাণ ছাঁৎ করিয়া ওঠে, বলেন,— বেশ কিসে রে?

--- কথায় বার্তায় আলাপে আদরে বেশ।

ওনিয়া, প্রথর মধ্যাহ্নের উপর মেঘেব চঞ্চল ছায়ার মত, মাতঙ্গিনীর বকের ভিতর দিয়া কিসেব একটা সুখকর সূশীতল মৃদুস্পর্শ ভাসিয়া যায়।.. কিন্তু পরক্ষণেই তিনি চমকিয়া ওঠেন।.. সারাজীবন ভরিয়া শুধু মানুষকে আপন করিয়া তুলিয়া তিনি দিনান্তের বহু পূর্বেই তাহাকে বিসর্জন দিয়া আসিয়াছেন... তবু আপন করিয়া লইবার মহালোলুপতা তাঁর আত্মিও তেমনি জাগ্রত.. মাতৃ হৃদয়ের সে-ক্ষুধা যম হরণ করিতে পারে নাই। . প্রাণপণে সেই ক্ষুধাটিকে দমন করিবার চেষ্টা তাঁর আসিয়াছে।..কিন্তু এ যে কথায় বার্তায় আলাপে আদরে বেশ!—

ভূতনাথ মণিকে হাত ধরিয়া টানিয়া কাছে লইত —

তার ঘোমটা লইয়া কাড়াকাড়ি করিত —

কত খেলা, কত আনন্দ, কত কৌতুক।...

অনুপমাকে সে লুকাইয়া দেখিত, হঠাৎ দেখা দিত। নিজেকে সহস্র চতুর অভাবনীয় উপায়ে তৃপ্ত করিবার লালসায় সে ছটফট করিয়া বেড়াইত।

কিন্তু বীণাপাণির কাছে সে আসে শান্ত হৃদয়ে... বাড়ির পর ঢেউ আপনি থামিয়া স্রোতের অন্তর ব্যাপিয়া শুধু একটা নিঃশব্দ ক্ষিপ্রতা রহিয়াছে।—

বীণাপাণি জানে, স্বামী পূর্বে দু'বার বিবাহ করিয়াছিলেন; স্ত্রী দু'টিই সুন্দরী ছিল।—

সে কালো।—

মাতঙ্গিনী দূর দূর বৃকে ভাবেন, ছেলে অসুখী না হয়।

তার মনের দৃষ্টিভঙ্গি মনেই পরিপাক পাইতে পাইতে সহসা এক সময় দুঃসহ হইয়া শুধু একটি প্রশ্নেই আত্মপ্রকাশ করিতে চায়।... বলেন,— সব জানো ত' বৌমা, আগেকার কথা?

বীণাপাণির বৃত্তিতে কিছুই বাকি থাকে না। বলে, —জানি, মা।...তারপর মনে মনে বলে, আমি যে কালো।—

মাতঙ্গিনী তার মনের কথা কি কবিয়া টের পান বীণাপাণি তা জানে না; তার মুখচুসন করিয়া বলেন,— মা আমার কালো, কিন্তু কালোতেই কেমন মানিয়েছে।

এটা সাঙ্ঘ্যের কথা—

শাশুড়ীর এই মমতাপূর্ণ ছলনায় বীণাপাণি একটু হাসে, হাত বাড়াইয়া স্বশ্রম পায়ের ধূলি লইয়া বলে,— তুমি ভেবো না, মা..

মাতঙ্গিনী অবাক হইয়া যান—

তার লুক্কায়িত উদ্বেগ কি কবিয়া বধুর কাছে ধরা পড়িল!...

আশীর্বাদ করেন, — জন্ম এয়োতি হও।

মণি শাশুড়ীর সঙ্গে সঙ্গে ছায়ায় মত ঘুরিত— কতক ভয়ে, কতক কৌতুকে, মনের কথা সে বৃত্তিত না, কাজ পণ্ড করাই তার দস্তুর ছিল, দৈবাৎ উৎরাইয়া যাইত। মাতঙ্গিনী বকিয়া বকিয়া পরক্ষণেই তাহাকে কোলের ভিতর টানিয়া লইতেন। মণিকে তিনি আপন পেটের অবাধ সন্তানের মত ভালবাসিয়াছিলেন।—

অনুপমা প্রকাশ্যে একবারে হাতে-কলমে পায়ে না তেলিলেও, আমল প্রায়ই দিত না।... দরদ বোঝা আর বুঝিয়া দেখা তার বড় ছিল না।... তবু মাতঙ্গিনী তাহাকে ভালবাসিয়া-ছিলেন— পুত্রের প্রিয়তমা বলিয়া। অলক্ষ্যে থাকিয়াই তিনি বৃত্তিতে পাবিতেন, বধুকে পাইয়া পুত্র এক হিসাবে চরিতার্থ হইয়াছে।—

কিন্তু বীণাপাণি একেবারে অনাবকম—

অতিশয় শাস্ত্র, অথচ এমন তীক্ষ্ণদী যে মাতঙ্গিনীর বিস্ময়ের অন্ত থাকে না— কি কবিয়া অতটুকু মেয়ে তার মনের সুদূরতম প্রাপ্ত পর্যন্ত একেবারে যেন স্পষ্ট দেখিতে পায়!—

মাতঙ্গিনী পরের হাতের সেবা কখনো পান নাই। সেবা কি মধুর সামগ্রী সে স্বাদ তিনি বীণাপাণির হাতে প্রথম পাইলেন।—

অলক্ষ্যে থাকিয়াই মাতঙ্গিনীর সর্বান্তঃকরণ অশেষ সুখের সঙ্গে অনুভব করে, পুত্রের মন বসিতেছে।... এ বসায় কলরব নাই, উদ্দামতা নাই, বিক্ষোভ নাই; জয়-পরাজয়ের গন্ধার নিঃশ্বাসে তাহা উত্তপ্ত নহে... এ বসা শুধু একটা রসঘন নির্মল মধুরতার মাঝে নিষ্কম্প শান্ত আত্মসমর্পণ।—

ভূতনাথের পসার হইয়াছে—

কিন্তু সব জিনিষেরই “মূল্যাদি” অত্যধিক বাড়িয়া যাওয়ায় সংসারের ‘নাই নাই’ রবটা যেন থামিয়াও থামে না।...

মাঝে মাঝে কৃষ্ণকান্তের নামে মণিঅর্ডারে টাকা আসে; কে পাঠায়, কেন পাঠায়, কে জানে; কৃষ্ণকান্ত সাবধানে লুকাইয়া টাকাটি গ্রহণ করেন।

কিন্তু হঠাৎ একদিন কিছুই লুকান বহিল না।...

দূরের এক রোগীর লোক আসিয়া কৃষ্ণকান্তকেই চাহিয়া বসিল— তাঁহার পরিচয় তরুণ কবিরাজ ভূতনাথকে সে কিছুতেই মঞ্জুর করিল না... রোগ বড় কঠিন—

কৃষ্ণকান্ত অতীব অনিচ্ছার সহিত পাক্ষীতে যাইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহার পাক্ষীও দৃষ্টিবাহিত হইয়া গেলে, মণিঅর্ডার আসিয়া পড়িল।—

বাণাপাণির পিতা পাঠাইয়াছেন, দশটি টাকা।—

ভূতনাথের বুদ্ধি কলাপ অধ্যয়নকালেই স্থূল ছিল, কিন্তু আত্মকাল অন্ততঃ বহিরাবরণ ছিন্ন করিবার মত ধারালো হইয়াছে। ... টাকা দশটি পূর্বোভাগে রাখিয়া ঝঁকায় দুটি টান দিতেই সমগ্র ব্যাপারটি তাহার কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। ... রঙের অপরাধে পুত্রবধূর পিতাকে মাসে মাসে জ্বিমানা দিতে হইতেছে।—

...এবং এই ব্যাপারের সূত্র সুদূর ইতিহাসটাও তার অজ্ঞাত রহিল না... অপরাধিত্রাটিকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি পুনরায় গোলাপ আহরণ করিয়া নিবেন যদি—

ঐ এক কথাতেই বিষম ভয় পাইয়া কালো মেয়েব বাপ ছেলের বাপকে সংযত পাঁথিতেছেন।...

আরো একটা নিদারুণ অতি ভয়ঙ্কর সন্দেহ ধারে ধীরে ভূতনাথের মনে স্থিতিলাভ করিতেছিল। . কি হেতু অবলম্বন করিয়া অসহ্য সন্দেহের উদ্ভব তাহা তাহার নিজের কাছেই একটা দূরত্ব হৈমালিব মত, অথচ সন্দেহটা যে আদৌ অনুলক নয় এ বিশ্বাসও অনিবার্য, যেন নিজেই তেরী হইয়া উঠিয়াছে।

কৃষ্ণকান্তের পাক্ষী অনেক বেলায় উঠানে আসিয়া নামিল; এবং তিনি বিশ্রামের জন্য অন্তরে না যাইয়া হাঁস্ফাঁস্ করিতে কবিত্তে বাহিরের ঘরে ঢুকিয়াই এমনভাবে থমকিয়া গেলেন যেন চূরি করিতে আসিয়া অন্ধকারে একেবারে পাহারাওয়ালারই ঘাড়ে পড়িয়াছেন।—

ভূতনাথের কোলের কাছেই দশটি টাকা ‘সাজান’ রহিয়াছে, এবং তাহার শ্বশুরের নামসম্বলিত কুপনখানাও রহিয়াছে . তাহারাই এই মহৌষধির কাত করিয়াছে।

ভূতনাথ টাকা দশটির দিকে চাহিয়া বলিল, —শ্বশুর আপনাকে দশটা টাকা পাঠিয়েছেন। কেন?

কৃষ্ণকান্ত সহসা প্রগল্ভ হইয়া উঠিলেন— তর্ তর্ করিয়া বলিয়া গেলেন,— তোমাকে বোধ হয় সাহায্য করেছেন। অতি অমায়িক সম্ভজন তিনি। একখানা চিঠিতে একবার লিখেছিলাম তোমার কথা, যে শ্রীমানের বড় টানাটানি; তাই বুঝি তিনি মেয়ে জামাইকে—

বলিতে বলিতে কৃষ্ণকান্ত অমায়িক সম্ভজন প্রেরিত টাকা দশটি ভুলিয়া লইয়া পুত্রের সম্মুখ হইতে পালাইয়া যেন বাঁচিলেন।

কিন্তু মানুষের দুর্ভাগ্য অত সুলভে নিম্ভুতি পায় না—

ভূতনাথের পিতৃভক্তি যেন পিতাকেই পদে পদে তেমনি সবেগে অনুসরণ করিয়া নিঃশেষ হইয়া বাহির হইয়া গেল। ... তাঁহার উচ্চারিত মিথ্যাকথাগুলির বিনাশ কিন্তু অত সহজে ঘটিল না.... তাদের ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির পর প্রতিধ্বনি জাগিয়া প্রতি মুহূর্তে কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া দুর্ভাগ্য ভূতনাথের কর্ণবিবরে আর্বাতিত হইতেই লাগিল।

ভূতনাথের শ্বশুর আর টাকা পাঠান না; ভূতনাথ অভয় দিয়া নিষেধ করিয়া তাঁহার জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া দিয়াছে। সুযোগ পাইয়া অর্থাৎ জামাতাকে নিজের তরফে পাইয়া, বলরামবাবু কৃষ্ণকান্তকে স্পষ্টভাষায় ধাপ্লাবাজ অর্থপিশাচ প্রভৃতি কুকথা না বলিলেও, পত্রে যাহা বলিয়াছেন তাহা লাঠি উন্টাইয়া ধরিলে কোংকার মত একই ভ্রিনিস।—

কৃষ্ণকান্ত পুত্রের সঙ্গে বাক্যলাপ একপ্রকার বন্ধ করিয়াই দিয়াছেন। ... জন্মদাতা পিতার অপেক্ষা কন্যাদাতা পিতা সম্পর্কে হইল বড়— আর তারই স্বার্থ হইল বড়!... অমন ছেলেব— ইত্যাদি। .. অসহ্য হইয়া সংস্কৃত এক শ্লোকই তিনি আঙড়াইয়া দিলেন।

মূর্থ পুত্রের জন্মদাতার যত কষ্ট সব সেই শ্লোকেব অক্ষরে অক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে।—

বীণাপাণির ভ্রুব।

ভ্রুব অল্প, কিন্তু তাহাতেই মাতঙ্গিনীর বুকের ভিতর পৃথিবীব দূশ্চিন্তা দাবান্নব দাহ লইয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে, .. আকুলিবা্যকুলি কেবলি মধুসূদনকে ডাকিয়া ডাকিয়া উৎকণ্ঠায় উদ্বেগে তাঁব জিহ্বা শুকহিয়া অনড় কাঠ হইয়া গেছে।...

আব দুটি এমনি করিয়াই মায়া কাটাইয়াছিল।

কিন্তু এবার মধুসূদন তাঁহার ডাকে বিচলিত হইয়া প্রাণরক্ষক দূত পাঠাইয়া দিলেন।

সন্ধ্যার পর বীণাপাণি একলাটি শুইয়া আছে, মাতঙ্গিনী এতক্ষণ তাহাকে কোলেব কাছে করিয়া বসিয়াছিলেন, তাহাকে পথ্য দিয়া এইমাত্র উঠিয়া গেছেন।

— বৌমা, কেমন আছ? বলিয়া কৃষ্ণকান্ত আসিয়া দাঁড়াইলেন।

বীণাপাণি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিল,—ভালই আছি, বাবা।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন,— কিছু খেয়েছ?

— খেয়েছি।

— কখন?

— এখনি খেলাম।

— তবে কিছুক্ষণ বাদে এই ওষুধটা খেয়ে ফেলো। বলিতে বলিতে কাপড়ের খুঁটেব আড়াল হইতে খল বাহির করিলেন। বলিলেন,— ভ্রুব যদি আবার আসে তবে ছেলেমানুষ বড় কষ্ট পাবে; আগে থেকেই সাবধান হওয়া ভালো। এই খাটের পায়ার কাছেই রইল কাগজঢাকা, নিজেই উঠে খেয়ে ফেলো’।

বীণাপাণি কহিল,—আচ্ছা।

ভূতনাথ কোথায় ছিল কে জানে—

কৃষ্ণকান্ত বাহিব হইয়া যাইতেই সে শশবাস্তে ঘরে ঢুকিয়া বলিল,— বাবা এসেছিলেন দেখলাম। তিনি কি ওষুধ দিয়ে গেলেন?

বীণাপাণি বলিল,— হ্যাঁ। কেন?

স্বামীর কণ্ঠস্বরের অর্থটা সে বুঝিতে পারিল না।

— খাওনি ত’?

বীণাপাণি নিবর্তনীয় বিম্বিত হইয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিল।.... এ ব্যাকুলতার অর্থ কি? . বলিল,— না। কেন বলো না?

— কোথায় সে ওষুধ?

খাটের ঐ পায়ার কাছে ঢাকা রয়েছে দেখো।

ভূতনাথ ঔষধের খল লইয়া বাহির হইয়া গেল।

কৃষ্ণকান্ত কবিবাক্ত তাকিয়ায় ভর দিয়া অর্ধশায়িত অবস্থায় পরম ভূঁপ্তর সহিত চোখ বুঁজিয়া সটকা টানিতেছিলেন—

কিন্তু এ সুখ তাঁর আদৃষ্টে টিকিল না।

মানুষের পায়ের শব্দে চোখ খুলিয়াই তিনি সামনে যেন ভূত দেখিলেন— এমনি অপরিসীম ব্রাসে তাঁর সর্বশরীরে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া মুখ দিয়া কেবল একটি অর্ধোচ্চারিত স্বল্পগীবী আর্তনাদ বাহির হইয়াই কণ্ঠ নিঃশব্দ হইয়া রহিল।...

ভূতনাথ সেদিকে দৃকপাতও করিল না, একটু হাসিয়া বলিল,— এ বৌটার পবনায় আছে, তাই কলেবায় মরল' না, বাবা। . পাবেন ত' নিজেই খেয়ে ফেলুন। . . বলিয়া সে ঔষধসম্মত হাতের খল আড়ষ্ট কৃষ্ণকান্তের সম্মুখে নানাইয়া দিল।

## চোর মাধুরীলতা

সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়— কলুর ছেলে, বাপ-দাদার মত ঘানি ঠেলে খাব তা না, ইন্সুলের মাষ্টার মশাই পাঁচুদা বাবার মাথায় কি খেয়াল ঢুকিয়ে দিলেন, সে একেবারে পণ করে বসল ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে ভদ্রর লোক করবে। তা বেশ! ভদ্রর লোকের ছেলেবা লাঙ্গল ধরতে শিখুক আর চাষাভুষোব ছেলেওলো কানে কলম ওঁড়ুক—সব উন্টে না হলে আর কলিকাল বলবে কেন! একেবারে একটানা গোরুর লাভ মল্তে মল্তে বাবার মেলাভ হয়েচে একরোখা। ভদ্রর লোক হতে হবে যখন একবার তাব মুখ দিয়ে বেরিয়েছে তখন মেবে-পটে ভদ্রর না করে আমাকে ছাড়বে না।

মাষ্টার মশাই বিপদটি ঘটালেন; কিন্তু লোকটি খাসা, একেবারে সদাশিব। তাঁব হাতে আমাকে সাঁপ দিয়ে বাবা ভাবলে ছেলের জনো আর ভাবতে হবে না, বিদোব সাগব লাফ দিয়ে ডিঙিয়ে ছেলেটা সংসারে একটা বিপরীত লক্ষ্যকাণ্ড কবে বসবে। যতক্ষণ বাড়ী থাকতুম বাবা একদিকে গোরুকে ঠেলা দিত, একদিকে আমাকে। বই হাতে করে চোঁচিয়ে পড়তে হত। ঘানির কাঁচকাঁচনির সঙ্গে সুর মিলিয়ে দুই গালে হাত দিয়ে কনুই দুটো দুই হাঁটুর উপব রেখে পিড়িতে বসে কপালে চোখ তুলে দুলতে দুলতে সুর করে চোঁচাতুম “কয়ে আকাব ক— কাক”, “দুই একে দুই, দু দুওণে চার।” গোরুওলো ভাবত ছোঁড়াটা আমাদের চেয়েও অধম, ঘানিও ঠেলে না, তেলও বেব করে না, শুধু শুধু চোঁচিয়ে মারে। তাব উপরে চোখে তুলির আরামটুকুও আমাব ছিল না— বইয়ের পাতার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে হত।

বহুর কানমলার ভিতর দিয়ে যখন কথামালায় পৌঁছলুম, বাবা আব থাকতে পাবন না, সহর থেকে একসঙ্গে একজোড়া ভূতো আর একটা ছাতা কিনে আমাকে ভদ্রব আনাব পয়লা ধাপে চড়িয়ে দিল। সেই থেকে আমার বইয়ের বোঝা যত বাড়তে লাগল সঙ্গে সঙ্গে বাবুয়ানার আসবাবও বাবা যোগাতে লাগল।

দশ বছর বয়সে একটি চার বছরের মেয়ের সঙ্গে আমাব বিয়ে হল। মা ছিল না, দেখাব কেউ নেই বলে বাবা অনেক দিন বউ ঘবে আনেনি। আমাকে মাঝে মাঝে শ্বশুর বাড়ী পাঠাত বটে কিন্তু সেখানে স্ত্রীর ঠাকুমার সঙ্গেই আমার আসব জন্মত, সুতরাং স্ত্রী যে কি বড় তখন পর্যন্ত মালুম করিনি।

যে বছর ছাত্রবৃত্তি দেব একদিন হাট-বারে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে হাট থেকে ফিবে এসেই বাবার খুব চেপে ছুর এল। রাগে আমাকে বাঘে, “ওরে ন্যাপলা! বৌমাকে আনতে পাঠা, তাকে অনেকদিন আনা হয়নি।” বৌ এল, কিন্তু তার সেবা বাবা বেশিদিন ভোগ করল না, ভাদ্র মাসের দিনসাতেক থাকতেই সংসার থেকে বিদায় নিল। দিনকতক এমন হল, বাড়ীতে ঢুকতেই প্রাণ হাঁপিয়ে উঠত। দাওয়ার উপর সেই তার প্যাঁড়েখানি, দেওয়ালের গায়ে পেরেকে ঝোলানো ছেঁড়া ছাতা, দরজার পাশে ছাঁকোটি, সব ঠিক আছে, কেবল নেই আমার বাবা। ছেলেবেলা থেকে মাকে পাইনি, বাবার কোলেই মায়ের কোল পাতা ছিল। একটি দিনের তরেও মনে পড়ে না যে বাবা কখনো গায়ে হাত তুলেছে।



যানি ত ছেড়েইচি, তার পরে আবার বই ছেড়ে এবাব বৌ নিয়ে পড়লুম। পরিবারটি আমার নেহাৎ নিম্নের ছিলনা, কিন্তু কি বলব, দেহে তাব রাগটা বড় বেশি। তেব বছর তার সঙ্গে ঘর করেছি তবু বেঁচে আছি,— মানুষের প্রাণ এতই কঠিন! সে যখন রাগত পোষা কুকুরটার ল্যাঙ্গটা তার পেটের সঙ্গে সমান হয়ে যেত, আমার ল্যাঙ্গ নেই কিন্তু সমস্ত দেহটাকেই ঐ ল্যাঙ্গের মত ওটিয়ে ফেলবার ইচ্ছে হত।

মেয়েটাকে যখন জন্ম দিলে ভাবলুম এইবারে রাগের ঝাঁজ কিছু মববে। উন্টো হল, আগে একজনের উপর রাগ ফলাত, এখন আরেকটাকে পেলো। ফুলি চার বছরেরটি হলে তাকে এমনি বেদম মার আরম্ভ করল যে, সে আমি দেখতে না পেলে বাইরে বেরিয়ে পড়তুম। বম্বে বিশ্বাস করবে না, অসহ্য হয়ে দুই একবার তাকে মেরেওচি— কিন্তু সে মার শেষকালে গিয়ে পড়ত আমাব ফুলুর পিঠেই, তাতে তার দুঃখের হিসেব বেড়েই চলত।

কিন্তু আমার ফুলরাণীর কি সহ্যওণই ছিল! তাব একটি-মাথা ভোমরার মত কালো কুচকুচে কৌকড়া কৌকড়া চুল ছিল, সে চুল মুঠো করে ধরে তার মা যখন দেওয়ালে মাথা ঠুকে দিত, ওগো, তখন যে আমি উন্মাদ হয়ে যাইনি, সেইটেই আমার জীবনের সব চেয়ে আশ্চর্য্য! বলিনি, তাব কি সহ্যওণই ছিল? চোখ দিয়ে দবদর করে জল পড়ছে, আব আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলচে, “বাবা তুই ভয় পাস্নে বাবা। আমাব কিছু লাগেনি। আমি তো লাগে বলে কাঁদিনে, মা আর মারবে না, ছেড়ে দেবে বলে কাঁদি।” সেই একরকমি দুধের মেয়ে, তার সে সব কথা মনে হলে বুক ফেটে যায়।

আবার এদিকে ফুলুর মা তাকে যত্ন করতে কসুর করত না। সাজিমাটি দিয়ে তার কাপড কেচে একেবারে ধবধবে কবে রাখত, সে যা যা খেতে ভালোবাসত নিজের হাতে তৈরি করে রেখে দিত। ফুলি কোনো জিনিষের জন্যে আবদার ধরলে সে যেমন করে-হোক সাত কোশ তফাতে হেঁটে গিয়েও তাকে জুগিয়ে এনে দিত। কে জানে বাপু মেয়ে মানুষের মন, যাব জন্যে কোনো কষ্টকে কষ্ট বলে গায়ে মাখত না, বুঝি না তাকে আবার কোন্ প্রাণে ধরে ধরে ঠেঙাত!

এই সময় ফুলির বোভ ঘুসুঘুসে ভুব আসতে লাগল— বোধকরি কোন রকম ঠাণ্ডা লেগেছিল। সেই জুরে একেবারে মাকে তাগ করল। মাব কাছে শোবে না, মার হাতে ওখুখ খাবে না, আমি যাবে না থাকলে এক খোঁটা জলও মার হাত থেকে নোবে না।

সেদিন ফুলির জুরটা বেড়েছিল। পিঙ্গীম ছেলে দিয়ে বৌ পথি তৈরি কবতে গেল। আমি ফুলুকে গল্প বলে ভোলাবার চেষ্টা করছিলুম। খানিকক্ষণ চুপটি করে থেকে আমাকে ডাকল, “বাবা!”

“কেন রে?”

“আমার নাম ফুলরাণী হল কেন সেই গল্প বল।”

“বলছি। আমাদের উঠানে তোর ঠাকুর্দা অনেক ফুলগাছ লাগিয়েছিল। তুই যখন হলি, সবগাছে তখন ফুল ধরেছিল। একদিন তোর মা একখানা কাঁথা পেড়ে সেখানে তোকে শুইয়ে রেখে কি করতে ঘরে গেল। আমি চেয়ে চেয়ে দেখি যত ফুল ফুটেছে সব চেয়ে আমার ছোট্ট ফুটফুটে মেয়েটি সেরা, তাই তোর নাম দিলুম ফুলরাণী।”

“দেখ বাবা, আজো ঠিক তেমনি ফুল ফুটেছে।” চিরদিনের মত ফুলুর কথা বন্ধ হল, আমার কাঁধে তার মাথাটি লুটিয়ে পড়ল। কতক্ষণ এমনি করে তাকে নিয়ে বসে রইলুম জানি না। কেহ্ন সময় তাকে বিছানায় শুইয়ে রান্নাঘরে ছুটে গিয়ে চৌচিয়ে উঠলুম—

“ওরে সয়তানী, আর আমার ফুলবাণীর চুলের মুঠি তুই ধরতে পারবিনে রে! সে তোর কাছ থেকে পালিয়ে গেছে।”

কথাটা কিছু কড়া হল। তখন কি আমার জ্ঞান ছিল? কিন্তু সে দিন থেকে তার মুখে আর রা ছিল না। যখন তার মাথায় রাগ চাপত সে দুই হাতে নিজেকে ধরে ঝাঁকানি দিত, তাতেও ঠাণ্ডা না হলে কবাটে মাথা কুটে রক্তপাত করে ছাড়ত।

এই রকম কোনোমতে দিন কাটতে লাগল। একদিন আমরা দুজনে পথের ধারের ভাঙা বেড়াটা সারছি, দেখি একটি ছোট মেয়ের চুল ধরে টানতে টানতে এক মাগী রাস্তা দিয়ে হন হন করে গালাগাল দিতে দিতে চলেছে, আর মেয়েটা, “ওমা, আব মারিস না বে না, আব মারিস না বে!” বলে ফুকে ফুকে কাঁদছে, আর থেকে থেকে তার মাঝে ঈর্ষা জড়িয়ে ধরছে। আমার স্ত্রী সেই শুনে পাগলের মত ছুটে চলে গেল, পরের দিন বায়েদেব পুকুরে তার দেহ ভেসে উঠল।

আমি শুধু বাকী রইলুম। আমি ঘরের ভীষ, ঘরটি আমার ভেঙে গিয়ে আমাকে ভাসিয়ে দিল। সারাদিন বাইরে বাইরে কাজ করি কিন্তু কার জন্যে এত খাটছি যখন চেষ্টা হয় সমস্ত শরীর মন ভেঙে পড়ে।

একদিন পাঁচুদাদা বল্লেন, “দাখ ন্যাপলা। তোকে এত বলি তবুও তুই দ্বিতীয় সংসার করবি নে। এক কাজ কর। হোর ফুলির মত একটি ছোট মেয়ে নিয়ে মানুষ কর, মনে করিস হোর ফুলিই ফিরে এসেছে।”

এ ত মন্দ কথা নয়।

মেয়ের খোঁজে ফিরতে লাগলুম। নিজের জাতের মধ্যে কাউকে পেলাম না যে মেয়ে বিনিয়ে দিতে চায়। শেষে অনেক খোঁজ করে একটি মেয়ে পেলাম।

সে বোবা আর কালো। নইলে মেয়ে দেবে কেন?

তার মাথাভরা কালো কোঁকড়া চুল দেখেই আমি তাকে কোলে তুলে একেবারে বাড়ী নিয়ে এলুম। এরও নাম দিলুম ফুলরাণী। সে ত কেবল মানুষের মত নয়, অবোলা ভ্রমুর মত আমার পোষ মানলে— যেখানে যাই সঙ্গে সঙ্গে ফিরত, এক মুহূর্ত আমাকে ছেড়ে থাকতে চাইত না। সে কখন আপনা-আপনি আমার ঘরের কাজ বাগানের কাজ শিখে নিল, দিনের মধ্যে কখনো তার হাত কামাই যেত না।

এ মেয়েকে ত কেউ বিয়ে করবে না, মনে করলুম ভালোই হল, কোনদিন কেঁদে আমাব ঘর থেকে ওকে বিদায় করতে হবে না। কিন্তু পাঁচুদাদা আমার মনের মধ্যে বড় একটা ধোঁকা লাগিয়ে দিলে। সে বললে, মানুষের প্রাণ পাখী, কখন আছে কখন নেই। তুই যদি খানখা মারা যাস ত হলে ও মেয়ের গতি হবে কি?

সে ত ঠিক কথা, এই যে গদাই এত বড় জোয়ান, আমাব চেয়ে পাঁচ বছরের ভেট, তিন দিনের ছুরে মারা পড়ল। কখন কি হয় বলা যায় কি। আমাব অভাবে এ বোবা কালো মেয়ের দিকে ত কেউ ফিরে তাকাবে না। তাকে বল্লেন, পাঁচু দাদা, একটা পবামর্শ দাও!

পাঁচু দাদা বল্লেন, কলকাতায় বোবা-কালাদের শেখাবার জন্যে ভালো ইন্সুল আছে। তুই ফুলিকে সেই ইন্সুলে ভর্তি করে দে, সেখানে ওকে লিখতে পড়তে শেখাবে, আব এমন হাতের কাজ শিখিয়ে দেবে যে, ও নিজের গুজবান নিজেই চালাতে পারবে!

মন ঠিক করতে অনেকদিন লাগল। কাছের খনকে কিছুতেই কাছে বাখতে পারিনে এমন আমার কপালের লিখন। দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বল্লেন, আচ্ছা, কলকাতাতেই পাঠিয়ে দেব। ও যদি আমার সেই ফুলিই হত তাহলে এতদিনে ত ওকে শ্বশুরবাড়ী ঘর করতে হত।

আমাকে ছেড়ে যেতে হবে বলে মেয়েটা ত কদিন ধরে আমার সঙ্গে সঙ্গে কেঁদে কেঁদে ফিরতে লাগল। বোবাব কান্না বড় দুঃখের কান্না, সে কিছুতেই সন্তা করতে পারা যায় না— কিন্তু সেও আমি সইলুম। একদিন পাঁচুদাদাকে সঙ্গে করে নিয়ে আমাব ফুলিকে কলকাতায় ইন্সুলে দিয়ে এলুম। চলে আসবার সময় সে আমাব চাদর চেপে ধরে আমাব নুনের দিকে

চেয়ে রইল। তখন আমার চোখের জল আর কিছুতেই থামতে চায় না। পাঁচুদাদা যদি না থাকত তাহলে তখনি মেয়েটিকে ফিরিয়ে আনতুম।

আবার আমার ঘর খালি! কিন্তু এবারকার এ ফাঁকাটা সে ফাঁকের মত নয়। এ ফাঁক আবার এক দিন ভরে উঠবে। কিন্তু দিন ত কটাতে হবে। ফুলকে মনে করে তার জন্যে একটি শান-বাঁধানো ঘর বানালুম। সেই ঘর সাজিয়ে তোলা আমার এক কাজ হল। আমার স্ত্রী থাকতে আমার যে সব হাঁড়িবাঁড়ি বাসনকোসন ছিল, এতদিন তাব কোন আদর ছিল না। সেগুলি আমি মেজে-ঘষে মেরামত কবে তকতকে করে ওঁড়িয়ে রেখে দিতে লাগলুম। আমার স্ত্রীর গয়না একটা হাঁড়ির মধ্যে ঘরে মেজের নীচে পোঁতা ছিল। সে আর-একবার আমি খুঁড়ে ভুলে নেড়েচেড়ে ওঁগেগেঁগে বোড়েপুঁছে মনে মনে ফুলিকে দান করলুম। ভালো দেখে রবি বর্মার ছবি কিনে দেওয়ালে টাঙিয়ে দিলুম,— একটা মেদিনীপুরের মাদুর এনে তার তক্তপোষের উপর পাতলুম। মনে মনে ভয় ছিল, কি জানি কলকাতা থেকে ফিরে এলে মেয়ের যদি আমাদের ঘবদুয়ারে পছন্দ না হয়।

আমাদের পাড়ার জটাধর রায় এসে উঁকি মেরে বলে, কি নেপালখুড়ো, ঘরে তোমাব লাটসাহেবের নেমস্তন্ন আছে নাকি? আমি হেসে বলি, আটক কি ভাই, কলিকালে সবই উন্টোপান্টা। — আমাদের বানুনপাড়ার চাটুযোদের ছেলেরা এসে আমার ঘব দেখে ও রেগে জ্বলতে থাকে। তাদের ভাবখানা এই, দেখেছ একবার, কলুর বেটা অক্ষর লিখতে পড়তে শিখে একেবাবে নবাব হয়ে উঠেছে। কোনদিন আমাদের সপের উপর এসেই বা বসে। — আমি কথাটি কইনে। এ ঘর যে আমি কার জন্যে সাজাচ্ছি সে ত গাঁয়ের কোন লোক জানে না— তারা বলে, পিঁপড়ার পাখা ওঠে মরিবার তবে!

দুটো বছর গেল, আমার ফুলরাণীব শিক্ষাব মেয়াদ শেষ হল। আমার আকাশ জুড়ে আত্ম আগমনীব গান বাজচে। তখন পূজাব ছুটিব সময়। আমাকে ত প্রতিমা গড়তে হযনি, আমার ঘবে আমার বোবা-কাল্যা মেয়েটির মধ্যে পার্শ্বভী এসেছেন। বানুনপাড়ার চাটুযোদের ঘবে যে প্রতিমা দাঁড়িয়েচে সে কি আমার এই উনাব চেয়ে বেশী কথা কইতে পারে?

আমার সব সাধ মিটল। আমার মত হতভাগা যা আশা করতে পাবে তার চেয়ে অনেক বেশী সুখে আমাদের দিন যেতে লাগল।

কিন্তু কাছের ধনকে দূরে নিয়ে যাবার জন্যেই ভগৎ জুড়ে দিনরাত ষড়যন্ত্র চলচে। বিধাতার একটা কোন পেয়াদা আছে, সে হাতব গাঁথতে দেবে না, সে সুতো ছিঁড়বে। এবাব আমার বুকের মাণিককে বাইরে ছিনিয়ে নেবার জন্যে কোথা থেকে একটা দূত এসে উপস্থিত হল। একে কোনদিন চিনিনে কিন্তু তবু ঘরের মধ্যে এর পথ আটক কবতে পারিনি।

বয়স হাব অল্প — পঁচিশ কি ছাব্বিশ হবে। চোখ দুটো কেমন তার ভাবেভোলা বকনের। নখর দেহ, গৌব বর্ণ। তখন পড়ন্ত বেলা, আমাদের বাড়ীব সামনের রাস্তায় তাকে দেখলুম। কিন্তু কোথায় যে সে যাবে, কিছু যে তার দরকাব আছে এমন বোধ হল না, অথচ আমার ঘবেব মধ্যেও আসে না কেন? একবার মনে হল, পথ হারিয়েছে, পথ ভ্রান্তাসা কববার জন্যে কোন মানুষ খুঁজচে ব্যাধ? কিন্তু পাশ দিয়ে গোকুর গাড়ি নিয়ে গাড়োয়ান গেল, তাকে কিছুই ভ্রান্তাসা কবলে না।

আমি খবর থেকে বেঁকিয়ে তাব সামনে গিয়ে দাড়াতে সে চলতে আবস্ত করলে, যেন সে পথিকমাএ, এতক্ষণ যেন সে চলাছিল। তাই দেখেই আমার সন্দেহ হল লোকটার একটা কিছু মংলব আছে। ওকে ডাক দিলুম, “ও মশায়!” কথাটা সে কানেই নিল না। আরো গলা চড়িয়ে বললুম, “শুনছেন মশায়?” শোনারও কোনো লক্ষণ নেই।

যাক্ গে, যে যেতে চায় ওকে যেতে দেওয়াই ভালো— ডাকাডাকি কবে লাভ কি? কিন্তু তার পরে দেখা গেল যেতে মোটেই চায় না, আব ডাকাডাকি যে আমি কবচি তা নয়— যে ভাষগা থেকে ডাক আসচে ঠিক সে ভাষগা, সত্যও মিনহে! সব কথা হ্রমে বলচি।

আমার ফুলুর মুখে কথা নেই কিন্তু কোনাদিন হাসির অভাব ছিল না। তার চোখের কালো তারার মধ্যে পর্যাপ্ত হাসি। কদিন দেখছি সে হাসিও আর বোবা হয়ে এসেছে। বিধাতা তাকে চুপ করিয়েই রেখেছেন কিন্তু সকল দেহ যে তার কথা কইত সেও যেন আজ-কাল বন্ধ, তার শরীরে আর ঢেউ খেলচে না। যদি জিজ্ঞাসা করি, “ফুলি, তোর কি হয়েছে না?” অমনি একমুখ হাসি দিয়ে সে তার জবাব দেয়। কিন্তু সে হাসি যেন কেমন ফ্যাকাশে। আজ পর্যাপ্ত কখনো তাকে এক মুহূর্ত কাজ কামাই করতে দেখিনি— কিন্তু সেদিন সকালবেলা দেখি বাঁশ-তলায় চুপটি করে বসে থিড়বীর পুকুরটার দিকে কেমন হয়ে চেয়ে ছিল। আমার মন খারাপ হয়ে গেল। ভাবলুম, বোবা মন অন্ধকার, সেখানে সব জায়গায় আমাদের দৃষ্টি চলে না, বোধ হয় পূর্বজন্মকার একটা কোন দুঃখ সেখানে ভরা হয়ে আছে।

সেদিন মহাজনদের হিসেব চুকাতে গিয়েছিলুম, ফিরে আসতে সন্ধ্যা এসে। বাড়ীর সামনে আসতেই দেখি সেদিনকার সেই মানুষটা আমারই বাড়ী থেকে বেরিয়ে ঠিক আমার সামনে এসে পড়ল। তাই বটে! চোর না হয়ে ত যায় না। হাত চেপে ধরলুম, দেখি আঙ্গুলে তার আংটি— এই আংটিই ত আমি ফুলুকে দিয়েছিলুম। আংটি ভূমি কোথায় পেলে? কোনো জবাবই করে না। ভারি রাগ হল। তাকে হিড়হিড় করে ঘরের মধ্যে টেনে এনে আমার চাদর দিয়ে কবে তাকে খেঁটার সঙ্গে বাঁধলুম। লোকটা তবু একটা কথা বললে না। তার ভাবখানা এই, আমাকে বাঁধাটা অনাবশ্যক, না বাঁধলেও নড়ব না। ভাবলুম থানা থেকে চৌকিদার নিয়ে আসি, কথা বলাবার ফন্দি তারা জানে।

এমন সময় ঘরে ফুলু এসে পড়ল। লোকটাকে দেখে তার মুখ শাদা হয়ে গেল। হবেই ত, ওরই হাত থেকে ত আংটি ছিনিয়ে নিয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, ফুলু, এ ত তোমার আংটি?— সে ঘাড় নোড়ে জানালে, হাঁ।— আমি বললুম, ভয় কোরো না, একে আমি এখন পুলিসে দিচ্ছি, আর উৎপাত করবে না।

দেখি ফুলুর চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়তে লাগল। যত বলি, কাঁদিস কেন মা, ততই তার কান্না বেড়ে যায়।

আমার এ কাহিনী আর কি বলব? এইটুকু বলিয়েই সবাই বুঝতে পারবে যেখানে এ গল্প শেষ হল সেখানে ফুলির কান্না ফুরিয়ে হাসি দেখা দিল— কিন্তু সে হাসি বং বেল ফুলেব মত ফুটফুটে নয়, রক্ত-করবীর মত লজ্জায় টুকটুকে।

আংটি চুরিটা প্রমাণ হল না বটে কিন্তু চুরি করে নিয়ে গেল যার আংটি থাকে,— আমার ফুলরাণীকে।

কেমন করে জানব, বোবা-কালাদের ইচ্ছুলে পুরুষদের বিভাগে এই ছেলেটা পড়ত, — সেইখানে দূরের থেকে বোবায় বোবায় চোখে চোখে দেখা এবং শোনা দুইই। নিঃশব্দে সব কথাবার্তা হয়ে গেছে, অন্তর্যামী ছাড়া কেউ শোনেনি।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, জাত কি?—জাতে মেলে না। পণ্ডিতের কাছে গেলাম, সে বলে, বিয়ে ত চলবে না।

ফুলুকে এসে বললুম, ও ফুলু, জাতে বাধে যে।— তার মুখ শুকিয়ে এটুকু হয়ে গেল। সে দিনটা আর কিছু বললুম না। রাতও গেল কেটে। পরের দিন তার চোখ দুটো দেখি ফুলে লাল হয়ে উঠেছে।

তখন তার চোখ দুটি থেকে নিধান পেলেন। যারা বোবা-কালারা তারা সবাই এক জাতের, যারা কথা কয় তাদের জাতের আর সীমা সংখ্যা নেই।

ছোঁড়াটা সাহেবের বাগানের মান্নী। আমার ফুলরাণী সেই ফুলের দেশে রাজত্ব করতে চলে।

তার পরে দিনকতক আমি কাঁদলুম। তার পরে ভাবছি আর যাই হোক মরতে পারব নিশ্চিত হয়ে।

। ডিকেন্সের ‘Dr Mangold’ গল্পের আভাসে রচিত।

## ব্যা

### সুকুমার রায়

গরীব চাষা, তার নামে মহাজন নালিশ ক'বেছে। বেচারার কবে তার কাছে পাঁচশ টাকা নিয়েছিল, সুদে আসলে তাই এখন পাঁচশো টাকায় দাঁড়িয়েছে। চাষা অনেক কষ্টে একশো টাকা যোগাড় ক'বেছে, কিন্তু মহাজন বলছে, “পাঁচশো টাকার এক পয়সাও কম নয়, দিতে না পাব জেলে যাও।” সুতরাং চাষার আর রক্ষে নেই।

এমন সময় শ্যামলা-মাথায় চশমা চোখে, তোখোড়-বুদ্ধি উকিল এসে বললে, “এ একশো টাকা আমায় দিলে, তোমাব বাঁচবার উপায় কবতে পারি।” চাষা তাব হাত ধরল, পায়ে ধরল, বললে, “আমায় বাঁচিয়ে দিন।” “তবে শোন, আমার ফন্দি বলি। যখন আদালতের কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াবে, তখন বাপু কথা টথা কহো না। যে যা খুঁশি বলুক, গাল দিক আব প্রশ্ন করুক, তুমি তাব জবাবটি দেবে না— খালি পাঠার মতো ‘ব্যা—’ কববে। তা যদি করতে পার তা হ'লে আমি তোমায় খালাস করিয়ে দেব।” চাষা বললে, “তাতেই আমি রাজী।”

আদালতে মহাজনের মস্ত উকিল, চাষাকে এক ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, “তুমি সাত বছর আগে পাঁচশ টাকা কর্জ নিয়েছিলে?” চাষা তার মুখের দিকে চেয়ে বললে, “ব্যা—”। উকিল বললে, “খবরদার! বল, নিয়েছিলে কি না,” চাষা বললে, “ব্যা—”। উকিল বললে, “হুজুর! আসামীর বেয়াদবি দেখুন।” হাকিম রেগে বললেন, “ফেব যদি অমনি করিস, তোকে আমি ফাটক দেব।”

চাষা অত্যন্ত ভয় পেয়ে কঁাদ-কঁাদ হয়ে বললে, “ব্যা ব্যা—”।

হাকিম বললেন, “লোকটা পাগল নাকি?”

তখন চাষাব উকিল উঠে বললে, “হুজুর, ও কি আজকেব পাগল, ও বহুকালের পাগল, জন্ম অবধি পাগল। ওর কি কোনো বুদ্ধি আছে, না কাণ্ডজ্ঞান আছে? ও আবাব কর্জ নেবে কি! ও কি কখনও খত লিখতে পারে নাকি? আর পাগলের খত লিখলেই বা কি? দেখুন দেখি, এই হতভাগা মহাজনটার কাণ্ড! ইচ্ছে ক'রে জেনে শুনে পাগলটাকে ঠকিয়ে নেবাব মতলব করেছে। আরে, ওর কি মাথার ঠিক আছে? এরা বলেছে, ‘এইখানে একটা আঙ্গুলের টিপ দে’, পাগল কি জানে, সে অমনি টিপ দিয়েছে। এই তো ব্যাপার।”

দুই উকিলে ঝগড়া বেধে গেল। হাকিম খানিক শুনে টুনে বললেন, ‘মোকদ্দমা ডিসমিস্’। মহাজনের তো চক্ষুস্থির। সে আদালতের বাইরে এসে চাষাকে বললে, “আচ্ছা, না হয় তোর চারশো টাকা ছেড়েই দিলাম— এ একশো টাকাই দে।” চাষা বললে, “ব্যা—!” মহাজন যতই বলে, যতই বোঝায়, চাষা তার পাঠাব বুলি কিছুতেই ছাড়ে না। মহাজন রেগে-মেগে ব'লে গেল, “দেখে নেব আমার টাকা তুই কেমন ক'রে হতম করবিস!”

চাষা তার পোটলা নিয়ে গ্রামে ফিরতে চলেছে, এমন সময় তার উকিল এসে ধরলে, “যাচ্ছ কোথায় বাপু? আমার পাওনাটা আগে চুকিয়ে যাও! একশো টাকায় যে রফা হয়েছিল,

এখন মোকদ্দমা তো জিতিয়ে দিলাম।” চাষা অবাক হ’য়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, ‘ব্যা—।’ উকিল বললে, “বাপু হে, ও সব চালাকি খাটবে না। টাকাটি এখন বের কর।” চাষা বোকার মতো মুখ করে আবার বললে, ‘ব্যা—।’ উকিল তাকে নরম-গরম অনেক কথাই শোনালো, কিন্তু চাষার মুখে কেবলই, ঐ এক জবাব। তখন উকিল বললে, “হতভাগা, গো-মুখ্য, পাড়ার্গেয়ে ভূত — তোর পেটে অ্যাতো শয়তানি কে জানে। আগে যদি জানতাম তা হ’লে পৌঁটলাসুদু টাকাগুলো আটক রাখতাম।” বুদ্ধিমান উকিলের আর দক্ষিণা পাওয়া হল না।

## লাভার

### কিরণধন চট্টোপাধ্যায়

লেকচারের ঘণ্টা তখনও পড়ে নাই। আমরা ৭/৮ জন মিলিয়া কলেজের গেটের কাছে দাঁড়াইয়া পুরাদমে সিগারেট ও গল্প চালাইতেছি। এমন সময় একখানি মেয়ে-কলেজের গাড়ি ঘড়ঘড় করিয়া রাস্তা দিয়া যাইতেই আমাদের সকলের চক্ষু তাহারই উপর পতিত হইল। গল্পের শ্রোত ক্ষণেকের জন্য বন্ধ হইল, কিন্তু গাড়িখানি একটু দূরে যাইতেই তাহা চারগুণ বেগে পুনরায় বহিতে লাগিল। এবার যে সুন্দরীকুলই আমাদের সমস্ত গণ্ডগোলার কারণ হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা বলাই বাহুল্য। নরেন বলিয়া উঠিল— দেখলি, ঠিক দরজার কাছে যে কালো মেয়েটি বসে ছিল? কি সুন্দর! একেবারে একটা throughbred Arabian pony -র মত নিটোল ঝক্ঝকে ও নিখুঁত।

প্রকাশ বলিল— আচ্ছা ungallant ত তুই— পৃথিবীতে এমন সুন্দর সুন্দর জিনিষ থাকতে শেষে বোড়ার সঙ্গে compare করলি। তোর মত unpoetic ও unimaginative লোক—

নরেন—থাম্ থাম্, তুই যদি এ simile-টার beauty appreciate করতে পার্টিস্ তা' হলে আর ভাবনা ছিল না।—থাকত কালিদাস ত লুফে নিত।

কুমুদ বলিল— তোরা ত যোড়া যোড়া করে মরছিস্, কিন্তু আমার এদিকে যে heart-টাই একেবারে চুরি হয়ে গিয়েছে— এই কালো মেয়েটারই কাজ— দাঁড়াও আজই আমি আমার Juliet-এর খোঁজ নিচ্ছি।

রবি গৌফে তা দিতে দিতে পাশ থেকে বলিল— তোর মত বাদরের আবার Juliet পাবার সাধ গেল কেন?

কুমুদ— That's blasphemy—যদি কারুর এখানে Apollo-র মত চেহারা থাকে সে কেবল আমারই— এ তোমাদের স্বীকার কব্তেই হবে।

চারু বলিল—Apollo হও আর যাই হও, ওই কালো মেয়েটিকে কিন্তু তুমি কিছুতেই পাচ্ছ না; এতক্ষণে ভেবে ভেবে ঠিক করে ফেলেছি যে ওকে win করবার মত যদি কাবো qualification থাকে তবে তা এই চারু মিস্তিরেরই আছে— যখন আমি আমার এই চোখ, এই নাক, তাব উপর এই চশ্মা নিয়ে তার সন্মুখে গিয়ে দাঁড়ালে ব্যাপারটা কি বকম দাঁড়াবে— একবার ভাবতে পারিস?

নিশ্চয় পারি, ঠিক এই বকম— বলিয়াই রবি তার পিছনে একটি প্রচণ্ড পদাঘাত করিয়া দৌড় দিল।

চারু তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে দৌড়াইয়া গিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিয়া বলিল— আমাকে লাথি মারার punishment স্বরূপ তোকে আমাদের প্রত্যেককে এক একটা করে সিগারেট খাওয়াতে হবে।

নিশ্চয়ই— বলিয়া কুমুদ রবির পকেট হইতে তাহার সিগারেটের বাস্কাটি বাহির করিয়া সিগারেটগুলি আমাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিল। এমন সময় ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল ও আমরাও সকলে lecture hall-এর দিকে ছুটিলাম।

সেদিন খুব বৃষ্টি পড়িতেছে। আমি একা একখান নভেল লইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িতেছি। এমন সময় প্রকাশ তার সমস্ত মুখখানা হাসিতে ভরাইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া আমার গায়ের উপর একখানা চিঠি ফেলিয়া দিয়া বলিল— দ্যাখ কেবলই ঠাট্টা করিস্! এইবার একবার পড়ে দ্যাখ্।

আমি একটু অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম— ব্যাপারটা কি?

প্রকাশ বলিল— আহা পড়েই দেখনা—

অগত্যা আমাকে চিঠিখানি খুলিতে হইল— সেখানি এইরূপ—

৪০ নং ডিয়ার লেন

প্রকাশ বাবু,

চিঠিখানি পেয়ে না জানি আপনি কি ভাববেন। কিন্তু আমি শত চেষ্টা করলেও আপনাকে না লিখে থাকতে পারতুম না। এ মবার গাঙ্গে আজ বান ডেকেছে, একে বোধ করা আমার অসাধ্য— এতদিনে আমি রাধিকাকে ঠিক বুঝতে পেবেছি আর বুঝতে পেরেছি কেনই বা তিনি কুলে কালি দিয়ে যমুনায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। সেই যে কি এক মুহূর্তে আপনার এই দুটি চোখের সঙ্গে মিলন হয়েছিল তা বলতে পারি না। Browning যে বলেছেন (দোহাই আপনার, ভাববেন না বিদো ছড়াছি) অনেক সময় এক মুহূর্তে যা পাওয়া যায় তাহা জীবনের আর সব পাওয়ার চেয়ে বেশী হয়। বড় সত্যি কথা। আব না— কলম জোর করে থামাই। প্রাণে কত কথা কত গান জেগে উঠছে, সব লিখলে হয়ত আপনি আমাকে অত্যন্ত প্রগলভা ভাববেন। যদি এ অধীনীর প্রতি দয়া হয় ত উত্তর দেবেন।

ইতি একান্ত আপনাবই

মণি

পড়িয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— এ মণিটি কে?

প্রকাশ একেবারে তাব সমস্ত দাঁত কয়টি বাহির করিয়া বলিল— সেই কালো মেয়েটি।

তুই কি কবে জানলি?

প্রকাশ— কেন রবির কাছ থেকে মণি হচ্ছে তার বোনের most intimate friend দুজনেই I A পড়ে। রবিরদের বাসায় মণি প্রত্যেক ববিবারে বেড়াতে যায়। সে আমাকে তার সঙ্গে introduce করে দেবে বলেছে।

আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। প্রকাশের love-এ পড়াটা কিছুই নূতন ব্যাপার নয়। তার love-এর গল্প শুনিতে শুনিতে আমরা অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলাম— বছবে তার তিন চার বার করিয়া love-এ পড়া চাই। অন্য দিকে কিন্তু ছেলে মন্দ ছিল না— কিন্তু এই একটা রোগেই তাকে খেলো করিয়া রাখিয়াছিল।

আমাকে নিস্তরু দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল— চুপ করে বয়েছিচ্? যে? :

আমি বলিলাম— তোর কপাল দেখে হিংসে হচ্ছে আর কি। উত্তর দিইছিচ্?

প্রকাশ— না। রবির সঙ্গে পরামর্শ কবে একটা যুতসই উত্তর দেব।

তার পরদিন ক্লাশে গিয়া রবিকে জিজ্ঞাসা করিলাম— রবি, প্রকাশের ঐশ্বর্যকার love affair-টা শুনেছিচ্?

রবি বলিল— হ্যাঁ ভাই, দেখেছিচ্, ছোকরাব কি কপালজোর— আমবা এতকাল ধরে কলঙ্কাতায় থেকেও, কোন সুন্দরীর একটু কৃপাকটাক্ষও লাভ কবতে পারলাম না— চিঠি ত



দূরের কথা। আর যদি বা নিজের কোন দিন কোন সুন্দরীর প্রতি কটাক্ষপাত করি ত তিনি তৎক্ষণাৎ চোখ দিয়ে অগ্নি বর্ষণ করে ভস্ম করবার চেষ্টায় থাকেন।

ইহার ২/৪ দিন পরে একদিন বিকালে প্রকাশ দাঁড়া জামাইটি সাজিয়া আমার পড়িবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—কি করে, তোর মণির চিঠির উত্তর দিলি?

সে বলিল— হ্যাঁ দিয়েছি।

কি লিখিলি?

উঃ লিখেছি ঢেব— বিদ্যাপতি ও চন্ডীদাস খুঁজে খুঁজে quotation-এ ভরিয়ে দিয়েছি। আর সব শেষে আমাকে আপনি বলে সম্বোধন করেছিল বলে খুব অভিমান করেছি। আর এই দাখু আজকেও তার একখান চিঠি পেয়েছি। Bijou তে তারা আজ যাবে, তাই আমাকে সেখানে যেতে লিখেছে।

আমি বলিলাম— তুই এখন তা হলে Bijou-তেই যাচ্ছিস?

নিশ্চয়ই।

কিন্তু ও pince nez-টা কেন পরেছিস? তোর চোখ আবার কবে থেকে খারাপ হল?

তুই এর বুঝি কি?— বলিয়া সে হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

তার পরদিন কলেজে দেখি প্রকাশকে ঘিরিয়া সকলে খুব হৈ-চৈ করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা কবিলাম— কি, হয়েছে কি?

বনেশ বলিল— আরে ভাই, কাল আমরা সকলে Bijou-তে গিয়েছিলাম— সেখানে গিয়ে দেখি আমাদের প্রকাশচন্দ্র একেবারে জামাইটি সেজে first class-এ বসে আছেন। ওর সে চেহারা যদি তুই দেখতিস্ ত হাসতে হাসতেই মারা যেতিস্।

কলেজ হইতে আসিয়া আমি একখানা খবরের কাগজ লইয়া পড়িতেছি, এমন সময় প্রকাশ উপস্থিত হইয়া বলিল— ভাই, কাল তার সঙ্গে Bijou -তে দেখা হয়নি। তার কোন এক মামা বুঝি তার সঙ্গে ছিলেন, তিনি কিছুতেই তাদের পরদার বাহিরে বসতে দেননি। এই দাখু।— বলিয়া সে আমার কোলের উপর একখানি চিঠি ফেলিয়া দিল। তাহার খানিকটা এই রূপ—

যদিও তুমি আমাকে দেখতে পাও নি কিন্তু আমি তোমাকে ছাড়া আর কিছুই দেখি নি।— আমার Bioscope-ও দেখা হয়নি। যখন আলোওলো নিভিয়ে দিচ্ছিল তখন চোখ বুজে তোমার কথা ভাবছিলাম, আর যখন আলো ভুলে উঠছিল তখন আঁখিভোরে তোমাকেই দেখছিলাম।

ইহার পরও প্রকাশ ২/১ জায়গায় সেজেগুজে গিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। প্রত্যেক বারই সেই মামাটির জন্য কোন না কোন কারণে দেখা হয় নাই। প্রকাশ ইহাতে মহা চটিয়া গিয়া একদিন আমাকে বলিল— ভাই, এবার যদি আবার কোথায়ও যেতে বলে ত কিছুতেই যাব না।

কিন্তু বেচারি সে সঙ্কল্প ঠিক রাখিতে পারিল না। দু এক দিন পরে আলিপুরের চিড়িয়াখানায় যাবার জন্য অনুরোধপত্র আসিল, তার শেষে লেখা— “এবার দেখা হবেই, মামা ত আর বাগানে আমায় বোরকা পরিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন না।”

কাজে কাজেই প্রকাশকে যাইতে হইল।

ইহার ৭/৮ দিন পরে প্রকাশ অতি বিষন্ন বদনে আমাদের বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইয়া আমাকে একখানি চিঠি পড়িতে দিল। চিঠিখানি এইরূপ :-

রাসভাবতার!

Zoo -তে গিয়েছিলে ত আবার ফিরে এলে কেন?— সেখানে একটা খাঁচা মিলল না?

ইতি

তোমারই মণি।

প্রকাশ বলিল— ভাই, আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— আচ্ছা ৪০ নম্বরের বাড়িটা কি কখন দেখেছিস?

সে বলিল— না।

আমি বলিলাম—চল তা'হলে, এখন চল।

দুজনে আসিয়া ট্রামে উঠিলাম। গাড়ের মাঠের এমন হাওয়াও প্রকাশকে কিছুমাত্র প্রফুল্ল করিতে পারিল না। হেদের কাছে আসিয়া আমরা গলিটি খুজিতে নামিয়া পড়িলাম। অবশেষে গলিটা পাইয়া একটু যাইতেই দেখি যে সম্মুখের বাড়ির বারান্দায় আমাদের মত ৭/৮ জন ছেলে দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছে। আমাদের দেখিয়া তাহারা— “আরে এস এস” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। দরজার দিকে তাকাইতেই কালো বোর্ডের উপর ৪০ নম্বর নজরে পড়িল—এটা আমাদের কলেজেবই একটা attach মেস্। ফিরিয়া দেখি প্রকাশ একখানি চলন্ত ট্রাম ধরিবার জন্য ছুটিতেছে।

## পার্বতী

দীনেশরঞ্জন দাশ

পার্বতী মন্দির-তলে দাঁড়াইয়া চাহিয়া দেখিল, দেবতার গৃহপ্রাচীরের গাত্র-লগ্ন বনলতার গ্যামল পত্রের উপর সূর্য্যস্তের কিরণলেখা হবিৎ বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। মন্দিরের সোপানশ্রেণী বাহিয়া মানব-মানবিকার যাতায়াতের একটা শৃঙ্খলিত গতিশ্রোত দীর্ঘ ও বিচিত্র বর্ণ লইয়া নিঃশব্দে পদচারণ করিতেছে। সে তাহার অঞ্চলের অন্তরালে আচরিত কুসুমগুচ্ছের থালাখানি যুক্ত অঞ্জলির উপর ধারণ করিয়া উচ্চারণ করিল, দেবতা তুমি কি সত্যই সুখী ?

পার্বতী সারাদিন ধরিয়া একটি একটি করিয়া ফুল বাছিয়া রঙের পর রঙ মিলাইয়া, কিশলয়ের আস্তরণের উপর ফুল সাজাইয়া একখানি ফুলের থালা প্রস্তুত করিয়াছে। বহুদিন হইতে তাহার মনে হইত, মানুষের দুঃখ দেবতা বুক পাতিয়া লন, কিন্তু দেবতা তাঁহাব দুঃখের বোঝা কোথায় রাখেন ? তাহার নিজের যাহা দুঃখ ছিল তাহা সে ভুলিয়া যাইত, দেবতার দুঃখের কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহাব সমস্ত বেদনা হাত বাড়াইয়া দেবতার দুঃখের ভাগ বৃকে টানিয়া লইতে চাহিত। এমনি করিয়া সে অনেক দুঃখকে ছাপাইয়া উঠিয়াছিল, অন্তহীন সুখের প্রলোভন হইতে আপনাকে দেবতার দুঃখে দুঃখ মিলাইবার পরম শান্তিতে ডুবিতে পারিয়াছিল।

আজ তাই তাহার মনে হইয়াছিল, এই অর্থাবিহীন শূন্য ফুলের থালাখানি দেবতার মন্দিরে স্থাপন করিয়া আসিবে। আরতির পর শূন্য মন্দিরে বসিয়া দেবতা যখন মানুষের নিবেদিত অর্থা-স্তুপের দিকে চাহিয়া থাকিবেন, তখন এই কুসুম-থালিকার উপরও তাঁহার দৃষ্টি পড়িবে। সেই অবসন্ন-অবসরে বৃষি একক নিঃসঙ্গ দেবতার সমস্ত বেদনা তিনি ঐ থালাখানির উপর রাখিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে পারিবেন।

পার্বতী তাহার নিজের মনের মত করিয়াই এ সকল কথা ভাবিল। আর ভাবিল, একটু দেরি করিয়াই সে মন্দিরে যাইবে। তাই মন্দিরের সোপান-তলে আসিয়াও সেই শূন্য-অবসরের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। তাহার সম্মুখ দিয়া শত শত মানুষ কি কামনা বৃকে ভরিয়া যে মন্দিরের দিকে চলিয়াছে তাহা সে ভাবিতে চেষ্টা করিল। সেই মুহূর্ত্তেই যাহারা মন্দির হইতে ফিরিতেছে, তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া সে ভাবিতে লাগিল, না জানি উহারা কি লইয়া ফিরিল।

চিন্তা করিতে করিতে পার্বতীর চোখের দৃষ্টি হইতে জনশ্রোতের সমস্ত ছবি মুছিয়া গেল। অন্ধকারে ঢাকা দুরাস্তরের বিটপিশ্রেণীর গাত্রস্পর্শ করিয়া আকাশের গায়ে যে একটা স্নান আলোর ধারা কাঁপিয়া কাঁপিয়া রাত্রির মৌনতার চারিদিকে ঘিরিয়া উঠিতেছিল, তাহারি দিকে দৃষ্টি তুলিয়া পার্বতী ভাবিতেছিল, দেবতা কি একলা থাকেন না ? কখনও না ? মানুষ যখন দেবমন্দির ছাড়িয়া আপন আলয়ে ফিরিয়া যায়, পূজারী ব্রাহ্মণ যখন দিনান্তে সুখ-দুঃখের বোঝা নিদ্রার কোলে স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত-অস্তুরে সুপ্ত সন্তানের পার্শ্বে শয্যা গ্রহণ করে, দেবতা কি তখনও একলা থাকেন না ? তখনও কি তিনি দেখিতে পান না, লোক-চক্ষুর

অন্তরালে বাহিরের পরিপূর্ণতার মাঝখানে আমারই মত কত মানুষ তাহার একলা-মনের বেদনা-আকাঙ্ক্ষা সাজাইয়া পূর্ণতার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে।

এমন ভাবিতে ভাবিতে পার্বতী শোকসাগরের তীরে আসিয়া দাঁড়াইল। এমন সময় তাহার সঙ্গে যে-বালকটি আসিয়াছিল, সে পার্বতীর হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, হাঁ মা, এ বুড়িটা কি কবতে মন্দিরে যাচ্ছে?

বালকের কথায় পার্বতীর ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল। সে চাহিয়া দেখিল, একটি বুড়ি পৃথিবীর যত জঞ্জাল ঘাড়ে করিয়া লাঠির উপর তাহার জরাজীর্ণ দেহের ভার রাখিয়া সোপান আরোহণ করিতেছে। আর তাহার ক্রেশাতুর কণ্ঠস্বর থাকিয়া থাকিয়া অস্পষ্ট ভাষায় কি কথা উচ্চারণ করিতেছে।

বালক পার্বতীকে নাড়া দিয়া বলিল, একটা পয়সা দাওনা মা ওকে। পার্বতীর মুখে কোন উত্তর পাইবার পূর্বেই বালক ডাকিল, ও বুড়ি, পয়সা নিয়ে যা।

বুড়ি ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাহার লাঠিটাকে ভাল করিয়া ধরিয়া বালকের দিকে চাহিয়া বিড় বিড় করিয়া বকিতে লাগিল, ঐ পুর্বের দিক থেকে যে-রাস্তাটা পশ্চিমের দিকে গেছে, তারই পরে সে মস্ত বড় একটা মাঠ, তার পরেই যে স্বপ্নপুরী, তার পরে যে বনটা, তার ধারে যে ভাঙ্গা বাড়িটা, এখানে যারা থাকে তাদের কাছে কেমন করে খবর পাঠাই আমি! তাও সেই যে এসব মালপত্র যাবার সময় আমার কাছে রেখে গেল, আজ পর্যন্ত নিয়ে যাবার নাম নেই! কতকাল আমি আর এসব ঘাড়ে করে আগলাই! তোরাও মরেছিস, বালাই গেছে, এখন যে কটা বেঁচে আছে তাদের দেখে কে?...এই বলিয়া বুড়ি আবার সোপান বাহিয়া উঠিতে লাগিল।

বালক পয়সা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বুড়ি পয়সা নিল না, চলিয়া গেল, বালকের তাহাতে বড় দুঃখ হইল। মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া সে একটু বিষাদের হাসি হাসিল। পার্বতী বালককে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, পথে আর কারকে পেলে পয়সা দিও। কেমন?

বালক একটু বিষণ্ণ দৃষ্টিতে পার্বতীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, বাড়ি যাবে না মা?  
পার্বতী রুদ্ধশ্বাস ফেলিয়া বলিল, চল, মন্দির থেকে ঘুরে আসি।

॥ ২ ॥

মন্দিরে যাইয়া সেই অন্ধকারে পার্বতী ফুলের থালাখানি রাখিল। তাহাব পর জোড়করে বলিল, জানি না কোন দুঃখ আছে কিনা, যদি থাকে সব আমাকে দিও, আমার শূন্য থালা ভরে থাকবে।

পার্বতীর শীত গ্রীষ্মের সর্বসহা অন্তর ফাটিয়া যেন এই কথা কয়টি ভুঁইচাপার মত ফুটিয়া উঠিল। সে বালককে লইয়া মন্দির হইতে ফিরিল।

মন্দির হইতে আসিবার সময় পার্বতী দেখিল, একটি রমণী বসনাঞ্চলে কি যেন ঢাকিয়া লইয়া ধীরপদে মন্দিরের অভিমুখে চলিয়াছে।

পার্বতীকে দেখিয়া রমণী শুদ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তুমি কি মন্দির থেকে ফিরছ?

পার্বতী বলিল, হাঁ।

রমণীর প্রায় শ্বাসরোধ হইয়া আসিয়াছিল। সে ক্ষীণ স্বরে আবার জিজ্ঞাসা করিল, মন্দিরে বুঝি কেউ নেই?

পার্বতী উত্তর করিল, আছে, একটা বুড়ি চাতালের পাশে শুয়ে আছে, আর কেউ নাই।

রমণী আবার চলিতে লাগিল। পার্বতী কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, তার পর বালককে লইয়া নামিতে লাগিল।

রাত্রে গৃহে ফিরিয়া দিদিমার কাছে শুইয়া বালক জিজ্ঞাসা করিল, ‘হ্যাঁ দিদিমা, ঠাকুর-দেবতারা রাত্রে ঘুমোয় না?’

পার্বতী তখন সেজ্জা তুলিয়া চৌকির গায়ে ঠেস দিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া ছিল।

বালকের প্রশ্নে সে একটু নড়িয়া বসিল, কিন্তু তেমন অলস ভাবে দীপশিখার দিকে চাহিয়া রহিল।

বালক তাহার তন্দ্রাচ্ছন্ন দিদিমাকে নাড়া দিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, বলনা দিদিমা, ঠাকুর ঘুমোয় কি না?

একটা টিকটিকি দেওয়ালের গায়ে শব্দ করিয়া উঠিল, টিক্ টিক্ টিক্।

দিদিমা জড়িত স্বরে উত্তর করিলেন, খায় দায় আর ঘুমোয় না? নে, তুই এখন ঘুমো দিকি। তাহার পরেই তিনি নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন।

বালক বিরক্ত হইয়া পাশ ফিবিয়া পার্বতীর মাথায হাত বাখিয়া বলিল, মা, আমবা ফেববাব সময়, অত রাত্রে ঐ মেয়েটি মন্দিরে যাচ্ছিল কেন মা?

পার্বতী মনে পড়িল সেই বমণীর কথা। ধীরে ধীরে সেই পবিত্রাশ্রম রমণীর মুখের সব বেখাগুলি তাহার মনে ফুটিয়া উঠিল। তাহাব অঙ্গভঙ্গি, চলিবাব কথা কহিবাব ধারা,— সব কিছু যেন তাহার ধারণার ভিতর সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। মনে হইল, সে যেন তাহাকে বহুবাব দেখিয়াছে। মনে হইল, তাহারই নিজের বহুবাবের অসংযত কামনার কঙ্কালকে যেন ঐ রমণীর পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া আজ মায়াপথ অতিক্রম কবিত্তে দেখিয়া আসিয়াছে। ঐ কপা ভাবিত্তে ভাবিত্তে তাহাব মুখে একটা অকারণ আনন্দ শিহরিয়া উঠিল। সে বালকের হাতের উপর মাথাটি পাতিয়া দিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কিছু হয়ত ঠাকুরের কাছে দিত্তে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মনে হইল, সকলেই কত কি ঠাকুরকে দিয়া আসে, এতদিন ভাবিয়াও সে কিছুই দিত্তে পারে নাই। আজ বর্ষদিন পরে তাহার সমস্ত কামনা সাজাইয়া, সমস্ত দুঃখ বাছিয়া বাছিয়া, সমস্ত আনন্দের রঙের পর রং মিলাইয়া একখানি শূন্য থালা দেবতার বিশ্রাম-দ্বারে পাতিয়া রাখিয়া আসিয়াছে। জানে না, তাহা কিসে পূর্ণ হইয়া উঠবে, অথবা প্রভাতে পুষ্প-পত্রের প্রত্যাখ্যাত স্তূপের মধ্যে তাহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পড়িয়া থাকবে।

পার্বতীর সমস্ত শরীরে যেন নবীন চেতনা সঞ্চারিত হইয়া গেল। তাহার অবসন্ন দেহভার সে চেতনো উৎসারিত হস্তের মত কিসের আশায় উন্মুখ হইয়া উঠিল। সে উঠিয়া বসিল, বালককে বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া কানে কানে বলিল, কাল খুব ভোরে আমরা মন্দিরে যাব, কেমন?

বালক বলিল, কাল বাবা আসবে, মা?

পার্বতী হাসিয়া বলিল, খুব ভোরে উঠে চলে যাব, আবার খুব সকাল সকাল ফিরে আসব।

বালক মায়ের গলায় হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল, হ্যাঁ, তাই হবে। আমাকে তাহলে ভোর বেলা তুলে দিও।

পার্বতী বালকের ললাটে মুখ রাখিয়া অনেকক্ষণ সেইভাবে পড়িয়া রহিল। বালক ঘুমাইয়া পড়িল। পার্বতী ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া লইল। তাহার পর নিজের বক্ষের উপর দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া রহিল; ইঠাং উঠিয়া পড়িয়া প্রদীপ নিভাইয়া দিল। নিজের মনে বলিত্তে লাগিল, ঘুমোতে কি পারে সে কখনও? আমার মত যারা জেগে বসে থাকে তাদের কাছে তাহলে কে এসে দাঁড়ায়।

আবার অনুচ্চ স্বরে নিজের মনেই সে বলিতে লাগিল,— যেন কে আসিয়াছে, কাহার সঙ্গে সে কথা কহিতেছে। না, ঘুমুই নি ত।... কেন এলে তুমি! কি মনে করে এলে!... থালা! হাঁ, সে আমিই রেখে এসেছি? কেন? দেবতা সতি বলতে পার, তোমার কোনও দুঃখ নেই, কোনও আশা নেই, কোনও আকাঙ্ক্ষা নেই? তোমার নিজের বলে কিছু নেই? মিছে কথা। আমি বলছি, মিছে কথা।... আচ্ছা, তুমি বসো। আমি আর কিছু বলব না। তুমি যা চাও, আমিও তাই চাইব। এতদিন বুঝিনি, তুমি এত পূজার আড়ালে এমন করে হতাশ হয়ে বসে ছিলে?... না, তুমি আমার মাথার কাছে বসো, তোমার হাতটা রাখ আমার কপালের উপর। আঃ.... আচ্ছা তুমি না দেবতা, এতদিন বুঝতে পারিনি কিছু? তোমারও অভিমান আছে?... যেতে হবে! কোথায়? যারা জেগে আছে, সবার কাছে! সারা রাত তাহলে ঘুমোও না তুমি?... দিনেও না? আচ্ছা যেও, আমি ঘুমিয়ে পড়লে যেও, এমন করে যাবে, আমি যেন জেগে না উঠি!

জানালা দিয়া মধ্যরাত্রের বাতাস পার্বতীর এলায়িত কেশরাশি কাঁপাইয়া দিয়া তার ললাট স্পর্শ করিল। পার্বতী মেজের উপর ঘুমাইয়া পড়িল।

॥ ৩ ॥

প্রত্যুষে আনন্দে জাগিয়া উঠিয়া সে বালককে সঙ্গে করিয়া মন্দির অভিমুখে ছুটিল। তখনও উষার কুহেলি কাটিয়া রক্তপদ্ম ফুটিয়া উঠে নাই। আশপাশের সমস্ত অস্তিত্ব যেন পার্বতীর সামনে মুছিয়া গেল। আজ প্রভাতের বিশ্বব্যাপী জাগরণ যেন তাহার এই আনন্দের অধীরতাকে আশ্রয় করিয়াই ফুটিতে পারিয়াছে।

মন্দিরের সম্মুখে উঠিয়া সে ছুটিয়া দরজার কাছে যাইয়া হঠাৎ পিছাইয়া আসিল। সেই শব্দে বুড়ি জাগিয়া উঠিয়া চাতালের কোণ হইতে বিড় বিড় করিতে লাগিল, ঘুমোও না একটু বাছ। সারা-রাত যে কি কাণ্ড করিস! দিনের বেলা ত মানুষের কাছে দেখাস ভাল মানুষটি! তোকে নিয়ে আর পারি না আমি। আমি আর কতদিন তোকে আগলে বেড়াব বলতো!

বুড়ি আবার চুপ করিয়া গেল; মন্দিরের ভিতরে যে থাকে সে যেন বুড়িরই দৃষ্টির বেষ্টনে অকল্যাণের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া আসিয়াছে।

পার্বতীর ইচ্ছা হইল, ছুটিয়া গিয়া বুড়িকে বৃকে জড়াইয়া ধরে। তাহার দেবতাকে সে এত ভালবাসে, রাত্রির অন্ধকারেও তাহার মঙ্গল-চিন্তা তাহার দেবতাকে ঘিরিয়া থাকে, তাহাকে প্রাণের কৃতজ্ঞতা ঢালিয়া দিতে ইচ্ছা করিল। এ সকল যেন তাহারই করিবার কথা, না বুঝিয়া সে এতদিন দেবতাকে ছাড়িয়া ছিল, বুড়ি তাহার দেবতাকে সঙ্গ দিয়াছে!

তাহার পর কি ভাবিয়া সেই অন্ধ আলো ও অন্ধকারের ভিতর অতি সন্তপণে মুক্ত মন্দিরদ্বার অতিক্রম করিয়া পুষ্পপত্রের স্তূপের ভিতর যে দুইখানি ক্ষুদ্র হস্ত উর্ধ্বে উঠিয়া খেলিতেছিল, তাহার উপর বুঝিয়া পড়িয়া সে চুপ করিল। ফুলপাতা সরাইয়া শিশুকে বৃকে তুলিয়া লইতে গিয়া দেখিল তাহারই নিবেদিত ফুলের থালাখানি ভরিয়া শিশুটি শুইয়া আছে।

পার্বতী মন্দির ছাড়িয়া পথে নামিল। তাহার মনে হইল, আজ প্রভাত-সমীর যেন বাধা-বন্ধ-হারা! তুণে তুণে যেন কে আজ ভাষা অর্পণ করিয়াছে। তরুণ আলোর ধারায় ধারায় যেন বিহগের গীতধ্বনি গোপন ভুবনের আশার কথা বহিয়া আনিয়া কম্পিত পুষ্প-লতার অন্তর-প্রান্তরে জীবন-কাহিনীর প্রতিধ্বনি ধ্বনিয়া চলিয়াছে।

পার্বতী শিশুকে বৃকে ঢাকিয়া যখন গৃহে ফিরিল, তখন তাহার মা গৃহকার্য সমাপন করিয়া স্নান সারিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া যুক্তকরে সূর্যপ্রণাম করিতেছিলেন। পার্বতী ধীরে ধীরে

আসিয়া তাঁর পশ্চাতে দাঁড়াইল। প্রণামান্তে তাহার মা মুখ ফিরাইয়া চাহিতেই— পার্বতী শিশুটিকে মায়ের বুকের কাছে ধরিয়া বলিয়া উঠিল, ধর, ধর।

মাতা নিতান্ত অপ্রস্তুত ভাবে শিশুকে কোলে লইলেন। তাহার পরই শিশুর শরীরের অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, মাগো এ কি রে? সর্বনাশ করেছিস? এ আবার কোথা থেকে কুড়িয়ে এনে বিপদ ডাকলি? ধর, ধর।

পার্বতী হাততালি দিতে দিতে মার সম্মুখে ছোট বালিকার মত হাসিতে হাসিতে বলিল, মন্দিবে পেয়েছি মা, খুব ভোরবেলা উঠে আমি আর সুরো মন্দিরে গিয়েছিলাম।

মা বিপন্নভাবে শিশুকে কাপড়ে ঢাকিয়া লইলেন। তাহার পর পার্বতীকে বলিলেন, আওন জ্বাল, আওন জ্বাল— এ আবার কি আপদ জেটালি! মাগো, কার কি, ঠিক নেই। এনে ত ঘরে ঢোকালি!

পার্বতী আওন জ্বালিল। তাহার মাতা শিশুকে সেকিয়া পরিষ্কার করিয়া পার্বতীর কোলে দিয়া, পুনরায় স্নান করিতে গেলেন।

পার্বতী শিশুকে ভাল করিয়া আচ্ছাদন করিয়া কোলে করিয়া রৌদ্রে বসিয়া রহিল। বালক সুবো, মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে শিশুর দিকে চাহিতে লাগিল।

বাহিরের দিকে চাহিয়া হঠাৎ সুরো চোঁচাইয়া উঠিল, বাবা এসেছে, বাবা এসেছে।

পার্বতী শিশুকে আরও বুকের কাছে টানিয়া লইয়া কাপড় দিয়া ঢাকিয়া বসিল। পার্বতীর বসনাঞ্চল সহসা যেন উতলা হইয়া উঠিল, তাহার মনেপ্রাণে যেন কাহার চিরন্তন ধ্যান নিরাড়ম্বর স্তব্ধতা হইতে বাহিরে আসিয়া প্রভাত-বাতাসে জাগিয়া উঠিল।

সুরো মায়ের কাঁধের উপর মুখ রাখিয়া আবার বলিল, মা, বাবা এসেছে।

পার্বতীর মা স্নান করিয়া আসিয়া দেখিলেন, পার্বতীর স্বামী বামাপদ ঘরের ভিতর চৌকির উপর চুপ করিয়া বসিয়া আছে। সুরো দরজার কাছে দাঁড়াইয়া একবার বাহিরে মায়ের দিকে চাহিতেছে, আবার ঘরের ভিতর বামাপদের মুখের দিকে তাকাইতেছে, পোষা বিড়ালটা আসিয়া সুরোর পা খঁষিয়া ল্যাজ তুলিয়া করুণ সুরে ডাকিতে লাগিল। সুরো তাহার হাতের অর্ধভুক্ত মুড়ির মোয়াটা মাটিতে ফেলিয়া দিয়া বলিল, নে, খা।

পার্বতীর মা বামাপদের কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অসুখ করেছে বামাপদ? পথে বৃষ্টি ঘুমোতে পারনি? শিগগির নেয়ে নাও, আমি ভাত চড়িয়ে দিচ্ছি, ভাত হলে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়, তাহলেই শরীরটা ঠাণ্ডা হয়ে আসবে।

বামাপদ মুখ তুলিল না। চৌকি হইতে নামিয়া একবার শাশুড়িকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইয়া আবার চৌকিতে বসিয়া পড়িল।

মা ডাকিলেন, ও পার্বতী! ওখানে বসে আছিস কেন? এখানে উঠে আয় না।

পার্বতী উঠিয়া ধীরে ধীরে ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। কোলের শিশুটি নাড়া পাইয়া একটু কাঁদিয়া উঠিল।

পার্বতীর মা সুবোকে সঙ্গে লইয়া বাহিরে যাইবার সময় আবার বলিয়া গেলেন, তুমি নেয়ে নাও বাবা, এখন আমার ভাত হয়ে যাবে।

তিনি রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। পার্বতী কোমল স্বরে বামাপদকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, এমন করে বসে রইলে যে! কাপড় বের করে দেব?

বামাপদ বলিল, না। শরীরটা ভাল না, স্নান করব না।

—স্নান না কর, কাপড়-চোপড় ত ছাড়বে?

—ভাত খাব না, মনে করছি।

—ভাত না খেলেও আর কিছু খাবে ত? রুটি করে দেব?

বামাপদ তারও কোন উত্তর দিল না। পার্বতী শিশুটিকে বিছানায় শোওয়াইয়া দিয়া বামাপদকে বলিল, তুমি একটু দেখো, আমি রুটি করে আনি।

পার্বতী চলিয়া গেল। বামাপদ একটু সরিয়া বসিল। শিশু তাহার পিছনে অঘোরে ঘুমাইতেছিল। পোষা বিড়ালটা আবার আসিয়া বামাপদের পা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। বামাপদ তাহাকে লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিল। বিড়ালটা আবার উঠিয়া আসিয়া বামাপদের পিঠের কাছে গা ঘষিতে লাগিল। বামাপদ একেবারে লাফাইয়া উঠিল। একটু চাহিয়া দেখিয়া হাত দিয়া বিড়ালটাকে ঠেলিয়া আবার বসিয়া পড়িল। তাহার শূন্য দৃষ্টি থাকিয়া থাকিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে পার্বতী ঘরে আসিলে বামাপদ প্রশ্ন করিল, এ কার ছেলে?

পার্বতী হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, কেন, বলছি ত, আমার।

বামাপদ কপাল কুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার মানে?

পার্বতী উত্তর করিল, আমার মানে আমার! মানে, আমি ওর মা।

বামাপদ কয়েক বৎসর পরে কর্মস্থল হইতে ছুটি পাইয়া বাড়ি আসিয়াছে। পার্বতীর কথায় তাহার সমস্ত চৈতন্য যেন লোপ পাইতে বসিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইল, ঘরের ভিতরে অবরুদ্ধ সিংহের মত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

পার্বতী নম্রভাবে বলিল, আজ সকালেই মন্দিরে একে কুড়িয়ে পেয়েছি।

বামাপদ বলিল, কাল রাত্রেও ত তুমি অনেকক্ষণ মন্দিরে ছিলে?

পার্বতী মাথা নাড়িয়া বলিল, হ্যাঁ, ছিলাম। কিন্তু তখন এ মন্দিরে ছিল না।

বামাপদ গম্ভীর স্বরে ডাকিল, পার্বতী! তাহার স্বর কাঁপিয়া গেল।

পার্বতী বামাপদের হাত ধরিয়া টোকিতে বসাইয়া বলিল, কি বলছিলে?

— এ ছেলে কার?

পার্বতী উত্তর করিল, কার ছিল তা জানি না। দেবতার কাছে পেয়েছি, এখন এ আমার।

— কোন জাত, কার ছেলে জানো না। তাকে তুমি কি বলে আনলে? কার ছেলে, তুমি কিছুই জানো না?

পার্বতী তেমনি আশ্চর্য হইয়া বলিল, বলেছি তো, জানি না। তবে আমি যা চেয়েছিলাম, তা পেয়েছি। এ আমারই দেবতার।

বামাপদ ক্ষেপিয়া উঠিল, দেবতা! দেবতা কে? কে সে? কার এ ছেলে, বল? তা নইলে হয় তুমি এ বাড়ি ছেড়ে যাবে, নয় আমি চলে যাব। তুমি না আমার সন্তানের মা?

পার্বতীও এবার যেন ক্ষোভে জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিল, হ্যাঁ, তাতে কি হয়েছে? এ শিশু আমার কাছে থাকবে। তোমাদের তাতে ক্ষতি হয়—

বামাপদ বাধা দিয়া বলিল, ক্ষতি হয়? তুমি বলতে পারছ, ক্ষতি হয়? এ যদি তোমার সন্তানও না হয়, তবু এ কে, তা জান না! একে ঘরে রাখলে সমাজ কি বলবে?

— তারা না বুঝে যদি কিছু বলে সে দোষ আমার নয়, এ শিশুরও নয়।

— তুমি একে মন্দিরে কুড়িয়ে পেয়েছ বলছ, বুঝতে পারছ এ কোন দুশ্চরিত্রের সন্তান? এ সব করলে তাদের কুকীর্তিকে পোষণ করা হবে। ওকে মন্দিরে রেখে এস।

পার্বতী ছুটিয়া শিশুর কাছে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর সে রুদ্ধ-কণ্ঠে বলিতে লাগিল, দুশ্চরিত্রের সন্তান কিনা তা জানি না। সন্তান, সন্তান। কার, কিসের ফল, তার বিচার কে করবে? সুরো আমাদের কারো দুশ্চরিত্রের ফল কি না, কে জানে? কে তা স্বীকার করবে, কে তার বিচার করবে? সুরো জন্ম লাভ করে তার যদি কোন অপরাধ না হয়ে থাকে, তা হলে এ শিশুরও কোনও অপরাধ নেই। আমি একে ফিরিয়ে দিতে পারব না। দেবতা একে আমার কোলে তুলে



দিয়েছেন। সন্তান বলেই একে মানুষ করব, তার জন্য তোমার ইচ্ছায় যদি আমাকে সব ছেড়ে চলে যেতে হয়, তাও পারব। দেবতার মন্দিরে একে নিয়ে আশ্রয় নেব।

বামাপদ অধীর হইয়া উঠিল। সে কাঁপিতে কাঁপিতে পার্বতীর হাত ধরিয়া টানিয়া বলিয়া ফেলিল, যাও তবে, ঐ পাপের বোঝা বুকে করে পুড়ে মবগে।

পার্বতীর চক্ষু দুইটি নিরুদ্ধ অশ্রু-আবেগকে ধরিয়া রাখিতে লাল হইয়া উঠিল। সে শিশুকে বুকে করিয়া বাহির হইয়া গেল।

সুরো দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া গিয়া মায়ের আঁচল ধরিয়া টানিল, মা কোথায় যাচ্ছ, মন্দিরে যাচ্ছ আবার?

পার্বতীর মা ঈকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এত বেলাতে কোথায় চললি আবাব?

বামাপদ ঘরের দরজার কাছে আসিয়া বলিল, যাক, যেতে দিন।

পার্বতীর মা এবার বুঝিতে পারিলেন, ব্যাপার কিছু গুরুতর হইয়াছে। তিনি ছুটিতে ছুটিতে গিয়া পার্বতীকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন। পার্বতী মায়ের কাঁধের উপর মুখ রাখিয়া ফোপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। সুবোব চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে তাহা বাবে বাবে মুছিতে লাগিল আব মাঝে মাঝে একটা স্নান হাসি মুখে ফুটাইয়া বামাপদকে দিকে চাহিতে লাগিল।

বামাপদ ডাকিল, সুরো! এদিকে এস।

পার্বতীকে লইয়া মা ঘরে আসিলেন। পার্বতী কিছুক্ষণ মাটির দিকে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিল। তাহার দুই চোখ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু মাটিতে টপ টপ করিয়া পড়িতে লাগিল। পাথায় দুঃখে তাহার বুক ভরিয়া দীর্ঘশ্বাস ফাটিয়া বাহির হইতে চাহিতেছিল, তাহাই ঢাকিয়া রাখিতে গিয়া তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে একটু পরে শিশুকে আবার বিছানায় শোওয়াইয়া দিল। তারপর মুখচোখ মুছিয়া বামাপদের দিকে চাহিয়া বলিল, আমি যাব না। এই ঘরেই একে নিয়ে থাকব। আর তুমি একে বাঁচিয়ে রাখবার খরচ দেবে। আমি নিজেই তাব জোগাড় করতাম, কিন্তু তোমাব তাতে অপমান হবে।... ভেবেছিলাম, চলে যাব। কিন্তু তা করব না। তুমি আমাকে যতখানি অপমান করেছ, তা না বুঝেই করেছ। চলে গেলে লোকেও কোন দিন বুঝত না, তুমিও বুঝতে না।

পার্বতীর মা বামাপদের পিঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন, আমি ত বুড়ো মানুষ বাবা, কিন্তু পার্বতী এমন কি করবে যাব জন্য তুমি ওকে তাড়িয়ে দিলে, তা ত বুঝতে পাবলাম না।

বামাপদ উত্তর করিল, পারবেন কি করে? আপনার মেয়ের দোষ দেখবেন কেন! পার্বতী কিছু করেনি? জাতের ঠিক নেই, কুলের ঠিক নেই, তাকে এনে ঘরে পুষতে হবে।

পার্বতীর মা ধীরে ধীরে আবার বলিলেন, তা বলোনা বাবা, আমিও প্রথমে পার্বতীকে ঐ বলে গাল দিয়েছিলাম। কিন্তু ভেবে দেখলাম, মা হয়ে ছেলে তুলে নিয়েছে, তাতে আর কি হয়েছে! জাত! জাত তো জন্মাবার পর ঠিক হয় বাবা। পার্বতী ওর মা। তুমিও তোমার কাজ করবে, ওকে রক্ষা করবে। বাস, ফুরিয়ে গেল।

সুবো একটু দূরে দাঁড়াইয়া সভয়ে বলিল, কেন বাবা, অত রাগ করছ? ও তো আমাবই মত দেখতে।

পার্বতী সুরোকে কোলে লইয়া বামাপদের কাছে আসিয়া বলিল, এ ছেলে তোমার, আব ও ছেলে আমার জীবন-দেবতাব। তা হলে হলো ত? তাব চেয়ে ত কুলশীল আব কিছু বড় নেই? তুমি এমন কলোনা, একটু ভেবে দেখ, কেউ না নিলে ও কি কবে বাঁচবে?

পার্বতীর মা বামাপদর বুকে হাত দিয়া বলিলেন, নে বাবা, নে। কেউ ফেলে দেয়, কেউ তাই কুড়িয়ে নেয়, এই ত সংসারে এতকাল দেখছি। যা হবার হবে, এখন তো রাখ।

বামাপদ সুরোকে পার্বতীর কোল হইতে নামাইয়া লইয়া বাহিরে যাইতে যাইতে বলিল, তবে থাক!

পার্বতী লাফাইয়া গিয়া নিদ্রামগ্ন শিশুকে চুষন-ধারায় প্লাবিত করিয়া দিল। তাহার চোখের জল পড়িয়া শিশুর মুখ অঙ্ককার-রাত্রির শিশিরে-ভেজা ফুলের মত দেখাইতেছিল।

বাহির হইতে বামাপদ ডাকিল, মা, ওকে ত কিছু কাপড় করে দিতে হবে। কাপড় এনে দিলে পার্বতী পারবে না শেলাই করে দিতে?

পার্বতীর মা বাহিরে আসিতে আসিতে চোখের জল আর হাসি মিলাইয়া উদ্ভর করিলেন, তা আর পারবে না বাবা! ঐটুকু ত প্রাণ, কাপড়-চোপড় না হলে বাঁচবে কেন?

## নিতান্ত হাল্কা মামলা

হেমেন্দ্রকুমার রায়

ফুরিয়ে গিয়েছে প্রাতরাশের পালা। সাঙ্গ হয়েছে সংবাদ পাঠ। জয়ন্তের ইচ্ছা বাঁশী সাধে। মানিকের সাধ দুই-এক চাল দাবা খেলে। এমন সময়ে কালীবাবুর প্রবেশ। দুজনেরই সাঁপড়ল বাদ।

বাবু কালীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী। দক্ষিণবঙ্গের একজন বড় জমিদার। কিন্তু এক বকম স্থায়ীভাবেই শিকড় গেড়েছেন কলকাতায়। জয়ন্তদের পাড়ার লোক এবং প্রায় বন্ধুও বটে। বয়স ষাটের কম হবে না। মাথার চুল কার্পাস তুলোর মত ধবধবে। কিন্তু গায়ের টুকটুকে রঙের জেল্লা এখনো ময়লা হয়নি এবং লম্বা চওড়া দেহখানিও বেশ শক্তসমর্থ। একাধিক জ্যোতিষী রজতমুদ্রার বিনিময়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, অন্তত পঁচাশী বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি যে কোন যমদূতকে কদলী প্রদর্শন করতে পারবেন এবং সেইজন্যে বৃদ্ধ বয়সে দ্বিতীয় পক্ষের তরুণী ভার্যার অধিকারী হয়েও কালীবাবু দিবা সপ্রতিভ মুখে নিষ্করণ পৃথিবীর বক্রদৃষ্টির দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারেন।

পরমায়ুর বাকি এখনো সিকি শতাব্দী— সে তো বহুকালের ব্যাপার। বয়সে বিয়ে করেছি তো হয়েছে কি? দীর্ঘজীবীকে আবার বুড়ো বলে খোঁটা দেওয়া কেন বাপু? কালীবাবুর মনের ভাবখানা হচ্ছে এই রকম। জ্যোতিষীদের কথায় তাঁর অটল নির্ভরতা।

মানিক কিস্তিৎ বিন্মিত স্বরে বলে উঠল,— আরে কালীবাবু যে! ভোরবেলা তো আপনার কাছে অবেলা! এমন অসময়ে বৌদির রঙিন আঁচল ছেড়ে আমাদের মত চিরকুমারদের খাস্তা আস্তানায় কেন?

কিন্তু জয়ন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কালীবাবুর মুখের পানে তাকিয়ে বললে,— আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে আপনি যেন অসুস্থ।

কালীবাবুর প্রফুল্ল মুখে অসুস্থতার ছাপ কেউ দেখে না। জয়ন্তের বিস্ময়ের কারণ আছে।

কালীবাবু অবসাদগ্রস্তের মত একখানা চেয়ারের উপরে অঙ্গভার ন্যস্ত করে বললেন,— হ্যাঁ জয়ন্তবাবু, আমি অসুস্থ। কিন্তু দেহের নয়, মনের অসুখ।

সরকার সব জমিদারী হস্তগত করবেন বলে আজকাল কোন জমিদারেরই মন সুস্থ নয়। কালীবাবু কি তাই—

জয়ন্তের চিন্তাশ্রোতে বাধা দিয়ে কালীবাবু হঠাৎ বললেন,— জয়ন্তবাবু, শুনেছি আপনারা সখের গোয়েন্দাগিরি করতে ভালোবাসেন। আমাকে একটু সাহায্য করতে পারবেন!

জয়ন্ত অল্পক্ষণ নির্বাক হয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে,— আপনাকে আমরা কোন্ দিক দিয়ে সাহায্য করতে পারি? আপনার কি কিছু চুরি গিয়েছে?

কালীবাবু বিমর্ষভাবে মাথা নেড়ে বললেন,— চুরি? না, আমার কিছুই চুরি যায়নি। চুরি গেলে আমি এতটা চিন্তিত হতুম না, আর সরকারি পুলিশ থাকতে আপনাদের বিরুদ্ধ করতেও আসতুম না।

— তবে?

— এই চিঠিখানা পড়ে দেখুন। এখানা কাল বৈকালে পেয়েছি। কালীবাবু নিজের পকেট থেকে একখানা খাম বার করে জয়ন্তের দিকে এগিয়ে দিলেন।

কালীবাবুর ডান হাতের দিকে চেয়ে জয়ন্ত বললে,— আপনার বুড়ো-আঙ্গুল আব তক্তনীর উপরে পটি বাঁধা কেন?

—একটা ঘরের দুই দরজার মাঝখানে পড়ে কাল বড়ই চোট লেগেছে। ডাক্তার ডাকতে হয়েছিল। আজ আর আঙ্গুল দুটো নাড়তে পারছি না। কিন্তু ও-কথা নিয়ে এখন আব মাথা ঘামাবার দরকার নেই। চিঠিখানা আগে পড়ে দেখুন।

খামের দিকে তাকিয়েই জয়ন্তের চোখ একটু চমকে উঠল। তার উপরে হাতের লেখা নেই, ছাপা বই থেকে কতকগুলো অক্ষর কেটে নিয়ে পর পর বসিয়ে কালীবাবুর নাম ও ঠিকানা লেখা হয়েছে। সাধারণ সরকারি খাম, আমহার্স্ট স্ট্রিট পোস্ট-অফিসের ছাপ মাঝা।

খামের ভিতরের কাগজও চিঠির কাগজ নয়, সাধারণ ফুলস্কাপ কাগজের আধখানা কেটে নিয়ে মাঝখানে ভাঁজ করে ব্যবহার করা হয়েছে। চিঠির কথাগুলোও মুদ্রিত পুস্তকের অক্ষর কেটে নিয়ে বসানো।

কথাগুলো এই :

২০/৮/৫৪

শ্রীকালীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী সমীপে

মহাশয়,

আমার স্ত্রী মাধবী বিধবা নয়। আমিই তার বৈধ স্বামী এবং বলা-বাহুল্য আজও বহল-তবীয়তে সশরীরে বিদ্যমান। স্বামী বর্তমান থাকতে হিন্দু স্ত্রীর দ্বিতীয়বার বিবাহ হতে পারে না, অথচ শুনিছি আমার স্ত্রীকে আপনি আবার ‘বিবাহ’ করেছেন। এটা যে গুরুতর অপরাধ, আশা করি আপনি তা স্বীকার করবেন।

এই বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্যে আমি শীঘ্রই আপনার সঙ্গে দেখা করব।

ইতি —

নিবেদক শ্রীমহীতোষ সেন।

পত্রখানা পাঠ করে জয়ন্ত নীচবে কালীবাবুর মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

কালীবাবু বললেন,— আমার বিবাহের ব্যাপার নিশ্চয় আপনার অভজনা নেই?

না, জয়ন্তের তা অভজনা নেই। ব্যাপারটা হচ্ছে এই :

নিঃসন্তান অবস্থায় কালীবাবুর প্রথম সহধর্মিণী পরলোকে গমন করেন ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে। বিপুল বিস্তারিত মালিক হয়েও সন্তানের অভাবে কালীবাবুর দুঃখের সীমা ছিল না। তাঁর তারাপ্রসন্ন নামে এক ভ্রাতৃপুত্র আছে বটে, কিন্তু তার নাম তিনি মুখেও আনেন না। সে হচ্ছে মদ্যপ, জুয়াড়ি, বেশ্যাসক্ত ও অকর্মণ্য, নিজের সমস্ত সম্পত্তি অনায়াসে উড়িয়ে দিয়েছে খোলামকুচির মতো এবং কালীবাবুও তাকে আর নিজের বাড়িতে ঠাই পৰ্বন্ত দিতে রাজি নন। যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে তাঁর জীবন হয়ে উঠেছিল অশান্তিময়। অবশেষে অনেক ভেবেচিন্তে ও বন্ধু-বান্ধবদের পরামর্শ নিয়ে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিধবা মাধবী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন।

তখন মাধবীর বয়স কুড়ি বৎসর এবং কালীবাবু পঞ্চাশের কোঠা পার হয়ে গিয়েছেন। সুতরাং বর-কন্যার এই মিলন যে রাজ্যযোটক বলে গণ্য হয়নি, সে কথা বলাবাহুল্য। ভার্যার সার্থকতা পুত্রের জনাই, অনেকের কাছে শাস্ত্রবাক্য আউড়ে কালীবাবু তা প্রমাণিত করতে চেয়েছিলেন বটে, কিন্তু শুধু শাস্ত্রের নির্দেশ পালনের জন্যেই যে তিনি পুনর্বিবাহ করতে

চেয়েছিলেন, এটা একেবারে পূর্ণ সত্য না হতেও পারে। কেবল যুবতী নয়, মাধবী ছিল পরমা সুন্দরী। অধিকাংশ বৃদ্ধের পক্ষে একটা মস্ত অস্বস্তিকর কথা হচ্ছে এই যে পঞ্চাশের ওপারে গিয়েও মনের ভিতরে আসঙ্গলিঙ্গা প্রবল থাকে যুবকের মতই। দুর্নিয়ার বহু ট্রাজেডির (এবং কমেডিরও) জন্ম এই মনোবৃত্তির মহিমাতেই।

এই অসম-মিলন মাধবী কিভাবে গ্রহণ করেছিল বাইরে তা প্রকাশ পায়নি। কিন্তু সে বুদ্ধিমতীরই মতো মুখে কোন প্রতিবাদ করেনি, কাবণ প্রতিবাদ কববার যোগ্যতা তার ছিল না। শৈশব থেকেই সে বাপ-মা-হারা, দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের ঘরে অনাদরে মানুষ; তার উপরে প্রথম যৌবনেই স্বামী হারিয়ে তাকে আশ্রয় নিতে হয়েছিল অনাথ-আশ্রমে, অতএব এখানে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রশ্ন উঠতেই পারে না, বরং বলা যায় যে, এই দ্বিতীয় বিবাহটা তার পক্ষে হয়ে দাঁড়িয়েছিল শাপে ববের মতো, কাবণ কালীবাবু যুবক না হলেও ধনকুবের। স্বৈচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কামিনীর যৌবন তো চির্বদিনই বিক্রীত হয়ে আসছে কাঞ্চনের বিনিময়ে।

তাব বৈধবোর পিছনেও আছে একটুখানি ইতিহাস। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে মহীতোষ সেনের সঙ্গে যখন তাব বিবাহ হয়, তখনও সে হয়নি উদ্ভিন্নযৌবনা। বিবাহের অল্পদিন পরেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ফৌজে চাকরি নিয়ে মহীতোষ মিশরে চলে যায়। তারপর ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে মিশর থেকে সবকিছু খবর আসে যে, কোন একটা যুদ্ধের পর থেকে মহীতোষ সেন 'মিসিং', অর্থাৎ নিখোঁজ। তাবপর একে একে কয়েক বৎসর কেটে যায়, কিন্তু তাব আর কোন পাত্রা পাওয়া যায়নি। অতএব স্বাভাবিকভাবেই সকলে ধরে নেয় যে, মহীতোষ আব ইহলোকে বর্তমান নেই। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিখোঁজ হওয়ার অর্থ দাঁড়ায় যে নৃত্য, এইটেই দেখা গিয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে।

কিন্তু ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ থেকে নিখোঁজ মহীতোষের আত্মা যে এখন প্রেতলোকে বাস করছে না ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে লিখিত তাব পত্রে সেই সত্যটাই প্রমাণিত হচ্ছে। বিস্ময়ের কথা, কিন্তু অসম্ভব নয়। পাশ্চাত্য দেশে অশুভবার দেখা গিয়েছে এমন ব্যাপাব।

॥ ২ ॥

জয়ন্ত মনে মনে ভাবতে লাগল, ব্যাপারটা বাঁতিমত নাটকীয় হয়ে উঠেছে। বাঙ্গালি জীবনে এমন ঘটনা সহসা ঘটে না।

কালীবাবু বললেন, — আমি এখন কি কবব?

মানিক বললে, — কি করা উচিত, তাব কিছুই কি আপনি স্থির করতে পারেননি?

কালীবাবু বললেন, — আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছি আর সেই জন্যই তো আপনাদের সাহায্য চাই।

জয়ন্ত শুধোলে, কিন্তু কি-রকম সাহায্য?

— এই পত্রখানা দেখে আপনার কি মনে হয়?

— আর পাঁচজনের যা মনে হতে পারে, তাই। অর্থাৎ বিশেষ কিছুই নয়। প্রথমত পত্রলেখক নিজের হস্তাক্ষর গোপন করতে চায়। দ্বিতীয়ত লেফাফা সবকারি, কাগজেও কোন বিশিষ্টতা নেই, এর 'ওয়াটার মার্কে' পাওয়া যায় বটে— Howard Smith, Belfast Bond, Made in Canada, কিন্তু এও হচ্ছে খুব সাধারণ—

কালীবাবু বললেন, — আক্ষেপ হ্যাঁ, আমিও ঐ মার্ক-মাঝা ফুলফ্যাপ কাগজ ব্যবহার করি।

জয়ন্ত ভূ সঙ্কুচিত করে বললে, — তাই নাকি? আপনিও ঐ একই কাগজ ব্যবহার করেন? তারপর অল্পক্ষণ স্তব্ধ থেকে সে বললে, — তাহলেই বুঝুন, এ রকম কাগজ আপনি

ব্যবহার করেন, আমি ব্যবহার করতে পারি, আবার আরো অনেকেও ব্যবহার করতে পারেন।  
তাই বলছিলুম, কাগজেও কোন বিশিষ্টতা নেই।

মানিক বললে,— কিন্তু এখানে একটা ব্যাপার আন্দাজ করা যেতে পারে। পত্রলেখক  
নিজের ঠিকানা দেয়নি। সে নিজের হাতের লেখাও কারকে দেখাতে চায় না। এ লুকোচুরির  
কারণ কি?

কালীবাবু বললেন,— অথচ সে নিজেকে আড়ালে লুকিয়ে রাখতে চায় না, কারণ সে  
নাকি শীঘ্র আমার সঙ্গে দেখা করবে। সুতরাং কোন রকম লুকোচুরিই এখানে যুক্তিহীন বলে  
মনে হয় নাকি?

জয়ন্ত বললে,— এ ব্যাপারটা নিয়ে আমিও মনে মনে মাথা খামাছি। চিঠিখানা লিখেছে  
নিশ্চয়ই কোন মতলববাজ লোক। আমার সন্দেহ হয়, লোকটার মনে বিশেষ কোন মন্দ  
অভিসন্ধি আছে, কিন্তু সেটা যে কি, তা বুঝে উঠতে পাচ্ছি না।

মানিক বললে,— চিঠিখানার ধরন-ধারণ অনেকটা উড়োচিঠির মতো। উড়োচিঠি প্রায়ই  
ভিত্তিহীন হয়।

কালীবাবু বললেন,— কিংবা কেউ হয়তো আমাকে গ্র্যাকমেল করবার ফিকিরে আছে।

জয়ন্ত বললে,— তাও অসম্ভব নয়।

— কিন্তু এ সবই তো আন্দাজী কথা। আমি আপনাদের কাছে এসেছি একটা নিশ্চিত  
নির্দেশ পাবার আশায়।

—কালীবাবু, এত তাড়াতাড়ি এত নিশ্চিতভাবে কিছু বলা চলে না। আমাকে একটু  
ভাববার সময় দিন। মনে হচ্ছে, একটা পথও যেন খুঁজে পেয়েছি। আমরা কাল সকালে  
আপনার সঙ্গে দেখা করব। সেই সময়ে হয়তো কোন কোন কথা বলতে পারব।

॥ ৩ ॥

পরদিন প্রভাতে যথাসময়ে কালীবাবুর বাড়ির দিকে পদচালনা করলে জয়ন্ত ও মানিক।

মানিক শুধোলে,— কাল দুপুরে তুমি কোথায় অদৃশ্য হয়েছিলে? আমি এসে ফিরে  
গিয়েছি।

— গিয়েছিলুম সৌরীনের কাছে, কলেজের সৌরীন মিত্রের কথা তোমার মনে আছে?

—সৌরীন মিত্র? এক সৌরীন মিত্র তো আমাদের সঙ্গে ‘ফোর্থ ইয়ার’ পর্যন্ত পড়েছিল।  
তুমি কি তার কথা বলছ?

— হ্যাঁ, সেই ই। আমি জানতুম, সৌরীনের এক ভাই বারীন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে  
সৈন্যে যোগ দিয়ে উত্তর-আফ্রিকায় গিয়েছিল। তার সঙ্গেই ছিল আমার দরকার।

মানিক বিস্মিত স্বরে বললে,— তার সঙ্গে তোমার কি দরকার থাকতে পারে?

— বিশেষ কিছুই নয়। আমি খালি জানতে গিয়েছিলুম, ক্ষৌজে মহীতোষ সেন নামধারী  
কোন ব্যক্তির সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল কিনা?

মানিক বলে উঠল, ওহো বুঝেছি!... তারপর কি জানতে পারলে?

— জানলুম, মহীতোষ সেন নিখোঁজ হলেও যুদ্ধে মারা পড়েনি।

— তারপর?

— ব্যাপারটা আর একটু ফলাও করে বলছি শোনো। মহীতোষের কথা তুলেই বারীন  
উল্লেখিত ভাবে বলে উঠল,— ব্র্যাকগার্ড! সে ভারতের বাইরে বাঙালির নাম ডোবাতে  
চেষ্টাছিল! আমি বললুম— ‘কেন’? বারীন বললে— লড়াই শুরু হতেই সে যুদ্ধক্ষেত্র  
থেকে কাপুরুষের মতো পালিয়ে গিয়েছিল। প্রথমে এটা জানা যায়নি, তাই তার নাম

বেরিয়েছিল নিখোঁজদের তালিকায়। তারপর সবকথা প্রকাশ পায়। তাকে নিয়ে খোঁজাখুঁজি চলে, কিন্তু তার নাগাল পাওয়া যায় না। ধরা পড়লে 'ডিজার্টার' বলে সামরিক আদালতে নিশ্চয়ই তার কঠিন শাস্তি হত। বুঝেছ মানিক! এতদিন পরে সেই বীরপুরুষই দুপ্তগ্রহর মত আবির্ভূত হয়েছেন বেচারী কালীবাবুর ভাগ্যগগনে।

—হঁ। ব্যাপারটা দেখছি বড়ই ঘোরালো হয়ে উঠল।

— সৈনিক বেশে বারীন আর অন্য দুই বন্ধুর সঙ্গে তোলা মহীতোষের একখানা ফটোও আমি সংগ্রহ করেছি। ভবিষ্যতে সেখানা কাজে লাগলেও লাগতে পারে।

— বিশেষ কাজে লাগবে বলে মনে হয় না। ভারত আজ স্বাধীন, আর মহীতোষ ছিল ইংরেজ আমলের সেপাই। ডিজার্টার বলে এখন কেউ তাকে গ্রেপ্তার করতে চাইবে কি?

— বোধহয় না। আর সেই জন্যই তো এতদিন পরে এই কাপুকষ আত্মপ্রকাশ করতে সাহসী হয়েছে।

— কিন্তু একটা প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাচ্ছি না। আত্মপ্রকাশ করতে উদাত হয়েও সে নিজের ঠিকানা আর হাতের লেখা লুকোতে চায় কেন?

— ঠিক বলেছি। এর মধ্যে যেন কোন শয়তানির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এখন একথা চাপা দাও, এই আমরা কালীবাবুর বাড়ির কাছে এসে পড়েছি।

॥ ৪ ॥

জয়ন্ত ও মানিক সচমকে দেখলে, কালীবাবুর দরজার সামনে ছোট এক জনতা। তার মধ্যে আবিষ্কার কবা যায় একাধিক লাল পাগড়িকেও।

মানিক সর্বিষ্ময়ে বললে,— এখানে আবার পুলিশ হাস্‌মা কেন?

ঠিক সেই সময় বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন ইনস্পেক্টর ভূপেন চক্রবর্তী। মেদদোষাক্রান্ত কিন্তু দশাসই চেহারা। ভারিকে চালচলন, উপরিতন কর্মচারী ছাড়া দুনিয়ার আব সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন কৃপালুনেত্রে। জয়ন্ত ও মানিক তাঁকে চিনত, কাষণ কোন কোন মামলায় তাদের পুরাতনবন্ধু ও পরামর্শপ্রার্থী ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর সুন্দরবাবুর সঙ্গে ভূপেনবাবুর দেখা পাওয়া গিয়েছে কয়েকবার।

তাদের দেখেই ভূপেনবাবু বলে উঠলেন, 'আরে আরে, এ কি ব্যাপার?' মড়া পড়তে না পড়তেই শকুনির টনক নড়ে। জয়ন্ত অপ্রসন্ন কণ্ঠে বললে,— মশায়েব উপমাটার অর্থ বুঝলুম না।

— অর্থটা কি এতই দুর্বোধ্য? হা হা হা হা! কিন্তু গোড়াতেই জেনে রাখুন মশাই, সুন্দরবাবু মতো আমিও আপনার সাহায্যপ্রার্থী নই— নিজের মামলার ভার আমি নিজেই বহন কবতে পারি। আর তা ছাড়া এটা একটা মামলার মতো মামলাই নয়, এ হচ্ছে নিতান্ত হাল্কা মামলা, যে কোন শিষ্ট ও এর তদ্বির কবতে পাবে।

জয়ন্ত বললে,— আপনি কি সব বাজে বকছেন? আমরা কোন মামলার ভাব নেবার জন্যে এখানে আসিনি। কালীবাবু ডেকেছেন তাই আমরা এসেছি। আমবা তাঁর বন্ধু।

— কালীবাবু আপনাদের ডেকেছেন? কিন্তু তিনি এখন কোথায়?

— কেন, তিনি কি বাড়িতে নেই?

— বাড়িতেও নেই, পৃথিবীতেও নেই।

— মানে?

— কাল রাতে তিনি আত্মহত্যা কবেছেন।

এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে জয়ন্ত ও মানিক একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। তাদের মন একথা বিশ্বাস করতে চাইলে না এবং তাদের মৌন মুখের উপরেও ফুটে উঠল সেই মনের কথা।

ভূপেনের শিক্ষিত দৃষ্টি সেকথাটা বুঝতে ভুল করলে না। ওষ্ঠাধর টিপে মৃদু হেসে তিনি বললেন,— যা ভাবছেন, তা নয়। কালীবাবু যে আত্মহত্যা করেছেন তাতে আর একটুও সন্দেহ নেই।

ততক্ষণে জয়ন্ত নিজেকে সামলে নিয়েছে। কালীবাবুর অভাবনীয় অপঘাতের সংবাদ পেয়ে সাধারণ লোকের মতো তার মন প্রথমটা আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু তারপরই জাগ্রত হয়ে উঠল তার তীক্ষ্ণধারনিশিত গোয়েন্দা-বুদ্ধি— যে কোন পরিস্থিতির মধ্যে যা থাকে সবদিকই অবিচল ও অবিভ্রান্ত। সে বেশ সহজভাবেই বললে,— মৃতদেহ কি এর মধ্যেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে?

— না, উপরওয়ালাদের আদেশের অপেক্ষা করছি।

— বলেছি, কালীবাবু ছিলেন আমাদের বন্ধু। শেষবারের জন্য একবার তাঁকে দেখতে পাব কি?

আবাব ঠোট টিপে একটু হেসে ভূপেনবাবু বললেন,— এসব জায়গায় বাইরেব বাঙে লোকের প্রবেশ নিষেধ। তবে আপনি পরিচিত ব্যক্তি, অতএব আমার আপত্তি নেই। কিন্তু এখানেও যেন সখের গোয়েন্দাগরি করে আপনি আমার উপরে টেক্স মারবার চেষ্টা না করেন, কারণ আমি সুন্দরবাবু নই। আমি বলছি এটা আত্মহত্যা মামলা, সব দেখে-ওনে আপনাকেও আমার কথা মানতে হবে।

জয়ন্ত বললেন,— ঘাবড়াচ্ছেন কেন, তাই সই।

ভূপেনের পিছনে পিছনে জয়ন্ত ও মানিক ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হল।

সেটা হচ্ছে কালীবাবুর একাধারে বসবাব ও পড়বাব ঘর। আকাবে বড়ই বলতে হবে। তিন দিকের দেওয়াল আড়াল কবে সারি সারি বইভরা আলমারি। যোঁদিকে দেওয়াল-ঢাকা আলমারি নেই সেইদিকে তিনটি জানলা ও ঘবে ঢোকবার জন্যে একটিনাত্র দরজা। ঘরের মাঝখানে একটা বড় টেবিল ও তার তিনদিকে চাৰখানা ও একদিকে একখানা চেয়ার। টেবিলের উপরে লেখবার প্যাড, দোয়াতদান, কলমদান, কাগজ চাপা, খানকয় বই ও অন্যান্য টুকিটাকি জিনিস।

ঘরের এককোণে একটা টাইপ-রাইটারের ছোট টেবিলের উপর টাইপ করার যন্ত্র। জয়ন্ত জানত, সেটা হচ্ছে কালীবাবুর বাংলা টাইপ-রাইটার, তিনি নিজে ব্যবহার করতে ভালোবাসতেন।

বড় টেবিলের একপাশে কিছু তফাতে একখানা ইঁজ-চেয়ার এবং তারই উপবে দেখা যাচ্ছে অর্ধশয়ান অবস্থায় হতভাগ্য কালীবাবুর মৃতদেহ। তাঁর মাথাটি বাঁ কাঁধের উপর লুটিয়ে পড়েছে এবং ডান রগের উপবে একটা গভীর, ভীতিকর ও রক্তাক্ত ক্ষত। মুখ ও বুকের কতক অংশের উপরে ও চেয়ারের একদিকে রক্ত জমাট বেঁধে আছে এবং মেঝেব উপরেও রয়েছে চাপ চাপ রক্ত। ইঁজচেয়ারের চাটালো হাতলের উপরে পড়ে আছে তাঁর ডান বাহুখান এবং সেই হাতের মুষ্টির মধ্যে রয়েছে একটা রিভলভার— ট্রিগ্গার উপবে তখনো সংযুক্ত রয়েছে মৃতের তক্তনীটি।

কালীবাবুর চোখদুটি খোলা এবং তাদের মধ্যে তখনো আড়ষ্ট হয়ে আছে বিস্ময়ের মত একটা ভাব— জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ করবার জন্যে যুক্তিহীন মৃত্যু যে এমন আকস্মিকভাবে তাঁকে আক্রমণ করবে, যেন তিনি তার জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। জয়ন্তের মনে হল এ চোখ যেন আত্মঘাতীর চোখ নয়।



কিন্তু ভূপেনের তা মনে হয়নি। তিনি অঙ্গুলি নির্দেশে বললেন,— দেখছেন ক্ষতের চারিদিকে পোড়া দাগ? তার মানে কালীবাবু রিভলভারের নলচোটা একেবারে নিজের রঙের উপরে রেখে টিপকল টিপে দিয়েছিলেন।

মুখে খালি ‘হু’ বলে জয়ন্ত হেঁট হয়ে পড়ে খরচোখে কালীবাবুর হাতটা কিছুক্ষণ পরীক্ষা করলে। তারপর বললে, পবন দিন কালীবাবুর অঙ্গুষ্ঠ আর তক্তমীর উপরে বিষম চোট লেগেছিল, এখনো তার চিহ্ন জাঙ্গল্যমান। কাল দেখেছিলুম আঙ্গুল দুটোর উপরে পটি বাঁধা রয়েছে।

ঘরের দরজার কাছ থেকে নুতন গলাব আওয়াজ এল।— রিভলভারের গোড়া টেপবার আগে কালীবাবু নিশ্চয়ই সেটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। এ দেখুন, ঘরের কোণে ব্যান্ডেজটা এখনো পড়ে রয়েছে।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি মূর্তি। বয়স হবে পঁইত্রিশ-ছত্রিশ। রং উজ্জ্বল শ্যাম। মুখশ্রী বিশেষদ্ব্যবস্জিত হলেও দেখতে মন্দ লাগে না। মাথায় পবিপাটি করে আঁচড়ানো লম্বা চুল, জোড়া ভুরু, ওষ্ঠের উপরে চার্লি-চ্যাপলিন গোঁফ। ডান গালে, একটা বড় আঁচল সহজেই চোখে পড়ে। ভ্রামাকপড় বাবুয়ানার পরিচয় দেয়। দেহ দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ।

জয়ন্ত জিজ্ঞাসু চোখে ভূপেনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে।

ভূপেন বললেন,— ইনি হচ্ছেন মতিলাল মজুমদার, কালীবাবুর প্রাইভেট সেক্রেটারি, বাসা এই বাড়িতেই। কাল রাত এগারোটোর সময়ে রিভলভারের শব্দ শুনে ছুটে এসে উনিই প্রথমে জানতে পারেন, কালীবাবু আত্মহত্যা করেছেন।

মতিলালের মুখের পানে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ভূপেনের জবানীতে জয়ন্ত তার পরিচয় শ্রবণ করলে। তারপর তার নমস্কারের উত্তরে প্রতিনমস্কার করে সে ঘরের কোণে এগিয়ে গিয়ে মেঝের উপর থেকে তুলে নিলে পরিত্যক্ত ব্যান্ডেজটা।

ব্যান্ডেজের খানিকটা অংশ রক্তের ছোপে আরক্ত।

জয়ন্তের দুই চক্ষু উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সে ফিরে মানিকের সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় কবলে। তারপর ধীরে ধীরে বললে,— ভূপেনবাবু, আত্মহত্যার কোন কারণ আপনি আবিস্কার করতে পেয়েছেন?

যেন কেমনা ফতে করেছেন এমন ভাব দেখিয়ে ভূপেন বললেন,— পেরেছি বৈকি! এই চিঠিখানা দেখুন। এখানা ছিল বড় টেবিলটার উপরে। এই একখানা চিঠিই আত্মহত্যার পক্ষে যথেষ্ট।

সেই চিঠি— ছাপার অক্ষব কেটে নিয়ে যা লেখা হয়েছে।

জয়ন্ত চিঠিখানা যেন দেখেও দেখলে না। বললে,— আর কোন সূত্র পেয়েছেন?

পেরেছি বৈকি, সবচেয়ে বড় সূত্র। এদিকে আসুন।—ভূপেনের মুখে মহা গাভীরের ভাব।

॥ ৫ ॥

ভূপেন কয়েক পদ অগ্রসর হয়ে বাংলা টাইপ-রাইটারের টেবিলের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, — দেখুন।

তখনও টাইপ-রাইটারের সঙ্গে সংলগ্ন রয়েছে একখানা ‘টাইপ’-করা কাগজ। জয়ন্ত মুখ নামিয়ে পাঠ করলে :

সধবাকে আমি বিধবা ভেবে বিবাহ করেছি— মাধবীর শাস্তসম্মত স্বামী  
আবার ফিরে আসছে। এর পর সমাজে আমার আর মুখ দেখাবার উপায়

থাকবে না। এই লজ্জা ও অপমানের কবল থেকে নিস্তার পাবার জন্যে  
আজ আমি এই পত্র লিখেই আত্মহত্যা করব এবং এর জন্যে আর কেহ  
দায়ী হবে না। ইতি —

শ্রীকালীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী

জয়ন্ত টাইপ-রাইটার যন্ত্রটা ধরে নাড়াচাড়া করে মিনিটখানেক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে কি  
ভাবতে লাগল। তারপর পকেট থেকে রূপোর শামুকের মতো দেখতে নসাদানটা বার করে  
একটিপ নস্যা গ্রহণ করলে।

গোড়া থেকেই মানিক এই অভাবিত আত্মহত্যার ব্যাপারটা স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করতে  
পারে নি। উড়েচিঠির সত্যতা সম্বন্ধে কালীবাবুর নিজেরই সন্দেহ ছিল এবং সেইজন্যেই  
তিনি তাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সন্দেহ নিরসন না করেই তিনি  
যে আত্মহত্যা করবেন, তাঁর প্রকৃতি এতটা দুর্বল ছিল না। বিশেষ কালীবাবু ছিলেন যেন  
জীবনজোয়ারের মূর্তিমান উচ্ছ্বাস; নিখিল বিশ্বের পরিপূর্ণ আনন্দ আশ মিটিয়ে উপভোগ  
করবার জন্য তাঁর চিন্তে ছিল একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা; এত সহজে দুর্ভাগাকে মেনে নিয়ে  
আত্মহত্যা করবার মানুষ তিনি ছিলেন না। তাঁর বিশ্বাস, জয়ন্তও এই কথা জানে এবং মানে।

জয়ন্ত হঠাৎ এখন নস্যা নিলে কেন? বহু মামলায় মানিক বারংবার লক্ষ্য করেছে, স্বপক্ষে  
কোন মূল্যবান সূত্র পেলেই জয়ন্ত খুশি হয়ে নস্যা না নিয়ে পারে না। এ টাইপ-রাইটারটা  
নেড়েচেড়ে সে এমন কি আনন্দজনক সূত্র আবিষ্কার করলে? কিন্তু জয়ন্তের মুখ দেখে এ  
প্রশ্নের কোন উত্তরই পাওয়া যায় না। তার মুখ একেবারেই কালীঘাটের পটে আঁকা মূর্তির  
মত ভাবহীন।

মুকুন্দের মত মস্তক সঞ্চালন করতে করতে ভূপেন বললেন,— কি জয়ন্তবাবু, এখন কি  
ভাবছেন? যা বললুম, তাই তো? কালীবাবু নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করেছেন— এটা নিতান্ত  
হালকা মামলা!

রূপোর নসাদানটা পকেটস্থ করে জয়ন্ত বললে,— আশ্বে হ্যাঁ, আপনার কথাই ঠিক।  
এটা নিতান্ত হালকা মামলা।

ভূপেন বললেন,— তাহলে এই রক্তাক্ত দৃশ্যের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা খামোকা আর  
মেজাজ খরাপ করি কেন? বাইরে চলুন।

— তাই চলুন। বাইরে গিয়ে মতিবাবুর কাছ থেকে আমি দু-একটা কথা জানবার চেষ্টা  
করব। আশা করি ওঁর আপত্তি হবে না?

মতিলাল দ্বিধাহীন কণ্ঠে বললেন,— বিলক্ষণ! আপত্তি আবার কিসের? তবে আমাকে  
বেশিক্ষণ ধরে না রাখলেই বাধিত হব, কারণ এই দুর্ঘটনার ফলে আমার ঘাড়ে পড়েছে  
অনেক অপ্রীতিকর কাজের ভার।

॥ ৬ ॥

- মতিবাবু, আপনি কালীবাবুর প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজ করছেন কতদিন?
- তিন বৎসর।
- কালীবাবু নিজের সাংসারিক ব্যাপার নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতেন?
- আশ্বে হ্যাঁ, আমার উপরে ছিল তাঁর অটল বিশ্বাস। কেবল সাংসারিক নয়, সমস্ত  
বৈষয়িক ব্যাপার নিয়েই আমার সঙ্গে তিনি পরামর্শ করতেন।
- কালীবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র তারাপ্রসন্নবাবুকে আপনি চেনেন কি?
- নিশ্চয়ই চিনি! এই কালকেই তো তিনি এখানে এসে বিষম হুলস্থূল বাধিয়ে দিয়েছিলেন।
- সে আবার কি?

— কালীবাবুর সঙ্গে তাঁর ভয়ানক ঝগড়া হয়েছিল। আমি সেখানে হাজির না থাকলে খুড়েকে তিনি নিশ্চয় মেরেই বসতেন।

— কেন?

— কালীবাবুর অবর্তমানে তারাশ্রমবাবুরই বংশধররা সম্পত্তির মালিক হতে পারবেন। কিন্তু উইলের এই সর্ত তারাশ্রমবাবুর মনঃপূত হয়নি, আর তাই নিয়েই ঝগড়া।

— উইল কবে হয়েছিল?

— গেল হপ্তায়, অর্থাৎ আজ থেকে ছয়দিন আগে।

এই সময়ে বাড়ির ভিতর থেকে একজন দাসী মতিলালের সামনে এসে বললে,— মা-ঠাকরুণ আপনাকে ডাকছেন।

মতিলাল বললে,— শুনলেন তো, আমার তলব পড়েছে; কর্তা-গিন্নি দুজনেরই আমাকে না হলে চলে না। বেশি বিশ্বস্ত হওয়ার মানেই হচ্ছে, বেশি খাটুনি খেটে মরা।

— মা-ঠাকরুণ কে?

— মাধবী দেবী।

— বেশ, আপনি আসুন, আমার আর কিছু জনাব নেই। ... না, না, আমার আর একটি মাত্র জিজ্ঞাসা আছে। কালীবাবুর বাড়িতে বাংলা টাইপ-রাইটার আছে কয়টি?

— একটা।

— বাস, আমার কথা ফুলে।

মতিলালের হস্তদস্তের মত প্রশ্ন।

ভূপেন বললেন,— ভয়স্তবাবু, বাড়ে কথা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মিছে আর ফাঁকড়া বাড়াচ্ছেন কেন? নিজের হাতে যে মবে, তাকে আব কোন সাহায্যই করা যায় না।

জয়ন্ত রসহীন কণ্ঠ হাস্য করে বললে,— আপনি যথার্থ কথাই বলেছেন। এটা নিতান্তই একটা হাল্কা মামলা। তবে আমার একটি অনুরোধ রাখবেন?

— বলুন।

— আত্মহতার আগে কালীবাবু যে কথাগুলি 'টাইপ' করে গিয়েছিলেন, ঐ টাইপ-রাইটারে সে কথাগুলি আর একখানা কাগজে 'টাইপ' করিয়ে আমাকে একবার দেখাতে পারেন?

— এ আবার আপনার কি খেয়াল?

— যথাসময়েই সব কথা বলব। বৈকালে আপনার সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে।

|| ৭ ||

বৈকাল। জয়ন্ত ও মানিক খানার ভিতবে প্রবেশ করল।

তাদের দেখেই ভূপেন টেবিল চাপড়ে বলে উঠলেন,— আরে ভয়স্তবাবু, আপনি এ আবার কি গোল বাধালেন?

মুখ টিপে হেসে জয়ন্ত বললে,— ব্যাপার কি?

— বড়ই রহস্যময়। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

— কি বুঝতে পারছেন না?

— যে টাইপ-রাইটারের সঙ্গে কালীবাবুর অস্তিম স্বীকার-উক্তি সংলগ্ন ছিল, তার মধ্যে 'রবন' বা কালির ফিতে নেই।

— আমি তা জানি।

— কেবল তাই নয়। তারপর নতুন রিবন আনিয়ে কালীবাবুর সেই স্বীকার-উক্তি 'কপি' করে দেখা গেল, সেটা 'টাইপ' করা হয়েছে অন্য কোন 'মেসিনে', কারণ আসল আর নকলের টাইপে'র ছাঁদ একরকম নয়।

— ব্যাপারটা যে এই রকম দাঁড়াবে, আমি আগেই সেটা অনুমান করতে পেরেছিলুম। এটা নিতান্ত হালকা মামলা।

ভূপেন প্রায় গর্জন করে বলে উঠলেন,— কে বলে মামলাটা হালকা? মামলাটা এর মধ্যেই দস্তুরমত ভারী হয়ে উঠেছে।

জয়ন্ত বেশ সহজভাবেই বললে,— হালকা কি ভারী জানিনা মশাই, তবে এটা যে খুনের মামলা, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই।

ভূপেন উত্তেজিতভাবে বললেন,— আপনি যে আরো বেশি ভারী— অর্থাৎ গুরুতর কথা বলছেন! আশ্বহতাকেও আপনি খুন বলে চালাতে চান নাকি?

— ভূপেনবাবু আমার মতো আপনিও তো স্বকর্ণে শুনেছেন, কালীবাবুর একটার বেশি টাইপ-রাইটার ছিল না? আর স্বচক্ষেই তো দেখেছেন, তাইতেই আটকানো ছিল তাঁর স্বীকার-উক্তি? অথচ সেই টাইপ-রাইটারে কালির ফিতে ছিল না। আপনি নিশ্চয়ই বলবেন না যে আশ্বহত্যার পূর্ব-মুহুর্তে নিষ্কৃষ টাইপ-রাইটার থাকতেও কালীবাবু বাড়ি ছেড়ে আর কোথাও ছুটে গিয়ে অন্য যন্ত্রে তাঁর স্বীকার-উক্তি 'টাইপ' করে এনেছিলেন? এটা একেবারেই অসম্ভব। এর মধ্যে নিশ্চয়ই দ্বিতীয় ব্যক্তির হাত আছে।

— দ্বিতীয় ব্যক্তি?

— হ্যাঁ, হত্যাকারী।

ভূপেনের লক্ষ্যত্যাগ ও আসনত্যাগ। সে চমকিত কণ্ঠে বললে,— কি বলছেন আপনি!

জয়ন্ত নিঃস্বপ্ন মনেই বললে,— ঘরের মেঝে থেকে কালীবাবুর আঙুলের ব্যান্ডেজ তুলে নিয়ে প্রথমই আমার চোখ খুলে যায়, কালীবাবুর ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠ আর তর্জনী ছিল ঐ ব্যান্ডেজ দিয়ে বাঁধা। সে অবস্থায় কেউ রিভলভারের ঘোড়া টিপতে পাবে না। অবশ্য কালীবাবু নিজেই পটি খুলে ঘোড়া টিপতে পারতেন। কিন্তু সে ক্ষেত্রে পটির উপরে এক ফোঁটা রক্তের দাগও লাগত না এবং তিনি তা করেনও নি। তিনি যখন ওলীবিদ্ধ হন, তাঁর আঙুলের উপরে তখন পটি বাঁধা ছিল আর সেই জন্যই পটির উপরে ছিল রক্তের ছোপ। সুতরাং হত্যাকাণ্ডের পর পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্যে হত্যাকারীই যে পটিটা সরিয়ে ফেলেছিল, এতে আর কোনই সন্দেহ নেই।

নির্বাক ভূপেন মুখবাদান করে জয়ন্তের দিকে তাকিয়ে রইলেন পরম বিস্ময়ে।

জয়ন্ত বললে,— এই মামলায় দুটো সব চেয়ে প্রমাণ হচ্ছে, রক্তাক্ত পটি আর 'রিবন'-হীন টাইপ-রাইটার। এই দুটো প্রমাণেই জানা যায়, ঘটনাস্থলে আবির্ভূত হয়েছিল দ্বিতীয় ব্যক্তি। তাড়াতাড়িতে সে লক্ষ্য করতে পারেনি যে, পটির উপরে রক্তের ছোপ আছে। অন্য কোন টাইপ-রাইটারে আগে থাকতেই সে স্বীকার-উক্তি 'টাইপ' করে প্রস্তুত হয়ে এসেছিল, কালীবাবুর মেসিনে সেখানা আটকবার সময়ে কল্পনাও করতে পারেনি যে, তার মধ্যে নেই কালির ফিতে।

ভূপেন চমৎকৃত, তখনও তাঁর মুখে নেই রা।

জয়ন্ত বললে,— এখন প্রশ্ন ওঠে, এই দ্বিতীয় ব্যক্তি কে হতে পারে? ভূপেনবাবু, আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে দেখেছেন, যে পত্রখানা কালীবাবুর তথাকথিত 'আশ্বহত্যা'র হেতু, তার 'ট্রেডমার্ক' খোঁজ নিলে জানতে পারবেন, কালীবাবু নিজেও ঐ একই 'ট্রেডমার্ক' মারা কাগজ ব্যবহার করেন। এই দেখে সন্দেহ হয়, পত্রপ্রেরক তাঁর বাড়িতে আনাগোনা করবার

সুযোগ পায়। কিন্তু এ সন্দেহের বিশেষ মূল্য নেই, কারণ এরকম কাগজ বাজাবে সুলভ, সুতরাং পরস্পরের সঙ্গে অপরিচিত যে কোন ব্যক্তি ব্যবহার করতে পারে। অতএব অন্য উপায়ে আমাদের হত্যাকারীর সন্ধান করতে হবে। ভূপেনবাবু, আপনি আরো একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন কি?

— ভূপেন ক্ষীণস্ববে শুধোলেন, কি?

— ইঞ্জি-চেয়ার আর তার উপরকার মৃতদেহের অবস্থান?

— হ্যাঁ। চেয়ার আর দেহ দুইই ছিল ঘরে ঢোকবার দরজার মুখোমুখি।

— ঘরে দরজা ছিল একটিমাত্র। তাহলে?

— কেউ যদি ঘরে ঢুকে থাকে, তবে তাকে কালীবাবুর সুমুখ দিয়েই ঢুকতে হয়েছিল।

— কেউ যদি কেন ভূপেনবাবু, কেউ নিশ্চয়ই ঘরে ঢুকেছিল।

— আপনি কি বলতে চান, খুনী যখন ঘরে ঢোকে, কালীবাবু তাকে দেখতে পেয়েছিলেন?

— তাই তো বলতে চাই।

— অথচ কালীবাবু তাকে বাধা দেননি?

— না, কারণ সে ছিল তাঁর পরিচিত। হ্যাঁ, অতি পরিচিত, তাই সন্দেহের অতীত। কাবণ খুনী যে ঘরে ঢুকেই সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে ওলি ছোঁড়েনি, সে প্রমাণও আছে। কালীবাবুর ডান রঙের উপরে রিভলভারের নলচে লাগিয়ে ওলি ছোঁড়া হয়েছিল, আমরা সকলেই তা জানি। সুতরাং বুঝতে হবে যে, খুনী যখন ঘরে ঢুকে কালীবাবুর খুব কাছে ডানপাশে এসে দাঁড়ায়, তখনও তিনি তাকে কিছুমাত্র সন্দেহ করতে পারেননি, কেন না সে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি। এখন আন্দাজ করতে পারেন, কে এই ব্যক্তি?

ভূপেন কতকটা তাড়িভূতের মত হয়ে পড়েছিলেন, এতক্ষণ পরে তাঁর দেহে, মুখে ও চোখে জাগ্রত হল জীবনচাক্ষুশ! উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন, আলবৎ আন্দাজ করতে পারি, নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারি!

— কে সে?

— কালীবাবুর ভাইপো তারাপ্রসন্ন। আমি এখনি তার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ব।

জয়ন্ত স্মিতমুখে বললে,— হ্যাঁ, সম্পত্তি থেকে প্রায় বঞ্চিত হয়ে কালীবাবুর উপরে সে বিষম খাপ্পা হয়ে আছে বটে। এমন অবস্থায় অনেক খুনখারাপ হতে দেখা গিয়েছে। আপনার অনুমান অসঙ্গত নয়।

— তাহলে এখানে দাঁড়িয়ে আমি আর সময় নষ্ট করি কেন? বিলম্বে কার্যহানির সম্ভাবনা।

— তীর্থ ক্ষণকাল। আর একটু সবুজ করলে ক্ষতি হবে না। আমার হাতে আরো কিছু কিছু প্রমাণ আছে।

॥ ৮ ॥

ভূপেন বললে,— যা বলবার বলে ফেলুন মশাই, আমার আর তর সইছে না।

জয়ন্ত বললে,— হ্যাঁ, তারাপ্রসন্নের উপরে সন্দেহ হবারই কথা। ও-বাড়িতে তার আনাগোনা ছিল। সে জুয়াড়ী, মদ্যাপ, লম্পট, বেকার— তার মত লোক সম্পত্তি হারিয়ে যে চণ্ডালে-রাগের বশবর্তী হয়ে নরহত্যা কববে, এটা কিছুই অসম্ভব নয়।

ভূপেন বললে,— হায় হায়, গোড়া থেকেই তার উপরে আমার সন্দেহ করা উচিত ছিল, তাহলে এতক্ষণে তার হাতে আমি লোহার বালা পরিয়ে দিতে পারতুম।

— এই বারে আর একটা কথা ভেবে দেখুন ভূপেনবাবু। ঘটনার রাত্রে কথা শ্রবণ করুন। ঘড়িতে এগাবোটা বেজেছে। দরজার দিকে মুখ করে কালীবাবু ইঞ্জি-চেয়ারের উপরে

বসে আছেন। এমন সময়ে যে-তারাশ্রম খানিক আগে মারমুখো হয়ে তাঁর সঙ্গে ভীষণ ঝগড়া করে গেছে, সে হঠাৎ ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল। আপনি যদি কালীবাবু হতেন, এ অবস্থায় পড়লে কি করতেন?

— উঠে তারাশ্রমকে তেড়ে মারতে যেতুম, নয়তো দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতুম, নয়তো—

— থাক, ওতেই চলবে। কিন্তু কালীবাবু ও-সব কিছুই করেন নি। তিনি নিশ্চিতভাবে চেয়ারের উপরেই বসে রইলেন, আর তারাশ্রম নির্বিবাদে সুমুখ দিয়ে সোজা তাঁর ডানপাশে এসে তাঁকে গুলি করে সরে পড়ল। এটা কি সম্ভবপর?

— উঁহ!

— তাহলে বেশ বোঝা যাচ্ছে তারাশ্রম হত্যাকারী নয়।

ভূপেন দস্তরমত মুসড়ে পড়ে বললেন,— আপনি তো সাংঘাতিক লোক মশাই। এই টেনে তোলেন আকাশে, এই ঠেলে ফেলেন পাতালে!

জয়ন্ত অবিচলিত ভাবে বললে,— আপনি মহীতোষ সেনের কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন?

— ভুলিনি, কারুরকি ভুলিনি। কিন্তু তার সঙ্গে এই খুনের কি সম্পর্ক?

— চিঠিতে সে নিজের ঠিকানা আর হাতের লেখা গোপন করেছে। কালীবাবু তাকে নিশ্চয়ই চিনতেন।

— ওরকম গোপনতার মানে হয় না। কালীবাবু বেঁচে থাকলে সে যে নিজেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসত, এটাও ভুলবেন না যেন।

— হ্যাঁ, পরে সভাই দেখা করতে এসেছিল হত্যার সংকল্প নিয়ে। কিন্তু সে চিঠিখানা লিখেছিল অন্য উদ্দেশ্যে।

— কি উদ্দেশ্যে?

ঐ চিঠির সঙ্গে কালীবাবুর মৃতদেহ আবিষ্কৃত হলে সকলেরই দৃঢ়বিশ্বাস হবে, কালীবাবু আত্মহত্যা করেছেন। দৈবগতিক তদন্তে কেউ আসল ব্যাপার সম্ভেদ করলেও, সে থাকবে নিরাপদে। কারণ পত্রে তার হাতের লেখা বা ঠিকানা নেই।

ভূপেন হতাশভাবে বললে,— এ যে বিশবীণ জলের নিচে পড়লুম বে বাবা। যাকে জানি না, চিনি না, তাকে ধরব কেমন করে?

ভূপেনের হাতে একখানা ফোটো গুঁজে দিয়ে জয়ন্ত বললে,— বন্ধুদের সঙ্গে সদলবলে এই দেখুন মহীতোষকে। ডানদিক থেকে দ্বিতীয় ব্যক্তিই হচ্ছে আপনার আসামী। চিনতে পারেন?

ছবির উপরে চোখ বুলিয়ে ভূপেন ঘাড় নেড়ে বললেন,— মোটেই না।

জয়ন্ত আর একখানা ছবি দেখিয়ে বললে,— এরমধ্যে মহীতোষের মূর্তি অনলার্জ করে দেখানো হয়েছে। ছোট ছবিতে ওর মুখের খুঁটিনাটি ভালো করে বোঝা যাচ্ছিল না। মহীতোষের দাড়ি-গোফ কামানো ছিল, কেবল আমি সখ করে তাব নাকের তলায় ছোট্ট একজোড়া গোফ একে দিয়েছি। এখন বলুন তো মহাশয়, ঐ গোফ, ঐ জোড়াভুরু আর ডান গালের ঐ আঁচিল আপনি এর আগে আর কোন মুখে দেখেছেন কিনা?

ভূপেন দুইচক্ষু ছানাবড়ার মত করে তুলে বললে,— আরে এ যে মতিলাল মজুমদার, কালীবাবুর প্রাইভেট সেক্রেটারি।

— তাহলে এবারে চিনতে পেরেছেন? উত্তম! হ্যাঁ, মতিলালই হচ্ছে খুনী এবং মহীতোষ সেন। নাম তাঁড়িয়ে সে কালীবাবুর কাছে চাকরি নিয়েছিল। কালীবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে এই ব্যাপারে তার যোগসাজস থাকতেও পারে। তবে মাধবী দেবী যে তাঁর পূর্ব-স্বামীকে চিনতে

পেরেছিলেন, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। একে পূর্বপ্রেম, তায় কালীবাবু বৃদ্ধ আর মতিলাল প্রায় যুবক, সুতরাং মাধবীকে খুব দোষ দেওয়াও যায় না— যৌন নির্বাচনে জয় হয় প্রায়শঃ যৌবনেরই। কালীবাবুকে ইহলোক থেকে বিদায় নিতে হত অনেকদিন পূর্বেই, কিন্তু মাত্র ছয়দিন আগে উইলে মাধবীকে জীবনস্বত্ব দিয়ে তিনি নিজের মৃত্যুকে ঘনিষে এনেছিলেন নিজেই। এখন আপনার কর্তব্য আপনি করুন ভূপেনবাবু, আপাতত বিদায় মাগে সখের গোয়েন্দারা।

জয়ন্তের দুই হাত চেপে ধরে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ভূপেন বললেন,— স্বীকার করি আপনি হচ্ছেন অতুলনীয়!

জয়ন্ত হাসিমুখে বললে,— কিছু না, কিছু না। সত্যি এটা নিতান্ত হাল্কা মামলা, নইলে এত সহজে কিনা হত না। তবে ব্যান্ডেজ আব টাইপ-রাইটার দিয়ে ভ্রম না করলে মতিলালকে মহীতোষ বলে চিনতে পারলেও কেউ তার কিছুই করতে পারত না। সে ধরা পড়ল খালি সামান্য অসাবধানতার জন্যেই। চলে এস মানিক, এখন ভূপেনবাবু যাবেন মহীতোষের খোঁজে।

## উচ্ছ্বল

### সরসীবালা বসু

ভোরের আলো সবেমাত্র পূর্বাকাশে ফুটিয়া উঠিয়াছে, শুকতারার উজ্জ্বল অঁখি তখনও নীলাকাশে পরিস্ফুট, মধ্যগগনে কৃষ্ণপঙ্কের চন্দ্রকণা নিষ্প্রভপ্রায়, শীতল বাতাস, ফোটা বেল ও মল্লিকা গন্ধে ভরপুর হইয়া বহিতেছে। গ্রামবাসিগণ গ্রীষ্মের রাত্রি অনেকক্ষণ পর্যন্ত জাগিয়া থাকিয়া, এখন ভোরের দিকে সকলেই প্রায় সুখনিদ্রায় অভিভূত। অদূরে গঙ্গাবক্ষে সাড়ে চারিটার স্টীমের ভেঁ ভেঁ শব্দে নিদ্রিত পাখীকুলকে সচকিত ও প্রভুষের শাস্ত্রাবকে উদ্ভিন্ন করিয়া জলে তরঙ্গোচ্ছাস তুলিয়া সদর্পে চলিয়া গেল।

অদূরে খড়ো ঘরের ছোট্ট জানালার ধারে পিয়ারী এই ভোরেই জাগিয়া উঠিয়া বসিয়া আছে। তাহার মুখ দেখিয়া বেশ বুঝা যায়, সমস্ত রাত্রি সে অনিদ্রায় অতিবাহিত কবিয়াছে, চক্ষে কেমন উদ্ভিন্ন ভাব, যেন কার আশাপথ চাহিয়াই সে সারা রাত্রির জগরণ-ক্লেশ স্বেচ্ছায় বহন করিয়াছে, প্রভাতের এ পবিত্র শাস্ত্র ভাব স্বেচ্ছায় বহন করিয়াছে। প্রভাতের এ পবিত্র শাস্ত্রভাব তাহার হৃদয়কে মোটেই স্পর্শ করে নাই। ক্লান্ত দৃষ্টিতে গঙ্গার পানে চাহিয়া সে বুঝি তাহার অতীত কাহিনী ভাবিতেছিল।

বিশ্বের পরিতাপ্তা সে, তাহাকে স্নেহ-যত্ন করিতে আপনার বলিতে পৃথিবীতে কেহই নাই। তাহার জ্ঞান, তাহার তরুণ হৃদয়ে ক্ষোভের আওন ধিকি ধিকি কবিয়া জ্বলিতে থাকিলেও সে তো কোন দিন আশা বা কল্পনা করে নাই যে একদিন তার এই পবিত্রান্ত্র লাঞ্ছিত জীবনে একজন নিতান্ত অপরিচিত ব্যক্তি কোথা হইতে আসিয়া সমুদ্রে নিজের অন্তরের স্নেহ ভালোবাসা দিয়া বরণ করিয়া লইবে, তাই যদিই সে লইল, তবে তার সে চিরবন্ধু চির আপনার হইল না কেন? মনের মধ্যে যদিও পিয়ারী — তাহাকে অসঙ্কোচে শূন্য হৃদয়-সিংহাসনে জীবন-দেবতা রূপেই অধিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছে, পরিপূর্ণ নির্ভবতাব সহিত তাহার চরণে আত্মনিবেদন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছে। কিন্তু বাহ্যে তো তাহাব কোন প্রমাণ নাই। সমাজের চক্ষে মানুষের কুটনীতির তর্কে সেই একান্ত আপনার জনকে তো আপন বলিয়া স্বীকার করিবার তার কোন অধিকারই নাই। তার সুখের সময় অবসব কালে সঙ্গিনী হইবার সুযোগ মিলিলেও দুঃখকষ্টের দিনে বিপদের সময়ে তাহার পাশে দাঁড়াইয়া তাহার দুঃখ বিপদের অংশ গ্রহণ করিবার ন্যায্য দাবী পিয়ারী কিছুতেই কবিত্তে পারে না, তাই হতভাগিনী — জ্ঞানমুখে অবসাদপূর্ণ হৃদয়ে বসিয়া এখন ভাবিতেছে, এমন লোকের সহিত এ জীবনে দেখা না হইলেই বুঝি ভাল ছিল। পিয়ারী যে কবে মাতৃহীন হইয়াছিল, সে কথা তাহার মোটেই স্মরণ নাই। পিতার একান্ত প্রাণঢালা স্নেহমন্ত্রণায় সে কোনদিনই মায়ের অভাব বুঝিতে পারে নাই। পিতা মহাদেও সুদূর চাপরা জেলা, হইতে পেটের দায়ে, স্ত্রী কন্যা লইয়া বাঙ্গলা দেশের এই পন্নীগ্রামের চটকলে রোজগার করিতে আসিয়াছিল, ক্রমে এইখানেই মাটির ঘর করিয়া বেশ স্থায়ী ভাবেই বসিয়া গিয়াছিল। স্ত্রীর মৃত্যুর পর দেড় বছরের পিয়ারীকে কোলে পিঠে করিয়াই সে চটকলে কাজ করিতে যাইত,



ঘরে নিজের হাতে ভাত রাঁধিয়া বাসন মাজিয়া, পিয়ারীকে যথাসময়ে তেল মাখাইয়া স্নান করাইয়া দিত। এজনা তাহার কোন অসুবিধা হইত না।

এমনি করিয়া মেয়েটাকে মানুষ করিতে করিতে সে দশ বছরে পদার্পণ করিল। স্ত্রীর মৃত্যু হইলে অনেকেই মহাদেওকে পুনরায় বিবাহ করিবার জন্য বিস্তর পরামর্শ দিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের জাতের মেয়ে সে দেশে ছিল না। সুতরাং আবার খরচপত্র করিয়া ছাপরা গিয়া ‘কণিয়া’র খোঁজ করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করা তাহার নিকট যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় নাই। কিন্তু এখন পিয়ারীকে দশ বছরেরটি হইতে দেখিয়া, এখন একবার দেশে গিয়া তাহার জন্য একটি ‘দুলাহা’র খোঁজ করা তাহার অবশ্য কর্তব্য বুঝিতে পারিল। সুতরাং অবিলম্বে দুই মাসের ছুটি লইয়া পিয়ারীর সাদী দিবার জন্য সে দেশে গেল, পিয়ারী কিন্তু ছোটবেলা হইতে বাঙ্গালা দেশে লালিত পালিত হইয়াছে, বাঙ্গালা বলিই তাহার ভাষা, বাঙ্গালা চালচলনেই সে অভ্যস্ত হইয়াছে। কাজেই নিজেদের দেশ তাহার নিকট বিদেশের মত ঠেকিতে লাগিল। তাহাব উপর তাহার বাঙ্গালী বিবির মতন চালচলন দেখিয়া যখন বর্ষীয়সী আত্মীয়গণ অবাক হইয়া নাকেমুখে হাত দিয়া বলিতে লাগিল— “আগে মইয়া ঈতো পুবা বাঙালীন বন্ গইল, কৈসে দলভাকা খরমে বৈঠা।” তাহা শুনিয়া শুনিয়া পিয়ারীর পিতৃগুণ্ড যেন জুলিয়া উঠিল, আত্মীয়-স্বজনবৎ আদব মমতা উপেক্ষা করিয়া তাহার মন সেই বাঙ্গলা দেশের গঙ্গাব ধায়ে খোড়ো বাড়ীটির উদ্দেশে ছুটিতে চাহিত, কিন্তু তাহাব ইচ্ছামত তো কার্য্য হইবে না। তাহার বাড়ী ফিবিবাব একান্ত তাগাদায় মহাদেও তাহাকে বাববাব বুঝাইতে লাগিল এই তাহার আসল দেশ, এইখানে বিয়া সাদী কবিয়া তাহাকে জন্ম কাটাইতে হইবে। অতঃপর অনেক খোঁজখারিজ করিয়া পনের বছর বয়সের দেওকী লালের সঙ্গে মেহের পিয়ারীর সাদী দিয়া মহাদেও যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। তবে মেয়েটা জন্মের মত পর হইয়া গেল, এই ভবিয়া বেচাবীব বৃকেব ভিতব আকৃপাকৃ করিলে এই মনে করিয়া সে আবার সাধুনা পাইল, এখন তো পাঁচ বছর মেয়ে তাহারই কাছে থাকিবে, তার পর ‘গওনা’ হইলে তবে তো সে শ্বশুর বাড়ী আসিবে। মহাদেওব বুড়ী চাচি ও আথী কিন্তু তাহাকে সুপবামর্শ দিল যে মেয়েকে আব সে বাঙ্গালা দেশে লইয়া যাওয়া উচিত নয়, এখন সে কিছুদিন দেশে তাহাদের নিকট থাকিয়া নিজেদের আচার ব্যবহার আদব কাযদা শিখুক। নহিলে পুবা বাঙালীন বনিয়া গিয়া এব পরে কেমন কবিয়া সে আপন আদমীর ঘর কবিতো পাবিবে? এখানে সে যবেব বিটিয়া, আদব যভেই থাকিবে, মহাদেও তাহার খরচা হিসাবে পাঁচ সাত টাকা মাসে মাসে পাঠাইলেই হইবে।

এই পবামর্শ মহাদেওব কাছে মন্দ না ঠেকিলেও পিয়ারী কিছুতেই বাপকে ছাড়িয়া থাকিতে বাজী হইল না। অগত্যা মহাদেও মেয়েকে লইয়া আবার নিজের কর্মস্থলে ফিরিয়া আসিল। পিয়ারীও পরমাত্মীয়গণের আদর যত্ন ও সংপারামর্শের হাত এড়াইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

মহাদেও এতদিন ধরিয়া যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিল, কন্যাব বিবাহে সে সব পুঁজি পাটাই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। এখন গওনার সময় আবার ঐ প্রকার ভাবী খবচপত্র আছে, সেজনা বেশ হিসাবী হইয়া আবার কিছু কিছু করিয়া জমাইয়া রাখিতে লাগিল। কিন্তু তাহার সাধের পিয়ারীর গওনা আর হইল না। বিবাহের তিন বৎসর পরে সে দেশ হইতে খবর পাইল যে, দেওকীলাল হঠাৎ কলেরায় মারা গিয়াছে।

পিয়ারীর বয়স এখন চৌদ্দ বৎসর, সে কিন্তু নিজের দুর্ভাগ্যে গুরুত্ব মোটেই বুঝিতে পারিল না— সুতরাং অনর্থক কাঁদিয়া কাটিয়া মন খারাপ করিল না, যেমন হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইত তেমনি বেড়াইতে লাগিল। মহাদেও কিন্তু বড় ভাবনায় পড়িল। এই বিদেশে বিড়ুয়ে যুবতী কন্যা লইয়া সে কেমন কবিয়া একা থাকিবে। এতদিন না হয় পিয়ারী ছোটটি ছিল, তাই থাকিতে পাবিয়াছিল, তারপর সে মনে মনে স্থি ব কবিয়াছিল, মেয়ের গওনা হইয়া

গেলে হয় মেয়েকে দেশে পাঠাইয়া দিবে, না হয় তো দেওকীলালকে নিজের কাছে আনিয়া চটের কলে কাজে লাগাইয়া দিবে। রামজী কিন্তু সে সাথে বাদ সাধিয়া বসিলেন। এখন মানুষের শরীর গতিকের কথা তো বলা যায় না, যদি তার হঠাৎ কিছু একটা ভালমন্দ ঘটিয়া যায়, পিয়ারী তখন কার দ্বারা গিয়া দাঁড়াইবে?

ভাবিয়া চিন্তিয়া মহাদেও হির করিল, বছর ঘুরিয়া গেলে আর একবার সে দেশে গিয়া দেখিয়া শুনিয়া আর একটি দুলাহার সহিত, 'সগাই' লাগাইয়া একেবারে ঘর বসাইয়া দিয়া আসিবে না হয়, মেয়ে-জামাইকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া জামাইকে এখানকার চটকলে কাজে লাগাইয়া দিবে।

কিন্তু মহাদেওর সে সাধও রামজী পূর্ণ করিলেন না। বৎসরান্তে যখন সে দেশে যাই যাই করিয়া সব গোছগাছ করিতেছিল, সেই সময় হঠাৎ তাহার পরপার হইতে ডাক আসিল, সুতরাং কাষ অসমাপ্ত বাখিয়াই তাহাকে চলিয়া যাইতে হইল। অভাগী পিয়ারী একেবারে অকূল পাথারে ভাসিল।

কিছুদিন পরে শোকের উচ্ছ্বাস কমিয়া আসিলে সে ভাবিয়া দেখিল, এখন যা হইবাব তা তো হইয়াই গেল, তাহাকে যখন বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, তখন গ্রাসাচ্ছাদনের তো একটা উপায় করা সর্বাগ্রে আবশ্যক। কিন্তু সে প্রাণ ধরিয়া কাহাবও দ্বারা খাটিয়া খাইতে পারিবে না। পাড়ার রিমি মা, রামুর মাসী তাহার ভালর জন্য উপযাচিকা হইয়া কাণে কাণে কি সব যুক্তি দিল কিন্তু হতভাগী পিয়ারী সে সব পরামর্শ শুনিল না, সুতরাং খোট্টা ছুড়ীর দেমাক দেখিয়া তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, “দেখছ, ছুড়ীর তেজ, ভাঙে তো মচকায় না, আচ্ছা দেখা যাক এ গুনোর কদ্দিন থাকে। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা।— ভাল পরামর্শ যখন কানে নিলে না তখন কপালের ভোগ আছেই”— ইত্যাদি।

পিয়ারী সে সকল কথা কানে না তুলিয়া, পাড়ার যে সকল ভদ্র গৃহস্থবাড়ীতে তার যাতায়াত ছিল, বাড়ি পাড়িয়া পাড়িয়া সেই সব বাড়ীতে বিক্রয় ও জাঁতায় আটা পিষিয়া, ডাল ভাঙ্গিয়া তাহাদের খোগান দিতে লাগিল। ইহাতে সহজেই তাহার অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইল।

বাদলার দিনে খোলা বারান্দায় বসিয়া সকাল বেলা জাঁতার গম পিষিতে পিষিতে পিয়ারী যখন মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চাহিয়া আপন মনে গান ধরিয়াছিল—

“বাদের ঘেরি আই বাহ না সুখাই  
কেইসে যাওব সখি কানাইয়া লাগে,  
এ-এ-শ্যামলিয়া।”

সম্মুখে জাহুবী— বক্ষে দ্রুত পবন সঞ্চালনে, ঢেউ-গুলা ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিয়া তাঁরের গায়ে আছাড় খাইয়া পড়িতেছিল, সহসা মুখলধারে বৃষ্টি নামিয়া আসিল। একখানি নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগিবামাত্র একজন আরোহী ছাতা মুড়িয়া দিয়া বাস্তবাবে নৌকা হইতে নামিয়া পড়িল।

সকালে সাতটার ভেঁ এইমাত্র বাজিয়া গিয়াছে। সে লোকটিকে চটকলে গিয়া হাজিরা দিতে হইবে। পিয়ারী আজ একমাস হইতে তাহাকে নিজের দয়ার দিয়া দুই বেলা চট কলের দিকে যাইতে ও ফিরিতে দেখে। লোকটিও কি জানি কেন পথ চলিতে চলিতে যখন পিয়ারীর দয়ারের কাছে আসিয়া উপস্থিত হয় তখন তাহার দ্রুত গতি কিছু মছুর হইয়া পড়ে— সম্ভবত পিয়ারী বারান্দায় বসিয়া জাঁতা ঘুরাইতে ঘুরাইতে যে গান করে সে গান তাহার মনকে আকৃষ্ট করে, কারণ পিয়ারীর গলা বেশ মিষ্ট। পিয়ারী কিন্তু এ গ্রামের কাহাকে দেখিয়া কুঠা বোধ করে না, করিলেও এই লোকটির সহিত চারি চোখের চাওয়া-চাওয়ি হইলেই কেনন যেন ভ্রুড়সড হইয়া পড়ে, তাহার সুর ভুল হইয়া যায়।

আজ যখন পথিক ছাত্তা মুড়ি দিয়া ভাড়াভাড়ি অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল, তখন হাওয়ার বেগে ও বৃষ্টির ঝাপটে লোকটির বিব্রত অবস্থা দেখিয়া পিয়ারীর সাধেব গান থামিয়া গেল। আহা, বেচারী তো মহা বিপদেই পড়িয়াছে। চটকল এখনও অনেক দূরে, এই ঝড় বৃষ্টিতে এতখানি পথ সে কেমন করিয়া যাইতে পারিবে! লোকটি কিন্তু নিতান্ত নির্বোধ নয়। সে দ্রুত গতিতে পিয়ারীর রোয়াকেব কাছে আসিয়া পৌছিয়া এক লাফে রোয়াকের উপর আশ্রয় লইল। ঝুটির উপরে ভিত্তা ছাত্তাটি টানাইয়া দিয়া, পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখহাত মুছিতে লাগিল। পিয়ারীর জাঁতা ঘুরান বন্ধ হইয়াছে দেখিয়া কহিল, “আটা পেয়া বন্ধ করলে কেন? তবে আমি চলে যাব কি।” এ ঝড়বৃষ্টির সময়ে শিয়াল কুকুরকে লোকে তাড়াইয়া দিতে পারে না। তা একটা মানুষকে পিয়াবী কোন মুখে চলিয়া যাইতে বলিবে? তার কি চক্ষুলজ্জা নাই? সে কহিল— “এখন, বড় জলের ছাট আসছে, একটু পরে ভাঙবে” এই বলিয়া সে ঘর হইতে একখানি ছোট টোঁকি আনিয়া পথিককে এক কোণে বসিতে দিল।

এক একজন মানুষের সহিত যে কি এক দিনক্ষণে আলাপ হইয়া যায়। যাহাতে তাহার সহিত হৃদয়ে এমন যোগ ঘটে যে অল্পদিনেব মধ্যেই সেই অপরিচিত পথেব পথিকও পরমাত্মার স্থান জুড়িয়া বসে। পিয়ারী ও পথিকের জীবনে বুঝি আজ এই ঝড়বৃষ্টিব সূত্র ধরিয়া সেই অপূর্ব ক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হইল, যেহেতু এই দিনকার আলাপের সূত্র ধরিয়া ঐ দুটা নবনাবীভ ভাগ্য যে কেমন কবিয়া দিনের পর দিন এক সঙ্গে জুড়াইয়া গেল, তাহা নিজেই তাহারা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। শুধু যখন তাহাদের ঈশ হইল তখন উভয়েই এইটুকু মাত্র বুঝিল যে, এখন উভয়েই উভয়কেই ছাড়িয়া কিছুতেই থাকিতে পারিবে না।

পিয়ারী ভোর হইতে কেদারের আশাপথ চাহিয়া উদ্ভিন্ন হৃদয়ে জানালায় বসিয়া আছে। ও পারের বাড়ীতে বন্ধ পিতা পীড়িত, সেজনা কেদার আজ কয়দিন হইতে রাগে আব পিয়াবীর ঘরে থাকিতে পারে না। সকালে আসিয়া পিয়ারীকে একবার দেখা দিয়া দু একটা কথা বলিয়া চটকলে চলিয়া যায়। সেখানে মোটে দুঘণ্টা কাজ কবিয়াই রুগ্ন পিতার সেবার জন্য তাড়াভাড়ি বাড়ী ফিরিয়া যায়। পিয়াবী কিন্তু সমস্ত রাত্রি আনচান কবিত্তে থাকে, ঘুম তাহার চোখে মোটেই আসিতে চাহে না। রাত্রি শেষ হইবার পূর্বেই সে জানালাব ধাবে বসিয়া গঙ্গার পানে চাহিয়া কেদারের আগমন প্রতীক্ষা কবে, যদিও সে জানে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে কখনই নৌকা আসিয়া কূলে ভিড়িবে না। কেদার আসিয়া এক নিঃশ্বাসে যখন তাহার পীড়িত পিতার সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলিয়া ব্যস্তভাবে কাজে চলিয়া যায়, পিয়াবীর বুক ফাটিয়া যেন একটা বিরাট হাহাকার আত্মপ্রকাশ করিতে চাহে। দুনিয়ার অপমান মাথায় লইয়া সকলের ভ্রুকুটি কুটিল কটাক্ষ উপেক্ষা করিয়া, সে যাহাকে জীবন দেবতা রূপে গ্রহণ করিয়াছে, তাহার পিতার এই কঠিন পীড়াব সময়ে এতটুকু সাহায্য করিবাব অধিকার তাহার নাই। কেদারের চোখমুখ দেখিয়া স্পষ্টই সে বুঝিতে পারে রোগীর পিছনে তাহাকে কি ওরুতর পরিশ্রম করিতে হইতেছে। কেদারের মা নাই, বাড়ীতে অন্য কোন এমন লোক নাই যে এক ঘটা জল ঢালিয়া বা রোগীকে এতটুকু সাও বালি তৈয়ার করিয়া দিয়া উপকার করে, পিয়ারীর অধিকার থাকিলে সে যে বুক দিয়া আজ রোগীর সকল সেবা ওশ্রমা করিতে পারিত। বড় ক্ষোভে বড় দুখে পিয়াবীর চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইত। নিঃশ্বাস ফেলিয়া শূন্যদৃষ্টিতে আকাশপানে চাহিয়া সে কত কি ভাবিত। গতবাত্রে সে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কি একটা স্থির কবিয়া, কেদারের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

নির্দিষ্ট সময়ে নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগিল। কেদার নৌকা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া দ্রুতপদে পিয়ারীর গৃহের দিকে আসিতে লাগিল। কয়দিন হইতে দৃশ্চিন্তা অনিদ্রা ও নিয়মিত আহার না করিয়া পিয়ারীর শরীর যথেষ্ট দুর্বল হইয়াছিল। কেদারকে দরজা খুলিয়া দিবার জন্য তাড়াতাড়ি উঠিতে গিয়া তাহার গা মাথা ঘুরিয়া উঠিল। সে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া দরজা খুলিতে গেল। কেদার বাড়ী ঢুকিয়াই পিয়ারীর ভ্রান মুখের দিকে চাহিয়াই যেন চমকিয়া উঠিল। কহিল, “একি পিয়ারী— তোমার মুখ এত শুকনো কেন? রাত্রে ঘুমোওনি বুঝি?” হায় হায়, পিয়ারী আজ কয় রাত্রিই যে অনিদ্রায় কাটাইয়াছে, সে খবর কি কেদার রাখিয়াছে? এখন কেদারের এই সম্মুখে প্রশ্নে পিয়ারীর চোখে জল আসিল। মুখ ফিরাইয়া সে কহিল, “তুমি বড় নিষ্ঠুর।” কেদার সাদরে পিয়ারীর হাত ধরিয়া কহিল, “পিয়ারী, তুমি আমার উপর রাগ করছ? কিন্তু পিয়ারী, বাবার যে বড় অসুখ, এ যাত্রা বাচেন কিনা সন্দেহ। বাড়ীতে আমি ছাড়া তাঁকে দেখবার আর কেউ নেই, এ অবস্থায় তাঁকে ফেলে তো আমি তোমার কাছে আসতে পারিনে, তুমি তো সবই বুঝতে পারছ পিয়ারী।”

কেদারের কণ্ঠস্বরে বিচলিত হইয়া পিয়ারী কহিল, “তোমায় কি আমি ঐ রোগী ফেলে আসতে বলতে পারি? আমার কি এমনই পাথবের কলিজা? তবে বলছিলাম কি, একলাটি পুরুষ মানুষ বোগীর সেবা কর, তোমারও ত কত কষ্ট হয়, তাঁর তেমন সুবিধে হয় না, তার চাইতে দিন কতকের জন্যে যদি আমায় সঙ্গে কোরে নিয়ে যেতে।”

পিয়ারী আর বেশী বলিতে পারিল না, তাহার জিহ্বা জড়িত হইয়া গেল। কেদারও পিয়ারীর কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইল। কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান সে, গ্রামে তাহাদের বংশমর্যাদা, সম্মান ও প্রতিপত্তিও বড় কম নহে। তাহার পিয়ারী-সংক্রান্ত ঘটনা গ্রামের মধ্যে অল্পবিস্তর জনাজানি হইলেও পুরুষ বাটাচ্ছেলের এ বকম বয়স দোষের কথা বড় কেউ গ্রাহ্য করবে নাই। তা বলিয়া ইহাকে একবারে ঘরে লইয়া গিয়া সকলের কাছে নিজেদের মাথা হেঁট করিতে পারে কি? অসম্ভব। লোকে তাহা হইলে এখন তাহা গায়ে ধুলা দিবে। বাবা যদিও সব কথাই জানেন তাহা হইলেও এতোটা বাড়াবাড়ি সহ্য করিবেন কেন?

কেদার আমতা আমতা করিয়া বলিল, “তা কি কোরে হয়?” কিন্তু তখনই তাহার মনে হইল, পিয়ারী যদি যায় তাহা হইলে সভাই সব দিকে সুবিধা হয়।

সে একা রুগ্ন পিতার সেবা তো পারিয়াই উঠিতেছে না, তাহার উপর বাক্তি জাগিয়া তাহার নিজের শরীর বড় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। পিয়ারী কেদারের পাণ্ডুবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া লজ্জার মাথা খাইয়া বলিয়া ফেলিল, “ঝিও তোমাদের একটা দরকার হয়ত। তা না হয় আমি ঝিয়েব মতন খেটেখুটে তোমাদের বাপ বেটার সেবা শুশ্রূষা কোরে দিলামই।”

কেদার কহিল “আচ্ছা পিয়ারী, বাবাকে আমি জিজ্ঞাসা করবো। তাঁকে না বোলে তো তোমায় নিয়ে যেতে পারি না, তিনি যদি রাজি হন তা হোলে আজই আমি এসে তোমায় নিয়ে যাব।”

সেদিন কেদার আর কাজেও গেল না, কারণ পিতার অসুখ বড় বাড়িয়াছিল। পাছে পিয়ারী ভাবে, সেই জন্য তাহাকে একবার খবরটা দিতে আসিয়াছিল মাত্র।

কেদারের পিতা গৃহিণীহীন হইয়াও স্ত্রীলোকের ন্যায় নিজে খাটিয়া খুটিয়া বাছীর সমস্ত দিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতেন। দুটি গাই ছিল, উহাদিগের নিয়মিত দেখাশোনা করিতেন। একমাত্র পুত্র কেদার অল্প বয়সে বিপত্নীক হইয়াও পুনরায় আর বিবাহ করিড়ে রাজী না হওয়ায় বৃদ্ধের বড় দুঃখ ছিল। এ বয়সে নাতি-নাতিনীর মুখ দেখিবার বড় আশা ছিল। ছেলে সে সাধ পূর্ণ হইতে দিল না। উপযুক্ত পুত্রের সঙ্গে বচসাই বা আর কত করিবেন। পরেব হাতের রান্না খাইতে প্রবৃত্তি না হওয়ায় বৃদ্ধ নিজের হাতে রান্না করিয়া পিতাপুত্রে উভয়ে

আহার করিতেন। বহুদিনের পুরাতন দাসী মাধী ঘরের অন্য সব কাজকর্ম সারিয়া রান্নার সব যোগাড় করিয়া দিত। বৃদ্ধের অসুখের দিনকয়েক পরে মাধীও পীড়িত হইয়া পড়ায় কেদারের অসুবিধার আর অন্ত ছিল না। বাড়ীঘরের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ঝিও আর পাওয়া যায় নাই। পাড়ার একটা গোয়ালাদের ছোঁড়াকে ধরিয়া আনিয়া নগদ পয়সা দিয়া কোন রকমে বাসন মাজা ও ঝাঁটপাটের কাজগুলা করাইয়া লইতেছিল। কাল হইতে পিয়ারী আসিয়া এক বেলাতেই ঘরবাড়ীর আবর্তনা দূর করিয়া, রোগীর ঘর ধুইয়া মুছিয়া, ধূনা জ্বলাইয়া, সমস্ত দুর্গন্ধ দূর করিয়া ফেলিয়াছে। চারিদিকে ছড়ান ময়লা ন্যাকড়া ও কাপড়গুলা সাবানে কাচিয়া ধবধবে করিয়াছে। বাসনগুলা ও ঘড়া ঘটি মাজিয়া বকবকে করিয়া পীড়ির উপর সাজাইয়া রাখিয়াছে। যথাসময়ে বৃদ্ধের তন্য সাও ও দুধ প্রস্তুত করিয়া, কেদারের দুটা ভাত তরকারী রাখিবার সব গুছাইয়া দিয়াছে।

বৃদ্ধ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পিয়ারীকে গৃহে আনিবার মত দিয়াছিলেন, না হইলে ছেলোটো খাটিয়া সারা হয়, অথচ তাহারও বোগশয্যায় অসুবিধার অন্ত নাই। মাধী এ সময় রোগে পড়ায় সংসার একেবারে অচল হইয়া পড়িয়াছে,— ঝি হিসাবে পিয়ারী না হয় আসিলই বা। এখন কিন্তু পিয়ারীর অক্লান্ত পরিশ্রমে সেবা ও কর্মপটুতায় যথেষ্ট প্রীত হইয়া বৃদ্ধ বলিয়া ফেলিলেন, “তুই বুঝি আর ভ্রমে আমার কেউ ছিলি গো। নইলে এই সময়ে এমন সেবা করতে এলি কেন?” বোগীব এই বাক্যই পিয়ারীর পরিশ্রমের যথেষ্ট পুৰস্কার। সে অস্মান মুখে বৃদ্ধের মলমূত্র পর্যন্ত নিজের হাতে পরিষ্কার করিয়া সমস্ত দিনরাত্রি খাটিয়া খুটিয়া, রাতে কেদারকে ঘুমাইতে বলিয়া, রোগীর মাথার কাছে পাখা হাতে ঠায় জাগিয়া রহিল। ভোরের দিকে কেদারের ঘুম ভাঙ্গিতেই সে ধড়মড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া কুণ্ঠিতভাবে বহিল, “এড় ঘুমিয়ে ছিলাম পিয়ারী, কবাতই ভেগেছি কিনা, শরীর যেন অবসন্ন হয়ে ছিল। তুমি একলাটি সমস্ত বাত ভেগে আছ। এখন তবে একটু ঘুমিয়ে নাও, আমি বাবাব কাছে বসি।”

পিয়ারী বিনা বাক্যবাহ্যে, ঘরের মেঝেয় মাদুর পাতিয়া শয়ন করিবানাই ঘুমাইয়া পড়িল, সেও আত্ম কৰ্মাদিন ধাবিয়া অনিদ্রায় অতিবাহিত করিয়াছে। উষার আলো ঘরের মধ্যে উকি দিতেই পুনরায় ব্যস্তভাবে উঠিয়া পড়িয়া গৃহকর্মে নিযুক্ত হইল।

এইকালে কয়দিনই কাটিল। বৃদ্ধের অবস্থা কিন্তু ক্রমশই খাপ পাইয়া আসিতে লাগিল, পাড়ার বান্ধবগণ চাটখোঁ, চিন্তামণি ঘটক, হরিশরণ বাড়ুয়ো প্রভৃতি মাতঙ্গর লোকেরা নিত্য নিয়মিত বৃদ্ধকে চোখে দেখা দেখিতে আসিতে কখনই অবহেলা করিতেন না। হিন্দুস্তানী ছুড়টার দিকে চাহিয়া তাহাদের পবিত্র ব্রাহ্মণ শোণিত উদ্ভূত হইয়া উঠিলেও মেঘেটাব কাজকর্ম যে খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও চটপটে, সে কথা অস্বীকার করিতে পারিতেন না! কিন্তু কেদারের ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তাশঙ্কায় তাহারা যথেষ্ট উদ্ভিগ হইয়া উঠিয়াছিলেন। একদিন বৃদ্ধের শয্যাপার্শ্বে বসিয়াই কেদারের অনুপস্থিতিতে তাহার উচ্ছ্বাসলতা সম্বন্ধে যখন সবলে তাঁর আলোচনা করিতেছিলেন, তখন নিশ্বাস ফেলিয়া বৃদ্ধ কহিলেন, “কিন্তু দাদা কোন চুলোয় কেউ না থাকলেও এই মেঘেটার ভ্রমোই শেষ সময়ে বেশী কষ্ট ভোগ করতে হবে না। যে সেবাটা বঞ্চে, নিজেই মেয়ে আর গর্ভবাবণী মা না হোলে এমন বুঝি কেউ কবাবে পারে না।” সে কথা অস্বীকার করিয়া কিছু বলিবার মত তখন আর কেহ দেখিতে না পাইলেও বুঝে: “একটা কিছু ভাবনাও হইয়া যে কেদারের পবিত্রতা ও নীতিত্বাৎ অন্তর্গত রাখিবার জন্য কেদারকে যে শাসন ও সৎকৃত করিতে হইবে, এ যুক্তি সকলেরই মস্তিষ্কে স্থান পাইল।

অনেক সেবাযত্ন ও চিকিৎসাপত্র করিয়াও বৃদ্ধকে এ যাত্রা আর বাঁচান গেল না, আজ বেলা দশটার সময় তাহার মৃত্যু হইয়াছে। কেমদারকে কিছুক্ষণ একান্তে কাঁদিবার অবসর দিয়া পাড়ার মাতব্বরগণ একটু নিরিবিলিতে একজোটে কি পরামর্শ করিলেন, তাহার পর, কেমদারের নিকট আসিয়া তাহাকে সংসারের অনিত্যতা এবং সংসারে যে বাপ-মা কাহারও চিরদিন বাঁচিয়া থাকে না সুতরাং বুদ্ধিমানের শোক করা অনুচিত ইত্যাদি পরামর্শ দ্বারা তাহার সদা পিতৃশোকের যথাসম্ভব সান্ধনা দিয়া কহিলেন— “দেখ বাপু, একটা কথা এ সময় বোলে রাখছি। হরিহর লোকটা বড় সাধু ছিল। তার ছেলে হয়ে তুমি কিন্তু একেবারে অন্য ধরনের হয়ে দাঁড়িয়েছ। তা হরিহরের মৃতদেহটার সদগতি না করলে আমাদের অধর্ম হবে। সে জনো তার সংকারটা আমরা করতে যাব। কিন্তু তুমি যে অনায়াস করেছ তার একটা প্রায়শ্চিত্ত না করা পর্য্যন্ত আমরা তোমার পিতাঠাকুরের শ্রাদ্ধশাস্তি উপলক্ষে তোমার বাড়ীতে জলস্পর্শ করতে পারব না— এ কথা বাবাজী, তোমায় আমরা আগে থাকতেই বলে রাখছি। তুমি বুঝেগেলে চোলো।”

কেমদারের তখন বোঝাশোনার মত অবস্থা ছিল না। যাহা হউক, ভদ্র সন্তানগণ যথারীতি শবদেহ শ্রাশানে বহন করিয়া লইয়া গিয়া সংকার শেষে কেমদারকে কহিলেন, “গোটা পাঁচেক টাকা দাও। মৃতদেহ দাহ কোরে মিষ্টমুখ করতে হয়, তা তোমার বাড়ী অগ্নি স্পর্শ করে ঘটক মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপে জলযোগটা সেরে নেওয়া যাবে এখন।”

কেমদার বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহাদের পাঁচটি টাকা দিয়া, ক্ষুব্ধ হৃদয়ে বাড়ী ফিরিল। তাহার আপনার বলিতে জগৎসংসারে আজ আর কেহ রহিল না। শূন্য গৃহে প্রবেশ করিয়া সে আজ বালকের ন্যায় হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। পিয়ারী মান মুখে সজল নয়নে এক পাশে বসিয়া রহিল।

দিন কিছু মানুষের সুখ দুঃখের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকে না। দিন কাটিতে লাগিল। সপ্তাহ কাল অতীত হইয়াছে অথচ পিতার শ্রাদ্ধশাস্তির জন্য কেদার কোন উচ্চবাচাই করিল না দেখিয়া পাড়ার হিতৈষী বৃদ্ধগণের শিখা ঘন ঘন কস্পিত হইতে লাগিল— কোন জাতেব একটা মেয়েকে বাড়ীতে রাখিয়া ছোঁড়াটার বুদ্ধি লোপ হইতে বসিয়াছে আব কি। সেই চিন্তায় তাহারা কেমদারকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া কহিলেন, “বলি বাবাজী, পিতার সদগতির জন্য পিণ্ডদান হিন্দুসন্তানের অবশ্য কর্তব্য। সুতরাং শ্রাদ্ধশাস্তি না করলে তোমারও অশৌচাস্ত হবে না। তা তুমি কি স্থির করেছ?”

কেমদারের উত্তর শুনিবার জন্য সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়া ধুঁকার টান দেওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ করিলেন। কিন্তু কেমদার চুপ করিয়াই বসিয়া রহিল।

ঘটক মহাশয়ের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তিনি কহিলেন, “ভাবছ কি কেমদার? এখনো কি ভাববার আর সময় আছে? একটা কিছু এতদিনে ভেবে ঠিক করনি? আশ্চর্য্য করিলকাল।

কেমদার কহিল, “দেখুন, আপনারা তো বলেছেন আমার বাড়ীতে শ্রাদ্ধক্রিয়া উপলক্ষে জলস্পর্শ করবেন না, সেই জনো আমিও চুপচাপ আছি। ব্রাহ্মণভোজনের আয়োজনই একটা বিরাট ব্যাপার, তাই যখন হবে না, তখন আর উদ্যোগ কিসের করব? গঙ্গাগর্ভে বাসে পিণ্ডদান করে অশৌচাস্ত হব এই ঠিক করেছি।”

ক্রোধ ক্ষোভে ব্রাহ্মণগণের মাথার রক্ত অত্যাধিক হইয়া উঠিল। চাটুষো মহাশয় কহিলেন, “বলি কেমদার, এই কি সন্তানের উপযুক্ত কাজ হবে? শাস্ত্রে আছে পিতাধর্ম, পিতাধর্ম— তাই পিতার আত্মা যাতে শাস্তি পায় তার চেষ্টা না করে, উদাস ভাবে বলছ নমোনম কোবে গঙ্গাগর্ভে পিণ্ডদান করবো? ব্রাহ্মণভোজন না করালে তাঁর প্রেতাত্মা কি তৃপ্তি লাভ করতে পারবে? কথখনো নয়।”

কেদার জুধ কণ্ঠে কহিল, “তা হলে কি করব, আপনাই বলে দিন।”

এইবার সকলেই খুসী হইয়া উঠিলেন। কেদারের এতক্ষণে সুবুদ্ধি হইয়াছে দেখিয়া অনেকেই উহাকে একসঙ্গে সদযুক্তি দিতে গেলেন। সকলকে থামাইয়া ঘটক মহাশয় অগ্রবর্তী হইয়া গভীর ভাবে কহিলেন, “দেখ কেদার, বয়স দোষে তুমি যা করছ, এমন অনেকেই করে থাকে। এমনকি এর চাইতে কেলেঙ্কারী কত জনে কত ঘরে করেছে— সে সব এই ষাট সত্তর বছর বয়সে অনেক দেখেছি। তা সময়ে সবাই আবার সামলে যায়। তোমরা ভাল ঘরেব ছেলে। এক সময়ে তোমার ঠাকুর্দা এই গ্রামে কত ক্রিয়াকর্ম করেছেন, আমার সবই হাটহদ্দ জানা আছে। তাঁদের বংশধর হয়ে তুমি যে চিরটাকাল এমন বোম্বটে হয়ে বেড়াবে, সে তো আমরা বেঁচে থাকতে দেখতে পারি না। বংশের মধ্যে তুমি একটি সন্তান। সুতরাং আবার বিয়ে-থা কোরে সংসারী না হলে বংশ লোপ হবে, সেও একটা মহাপাপ। পিতৃক্ষণ হতে মুক্ত হওয়া সকল হিন্দু সন্তানের অবশ্য কর্তব্য। তা দেখ কেদার, এ নষ্ট ছুঁড়টাকে বিদেয় করে দিয়ে, একটা সামান্য রকম প্রায়শ্চিত্ত করে ফেল। বাস, সব লাটা চুকে যাক, আর তখন কারও কিছু বলবার থাকবে না। তখন তুমি স্বচ্ছন্দে পাঁচশো ব্রাহ্মণের আহ্বারের যোগাড় কর না কেন, কোন ভাবনা নাই।

কেদার কোন কথার উত্তর দিল না, যাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে সে গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া চাটুযো মহাশয় কহিলেন, “বাবাজী, ঘটক মহাশয় যা বলেন তা অতি উত্তম প্রস্তাব। এর উপর আর কথা চলে না। প্রায়শ্চিত্ত যদি না কর তাতেও কোন ক্ষতি নেই, যেহেতু শাস্ত্রে আছে পুরুষ পরশপাথর। তবে কিনা এ উপসর্গটা যে তোমার ঘাড়ে চেপে থাকবে সে কিছুতেই হবে না। ওটাকে বিদেয় করে দাও। কোন চিন্তা নেই বাবাজী, আমরা তোমার জন্য চাঁদপানা বউ খুঁজে আনবো। ও পথের আপদ ঘর থেকে তাড়ানই মঙ্গল।”

কেদারকে নিরন্তর দেখিয়া “মৌনঃ সন্ন্যাসি লক্ষণঃ”, বুঝিয়া খুসী হইয়া ঘটক মহাশয় কহিলেন, “তা কেদার এখন ঘরে যাও, একটু ভেবেচিন্তে দেখগে, ছুঁড়ীকে না হয় পাঁচ টাকা নগদ ধরে দিও। ওদের ভাবনা কি, আর একজনার ঘাড়ে স্বচ্ছন্দে গিয়ে চেপে বসবে। যা হোক তোমার স্বন্ধ থেকে নামলে যে বাঁচা যায়।

কেদারের দুই পায়ের উপর মুখ রাখিয়া অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে পিয়ারী কহিতেছিল, “তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে একেবারে তাড়িও না। তুমি বিয়ে করে বৌ আনো, আমি তার দাসী হয়ে থাকব কিন্তু আমায় পথে বের কোরে দিও না।”

অভাগিনীর কণ্ঠস্বরে নিতান্ত অসহায় কাতরভাব স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিতেছিল। কেদার মনে ভাবিয়া চিন্তিয়া যখন তাহাকে তাহার হিতৈষিগণের সদযুক্তির কথাগুলো প্রকাশ করিয়া বলিল, তখন পিয়ারী দুনিয়া অন্ধকার দেখিল— কেননা সে বেশ জানে তাহাকে অসহায় দেখিয়াও তাহার স্বভাবের গাভীরোর জোরে যাহারা এতদিন তাহাকে কুপথে আনিবার প্রলোভন দেখাইতে সাহস কবে নাই, আজ তাহারা অকুণ্ঠিত ভাবে অগ্রসর হইয়া তাহাকে নানা রূপে উৎপীড়িত করিবেই করিবে। তাহা ছাড়া সে পাঁচজন ভদ্রলোকের দ্বারা যে ডাল, বাড়ি, আটা বিক্রয় করিয়া জীবিকা উপার্জন করিত, তাহাও আব সে পারিবে না। কারণ কেদারের সহিত পরিচয় হওয়া পর্যন্ত সে লোকালয়ে কুলটা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। তাহার সে নিঃসঙ্গ জীবন যখন এক অপূর্ব মাধুর্য্যরসে কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছিল, তখন সে তাহার সঙ্গীহীন ভাব বুঝিতেও পারে নাই। কিন্তু আজ সে কল্পনায় মুহূর্ত্তের মধ্যে নিজের অবলম্বনহীন লক্ষ্যশূন্য যে নিঃসঙ্গ জীবনের ছবিখানি দেখিতে পাইল, উহা কি ভয়ানক! না, না, এমন জীবন সে কখনই বঁচন করিতে পারিবে না, তাই সে

আশ্রয়হীনা লতার ন্যায় নিরাশ হইয়া কেদারের পা-দুখানি নয়নজলে সিক্ত করিয়া, করুণ স্বরে মিনতি করিল, “আমায় তাড়িয়ে না, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় পথে বার করে দিও না।”

এখনও তাহার নিতান্ত তরুণ বয়স, সংসারের ভ্রুকুটি কুটিল কটাক্ষেব তীব্র আঘাত সহিয়া কঠিন হইবার ক্ষমতা আজও তাহার হয় নাই। সুতরাং উহার কল্পনা মাত্রই তাহাকে যেন উন্মত্ত করিয়া তুলিল। এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর যে তাহার কোথাও কেহ নাই, কাহার কাছে সে আশ্রয় লইবে?

পিয়ারীর ভয়চকিত মুখখানি ও তাহার মর্মস্পর্শী করুণ মিনতি কেদারের কর্তব্যপরায়াণ চিত্তকে বিকল করিয়া তুলিল।

কিন্তু মৃত পিতার প্রেতাত্মার সদগতি বিধান আবশ্যিক, পিয়ারীকে বিদায় না করিলেই বা তাহার বাড়ীতে পুত্রনীয় ব্রাহ্মণগণ পাত পাড়িতে আসিবেন কেন? অথচ তাহারা এই ছুঁড়ীটার সম্বন্ধে যাহাই বলুন, সে ত পিয়ারীর ক্ষুদ্র হৃদয়খানির প্রাণপূর্ণ স্নেহ ও সরলতাব যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছে। সে তার অনায়াত জীবনকুসুম যে শুধু তাহারই চরণে উৎসর্গ করিয়া কল্যাণী নাম গ্রহণ করিয়াছে, সে কথা ত তাহার অন্তর্যামী ভালরকমই জানেন। সুতরাং তাকে আত্ম নিষ্ঠুরের মত অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করিতে তাহার মন সর্ব্বত্রেছে কৈঃ পিতৃপুত্র ইহাতে যদি অশান্তি ভোগ করেন তাহা হইলে অবশ্য সেই— দোষী, সেই দোষী।

কিন্তু আগে হইতে যে অপরাধের বোঝা সে স্বেচ্ছায় মাথায় তুলিয়া লইয়াছে, আত্ম এই নিবাসিনী নারীকে বিশ্বের লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার মধ্যে দাঁড় করাইয়া দিলেই কি তাহা সে ভার নানিয়া যাইবে? সে যুক্তিতে মন সায় দিতেছে না তো। সে রাত্রি অনাহারে অনিদ্রায় অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অতিবাহিত করিয়া ফেলিয়া, প্রাতে কেদার পিয়ারীকে কহিল, “পিয়ারী, দুদিন লুকিয়ে থাকতে পারবে?”

পিয়ারী অবাক হইয়া কেদারের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, “কেন পারবো না?”

“তা হলে আমাদের এই ওদামঘরে তোমায় দুদিন বন্ধ থাকতে হবে। টু শব্দটি কবতে পারে না। দুদিন পাবে আমি তোমাব সম্বন্ধে যা হয় একটা কিছু ব্যবস্থা করবই। তবে, তোমাকে তাড়িয়ে দেব না এটা নিশ্চয়।”

পিয়ারী প্রথমে বড় ভয় পাইয়াছিল। কিন্তু কেদার যখন নিশ্চয় করিয়া বলিতেছে তাহাকে তাড়াইয়া দিবে না, তখন নিশ্চয়ই সে নিজের কথা বাখিবে। সুতরাং পিয়ারী স্বচ্ছন্দে দুদিনোবদন ওদামঘরে বন্দী থাকিতে রাজী হইল। কেদারের আশ্রয়ে থাকিলাব ওনা সকল প্রকার দুঃখকষ্ট সে আনন্দের সহিত সহ্য করিতে পারে। সুতরাং দুইদিন বন্দী হইয়া থাকা ত কোন সামান্য কথা। কেদারের পিতা বেশ হিসাবী লোক ছিলেন। সুতরাং তাহার সন্ধিত অর্গে কেদার প্রচুর উদ্যোগ আয়োজন করিয়া গ্রামের ও আশপাশের গ্রামের প্রায় সহস্র ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া, পরিপটীরাপে ভোজন করাইল। হরিসংগীতে বৃষোৎসর্গ, বোড়শদান কিছুই বাকী বহিল না। যিনি যাহা পরামর্শ দিলেন, সে নির্বিকচাবে তাহাই গ্রহণ করিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিল। কাম্বালী বিদায় ও বেশ ঘটী করিয়া হইয়া গেল। পাড়ার সকলে প্রচুর পরিমাণে লুচি মণ্ডা ক্ষীর দই খাইয়া, ছেলেমেয়েদের খাওয়াইয়া, ভোজনান্তে চাদবৈব শ্রুতি একটী বৃত্ত পোটলা বাড়িয়া কেদারের পিতার অক্ষয় স্বর্ণ কাননা করিতে করিতে গৃহে ফিরিলেন। চাটুয়ো ও ঘটক মহাশয় কেরাদিন করিয়া কোমরে গাম্ভী করিয়া সমস্ত দপাওনা করিয়া সকল কার্যকর্ম বেশ সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন বলিয়া, সকলের নিকট অল্পত্ব সাংবাদ লীভ করিলেন। কাজ শেষ হইয়া গেল। কেদারকে সকলেই শতমাথে বাপের সুপুত্র বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল। কাম্বালী ভোজনের পরদিন ভোরের সময় ঘটক মহাশয় যখন চৌধুরীদের



বাগানে নামাবলী গায়ে দিয়ে শতনাম উচ্চারণ করিতে করিতে পূজার ফুল সংগ্রহ করিতেছিলেন সেই সময় দুইটা মুটের মাথায় বাসন বোঝাই করিয়া কেদারকে তাঁর দিকে আসিতে দেখিয়া সর্বস্বায়ে কহিলেন, “একি কেদার কোথা যাচ্ছ, হঠাৎ একি?”

কেদার তাঁহার পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ হইয়া কহিলেন, “আজ্ঞে, গ্রামে ত বাস করবার মুখ রাখিনি, কায়েই গ্রাম ছেড়ে চললাম।”

অদূরে পিয়ারীকে দেখিয়া ঘটক মহাশয় উত্তেজিত হইয়া কহিলেন— “ছুড়ীকে যে বিদেয় করে দিয়েছিলে তা কোথেকে আবার এসে জুটলো?”

কেদার কৃষ্ণত ভাবে কহিল, “আজ্ঞে বিদেয় কন্তে পারিনি, অসহায় স্ত্রীলোক, ওকে কোথায় তাড়াই বলুন, তাতে আবার যে কান্নাকাটী কবতে লাগলো, কায়েই ওদামঘরে চাৰি দিয়ে রেখেছিলাম।

ঘটক মহাশয়ের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তিনি পাণিষ্ঠ নবাবম, মিথ্যাবাদী ইত্যাদি বিশেষণে কেদারকে সম্বোধন করিয়া অভিসম্পাত দিবার উপত্র নৈই কেদার সবিনয়ে কহিল, “আপনাবা ব্রাহ্মণ, কলির সাক্ষাৎ দেবতা। আপনাদের বাক্য মিথ্যা হবার নয়। আপনাদের অজ্ঞত আশীর্বাদে আমার বাপের আত্মা এখন স্বর্গলোকে উঠে গেছেন তাতে আমার কোন সন্দেহ নৈই। সে আত্মাকে আব মিছে কষ্ট দিয়ে না মিয়ে থানবেন না। পিয়ারীকে নিয়ে এখন কলকাতার দিকে চললাম। বাড়ীতে দুটো গরু রইল, সবে বিইয়েছে, আপনি দুধ খাবেন। আর বাগানে অনেক জিনিষ ফলেছে। আপনার জিম্মাতেই রইল।”— বলিয়া কেদার ঠন করিয়া চাৰিটা ঘটক মহাশয়ের পায়ের কাছে ছুড়িয়া দিল। ঘটক মহাশয় উদাত রসনাকে সংযত করিয়া কহিলেন— “তা ওপারে গিয়ে এখন কি করবে?”

কেদার কহিল, “কি আর করব! দেখি যদি ওদের জাতে কেউ সাাঙা কি কষ্ট বদল কিছু কোরে ন্যায়। বোষ্টমই হতে হবে দেখছি, ওকে ছাড়তে তো আর পারছি না।”

ঘটক মহাশয় পিয়ারীর উদ্দেশে কতকগুলো কটুপ্তি করিয়া উহার উর্দ্ধতন চতুর্দশ পুরুষকে বৌবর নরকে পাঠাইয়া দিয়া কহিলেন, “বান্ননের ছেলে হয়ে বোষ্টম হবে, ও সব পাগলানী ছেড়ে দাও কেদার। যাচ্ছ এখন যাও। ও পেড়ী বেশীদিন ঘাড়ে চেপে থাকবে না। যাঁৎ বুঝে একদিন পালাবেই। ওসব ডাইনীদেব ছলচাতুরী দেখতে দেখতে আমাদের হাড় পেকে গেল। তা খুব সাবধানে থেক, তোমাং ভালমানুষটি পেয়ে মায়াকান্না কেঁদে একেবারে ভেড়া বানিয়ে ফেলেছে, ওরা যাদু জানে। এখন কাঁচা বয়স, কাচা বুদ্ধি, তাতেই কিছু বুঝতে পারছ না, এরপর বুড়োর এইসব কথা কত মিষ্টি লাগবে।”

মুটে ডাবিল, “বাবু শীগগীর এস, গাড়ীর ঘণ্টা হোয়ে গেল যে।”

কেদার ঘটক মহাশয়কে আবার নত হইয়া প্রণাম করিয়া তাড়াহুড়ি পা চালাইয়া মুটের সঙ্গ লইল। ঘটক মহাশয় মাটি হইতে চাৰিটা কুড়াইয়া সাজিতে রাখিতে রাখিতে ঘোব কলির অদ্ভুত ব্যাপার সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া অবাচ হইয়া গেলেন— ছোড়া কি না অবশেষে এমন বহিয়া গেল যে বলে কি মেয়েটার সঙ্গে কষ্টী বদল করিবে! জাত মান কিছুই আর মাহাত্ম্য রহিল না। খ্রীষ্টানী হাওয়ায় দেশকাল উচ্ছন্ন যাইতে বসিয়াছে।

## সাগরের মায়া

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

সমুদ্রের ধাবে পুরানো মন্দিরের পূজারীকে যে দেখিত সেই শ্রদ্ধা করিত। তাঁহার মতো অমন নিষ্ঠাবান ভদ্র দেশের মধ্যে আর একটি ছিল কি না সন্দেহ। তিনি বৈরাগী— স্ত্রীপুত্র, ঘরসংসার তাঁহার ছিল না— দেব-সেবাই তাঁহার জীবনের একমাত্র কাজ।

তাঁহার সখের মধ্যে ছিল ছবি আঁকা। সময় পাইলেই তিনি ছবি আঁকিতে বসিতেন। কিন্তু কি ছবি যে আঁকিতেন তাহা কাহাকেও জানিতে দিতেন না। লোকে ভাবিত, বোধ হয় দেবদেবীর ছবি।

প্রায় প্রতিদিন দুপুর বেলা তিনি সমুদ্রের ধারে গিয়া বসিতেন— কখনো কখনো একখানা নৌকা লইয়া ভাসিয়া পড়িতেন,— অনেক দূরে গিয়া হাল ছাড়িয়া দিতেন। লোকে দেখিত নৌকা আপনি ভাসিয়া চলিয়াছে— তিনি তন্ময় হইয়া ছবি আঁকিতেছেন। ছবি আঁকিতে আঁকিতে পূজাবী হঠাৎ যখন একবার মুখ তুলিয়া চাহিতেন, দেখিতেন,— নৌকায় চাষিদের কিলবিল করিয়া মাছ খেলা করিতেছে। তাঁহার ছবি আঁকা যুবিয়া যাইতে,— তিনি নৌকা ছাড়িয়া জলের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতেন। কখনো ডুব দিয়া, কখনো জলের উপর ভাসিয়া যে দিকে মাছেরা ছুটিত সঙ্গে সঙ্গে তিনিও সেইদিকে ছুটিতেন,— এ যেন মাছের সঙ্গে নুকোচুরি খেলা। এই খেলায় তাঁহার আনন্দের সীমা ছিল না।

গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে তাঁহার ভাব ছিল বংশী জেলের সঙ্গে। এত সাধু সন্ন্যাসী থাকিতে সামান্য এক জেলের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া লোকে অবাক হইয়া যাইত। কাহারো সহিত তিনি বড়-একটা কথা কহিতেন না— যত কথা বংশীর সঙ্গে। দূরনে দেখা হইলে আর রক্ষা নাই। বংশীকে ধরিয়া টানিয়া পূজারী নিজের ঘরের মধ্যে লইয়া যাইতেন— অনেকক্ষণ ধরিয়া গোপনে ফিস্ফাস্ ফুসফাস্ করিয়া কি কথা যে কহিতেন লোকে অনেক অনুসন্ধান করিয়াও জানিতে পারিত না।

সমুদ্রের মাঝে নৌকায় বসিয়া পূজারী যে কি ছবি আঁকেন তাহা দেখিবার জন্য সকলেই অধৈর্য হইয়া উঠিত। কিন্তু জানিবার উপায় নাই। জিজ্ঞাসা করিলে পুরোহিত হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন; পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলে বলিতেন,— “রোসো, এখনো সময় হয়নি; ঠিক হলে তবে দেখাবো।”

পূজারীর কথায় আশ্বস্ত হইয়া লোকেরা কোনো রকমে ধৈর্য ধরিয়া রহিল। কিন্তু দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যায় তবুও পূজারী তাঁহার ছবি দেখাইবার নাম করেন না। লোকেদের পক্ষে ধৈর্য রাখা কঠিন হইয়া উঠিল। তাহারা প্রতিদিনই দেখে পুরোহিত মহা উৎসাহে ছবি আঁকিতে লাগিয়া গেছেন, কিন্তু ছবি দেখিবার আর সুযোগ হয় না;— দেখিতে চাহিলেই পুরোহিত বিরক্ত হইয়া উঠেন। এমন করিয়া দিন যাইতে যাইতে হঠাৎ একদিন সমুদ্র হইতে ফিরিয়া পূজারী জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলেন, বহু চেষ্টাতেও তাঁহার চেতনা ফিরিয়া আসিল না। গ্রামের সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়িল,— শিম্বোরা তাঁহাকে ধরিয়া বসিয়া রহিল।

ভয়ঙ্কর গরম;— মাথার উপর গ্রীষ্মকালের রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। দুপুরবেলা পুরোহিত নৌকা করিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। আজ আর তাঁহার ছবি আঁকিতে তেমন মন লাগিতেছে না, —তুলি ফেলিয়া তিনি অনামনস্কভাবে নৌকায় বসিয়া আছেন। হঠাৎ তাঁহার কি খেয়াল হইল, তিনি কাপড় খুলিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন,— একেবারে এক ডুব। তিনি ক্রমাগত সমুদ্রের তলে যাইতে লাগিলেন— যতই যান ততই জল, যেন তার শেষ নাই। কি আশ্চর্য! হঠাৎ তাঁহার শরীর এমন হালুকা হইয়া গেল কেমন করিয়া। তিনি যে-দিকে খুসী বেশ অবলীলাক্রমে তো যাইতে পারিতেছেন! জলের মধ্যে এতক্ষণ থাকিয়াও তো তাঁহার নিশ্বাস লইতে এতটুকু কষ্ট হইতেছে না।

হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড মাছ তাঁহার সামনে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া পুরোহিতের প্রথমটা কেমন ভয়-ভয় করিতে লাগিল— তিনি ছুটিয়া পলাইতে গেলেন। কিন্তু মাছটা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল— “মা ভৈঃ!”

পুরোহিত ঠাকুর ভারি আশ্চর্য হইয়া গেলেন— মাছের কথা তো বেশ বোঝা গেল।

পুরোহিত থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। মাছ তখন তাঁহার কাছে আসিয়া বলিল— “জলে তোমার ভারি আনন্দ দেখছি! তুমি জলেই থাকবে? না ডাঙ্গায় যাবে?”

পুরোহিত তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন— “আমি জলে থাকব।”

— “তবে এস।” বলিয়া মাছটা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল। পুরোহিত ঠাকুরের ভারি আশ্চর্য হইতে লাগিল— যা দেখেন সবই নূতন! জলের মধ্যে যে এত ব্যাপার তাহা তাঁহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল,— তিনি হতভম্ব হইয়া সব দেখিতে লাগিলেন— ডাঙার সহিত কিন্তু মিল নাই— সবই যেন কেমন-এক-রকমের! কোথা দিয়া কেমন করিয়া কি হয়, কিছুই বোঝা যায় না।

পুরোহিত ঠাকুর মাছের সঙ্গে সাঁতরাইয়া চলিয়াছেন, যত-বাক্সের মাছ কৌতূহলের সহিত তাঁহাকে ঘিরিয়া চলিয়াছে। সবাই কানাকানি করিতেছে— “এ কে এ কে!” সমস্ত জলের মধ্যে একটা সোবগোল পড়িয়া গেছে— যে যেখানে ছিল সবাই তাঁহাকে ছুটিয়া দেখিতে আসিয়াছে। পুরোহিত ঠাকুর অবাক! এত জলজন্তু! তিনি মোটে দুই চারিটার বই নামই জানেন না।

সেই প্রকাণ্ড মাছটা খানিক দূর তাঁহাকে লইয়া কি এক গুহাব মধ্যে প্রবেশ করিল,— সেখান হইতে দুটি সোনালি রঙের মাছের ডানা আনিয়া পুরোহিতকে পরাইয়া দিল। দেখিতে দেখিতে পুরোহিতের সর্বাস্ত্র মাছের মতো হইয়া গেল— আর তাঁহাকে চেনা যায় না। তাঁহার আশ্চর্য বোধ হইতে লাগিল— একেবারে হুবহু মাছের মত, এতটুকু তফাৎ নাই।

তিনি পাখনা নাড়িয়া এদিক ওদিক ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন— মহা ফুর্তি! তাঁহাকে লইয়া মাছদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল,— কেহ তাঁহার সহিত গল্প জুড়িয়া দিল, কেহ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া জলের মধোকার জায়গা পরিচিত করাইয়া দিতে লাগিল, দুই চারি জন মৎসাকন্যা তাঁহার পাখনার ছটায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পাশে পাশে অনবরত ঘুরিতে লাগিল। তাঁহাকে পাইয়া সবাই সুখী। তাঁহার যাহাতে কোনো কষ্ট না হয় সকলেরই সেই চেষ্টা। জলের মধ্যে যাহাতে তাঁহার মন বসে সে জন্য তাহারা কত রকমের যে প্রলোভন সৃষ্টি করিতে লাগিল তাহার ঠিক নাই। তাঁহাকে অভয় দিয়া সকলে বলিল— “দেখ, এখানে তোমার কোনো ভয় নেই— যেখানে খুসী যেতে পার,— যা ইচ্ছে যেতে পার, কেউ তোমায় কিছু বলবে না। কিন্তু খবরদার! মানুষেরা ওপরে থেকে যে টোপ ফেলে সে টোপ খাবার লোভ কোরোনা; তাহলেই বিপদে পড়বে।” টোপ খাওয়ার কথা শুনিয়া পুরোহিত

ঠাকুর মনে মনে হাসিতে লাগিলেন— মনে মনে বলিলেন— টোপ যে কি জিনিস সে কি আমায় বলতে হবে!

পুরোহিত ঠাকুর মনের সুখে জলের মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। সবই তাঁহার বেশ লাগিত;— কেবল একটা জিনিস তাঁহার বড় বাধ-বাধ ঠেকিত। মনুষ্য-জীবনে তিনি কখনো সংসার করেন নাই— মৎস্য-জীবনেও সেটা তাঁহার দ্বারা ঘটয়া উঠিল না। মৎস্য-সুন্দরীরা বৃথাই তাঁহার অনুসরণ করিত— বৃথাই তাঁহার জন্য হাছতাশ করিয়া মরিত!

জলের মধ্যে কোথায় কি আছে তাহা দেখিবার সখ এতদিনেও পুরোহিতের কিছুতেই মিটিত না; তিনি দিবারাত্রি কেবলই ঘুরিয়া বেড়াইতেন— চলিতে চলিতে কত দূর-দূরান্তরে যে গিয়া পড়িতেন তার ঠিক নাই। কেবলই সাঁতার দিয়া বেড়ান— তাহাতে শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, অবসাদ নাই। যখন ডাঙার মানুষ ছিলেন তখন দু চার মিনিটের বেশি জলের মধ্যে কিছুতেই থাকিতে পারিতেন না— কে যেন তাঁহার পা চাপিয়া ধরিত— কে যেন ঠেলিয়া তাঁহাকে উপরে ফেলিয়া দিত— জলের রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে কিছুতেই দিত না। কিন্তু এখন? কী স্বচ্ছন্দ সহজ অবাধ গতি! একেবারে জলের জীব! জলের কোনো রহস্য তাঁহার কাছে আর গোপন নাই। মানুষের কি এমন সৌভাগ্য হয়!

পুরোহিত ঠাকুর এক একবার জলের উপর ভাসিয়া উঠিতেন, দেখিতেন, মাটির সংসারটা কেমন চলিতেছে! প্রথম প্রথম জলের তুলনায় মাটিটা মনে হইত যেন নির্জীব, নীরস, কঠিন। উপরে অনন্ত আকাশ, সামনে অন্তহীন বালির চর— রৌদ্রকিরণে সমস্ত যেন গুচ্ছ হইয়া উঠিতেছে— চাবিদিকে একটি স্নান ছায়া ছড়াইয়া পড়িতেছে। নিশ্বাস লইবার বাতাসটুকু পর্যন্ত উত্তপ্ত, শুষ্ক! তাঁহার ভারি ইচ্ছা হইত ডাঙার লোকদের ডাকিয়া একবার দেখাইয়া দেন জলের মধ্যে কী আরাম— এ কী চমৎকার জায়গা! কিন্তু তাহা পারিতেন না বলিয়া প্রথম প্রথম মনে ভারি আপশোষ হইত। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল ততই তাঁহার এ ভাবে পরিবর্তন হইতে লাগিল।

এক একদিন দেখিতেন বংশী জেলে জাল ঘাড়ে করিয়া একা সমুদ্রতীর দিয়া চলিয়াছে— তাঁহার ভারি ইচ্ছা হইত তাহাকে ডাকিয়া দুইটা কথা কন। তিনি যে মন্দিরে ছিলেন সেই মন্দিরের চূড়া তিনি জলের উপর ভাসিয়া উঠিলেই দেখিতে পাইতেন, — সন্ধ্যাবেলাকার আরতির শব্দ মাঝ-সমুদ্রের নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া তাঁহার কানে আসিয়া পৌঁছিত। যে নৌকা করিয়া তিনি সমুদ্রে বেড়াইতেন, দেখিতেন, সে নৌকাতানা বালির উপর একধারে কাত হইয়া পড়িয়া আছে— তাহারই চাবিপাশে জেলেদের ছেলেমেয়েরা খেলা করিতেছে। ঐ এখানে গ্রামের বাঁকা পথটি মেঘের গায়ে মিশিয়া গেছে। ঐ পুষ্পবনে বাতাসের মাতামাতি চলিতেছে;— সন্ধ্যাবেলা ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে;— তিনি নির্নিমেষ নয়নে সেইদিকে চাহিয়া থাকিতেন,— এই সমস্ত অতিপরিচিত জিনিসগুলো তাঁহাকে ক্রমাগতই ডাঙার দিকে টানিতে থাকিত— জলের মধ্যে তাঁহার আর মন বসিত না। প্রবল প্রকাণ্ড সাদা ঢেউগুলার সঙ্গে এক একবার পৃথিবীর কোলের কাছে গিয়া আছড়াইয়া পড়িতে বড় ইচ্ছা হইত!

আর থাকিতে না পারিয়া একদিন তিনি বিষমবদনে সেই মৎস্যরাজের নিকটে গিয়া বলিলেন— “মৎস্যরাজ, আমাকে মুক্তি দিন— ডাঙার জীব আমি ডাঙায় ফিরে যাই!”

মৎস্যরাজ বাস্তব হইয়া বলিলেন— “কেন? কেন?— আপনার কিসের দুঃখ? কেউ আপনার অপমান করেছে? কেউ আপনাকে কষ্ট দিয়াছে? আপনার কিছুর অভাব পড়েছে? বলুন, এখনই তার প্রতিকার করছি!”

পুরোহিত বলিলেন—“অপমান কেউ করেনি, অভাব কিছু হয় নি;—আপনার অনুগ্রহে পরম সুখে আমি আছি, কিন্তু এখানে আমার মন টিকচে না। আপনি আমায় মুক্তি দিন।”

রাজা বলিলেন—“সে তো হবার যো নেই ঠাকুর! আমরা মাছই সৃষ্টি করতে পারি—মানুষ তো পাবি না।”

সর্বনাশ! তবে উপায়! বাজার কথা শুনিয়া পুরোহিতের মাথায যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি এক-কোণে চূপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহাকে বিমর্ষ দেখিয়া মাছেরা ব্যস্ত হইয়া উঠিল,—সকলে জিজ্ঞাসা করিতে লাগল—“কেন? কেন? কি হয়েছে?”

পুরোহিত বলিলেন—“আমাব আর এখানে ভালো লাগছে না।”

ভালো যাহাতে লাগে সমস্ত মাছেরা মিলিয়া তাহারই আয়োজন করিতে লাগিল। অতলের তলে যে গোপন রাজ্যে নীলিমার মাঝে আলোর গাছে আলোব ফুল তারার মতো ফুটিয়া আছে—যেখানকার জল স্পর্শ মাত্রই সমস্ত পদার্থ আলোকময় হইয়া উঠে—পূজারীকে লইয়া মাছেরা রাসাতলের সেই আলোক-কুঞ্জে প্রবেশ করিল। চারিদিকে রং তামাসা নাচ গান!—সমস্ত বাজ্য ভূড়িয়া উৎসবের আনন্দধ্বনি, আলোকের স্রোত! মৎসা-পবীরা ডানা নাড়িয়া, পাখা মেলিয়া পুরোহিতের সামনে নৃত্য করিতে লাগিল, কেহ হাসিয়া, কেহ কাদিয়া তাঁহাব মন ভুলাইতে চাহিল, কিন্তু পুরোহিতের মনের বিষণ্ণতা কিছুতেই গেল না;—এইসকল আমোদ আহ্লাদে তাঁহার বিবর্তিত বোধ হইতে লাগিল। একটু ছাড়া পাইলেই তিনি জলের উপর ভাসিয়া উঠিয়া যেন হাফ ছাড়িয়া বাঁচিতেন। ঐ সেই তাঁহাব চিরজীবনের স্মৃতি বিভ্রাট মন্দিরের চূড়া। ঐ সেই বালির চর—গ্রাম্য পথ। আব সবাব উপবে সেই দিনেব আলো! তাঁরেব দিকে চাহিয়া তাঁহার বুক ভাঙিয়া দীর্ঘশ্বাস উঠিত।

মাছেরা যখন দেখিল পুরোহিতের মন কোনো আনন্দে যোগ দিতেছে না, তখন তাহারা হতাশ হইয়া থামিয়া গেল। আগে যেমন দিন চলিতেছিল তেমনি দিন চলিতে লাগিল, চারিদিকের উৎসব আমোদ বন্ধ হইয়া গেল। পুরোহিত বিপদে পড়িলেন। আর তাঁহার কাছে এখন কেহ ঘেঁসে না। সবাই তাঁহার উপর বিরক্ত। কেবল একটি মৎসাকন্যা তাঁহাব সঙ্গ ছাড়িল না। সে দিনবাত তাঁহাবই কাছে থাকিত—তাঁহার সহিত গল্প করিত, তাঁহাব কাছে মানুষের দেশের গল্প শুনিত। পুরোহিত ঠাকুরের তাহাকে লাগিত ভালো। সব মাছেরাই মানুষকে শত্রু মনে কবে—কিন্তু এই মেয়েটি তাহা মনে করিত না। মানুষদের কথা শুনিবার জন্য, তাহাদের দেশ দেখিবার জন্য, তাহাদের ভাষা শিখিবার জন্য তাহার ভাবী আগ্রহ। সে প্রতিদিন পুরোহিতের সঙ্গে জলের উপর গিয়া মন্দিরের চূড়া, প্রদীপের আলো দেখিয়া আসিত,—আবতিব বাজনা, জেলেদের গান শুনিয়া আসিত। ঐ সব যে তাহার খুব ভালো লাগে সে কথা সে বোঝই হাজাব বার করিয়া পুরোহিতকে বলিত,—এখানে যাইবার জন্য তার ব্যাকুলতাও সে গোপন করিতে পারিত না।

আর কাহাকেও না পাইয়া পুরোহিত এই মেয়েটির সঙ্গে বোজ পরামর্শ করিতেন, কি করিলে এই জলরাজ্য হইতে মুক্তি পাওয়া যাইবে। মেয়েটি অনেক ভাবিল কিন্তু কোনো উপায় সে দেখিত না। সে তাহার বড় বড় চোখ মেলিয়া চাহিয়া কেবলই পুরোহিতকে উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিত—“তুমি যখন যাবে আমায় সঙ্গে নিয়ে যাবে তো?”

পুরোহিত ঠাকুর চমকিত হইয়া বলিয়া উঠিতেন—“সে কি! সে যে তোমার মৃত্যু!”

শুনিয়া মেয়েটির মুখ মলিন হইয়া যাইত—সে আপন মনে বসিয়া বসিয়া কি ভাবিত।

হঠাৎ একদিন একটা কথা ধাঁ করিয়া পুরোহিতের মনে পড়িয়া গেল।—টোপ! টোপ গিলিয়া উপরে উঠিলে হয় না? তাহার পর যাহা থাকে কপালে! মেয়েটিকে পুরোহিত এই কথা বলিলেন। টোপের নাম শুনিয়া সে শিহরিয়া উঠিল—সে যে ভয়ানক! কিন্তু পুরোহিত

কিছুতেই দমিলেন না— তিনি যেন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছেন। মেয়েটি অনেকক্ষণ বসিয়া ভাবিল, তারপর বলিলেন— “আমিও টোপ গিলিব।”

পুরোহিত ধমক দিয়া বলিল— “না! সে কি করে হবে। আমি ডাঙার মানুষ, বেঁচে যেতে পারি— কিন্তু তোমার যে প্রাণসংশয়!”

এই কথা শুনিয়া মেয়েটি কাতর ভাবে মুখ নীচু করিল।

পুরোহিত টোপের সন্ধানে ফিরিতে লাগিলেন। তাঁহার আর অন্য ভাবনা নাই,— মুখে অন্য কথা নাই— কেবল টোপ আর টোপ! টোপের জন্য তিনি সমুদ্রটাকে যেন ওলটপালট করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কখন কোথায় থাকেন কিছুই ঠিক নাই; মেয়েটি আর তাঁহাব দেখাই পায় না। যখন হঠাৎ একবার দেখা পায় তখন দেখে পুরোহিত এমন গভীর হইয়া আছেন যে কথা কহিতে সাহস হয় না,— সে মুখখানি মলিন করিয়া নীরবে ঘুরিয়া বেড়ায়।

অনেক দিনের পর একদিন টোপ পাওয়া গেল। সে দিন পুরোহিত ঠাকুর ও মেয়েটি যেখানে বসিয়াছিলেন ঠিক সেইখানটিতে দুইটা বঁড়িশিতে গাঁথা দুই টোপ আসিয়া পড়িল। পুরোহিত ঠাকুর আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন— “পেয়েছি!” মেয়েটিব বুক দুব দুব করিয়া উঠিল। পুরোহিত টোপ ধরিবার জন্য তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গেলেন। কিন্তু টোপ গিলিবাব পূর্বে, কি মনে হইল, তিনি মেয়েটির দিকে একবার ফিরিয়া চাহিলেন, তারপর ব্যস্ত হইয়া বলিলেন— “চলুন!”

মেয়েটি ফ্যানফ্যান করিয়া চাহিয়া রহিল, তারপর যখন দেখিল পুরোহিত ঠাকুর টোপটা গিলিয়া ফেলিলেন, অমনি সে পাগলের মতো ছুটিয়া গিয়া আর একটা টোপ টপ কবিয়া গিলিয়া ফেলিল। চক্ষের নিমেষে দুই জনেই একসঙ্গে উপরে উঠিয়া পড়িল। পুরোহিত আগে মেয়েটিকে দেখিতে পান নাই, উপরে উঠিয়া দেখিলেন,— যে জলের মধ্যে ছায়ার মতো তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়াছে, আজ এই মরণের পথেও সে তাঁহাব সঙ্গে তাগ করে নাই।

পুরোহিতের মনের ভিতরটা কেমন করিতে লাগিল। বড়শিতে মেয়েটির ঠোট কাটিয়া দরদরধারে রক্ত পড়িতেছে! দেখিয়া পুরোহিতের কণ্ঠ হইতে লাগিল। তিনি আকুল হইয়া ভাবিতে লাগিলেন— কেন মেয়েটির এ দুর্বুদ্ধি! কিসের জন্য সে আজ আমার সঙ্গে মৃত্যুর দ্বার পর্যন্ত আসিয়াছে! পুরোহিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে একবার মেয়েটির পানে চাহিলেন, দেখিলেন, সে তাহার সেই বেদনাপ্লুত রক্তমাখা ঠোটের উপর হাসি ফুটাইয়া তাঁহার দিকে তখনও অনিমেষ নয়নে চাহিয়া আছে! পুরোহিতের প্রাণটা পাগল হইয়া উঠিল,— ইচ্ছা হইতে লাগিল, সমস্ত হৃদয় দিয়া মেয়েটির সকল দুঃখ তখনই মুছিয়া লন। কিন্তু তিনি যে বন্দী! সেই জন্য কিছু করিতে পারিতেছেন না বলিয়া তাঁহার হৃদয় আরো আকুল হইয়া উঠিতে লাগিল।

যে জেলে তাঁহাদের জল হইতে উঠাইয়াছে সে তাড়াতাড়ি পুরোহিতের মুখ হইতে বঁড়িশ খুলিয়া লইতে লাগিল, পুরোহিত অবাক হইয়া দেখিলেন সে জেলে আর কেহ নহে, তাঁহারই বন্ধু বংশী! তিনি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন— “এই যে বংশী! যাক! ভালোই হয়েছে! ওরে, ঐ মাছটাকে শিগগির ছেড়ে দে!”

বংশী তাঁহার কথা গ্রাহ্যই করিল না,— সে নিশ্চিত মনে তাঁহাকে একটা চুবড়ির মধ্যে পুরিয়া ফেলিল;— পুরোহিত তাহার মধ্যে হইতে চীৎকার করিতে লাগিলেন— “ওরে করিস কি! বংশী! শোন! শোন! আমি যে তোদের পুরোহিত!”

বংশী তবুও তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না,— পুরোহিত পড়িয়া পড়িয়া চোঁচাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বংশী সেই মেয়েটিকেও চুবড়ির মধ্যে ফেলিয়া দিল। পুরোহিত

হতাশ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন,— “এখন উপায়!” মেয়েটি কোনো কথা কহিল না— সে কেবল একটু একটু করিয়া সরিয়া সরিয়া পুরোহিতের বুকের কাছে আসিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। মেয়েটি তখনও হাঁপাইতেছিল— ভালো করিয়া নিশ্বাস লইতে পারিতেছিল না— প্রাণ তাহার যায় যায়। পুরোহিতের বুক যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। আর কিছু করিতে না পারিয়া তিনি নিজের ডানা দিয়া মেয়েটির মুখের কাছে বাতাস করিতে লাগিলেন।

বংশীর উপর তাঁহার ভারি রাগ হইতেছিল— এত করিয়া তাহাকে বলিলেন তবুও সে কথা শুনিলনা! মেয়েটির অবস্থা দেখিয়া তাঁহার কিছুই ভালো লাগিতেন না। কেমন করিয়া মেয়েটিকে বাঁচাইবেন সেই কথা ভাবিতে ভাবিতে তিনি অস্থির হইয়া উঠিতেছিলেন। বংশী চুবড়ীটা মাথায় করিয়া তাঁহাদের দুই জনকে গ্রামের দিকে লইয়া যাইতেছিল। চুবড়ির ফাঁক দিয়া পুরোহিত তাঁহার সেই চিরপরিচিত পথঘাট দেখিতে পাইতেছিলেন,— মধ্যে মধ্যে দু-একজন পরিচিত লোকও নজরে পড়িতেছিল— এই সেই গ্রামের বাঁকা পথ! এই মন্দিরের দুরার! কিন্তু কে, পুরোহিতের মন তো উল্লসিত হইয়া উঠিতেছে না। যাহাদের দেখবার জন্য তাঁহার মন পাগল হইয়া উঠিয়াছিল আজ তাঁহার চোখে সেগুলো বিষ বোধ হইতেছে। মেয়েটির দিকে চাহিয়া তাঁহার কেবলই মনে পড়িতেছে— সেই নীল সমুদ্রের কথা! তিনি ভাবিতেছিলেন, যদি কোনো বকমে ছাড়া পাই তাহা হইলে মেয়েটিকে লইয়া অতল সমুদ্রে এখনই ভাসিয়া পড়ি!

বংশী ঘরে আসিয়া বোঝা নামাইল,— চুবড়ি খুলিয়া পুরোহিতকে টানিয়া বাহির করিল— মেয়েটি চুবড়ির মধ্য হইতে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিতে লাগিল।

পুরোহিত চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন— “ওরে বংশী হতভাগা! কথা গুনচিসনে কেন? আমি যে তোদের পুরোহিত! আমাদের ছেড়ে দে!”

বংশী কোনো উত্তর করিল না;— পুরোহিতকে তুলিয়া একবার ভালো করিয়া দেখিয়া মাটিতে নামাইয়া রাখিল, তারপর বিড় বিড় করিয়া কি বকিতে লাগিল পুরোহিত বুঝিতে পারিলেন না। এমন সময় বংশীর স্ত্রী আসিয়া সেইখানে উপস্থিত। পুরোহিত আশাশ্বিত হইয়া বলিলেন— “দেখ তো বোমা! বংশীব আক্কেল! আমাদের ধরে রেখেছে! বলছি ছেড়ে দে, তা গুনবেনা।”

বংশীর স্ত্রীও বংশীর মতো পুরোহিতকে একবার হাতে করিয়া তুলিয়া দেখিল— তারপর চুবড়ির কাছে গিয়া উঁকি মারিয়া দেখিয়া আসিল,— পুরোহিতের কথায় কর্ণপাতও করিল না। পুরোহিত বাগে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। বংশী সেদিকে ফিরিয়াও চাহিল না, স্ত্রীর প্রতি চাহিয়া কি বলিল— তারপর হাসিতে লাগিল। তাঁহার এই বিপদ আর বংশী হাসিতেছে— দেখিয়া পুরোহিতের সর্ব্বাঙ্গ তুলিয়া উঠিল;— তিনি বংশীকে অভিসম্পাত করিতে লাগিলেন, কিন্তু তবুও বংশী অটল।

কি সর্ব্বনাশ! পুরোহিত দেখিলেন বংশীব স্ত্রী একখানা বাঁট হাতে করিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া বসিল। তার পর ধীরে ধীরে তাঁহাকে তুলিয়া লইল। পুরোহিতের বুকের রক্ত শুকাইয়া আসিতে লাগিল— তিনি প্রাণপণে চীৎকার দিতে লাগিলেন— “ওরে আমি! আমি! আমাকে কাটিসনে— ব্রহ্মহত্যা হবে!”

বংশীর স্ত্রী তবুও শুনিল না। সে দিবা সহজ ভাবে পুরোহিতের গলাটা বাঁটির উপর লইয়া গেল। পুরোহিত মুক্তি পাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বংশীর স্ত্রীও ছাড়িবে না— এমন করিয়া ধস্তাধস্তি চলিতে লাগিল। তিনি যতই ছাড়া পাইবার চেষ্টা করেন বংশীর স্ত্রী ততই তাঁহাকে জোর করিয়া ধরে;— একবার তাহার হাত ছাড়িয়া তিনি

মাটি লইলেন বটে, কিন্তু বংশীর স্ত্রী তৎক্ষণাৎ আবার তাঁহাকে তুলিয়া লইল— এমন জোরে চাপিয়া ধরিল যে তাঁহার নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপায় হইল। পুরোহিত বুলিলেন আর উপায় নাই। তিনি ইষ্টদেবের স্মরণ করিতে লাগিলেন। আর কি! একমুহূর্তের মধ্যেই তো সব শেষ হইয়া যাইবে। এই অন্তিম সময় মেয়েটিকে একবার দেখিবার জন্য তাঁহার ভারি ইচ্ছা হইতে লাগিল। কিন্তু হয়! কে তাহাকে এখন তাঁহার কাছে আনিয়া দিবে!

বংশীর স্ত্রী ঘস্ ঘস্ করিয়া দুইটা পোচ বসাইয়া দিল। পুরোহিতের সর্ব্বাস শিব শির করিয়া উঠিল।

\* \* \* \*

পুরোহিত হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিলেন— “বংশী বংশী!” শিম্বোরা তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহাকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। সকলে হরধ্বনি করিয়া বলিয়া উঠিল— “গলেছেন— বড়িটা গলেছেন! যাক এ যাত্রা ওরুদেব রক্ষা পেলেন!”

পুরোহিত ঠাকুর বিস্মিতভাবে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন;— একবার শিম্বাদের মুখের পানে চাহেন, আর একবার নিজের শরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন— কেমন যেন হতভম্ব।

হঠাৎ তিনি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া মন্দির হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন,— শিম্বোরা পিছনে পিছনে চীৎকার করিতে লাগিল— “কোথা যান? কোথা যান?”

পুরোহিত ফিরিয়া না দাঁড়াইয়া বলিলেন— “বংশীব বাড়ি।”

শিম্বোরা বলিল— “দুর্ব্বল শরীরে অত দূর যাবেন? বলুন না বংশীকে কি বলতে হবে— আমরা বলে আসছি,— না হয় তাকে ডেকে আনি।”

পুরোহিত ব্যস্ত হইয়া বলিলেন— “ওবে না না! সে হবে না— আমাকেই যেতে হবে।” বলিয়া তিনি উর্দ্ধশ্বাসে চলিতে লাগিলেন। একেবারে বংশীব ঘনেষ ভিতবে গিয়া ডাকিলেন— “বংশী!”

বংশীর স্ত্রী এখানে বসিয়াছিল; সে পুরোহিতকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া সরিয়া গেল।

পুরোহিত বলিলেন— “হাঁরে বংশী, আত্ম মাছ ধরতে গিয়েছিলি?”

বংশী বলিল— “আজ্ঞে রোজই তো যাই।”

—“আরে আত্ম গিয়েছিল কি না বল না।”

বংশী পুরোহিতের ধরনধারণ সব জানিত; সে এ প্রশ্নে কিছুমাত্র বিস্মিত হইল না, সে বলিল— “আজ্ঞে হাঁ, গিয়েছিলুম।”

পুরোহিত বলিলেন— “কটা মাছ ধবেছিস?”

—“আজ্ঞে দুটো।”

—“দুটো! কই দেখি! দেখি!”

—“আজ্ঞে দুটো তো নেই— একটা আছে।”

—“একটা আছে তো!” বলিয়া পুরোহিত যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

বংশী মাছটাকে পুরোহিতের সামনে আনিয়া ধরিল। পুরোহিত ব্যাকুল ভাবে সেটাকে হাতের উপর তুলিয়া লইলেন;— একহাতের উপর রাখিয়া আর এক হাত তাল্পুর গায়ে ধীরে ধীরে বুলাইতে লাগিলেন;— একবার বকের কাছে তুলিয়া ধরিলেন— একবার মুখের কাছে লইয়া গেলেন— একবার তাহার কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করিয়া কি বলিলেন।

বংশী অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল।

পুরোহিত বলিলেন— “বংশী, শির্গার ডিঙি ঠিক কর।”



বংশী তড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। পুরোহিত মাছটিকে বুকে লইয়া তাহার পিছন পিছন চলিতে লাগিলেন।

বংশী বলিল— “ঠাকুর! আপনি কষ্ট করছেন কেন। আমার হাতে দিন, আমি নিয়ে যাচ্ছি।” বলিয়া সে হাত বাড়িয়া দিল। পুরোহিত তড়াতাড়ি হাত সবাইয়া লইয়া বলিয়া উঠিলেন— “না না! চল।”

বংশীর সহিত পুরোহিত ডিঙির উপর বসিলেন,— যেনপুঞ্জ ভেদ করিয়া বংশী ডিঙি চানাইতে লাগিল। ডিঙি যখন ডাঙা হইতে অনেক দূরে— গাঢ় নীল ঢেউয়ের উপর ভাসিতেছে দুলিতেছে, তখন পুরোহিত মাছটিকে বুক হইতে নামাইয়া একবার তাহার মুখের দিকে আকুল ভাবে তাকাইলেন, তাবপব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে ঢেউয়ের উপরে রাখিয়া দিলেন,— মাছটা জলের উপর স্থির হইয়া ভাসিতে লাগিল— ভুলিয়া পলাইবার কোনো চেষ্টা দেখাইল না। পুরোহিত তখন হইয়া তাহার পানে চাহিয়া বহিলেন— চোখ আব ফিরে না। মাছটা অনেকক্ষণ ধরিয়া ডিঙির সামনে ভাসিয়া বহিল,— মনে হইল যেন সে পুরোহিতের পানে কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। অবশেষে যেন সে হতাশ হইয়া একটি নীল ঢেউ দূরীক করিয়া তাহার ভিতর ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল।

পুরোহিতের চোখের সামনে অনন্ত শূন্যতা স্রাবিয়া উঠিল,— উপরে নীল আকাশের শূন্যতা - নীচে নীল সমুদ্রের শূন্যতা— সমস্ত বিশ্বসংসার আত্ম তাঁব শূন্য বোধ হইতে লাগিল। বংশী নৌকা ফিরাইতে গেল,— পুরোহিত হাত ভুলিয়া বাবণ করিলেন,— মাছটি যেখান দিয়া সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে সেই দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, তাহার কেবলই মনে হইতেছিল— মাছটি আবার বুঝি ভাসিয়া উঠিলে,— তিনি সেই প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন। বংশী থাকিয়া থাকিয়া ডাকিতে লাগিল— “ঠাকুর! ঠাকুর!”

পুরোহিত কোনো সাড়া দিলেন না।

\* \* \* \*

পবদিন হইতে পুরোহিতের খোঁজ পাওয়া গেলনা,— তিনি যে কোথায় আছেন, কি করিতেছেন কেহ বলিতে পারিল না। তাহার নৌকাখানাও কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। কেবল বংশী বলিত, প্রতি পূর্ণিমার ব্যত্রে ঘরঘর দাওয়ায় বসিয়া সে দেখে একখানি ছোটো নৌকা সমুদ্রের মধ্যে অনেক দূরে এক একবার ঢেউয়ের উপরে উঠিতেছে আর মিলাইতেছে।

বংশীর এ কথা কেহ বিশ্বাস করিল না— সকলে হাসিয়া উড়াইয়া দিল। বংশী বলিল— “চল, দল বাধিয়া এক পূর্ণিমার ব্যত্রে এ নৌকায় সন্ধানে বাহির হইয়া পড়ি, তাহা হইলেই বোঝা যাইবে আমার কথা ঠিক কি না।” কিন্তু পুরোহিতের শিষ্যবর্গের মধ্যে এমন কোনো সাহসী মিলিল না, যে মায়া নৌকায় সন্ধানে সমুদ্রে পাড়ি দিতে পারে। কাজেই পুরোহিতের কথাটা ব্রহ্মে চাপা পড়িয়া গেল।

হঠাৎ একদিন বৈশাখের দাবণ বাড়বে পব জল বাড়ি সমুদ্রতীরে গিয়া বংশী দেখিল, একখানা ছোটো নৌকা বালুচরে কাত হইয়া পড়িয়া আছে। দৌখাই সে চিনিল পুরোহিত ঠাকুরের নৌকা। শিষ্যবর্গ খবর পাইয়া ছুটিয়া আসিল,— সকলে মিলিয়া হরিধ্বনি করিতে করিতে নৌকাখানা টানিয়া তুলিয়া আনিল। তাবপর, ঠেলিয়া সোজা করিয়া দেখে, নৌকায় খোল জুড়িয়া একখানা নরকদ্বার একটা ছোটো পিতলের সিঁদুরে মাথা রাখিয়া পড়িয়া আছে। মহাসমারোহে ওকদবেই অস্থি শিখোবা সন্নিধিত্ত করিল। তাবপর সকলে মিলিয়া যখন সেই পিতলের সিঁদুর খুলিয়া ফেলিল, তখন দোঁখান ভিতরে আব কড়ই নহি

দেখিল একখান সমুদ্রের মাটির কাটা আব একতড়া কাগজ— সমুদ্রের আশ্চর্য এক মাড় নানা ভঙ্গিতে, নানা অবস্থায়, নানা বর্ণে সঁকা।

## অপবাদ

নরেন্দ্র দেব

শিবুদের ঠিক পাশের বাড়ীতেই ইলা আর নীলা বলে দুটি সুন্দরী তরুণী থাকে। তারা দুই বোন। অল্প দিন হ'ল এ পাড়ায় এসেছে— কিন্তু এরই মধ্যে পাড়ায় তাদের বদনাম রটেছিল যে তারা নাকি সূচরগ্রা নয়, কারণ, তাদের কোনও পুরুষ অভিভাবক ছিল না। বাড়ীতে ঝি চাকর আর দ্বারবান ছাড়া আর কোনও লোকজন দেখা যেত না। কেবল রোজ রাত্রি নটার সময় একখানা খুব বড় মোটর গাড়ী তাদের বাড়ীর গলির মুখে এসে দাঁড়াতে দেখা যেতো। কিন্তু, কত রাত্রে যে সেখানা ফিরে যেতো তার খবর পাড়ার লোকেরা কেউ সঠিক বলতে পারতো না। কেউ বলতো বারোটো, কেউ বলতো একটো, কেউ বলতো দু'টো! কাজেই এ সম্বন্ধে একটা চূড়ান্ত-মীমাংসা আত্মও হয়নি, তবে এটুকু এক রকম স্থির হ'য়ে গেছিল যে মোটরখানা অনেক রাত্রে ফেরে এবং তার মালিক একজন মস্ত বড়লোক ও নামজাদা এটর্নি!

গুজব যে এই বড়লোক এটর্নি বাবুই না কি বড় বোন ইলার রূপের ফাঁদে ধরা পড়ে' এদের সমস্ত ব্যয়ভার বহন ক'রছেন! কিন্তু সে যাই হোক, বেশী বলে বদনাম রটলেও কেউ তাদের এক দিনের জন্যেও পাড়ায় কোনও বেচাল দেখতে পারিনি। মাঝে মাঝে সে বাড়ী থেকে মিহি সুরে শ্রবণ-মধুর সঙ্গীতালপ শোনা যেতো বটে, কিন্তু চিক্-ফেলা বারান্দার দিকে অনেকক্ষণ হাঁ কবে চেয়ে থেকেও শিবু কোনও দিন তাদের পাশের বাড়ীর এই রহস্যময়ী ভাড়াটেদের কারুরই মুখ দেখতে পেতো না!

হঠাৎ এক দিন কলেজ যাবার সময় শিবু দেখলে তাদের গলিব মুখে বেথুন কলেজের প্রকাণ্ড বাসখানা এসে দাঁড়িয়েছে। একটু পরেই তাদের পাশের বাড়ী থেকে একটি পনোবো যোলো বছরের ফুটফুটে মেয়ে এক গোছা বই খাতা হাতে করে বেরিয়ে এলো।

গলিটা সরু, দু'জন লোক পাশাপাশি যেতে পারে না, কাজেই শিবু, মেয়েটিকে পথ ছেড়ে দিয়ে একটু পাশ কাটিয়ে দাঁড়ালো।

অধর-প্রান্তে একটু স্নিগ্ধ মধুব হাসি ফুটিয়ে মেয়েটি একবার চকিতের জন্য শিবুর মুখের দিকে চেয়ে গাড়ীতে গিয়ে উঠলো।

দু'টি কালো চোখের সেই নিমেষের নয়নপাতে অনেকখানি ধন্যবাদ নিবেদন করা ছিল। শিবু মুগ্ধ হ'য়ে দীর্ঘক্ষণ সেই অজগর গাড়ীখানার চলে যাওয়ার পথে পলকহীন চোদ্দ চেয়ে রইল। কিন্তু ওই এক-গাড়ী মেয়ের মধ্যে পাশের বাড়ীর সে মেয়েটি যে কোথায় হারিয়ে গেল, শিবু আর তাকে খুঁজে পেলো না। তার বদলে পাঁচ-সাত জোড়া চশমা-পল্লা চোখ গাড়ীর ভিতরের অন্ধকার থেকে তার দৃষ্টির সামনে যেন চক্ চক্ ক'বে উঠলো!

শিবু অপ্রস্তুতের মতো চোখ ফিরিয়ে নিলে, কিন্তু সে দিগ্গজ গাড়ীখানা তখন একটা মোড় ঘুরে অদৃশ্য হ'য়ে গেছে।

শিবু সেদিন কেমন যেন একটু মনমরা হয়ে কলেজে চলে গেল।

এমন করেই শিবুর সঙ্গে নীলার প্রথম দেখা হয়েছিল সে এক দিন দৈবাৎ। তার পর থেকে রোজই হয়; কিন্তু, আর দৈবাৎ নয়। বেথুন কলেজের গাড়ীর আওয়াজ পেলেই শিবুর কলেজ যাবার সময় হয়ে যেতো। কিন্তু, নীলা যতক্ষণ না বেরিয়ে এসে গাড়ীতে উঠতো, ততক্ষণ সে কিছুতেই আর তাদের বাড়ীর সামনের সেই ছোট্ট সৰু গলিটা পার হ'য়ে যেতে পারতো না! কাজে-কাজেই তাদের দু'জনের এখন প্রতাহই দেখা হওয়াটা একটা নিশ্চিত ব্যাপার হ'য়ে উঠেছিল।

কেবল রবিবার ও ছুটির দিন হ'লে শিবু এ মেয়েটির দেখা পেতো না। ছুটির দিন এগিয়ে আসতো ওখু যেন শিবুকেই সাজা দেবার জন্য। অদর্শনের যন্ত্রণা তাকে এমনি কাতর ও অধীর করে তুলতো যে বারান্দার সারি সারি নীল চিকুণলোর দিকে চেয়ে চেয়ে ক্লান্ত হ'য়ে সে অনেক সময় ভাবতো—যা-হোক একটা কিছু ছুতো ক'বে একবার পাশের বাড়ীতে ছুটে গিয়ে মেয়েটিকে দেখে আসি।

কিন্তু, বেচারির সাহসে কুলাতো না। দরজার সামনে যে দ্বাবান বসে কেবলই হাতের তালুতে রগড়ে খৈনি খেতো ও তুলসীদাসী রামায়ণ পড়তো, তাকে শিবু তত ভয় করতো না। কিন্তু, ওই বাড়ীখানার চারিদিকে এমন একটা কলঙ্কের কাঁটা-দেওয়া কুংসার বেড়া বেঁধে দেওয়া হ'য়েছিল, যে, শিবুর সেটা কিছুতেই ডিঙিয়ে যেতে সাহস হ'তো না।

\* \* \*

একদিন বাড়ী থেকে বেরুতে নীলার একটু দেবী হয়ে গিয়েছিল। গাড়ী এসে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল বলে সে একটু তাড়াতাড়ি এগিয়ে, প্রায় ছুটেই গাড়ীতে উঠতে যাচ্ছিল। এমন সময় তার খাতার ভিতর থেকে ফাউন্টেন পেনটা ছিটকে বেরিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। শিবু দেখতে পেয়ে কুড়িয়ে নিয়ে গাড়ীর দরজার কাছে দৌড়ে গিয়ে সেটা নীলাকে দিয়ে এলো। নীলা সেটা হাত বাড়িয়ে নেবার সময় এমন সুন্দব হেসে কৃতজ্ঞ চোখে চেয়ে শিবুকে মিহি মিষ্টি গলায় ধন্যবাদ দিলে, যে, শিবুর দেহ-মন একটা চরিতার্থতার আনন্দে যেন পরিপূর্ণ হ'য়ে গেল।

ওদিকে গাড়ীশুদ্ধ মেয়ে কলরব কবে নীলাকে জিজ্ঞাসা করলে— ও কে ভাই, ও সুন্দব ছেলেটি বুঝি তোমার দাদা?

নীলা একটু ইতস্তত করে বললে— হ্যাঁ।

এমনি কবেই তাদের প্রথম আলাপ-পরিচয় হয়েছিল।

তাব পর কি একটা ছুটির দিনে নীলার অদর্শনে কাতর শিবু বাড়ীতে আব তিষ্ঠতে না পেরে বিকেলের দিকে তার ইউনিফর্মটা পাট করে বগলে নিয়ে মাঠে খেলতে যাবার জন্য বেরিয়ে পড়ল। গলিতে নেমেই দেখে নীলা আসছে,— আজ আর ইস্কুলের পোষাক নয়, চমৎকার বেশভূষা। জরীর ওল-বসানো ঢাকাই শাড়ী ব্রালিকা ধরনে পরা। গায়ে সেই বকমেরই একটি ব্লাউজ। নিভাঁজ কালো এলো চুলের গোছা পরিপুষ্ট পিঠখানি ছাপিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। মাথার দু পাশে চুলের গায়ে দুটি সুন্দর ক্রিপ্ অঁটা। হাতে একটি ঝকঝকে নূতন এম্ব্রাজ।

হঠাৎ শিবু সামনে এসে পড়াতে নীলা পথের মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো। কপসী নীলার সেই 'কুন্দেশু-তুষার-হার-ধবলা' বীণাপাণি মূর্তি দেখে মুগ্ধ ও চমৎকৃত শিবনাথের হাত থেকে ইউনিফর্মের মোড়কটা মাটিতে পড়ে গেল। শিবুর কিন্তু সেদিকে খেয়াল ছিল না। নীলা দেখতে পেয়ে হেঁট হয়ে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে শিবুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে— আপনার এটা কি পড়ে গেল।

শিব চমকে উঠে— ‘হ্যাঁ’ বলে হাত বাড়ালে।

নীলা সেটা ফিরিয়ে দেবার আগে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বললে— আপনি কোন্ টিমে খেলেন?

ইউনিফর্মের মোড়কটার গা থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে শিব বললে— আমাদের কলেজ টিমে।

— আজ বুঝি খেলা আছে?

— হ্যাঁ।

— তবে আসুন না আপনাকে মাঠে নামিয়ে দিয়ে যাই, আমি ত ওই দিকেই যাচ্ছি—

— কোন্ দিকে?

— আমাদের গান-বাজনার ইস্কুলে।

— আপনি গান-বাজনাও শিখছেন?

শিবনাথের চোখে-মুখে একটা সপ্রশংস বিষ্ময় ফুটে উঠল।

নীলা একটু লজ্জিত হয়ে বললে— এই একটু আধটু, তাও দায়ে পড়ে। দিদির ইচ্ছে, জামাইবাবুর সখ, কি কবি বলুন,— তাই ও পাঠটাও পড়তে যেতে হচ্ছে— বলতে বলতে নীলা তার বাঁ হাতটি নীলায়িত ভঙ্গীতে তুলে মৃণাল মণিবন্ধে বাঁধা সোনাব হাত ঘড়ীটির দিকে চকিতে একবার চেয়ে দেখে বললে— আসুন, আব সময় নেই কিন্তু,—

নীলা গাড়ীর দিকে এগিয়ে চললো—

শিব একবার সভয়ে তাদের বাড়ীর দিকে চেয়ে দেখে কলের পুতুলের মতো নীলাব পিছু পিছু গিয়ে টুক করে গাড়ীতে উঠে পড়লো।

নীলা তাকে এদিকের সিটে বসবার জন্য অনেক পিঁড়াপিঁড়ি করা সত্ত্বেও শিব উঠে সামনের সিটেই বসে পড়েছিল।

নীলা গাড়ীতে উঠবার সময় হাতের এশাভটা শিবর দিকে বাড়িয়ে দিলে, শিব অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে দু’হাত বাড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে সেটাকে সযত্নে বুকের উপর তুলে নিলে। সম্মুখে সেটার গায়ে হাত বুনিয়ে বললে— আপনার এশাভটা ত ভাবী চমৎকার।

নীলা গাড়ীতে উঠে বাসে হাঁকাতে বলে দিয়ে প্রশ্ন কবলে— আপনি কি বাজাতে জানেন?

ঘাড় হেঁট করে শিব বললে— সামান্য রকম, — মোটে মাসদুই-তিন খাঁ সাহেবেব বাড়ীতে শিখতে গেছলুম। কিন্তু ‘পড়াশুনোর ক্ষতি হবে বলে দাদা বাণে কবলেন, তাই আব ওটা ভালো করে শেখা হলো না। আপনি বেশ ভালো বাজাতে শিখেছেন বোধ হয়।

— রামঃ! কেবল দিদিব তড়ায় মাঝে মাঝে একটু একটু ছড়ি টান। তাও, এ ইস্কুলে গিয়ে। বাড়ীতে এসে আপ আমি একে ছুই না।

— কেন? আপনি কি গান বাজনা পছন্দ কবেন না?

— পছন্দ কবলেই বা কি হবে? আপনিও যেমন! আমাদের দেশে গৃহস্থ মেয়েদের গান বাজনা শেখা একটা বিড়ম্বনা বই ত নয়! সংসারের কাজকর্ম নিয়ে, ছেলেরা নিয়ে মানুষ করা নিয়ে তাদের দিনরাত এমন ব্যস্ত থাকতে হয়, যে, এ রসটুকু উপভোগ করার তাবা ফুরসতই পায় না! তা ছাড়া আমাদের হৃদয় ঘরে আবাব ‘ওর জনরা উপস্থিত থাকলে— ওটা তো এক-রকম নিষিদ্ধ ব্যাপার বলেই বিবেচিত হয়! এই বলে নীলা একটু মৃদু হাসলে, শিব সে হাসিতে যোগ দিয়ে বললে—

— আপনি যা ব’লছেন সে কথা ঠিক—

তা তো ব’ললুম। কিন্তু, আমাদের সমাজে এ ‘ওলো ক’তদূর অনায়াস ব’লুন তো! সারাদিনেও পার্টিসের পর এন্ট্রি অবসর, পেন্সে আমবা যদি খানিকটা গান বাজনা নিয়ে আয়োজ কবি তাহলে দোকানটা যে দিদি ক’মি, এ ব’লতে পারি না!

— দোষগুণ যদি বিচার ক'রে দেখা হতো, তা'হলে বোধহয় পুরুষরা মেয়েদের এতটা কড়া শাসনে রাখতে পারতো না—

—আপনি হয় ত' জ্ঞানেননা, এ সব বিষয়ে পুরুষ অভিভাবকদের চেয়ে বাড়ীর সেকেন্দ্রে গিন্নীরাই বেশী আপত্তি করেন। তাঁরা স্পষ্টই বলেন— ওটা নিতান্ত বেহায়াপনা! হাঁদুর বাড়ীর গৃহস্থ ঘরের বৌ-ঝি আবার গান-বাজনা করবে কি— তারা কি বাঙ্গালী?

শিবু এস্রাজের তারে একটি আঙুল ছুঁইয়ে দু-একটা মৃদু বন্ধার তুলে বললে— তাঁদের কথা ছেড়ে দিন— তাঁরা অশিক্ষিতা, অনেকের অক্ষর-পরিচয় পর্যন্ত নেই। আজকালকার দিনে মেয়েরা যে-সব সুবিধে ভোগ ক'রতে পাচ্ছে, তখনকার কালে তাঁরা সে-সব সুবিধে কখন পাননি। কাজে কাজেই, তাঁরা স্বভাবতই একটু (jealous) হয়ে ওঠেন, দেখে শুনে সহ্য ক'রতে পারেন না— তাই বাধা দিতে চেষ্টা করেন।

গাড়ী টোরঙ্গী দিয়ে যেতে যেতে একটা বাঁয়ে গলির মুখে যখন মোড় নিতে যাচ্ছিল, নীলা গাড়ী থেকে মুখ বাড়িয়ে বললে— ডাহিনা যাও— ময়দান।

শিবু তাড়াতাড়ি বললে— না না, কেন কষ্ট করে আবার অতটা যাবেন? —আমাকে এইখানেই নামিয়ে দিলে হবে—ওই ত, আমাদের গ্রাউণ্ড দেখা যাচ্ছে—

নীলা হেসে উঠে বললে— এতটা পথ আপনাকে নিয়ে এলুন, আর ওইটুকু যেতেই কি আমাদের ঘোড়া মরে যাবে?

শিবু অপ্রতিভ হয়ে বললে— এ গাড়ী ঘোড়া বুঝি আপনাদেরই নিজের?

নীলা চট্ ক'রে এ প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে পারলে না, একটু ভেবে বললে— আমাদের নিজের মানে আমার নয়— এ সুবোধ বাবুর। তবে, তাঁর গাড়ী-ঘোড়া, লোকজন, টাকা-কড়ি সবই ত' দিদির, কাজেই আমারও ব্যবহার কববার একটা অধিকার আছে।

কথাটা শুনে শিবু মনে মনে শিউরে উঠে চূপ ক'রে বসে ভাবতে লাগল— তাই ত! সুবোধ বাবুরই সব। তাহ'লে পাড়ার লোকেরা যা বলে সেটা সত্যি? ছি ছি— এবা তবে সত্যিই বেশী! সুবোধবাবু এদের মনিব! কী লজ্জার কথা! শিবুর চট্ ক'রে মনে হ'লো— তাই ত', আমাকে যদি কেউ এর সঙ্গে এক গাড়ীতে দেখে তাহ'লে আমি তো আর কান্নার কাছে মুখ দেখাতে পাববো না! শিবু গাড়ী থেকে মুখ বাড়িয়ে চীৎকার ক'রে উঠলো— সবুর!— সবুর!

গাড়ী দাঁড়াতেই শিবু উঠে প'ড়ে তার হাতের এস্রাজটা গাড়ীর গদির ওপর হেলিয়ে রেখে টপ্ কবে বাইরে লাফিয়ে পড়লো এবং নীলাকে চট্ ক'রে একটা নমস্কার ক'রে— 'চলুন' বলে পিছন ফিরে মাঠের উপর দিয়ে— প্রায় একরকম ছুট দিলে।

নীলা একটু বিস্মিত হ'য়ে গাড়ী ঘুরিয়ে নিতে বললে।

\* \* \*

শিবু সেদিন আর তেমন মন দিয়ে ভাল ক'রে খেলতে পারলে না। খেলার শেষে 'স্টেটের' আড্ডাতেও সে তেমন ক'রে যোগ দিতে পারলে না! সন্ধ্যার পর সারাটা পথ সে কেবল নীলাদের কথাই ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফিরে এলো। তার বড্ড দুঃখ হ'চ্ছিল যে, অমন সুন্দর মেয়ে কেন বেশী হ'ল?—

শিবুর দাদা ভোলানাথ বাড়ীর বাইরে রকে বসে একটি মস্ত ঠাঁকোয় কাঠের একটা বিষং-প্রমাণ লম্বা নল লাগিয়ে তামাক খাচ্ছিলেন এবং সামনের বাড়ীর বিধু বাগ্‌চির সঙ্গে কলিকালের ছেলেদের বর্তমান বেচাল সম্বন্ধে নানা আলোচনা করছিলেন।

শিবু সেদিকে মোটে না চেয়েই বাড়ীর ভিতর ঢুকে প'ড়ছিল। কিন্তু, ঠিক সেই সময়েই দাদা তাতে ডাকলেন— শিবনাথ!

শিবু চমকে উঠলো! দাদার গলাটা আজ যেন তার কানে অতিরিক্ত গম্ভীর ব'লে মনে হ'লো।

'আজ্ঞে!' বলে সে ভোলানাথের কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়ালো।

ভোলানাথ হুকোর নল থেকে মুখটি সরিয়ে নিয়ে অত্যন্ত কঠোর ভাবে তাকে জানিয়ে দিলেন যে— আর কোনও দিন যদি তিনি শোনে যে শিবনাথকে পাশের বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে একগাড়ীতে বেড়াতে যেতে কেউ দেখেছে— তা হ'লে এ-বাড়ীতে আব তাকে ঢুকতে দেওয়া হবে না—

শিবনাথ মৃদু স্বরে কি একটা ভবাব দেবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু ভোলানাথ রুঢ় কণ্ঠে তাকে প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে বললেন— এতখানি বয়েস হয়েছে তোমার— এন্ এ পড়ছো— আর এটা জানতে পারোনি আরুণ্ড যে পাশের বাড়ীর ও দুটো বেশ্যার মেয়ে।

এ কথা শুনে শিবু হঠাৎ একবার কি-জানি-কেন পাশের বাড়ীর চিক-ফেলা বারান্দার দিকে চকিতের ন্যায় চেয়ে দেখলে। আজ কিন্তু চাইবামাত্র সেই নীল চিকের ফাঁকে একখানি অতি সুন্দর মুখ সে দেখতে পেল। এ মুখ সে আর কখনও দেখিনি! কিন্তু সে মুখে তখন ঘৃণা, লজ্জা, ক্রোধ, ক্ষোভ, সমস্ত যেন একসঙ্গে ফুটে উঠেছিল। শিবু অপরাধী মতো ছুটে বাড়ীর মধ্যে পালিয়ে গেল।

ভোলানাথ তখন বিধু বাগচিকে বলতে শুরু করলেন— আমাকে বোধ হয় এইবার এ পাড়া ছাড়তে হ'লো। এমন চোখের সামনে ডাইনীরা যে আমার ভাইগুলোর মাথা চিবিয়ে খাবে— এ আমি দেখতে পারবো না।

তার পর শিবুকে ডেকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে নীলার প্রস্রাব হাতে গড়েব মাঠে বেড়াতে যাওয়ার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করে তিনি বললেন— এর একটা যদি তোমরা কিছু বিহিত না করো, তাহলে তো ভাই এই সাতপুরুষের ভিটে বেচে আমাকে বাধা হ'য়ে এখন থেকে চলে যেতে হবে!

ঠিক এই সময় গলির মুখে একখানা প্রকাণ্ড মোটর গাড়ী নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালো। গাড়ীর তীব্র আলোয় শিবুদের সন্মুখ গলিটা আলো হ'য়ে উঠলো।

সমস্ত পথটা একটা নিষ্কণ্ট সৌরভে আমোদিত ক'রে তুলে সুবোধ বাবু যখন ভোলানাথের রকের সামনে এসে পড়লেন, ভোলানাথ সসম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে হুকো-শুদ্ধ হাতে তাঁকে একটা নমস্কার ক'রে বললেন— আপনার কাছে এ গরীবদের একটু নিবেদন আছে।

সুবোধ বাবু দাঁড়িয়ে গেলেন। ভোলানাথ হুকোর নলটায় বার দুই খুব জোরে জোরে শেষ টান দিয়ে, খুব খানিকটা চোয়া ধোয়া ছেড়ে, খানিকটা কেশে গলাটা ঝেড়ে নিয়ে, হুকোটা বিধু বাগচির হাতে দিয়ে বললেন— আপনি বডলোক, আপনার অগাধ পরিসা, এসব আপনাকে শোভা পেতে পারে, কিন্তু, আমাদের মতো গরীব গৃহস্থের ছেলেগুলো মাটি হ'য়ে যায়— এইটাই কি আপনার ইচ্ছে?

সুবোধবাবু আশ্চর্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন— কেন? কি হয়েছে?

ভোলানাথ তাঁব অভিযোগ বাক্ত করতে গিয়ে যেমন একবার তাঁর প্রতিবেশিনীদের উল্লেখে বলে ফেলেছেন বেশ্যার মেয়ে,— সুবোধবাবু তৎক্ষণাৎ তাঁকে তীব্র তিরস্কার করে বললেন— ওদের জননী সতীলক্ষ্মী ছিলেন— তিনি সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যা ছিলেন; তাঁর সম্বন্ধে এবং আপনার প্রতিবেশিনীদের সম্বন্ধে আপনি যখন কিছু বলবেন, বেশ সংযত ও ভদ্র ভাবে এবং তাঁদের উপযুক্ত সম্মান রেখে কথা বলবেন।

ভোলানাথ হঠাৎ উদ্বেজিত হ'য়ে উঠে বললেন— তা হয় ত' তাঁরা হ'তে পারেন, কিন্তু, উপস্থিত ওদের দুই বোনের পেশাটা কি, তা জানতে পাড়ার লোকের কান্নের গানী নেই— সুতবাং.

বাধা দিয়ে সুবোধবাবু বললেন— মাপ করবেন, আপনি কিছু জানেন না। ওঁদের দুই বোনের মধ্যে জোষ্ঠা হচ্ছেন আমার স্ত্রী। কনিষ্ঠা এখনও অবিবাহিতা।

ভোলানাথ রুষ্ট ভাবে বললেন— ওসব আর আমাদের শেখাবেন না, আমরা ওসব জানি, একেবারে নেহাৎ দেহান্তী লোক মনে করবেন না। সাতপুরষ কলকাতায় বাস করছি, আপনার মতো বড়লোকও ঢেব দেখেছি। ছোট বোনটার চটপট একটা গতি করুন— নইলে তিনি যে আমার ভাইওলির মাথা খাবেন তা হ'তে দিচ্ছিনে; হয় আমি এপাড়া ছাড়বো, আব নয় আপনার মেয়েমানুষদের এপাড়া ছাড়া করবো— তবে আমার নাম ভোলানাথ চাটুয়ো— এই বলে বাখলুম।

আপনার মতো অভদ্র ইতব লোকওলো যাহে এপাড়া থেকে শীঘ্র দূর হয়, আমিও সেই ব্যবস্থা কববো জানাবেন— অতঃপ্ত অবজ্ঞাব সঙ্গে এই কথাওলো বলে সুবোধবাবু বাড়ীর মধ্যে চলে গেলেন।

বিধু বাগচি বললে— কাণ্ডটা ভালো ক'বলে না দাদা,—বড়লোকের সঙ্গে বিবাদ রাখা উচিত নয়— সেই ছেলেবেলাখ পড়া মুংপাত্র ও কাংসাপাত্রের গল্পটা কি মনে নেই?

—আরে রেখে দাও তোমার বড়লোক! ভয় করতে হয় তোমরা ক'রগে— ভোলা চাটুয়ো কাউকে কেয়ার করে না! বলতে বলতে ভোলানাথও ঝুঁকো নিয়ে বাড়ীর ভিতর চলে গেল।

\* \* \*

কলেজে যাবার সময় গলিব মধ্যে শিবনাথ ও নীলার সে প্রতাইই দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা হয়, পাড়ার কবর কাছেই সে খবরটা চাপা ছিল না। সুতরাং ভোলানাথও, যথাসময়ে এ সংবাদ অবগত হ'য়েছিলেন। কাজে কাজেই তিনি পবেব দিন থেকে অফিস যাবার সময় নিজে ভায়াকে সঙ্গে ক'রে কলেজে পৌছে দিয়ে আসবার প্রস্তাব ক'রলেন।

শিবনাথ বললে— দাদা, সে কি রকম করে হবে? আমাদের গ্রে কিছু ঠিক নেই, কোনও দিন বারোটায় ক্রাশ— কোনও দিন দু'টায় ক্রাশ— সব দিন ত্রো দশটায় ক্রাশ থাকে না।

ভোলানাথ বললেন— বেশ, যেদিন দশটায় ক্রাশ থাকবে সেদিন আমার সঙ্গে কলেজে যাবি। আর যেদিন বেলায় গেলে চলবে সেদিন বাড়ীতে বসে থাকবি, যতক্ষণ না ঐ বেবুশে মেয়েটা ইঙ্কুলে বেরিয়ে যায়! নইলে তোকে আমি বাইবের কোনও কলেজে ট্রান্সফার ক'রে দেবো।—

অগত্যা শিবনাথকে এই প্রস্তাবে সম্মত হ'তে হ'লো। ফলে নীলার সঙ্গে তার দেখা শোনাটা এখন সকালে না হ'য়ে বিকেলে শুরু হ'লো।

অর্থাৎ কলেজ থেকে ফিরে শিবনাথ আর বাড়ীতে ঢুকতো না, চারটের পর থেকে গলিব মুখে বড় রাস্তার ধারে বেথুন কলেজের গাড়ীর জন্য অপেক্ষা ক'রতো!

কিছুদিন পরে এটাও জানাজানি হ'য়ে গল। ভোলানাথ একদিন শিবকে ডেকে বললেন— দেখো, ছোট ছেলের মতো রোজ রোজ এমন ক'বে তোমায় ডেকে শাসন করতে আমার লজ্জা করে। বড় ভাইয়ের কথাটা অগ্রাহ্য করা কি তোমার উচিত? তবে আর তোমায় এতো লেখাপড়া শেখালুম কি জন্য? ভদ্রলোকের ছেলে হ'য়ে তোমার বেশ্যার মেয়েদের সঙ্গে মিশতে লজ্জা করে না একটু? শুনলুম নাকি বুড়ো ছেলে তুমি কলেজ পালিয়ে এসে মেয়েটার সঙ্গে দেখা করো—

শিবু গম্ভীরভাবে বললে— দাদা ওরা বেশা নয়।

ভোলানাথ দাঁতমুখ খিচিয়ে বলে উঠল— না! তাকি আর? ওরা হচ্ছে খড়দার মা-গোসাই।

শিবু বললে— ওরা ভদ্রমহিলা—

— হ্যাঁ, একেবারে ‘কুলবালা’! তুই আমার চেয়ে জানিস্ কি না? কে বলেছে তোকে ওরা বেশ্যা নয়—

— না দাদা, নয়—

— সে কি রে হতভাগা!— পাড়াগুচ্ছ লোক যে কথা জানে, তুই তা’ জানিসনি আজও?

— পাড়াগুচ্ছ লোক ভুল জানে দাদা, আমিও সেই ভুলে ওই মেয়েটিকে একদিন আপনার চেয়েও ঢের বেশী অপমান করেছিলুম। লিখে দিয়েছিলুম— ‘তোমরা বেশ্যা— তোমাদের সঙ্গে আমি পরিচয় রাখতে ইচ্ছে করিনি।’ তারই উত্তরে সেইদিন প্রথম ওদের প্রকৃত পরিচয় জানতে পারলুম— ওরা, যে কত মহৎ— কত উদার সে আপনার ধারণা হবে না—

ভোলানাথ মনে মনে বললেন— হ্যাঁ! মরেছো দেখছি একেবারে।— প্রকাশ্যে বললেন— ওদের প্রকৃত পরিচয় কি তুমি ওদেরই কাছ থেকে সংগ্রহ করেছো শিবু?—

শিবু বললে— নীলা আমায় বলেছে।

— নীলা! নীলা আবার কে?

— ছোটবোনের নামই তো নীলা। আর ওর দিদির নাম ইলা!—

— বটে! আত্মকাল ওরা নামও নিচ্ছে সব অন্যরকম দেখছি— আমাদের সময়ে নাম গুনতুম— পাম্মা—ফিবোজা—মতিবিবি—এই সব—

— আঃ! কি বলছেন আপনি ওসব? ভদ্রলোকের মেয়েদের অপমান করবেন না— দাদা।

শিবুর চোখে মুখে একটা বিরক্তি ও ঘৃণা ফুটে উঠল।

ভোলানাথ সেটা লক্ষ্য করে আব কিছু বললেন না, মনে মনে ভাইটিব জন্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠলেন। ভাবলেন ডাইনীরা ছোঁড়াটাকে ভালমানুষ পেয়ে গেঁথে ফেলেছে দেখছি!

শিবু বললে— আপনি যদি ওদের পরিচয় শোনেন, তাহ’লে বুঝতে পারবেন যে ওদের প্রতি আপনি কতবড় অবিচার কবছেন।

ভোলানাথ বললেন— ওদের মুখে ওদের পরিচয় শুনে বিশ্বাস করবার মতো বয়স আব আমার নেই— বুঝলে। তোমাকে আমার এই শেষ অনুরোধ যে ওদের সংস্রব তুমি তাগ করো, নইলে তোমার ভবিষ্যৎ বড় বিষময় হয়ে উঠবে শিবু!

\* \* \*

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা হয়ে যাবার পর নীলা আব ইস্কুলে যেতো না। কাজেকাজেই শিবনাথের সঙ্গে তার দেখাসাক্ষাৎও আজকাল আর বড় একটা হয় না।

ইতিমধ্যে একদিন মোটবাট বেঁধে ইলারা বাড়ীতে চাবী দিয়ে কোথায় হাওয়া খেতে চলে গেল। ভোলানাথ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। ভাবলেন— যাক্, আপদ গেল। এইবার দেখে শুনে ভায়ার একটা বিয়ে দিয়ে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

কিন্তু, ভোলানাথের কানে এ খবরটা আর গিয়ে পৌঁছল না, যে, পাশেব বাড়ীর আপদ বালাইরা উপস্থিত কিছুদিনের জন্য স্থানান্তরে গেলেও ভায়ার সঙ্গে তাদের যোগসূত্র ছিন্ন হয়নি। শিবনাথ যে রাত্রি ভ্রমে আজকাল রোজ আটপাতা করে চিঠি লিখে নীলাকে এব, নীলা যে সেই সুদূর মুর্শেরী পাহাড়ের কোল থেকে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই পত্রপুটে ভরে তার আনন্দ অঞ্জলি শিবনাথের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে— এর কোনও সন্ধানই ভোলানাথ পাননি। তিনি এখন প্রায় প্রতি রবিবারেই হয় বালি, নয় বেহালা, নয় বেলঘরেতে শিবনাথের জন্য পাত্রী দেখে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।



দেখতে দেখতে দু'মাস কেটে গেল। একটিও পাত্রী কিন্তু ভোলানাথ এখনও পর্যন্ত মনোনীত করে উঠতে পারলেন না। যেখানে মেয়ে পছন্দ হয়, সেখানে তারা এম এ-পড়া ছেলের উপযুক্ত দক্ষিণা দিতে অক্ষম; যেখানে পাণ্ডনার প্রতিশ্রুতি খুব বেশী পাওয়া যায়, সেখানে কন্যাটি একেবারে যেন সাক্ষাৎ বিভীষিকা! ভায়ার জন্য ভোলানাথ কোথাও একত্রে কামিনী-কাক্ষনের অপূর্ব সমাবেশ আবিষ্কার করতে পারছিলেন না।

অবশ্য তাঁর চেষ্টারও কোনও ক্রটি ছিল না, বিশেষ যেদিন অফিস থেকে এসে দেখলেন যে পাশের বাড়ীতে আবার আলো জ্বলছে এবং দেউড়ীতে সেই দ্বাবানটি পুনরায় তুলসীদাস ভাঁজতে সুরু ক'রেছে—তিনি পাত্রীর সন্ধানে সেদিন থেকে একান্ত ভাবে তৎপর হয়ে উঠলেন।

নীলারা ফিরেছে, কিন্তু শিবনাথের সঙ্গে এখনও দেখা হয়নি। শিবনাথ দেখা করবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হ'য়ে উঠেছিল, কিন্তু দাদার ভয়ে তাব কিছুতেই সাহস হচ্ছিল না। হঠাৎ একদিন একটা অভাবনীয় সুযোগ এসে গেল।

সেদিন গেজেটে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফলাফল বেরিয়েছিল। শিবনাথের ছোট ভাই শম্ভুনাথও এবার ম্যাট্রিক দিয়েছিল, শিবনাথ তাই একখানা গেজেট কিনে এনে রকে বসে দেখছিল। তাব আশে পাশে শম্ভুনাথ এবং পাড়ার আরও অনেকগুলি ম্যাট্রিকের আসানী ছেলে ভীড় জমিয়ে তুলেছিল। মহা একটা কলরব চলছিল।

সেই সময় পাশের বাড়ীর দ্বারবান এসে একটা লম্বা সেলাম ঠুকে শিবনাথের হাতে একখানা চিঠি দিলে।

চিঠির উপর নীল পেন্সিলে নীলার হাতের মতির হরফ দেখে গেজেটখানা শম্ভুর হাতে দিয়ে শিবনাথ তাড়াতাড়ি চিঠিখানা খুলে পড়লে— নীলা লিখেছে—

“পাশের খবরটা জানবার জন্যে পাশের বাড়ীতে আর একটি প্রাণীও যে বিশেষ উৎসুক হ'য়ে আছে সে কথাটি কি স্মরণ করিয়ে দিতে পারি? গেজেটখানা নিয়ে যদি একবারটি দয়া ক'রে আমাদের বাড়ীতে আসেন তাহ'লে বিশেষ অনুগৃহীতা হবো। ইতি—নীলা”

শম্ভুর হাত থেকে ছোঁ মেরে কাগজখানা কেড়ে নিয়ে—রকের ধারে জমায়েৎ সমস্ত ছেলেদের অবাঞ্ছিত করে দিয়ে— শিবনাথ চক্ষের পলকে পাশের বাড়ীতে ঢুকে পড়ল।

নীলা তার জন্য নীচেয় নেমে এসেই অপেক্ষা করছিল। পরম সন্মাদরে শিবনাথকে সে অভ্যর্থনা করে নিলে। দুটি কমল-কোরক তুল্য কমলীয় করপট জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে সুন্দর একটি নমস্কার করে নীলা শিবনাথের কুশল জিজ্ঞাসা করলে এবং সঙ্গে করে একেবারে উপরে নিয়ে গিয়ে নিজের পড়বার ঘরটিতে এনে আপনার বসবার ইঁজি চেয়ারখানি আঁচল দিয়ে বেড়ে তাকে বসতে দিলে। আর একখানা চেয়ার টেনে শিবনাথের কাছে এগিয়ে নিয়ে এসে নিজে তাতে বসল এবং বিন্দু হাস্যে অধর-প্রান্ত রঞ্জিত করে জিজ্ঞাসা করলে— দেখলেন? ছাপার হরফে এই বদখং নামটা কি বেরিয়েছে?

শিবনাথ মহা অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়লো। সে তো নীলার নামটা আছে কি না এখনও দেখেনি, অথচ নীলা ঠিক ক'রে বসে আছে যে সে তার নামটা নিশ্চয় দেখেছে—! শিবু কী বলবে ভাবছে, এমন সময় নীলা বললে— নেই বুঝি?

শিবু তাড়াতাড়ি বললে— এইমাত্র কাগজখানা কিনে এনেছি, আনতে না আনতেই ওরা সব কাড়াকাড়ি সুরু করে দিলে, আমি এখনও একপাতাও দেখবার সময় পাইনি!

নীলা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে শিবুর হাত থেকে গেজেটখানা কেড়ে নিয়ে বললে— তাই বলুন! চুপ করে আছেন দেখে আমি একেবারে দমে গেছলুম!

ঝড়ের বেগে নীলা গেজেটখানার পাতার পর পাতা উল্টে যেতে লাগল— তার চোখের চঞ্চল দৃষ্টি গেজেটের প্রত্যেক পাতার উপর থেকে নীচে পর্যন্ত নেচে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ এক জায়গায় স্থির হয়ে সে বলে উঠলো— হুররে!

তারপর টেবিলের উপর থেকে তার মোটা নীল পেন্সিলটা তুলে নিয়ে তার নামটায় দাগ দিয়ে শিবনাথকে দেখতে দিলে।

শিবনাথ যখন নীলার নামটা পড়ে দেখছে, নীলাও তার পাশে গিয়ে ইজি চেয়ারটা ব হাতলের উপর ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল। নীলার একগুচ্ছ কেশ তার কানের পাশ থেকে ঝুলে এসে শিবুর কাঁধের উপর লতিয়ে পড়ল। নীলার শাড়ীর প্রান্ত একটুখানি উড়ে শিবুর গায়ে এসে লাগল, আর তার মৃদুতপ্ত নিশ্বাসের লঘু স্পর্শ শিবনাথের কপোল রোমাঞ্চিত করে তার অন্তরে-বাহিরে কি যেন একটা পুলক-শিহরণ জাগিয়ে তুললে!

শিবু নিম্পন্দেব মতো গেজেটখানার সেই নীল দাগ দেওয়া নামটার দিকে চেয়ে বা স্বপ্ন দেখছিল কে জানে— নীলা জিজ্ঞাসা করলে— আপনার বিশ্বাস হ'চ্ছে না বুঝি?

শিবু ঈষৎ যেন চমকে উঠে বললে— কেন? বিশ্বাস হ'বে না কেন? এমন স্পষ্ট লেখা রয়েছে—নীলা রায়—

শিবুর কথা শেষ হবার আগেই নীলার দিদি ইলার গলা পাওয়া গেল, তিনি বললেন - কে এসেছে রে নেলি?

বলতে বলতে ইলা সেই ঘরে এসে উপস্থিত হ'লো। নীলা অমনি ফস্ ক'বে গেজেটখানা শিবুর হাত থেকে টেনে নিয়ে তাব দিদির সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বললে-- চেয়ে দেখো একবার—চক্ষু-কর্ণের বিবাদটা ভঞ্জন ক'বে নাও এইবেলা, বড্ড যে বলেছিলে আমি কলাটি পাশ হবো— পড়ে দেখো ফার্স্ট ডিভিশন!

ইলা পড়ে দেখে বললে— তাই ত রে! এ যে তোর নামই দেখছি! সত্যিই তবে পাশ হ'য়ে গেলি না কি নেলি?—

—ওই দেখুন শিবুবাবু, দিদিও আমার ঠিক আপনারই মতো কিছুতেই বিশ্বাস ক'বতে চাইছে না যে আমি পাশ করছি! সুবোধবাবু যে দিন যুনিভার্সিটি থেকে খবর এনে দিলে— দিদি হেসে উড়িয়ে দিলে! বললে ভুল হ'য়েছে, ও আর কোনও নীলা হবে। আমাদের এ নীলা নয়! আজ গেজেটে ছাপা হরফে নাম বেরিয়েছে তবু দিদি সন্দেহ ক'বছে—

ইলা আবার জিজ্ঞাসা বরলে— হ্যাঁ রে নেলি! তবে কি সত্যিই পাশ হয়েছিস—?

নীলা কৃত্রিম ক্রোধ প্রবাহ ক'রে বললে— না-না রাম! সত্যি কখনও পাশ হ'তে পারি? ও আমি ঘুস্ দিয়ে গেজেটে নামটা ছাপিয়ে নিয়েছি!... কি বলেন শিবুবাবু?— আপনারও বোধ হয় তাই বিশ্বাস?—

শিবু একটু কুণ্ঠিত হয়ে বললে— কই আমি তো একবার এরূপ কোনও সন্দেহ কখন প্রকাশ করছি বলে মনে পড়ছে না?

এতক্ষণে শিবনাথের প্রতি ইলার দৃষ্টি পড়লো। ছোট্ট একটি নমস্কার করে বললে— এই যে— আপনি এসেছেন যে! কতক্ষণ?

শিবনাথ আশ্চর্য হয়ে— ইলাকে প্রতিনিমস্কার করে জিজ্ঞাসা করলে—'আপনি কি আমাকে চেনেন?

ইলা হেসে বললে— বুড়ো হ'য়েছি বটে, কিন্তু আমার দৃষ্টি-শক্তি এখনও এত ক্ষীণ হয়নি যে, পাশের বাড়ীর লোককে চিনতে পারবো না! তাছাড়া, নীলার মুখে 'যে শিবনাথ বাবুটির সুখ্যাতি শুনতে শুনতে কানে আমার তালা ধরে যাবার যোগাড়— তাকে কি সে আমায় না চিনি দিয়ে ছেড়েছে মনে করেন? একদিন হাত ধরে টেনে এনে সে আমাকে

বারান্দার চিক্ সরিয়ে আপনাকে দেখিয়ে দিলে। আমি আপনাকে দেখেই বললুম— এটি তো আমাদের পাশের বাড়ীর ছেলে! ওকে আমি অনেকবার দেখেছি, দু'টি চোখে অবাক আগ্রহ ভরে নিয়ে এই বারান্দার নীল চিকগুলোর দিকে কতদিন চেয়ে থাকে!

এই ব'লে ইলা ক্ষণকাল চুপ ক'রে রইল। তারপর একটু দুষ্টুমীর হাসি হেসে শিবনাথকে জিজ্ঞাসা করলে— চিকের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতেন কেন? আমাদের এই নীল চিকগুলো খুব সুন্দব দেখতে, না?

নীলা হেসে উঠে বললে— দিদি যেন কী! উনি বুঝি চিকের সৌন্দর্য দেখবার জন্যই চেয়ে থাকতেন—

ইলা এবার বোনের দিকে চেয়ে বললে— তবে বুঝি তোমাকে একবার দেখতে পাবার লোভেই কাঙালের মতো শিবনাথবাবুর ব্যাকুল দৃষ্টি এই বারান্দার দিকে প্রতাহ চোখ পেতে চেয়ে থাকতো?

শিবনাথ যেন শ্বশুর-বাড়ীতে আসা নূতন জামাইটির মতো লজ্জায় ঘাড় হেঁট ক'রে বসে বইল।

নীলা তার সুন্দব মুখখানি সরমে রাঙা ক'রে তুলে বললে— যাও, তুমি ভারী দুষ্টু!

ইলা শিবনাথের দিকে ফিরে হাসতে হাসতে বললে— আচ্ছা, তুমিই বলো তো ভাই, আমার কথা ঠিক কি না?

পর মুহূর্তেই শিবনাথকে 'তুমি' বলে ফেলাটা হয়ত অভদ্রতা হয়ে গেল ভেবে ইলা বললে— তোমাকে ভাই আমি ছোট ভা'য়ের মতো দেখি,— নীলা তোমায় দাদার মতো ভালবাসে, সুতরাং তুমি আমাদের স্নেহের পাত্র। তোমায় যদি শিবনাথ বাবু, আপনি, মশাই না বলতে পারি, তুমি বাগ কবাবে না ত?

শিবনাথ শুধু বললে— আপনি আমারও দিদি।

এ কথাটা শুনে নীলার মনের মধ্যে কেমন একটা হাহেতুকী স্মৃতি হ'লো! সে আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠে বললে— দিদি, পাশ করলুম, আমাকে একদিন খাওয়াবে না?

ইলার মুখখানি সহসা গভীর হয়ে উঠলো! ভারী গলায় ব'ললে— পাশ ক'রে আব কার মাথা কিন্‌লি নীলা? গভর্মেন্ট আফিসে কি চাকরী করতে যাবি? যে রকম ব্যাপার দেখছি, তোকে বোধ হয় শেষটা 'নার্স' কিন্‌বা 'মিডওয়াইফ' হ'য়ে জীবনটা কাটাতে হবে। এখন থেকেই পাড়ায় আমাদের যে রকম সুনাম রটতে শুরু হয়েছে, তাতে কোনও ভদ্রলোকের ছেলে যে তোমায় বিয়ে কবতে সাহস করবে, আমার তো তা মনে হয় না!

শিবু তাড়াতাড়ি বললে— না দিদি, যে শুধু লোকের কথা শুনে বিশ্বাস করবে সে হয়ত ভয় পাবে, কিন্তু, যে আপনাদের পরিচয় পাবে সে নীলাকে বিবাহ করা তার একটা সৌভাগ্য বলেই মনে করবে!

নীলা আস্তে আস্তে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল!

ইলা বললে— দেখো ভাই, তোমাদের ওই কবিত্ব-টবিত্ব আমার সত্যিই বলছি একটুও ভাল লাগে না! আমি সাদা কথার মানুষ, সোজাসুজি চলতে ভালবাসি! নীলা আমার প্রায় সতেরোয় পড়লো। আমি একটি সংপাত্র দেখে ওর বিয়ে দিতে চাই। আমাদের বাঙালীর ঘরের মেয়ে সতেরো আঠারো বছরের বেশী খুবড়ী করে রাখা ঠিক নয়।

শিবু খুব উৎসাহের সঙ্গে বললে— আপনি যা বলছেন সে কথা খুব ঠিক; কিন্তু, ও বয়সের আগেও কোনও মেয়ের বিয়ে দেওয়া উচিত নয়। অল্প বয়স থেকেই সম্ভান প্রসব করার দকন আমাদের দেশের অধিকাংশ মেয়ে জীবনে কখন আর সুস্থ সবল ও পরিপুষ্ট যৌবন লাভ করতে পারে না! তারা প্রায় চিররুগ্না হয়ে থাকে, নয় অকালে ইহলীলা সম্বরণ করে।

— সে তো চোখের উপরই দেখতে পাচ্ছি ভাই, কিন্তু উপায় কি বলো? আমাদের সমাজ যে সেটা মানতে চায় না? সে কারুর যুবতী কন্যা অনুচা আছে দেখলে তার নামে দুর্নাম রটায়।

— সে রকম মুঢ় সমাজের বিধি ব্যবস্থা না মানাই উচিত।

— না মেনেও যে উপায় নেই দাদা! মানুষ তো সমাজ ছাড়া জীব নয়! ছেলেমেয়ের বিয়ে দেবে সে কেমন করে?

— ছেলেমেয়ে তাদের সুশিক্ষা ও সদৃশের জোরে সমাজের বুকের উপর দিয়ে তাদের সত্য ও ন্যায়ের বিজয়-রথ চালিয়ে নিয়ে চলে যাবে— সমাজ বাধা হয়ে তাদের নতশিরে মেনে নেবে—

— তোমার কি সে সাহস আছে?

— নিশ্চয় আছে। আমি দেখাতে চাই যে আমরা সমাজের দাস নই—প্রভু!

— তোমার কথা শুনে মনে বেশ জোর পাচ্ছি, কিন্তু আমার অবস্থা যে অন্য রকম ভাই! সমাজ যে আমার ললাটে কলঙ্কিনীর ছাপ দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে—

কথাটা শুনে শিবু একটু চঞ্চল হ'য়ে উঠলো; উজ্জ্বলিত ভাবে বললে— কিন্তু, আপনি ত কলঙ্কিনী নন— কোন্ পাষণ্ড বলে? আমি তাদের কথা বিশ্বাস করিনে—

শিবুর কথা শুনে ও তার ভাবভঙ্গী দেখে ইলা এবার হেসে ফেললে— বললে— তোমার বিশ্বাস অবিশ্বাসের উপর তো সমাজের মত বদলাবে না শিবনাথ! কলঙ্কের অপবাদ একবার কানে এসে পৌছলেই হ'ল। লোকে আর বিচার করে তলিয়ে দেখে না যে সেটা সত্য কি মিথ্যা— সম্ভব কি অসম্ভব— সে অপবাদ তারা তৎক্ষণাৎ অবিসম্বাদী সত্য বলে চরম সিদ্ধান্ত করে ব'সে।

এই পর্যন্ত বলে ইলা চুপ করে রইল। অনেকক্ষণ আত্মস্থ হ'য়ে কি যেন ভাবলে। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে— আর লোকেদেরই বা দোষ কি? চিরদিন সর্বশাস্ত্রের মারফৎ তারা শিখে আসছে— স্ত্রীলোককে অবিশ্বাস করতে, ঘৃণা করতে। নারী নরকের দ্বার— নারী-চরিত্র দেবতারও দুর্জয়— ফ্রোডস্ট্র নারীকেও বিশ্বাস কোববে না কখন— এই-সব শিক্ষা ও সংস্কার নিয়েই তো এ দেশের ও এ সমাজের পুরুষেরা বড় হচ্ছে। সুতরাং তাদের কাছে নারী আর কি সুবিচার প্রত্যাশা ক'রতে পারে বলো?... তাই ত আমার মাঝে মাঝে ভয় হয় যে, হয়ত নীলাকে আমার সুখী ক'রতে পারবো না। আমি এই সমাজের অনায়াস বিধিকে অবজ্ঞা করছি, সে কি আমাকে তার শাস্তি না দিয়ে ছাড়বে? নিশ্চয় সে কাপুরুষের মতো আমার এই নিরপরাধ নির্দোষ বোনটির কল্যাণে বিরোধী হ'য়ে, আমাকে সাজা দেবে।

শিবনাথ অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বললে— নীলার জন্যে আপনি কিছুমাত্র ভাববেন না। কেউ যদি ওকে গ্রহণ কবতে না চায়— আমাকে জানাবেন—

—তোমাকে জানিয়ে কি লাভ? মিছে তোমার মনে কষ্ট দেওয়া বৈ' ত' নয়। তুমি ভাই, ওকে যেরকম ভালবাসো শুনিছি— তাতে নিশ্চয় ওর দুঃখের দুঃসংবাদ তোমার প্রাণে খুবই লাগবে।—

শিবু দু'একবার মাথাটা চুলকে নিয়ে বলে ফেললে— আমাকে যদি অযোগ্য প্রাণ বলে বিবেচনা না করেন, তাহলে—আমি নীলার পাণিগ্রহণ ক'রে ধন্য হ'তে পারি। '

ইলা এই কথাটাই তার মুখ থেকে এতক্ষণ শুনতে চাচ্ছিল। তবু সে উচ্চহাস্য ক'রে উঠে বললে— তুমি কি পাগল হ'য়েছো ভাই? তোমার হাতে যদি ওকে তুলে দিতে পারতুম— তাহ'লে—তার চেয়ে সুখের আর কি হ'তে পারতো বলো? কিন্তু তা যে হবার জো নেই

দাদা! নেলিকে মুশৌরীতে লেখা তোমার কবিত্বপূর্ণ চিঠিখানা পড়ে অবধি আমি সেটা অনেক ভেবে দেখেছি। সে হয় না,— তোমার দাদাই এ বিবাহের প্রধান বিরোধী হবেন,— তুমি কি আর তোমার দাদার অমতে বিবাহ করতে পারবে? আব পারলেও সেটা কি করা উচিত?

—অনুচিতই বা কিসে? তিনি আপনাদের সঠিক পবিচয় জানেন না— একটা ভুল ধারণা নিয়ে বসে আছেন। কিন্তু, আমি তো আপনাদের সমস্ত ইতিহাস জানি— তাছাড়া— আপনাদের এ মিথ্যা কলঙ্ক ও অপবাদ যদি সত্যও হ'তো, তাহ'লেও আমি নীলাকে গ্রহণ ক'রতে কিছুমাত্র দ্বিধা কবতুম না— যদি—

ইলা আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইলে— যদি কি?—

সলজ্জ বিনত মুখে শিবনাথ বললে— যদি জানতে পারতুম যে— আমাকে বিবাহ করলে নীলা নিজে সুখী হবে বলে মনে কবে—

একখানি জাপানি কাঠের রঙীন ট্রের উপর চক্চকে চীনে মাটির ফুলকাটা পিয়লায়— গরম চা এবং আর একখানি প্লেটে কিছু জলখাবার সাজিয়ে নিয়ে নীলা সে ঘরে ফিরে এলো— এবং শিবনাথের সামনে অঞ্জলি দেবার মতো দু'হাত বাড়িয়ে সেগুলি ধ'রে বললে— পানের খবর শুনিয়েছেন, একটু মিষ্টিমুখ করুন।

শিব বললে— সে হিসেবে আমার ওতে কোনও claim নেই, কেন না, খবরটা আসলে সুবোধবাবুই আগে দিয়েছিলেন, আমি শুধু গেজেটখানা দেখিয়েছি। তবে খেতে আমার কোনও আপত্তি নেই এইটুকু বলতে পারি। মিষ্টিমুখ ক'রতে আমি খুব মজবুত—

বলতে বলতে শিব এক হাতে চায়ের কাপটি এবং আর এক হাতে জলখাবারের প্লেটটা তুলে নিলে।

ইলা বললে— শুধু মিষ্টিমুখ করিয়ে ফাঁকি দিলে চলবে না, নেলি, শিবনাথকে তোমার মিষ্টি গলার একখানি গানও শুনিয়ে দিতে হবে—

নীলা লজ্জায় আবদ্ধ হ'য়ে উঠে বললে— আমি বুঝি গাইতে জানি?

শিব বললে— গান না শোনালে কিন্তু আমি জলস্পর্শ করছি— এই রইল তোমার চায়ের বাটি আর জলখাবার!

অগত্যা নীলা গিয়ে টেবল হারমোনিয়মটার ডালা খুলে ঘাড় বেকিয়ে তার বিলোল আঁখি মেলে শিবনাথের দিকে চেয়ে বলে ব'সলো—

— কিন্তু, আপনাকেও একটা গাইতে হবে।—

শিব বললে— আচ্ছা।

নীলা বললে— কাব গান শুনতে আপনাব ভাল লাগে বলুন—

শিব বললে— একটিমাত্র লোকেব— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নীলা হারমোনিয়মে সুব দিয়ে— গান ধরলে—

— আজি গন্ধ-বিধুর সমীরণে

কার সন্ধানে ফিরি বনে বনে?

আজি ক্ষুদ্র নীলাম্বর মাঝে

এ কি চঞ্চল ফ্রন্দন বাজে—

শিবনাথ গান শুনতে শুনতে এমনি তন্ময় হ'য়ে পড়লো— যে তার হাতের গরম চায়ের পেয়ালাটা ভুড়িয়ে জল হ'য়ে গেল!

ইলা শিবনাথকে এ বিষয়ে সচেতন ক'রে দিয়ে বললে— গান শোনা আর পান কবা একসঙ্গে কখন অভ্যাস না থাকলে এই অসুবিধে হয়।

শিবু অপ্রস্তুত হ'য়ে সেই ঠাণ্ডা চায়ের বাটিটাই ঢক্‌ঢক্‌ করে এক নিঃশ্বাসে শেষ ক'রে ফেলে হুলখাবারে মনোযোগ দিলে— এবং নীলাকে জিজ্ঞাসা করলে—

“সে কোন্ বনের হরিণ  
ছিল আমার মনে—”

এ গানটা জানো?

নীলার সুললিত কণ্ঠ সুমধুর তানলয়ে আবার বাঙ্কত হ'য়ে উঠলো! নীলার গান শেষ হবার পর দুই বোনের একান্ত পীড়াপীড়িতে শিবনাথ গাইলে—

—“আমার নয়ন ভুলানো এলে  
শিউলিতলার পাশে পাশে  
ঝরাফুলের রাশে রাশে  
শিশির ভেজা ঘাসে ঘাসে  
অরুণ রাঙা চরণ ফেলে!”

এমনি করে তিন চারখানা গান শুনে ও শুনিয়ে শিবু যখন বিদায় নিয়ে ফিরলো তখন বেলা বাবোটা বেজে গেছে।

ইলা আসবার সময় বিশেষ করে তাকে ব'লে দিলে— আজ রাত্রে এসে নৌলির পাশেব খাওয়া খেয়ে যাবে, তোমার নিমন্ত্রণ রইল আমার কাছে—

শিবনাথ প্রতিশ্রুতি দিয়ে এলো যে সে নিশ্চয় আসবে। যে গানের সুব কতদিন ওকে বাড়ী থেকে টেনে বার করে এনে পাশের বাড়ীর বারান্দাব চিকের দিকে চাইয়ে দাড়ি কাঁচিয়ে রাখতো— তার প্রত্যক্ষ উপভোগের লোভ কি সহজে ত্যাগ করা যায়! তাব উপর এই দু'টি মেয়ের এই অকুণ্ঠ ব্যবহাব, এই আন্তরিক যত্ন আদব।— এ যে শিবনাথের জীবনে এক নূতন আনন্দ-আস্থাদের অনুভূতি এনে দিলে!

নীলার দিদি ইলাকে শিবনাথ এই প্রথম দেখলে! যেমন সুন্দর দেখতে, তেমন সুন্দর কথাবার্তা, তেমন সুন্দর ব্যবহাব! কতই বা বয়স— পঁচিশ ছাব্বিশের বেশী নিশ্চয়ই নয় — শিবুর চেয়ে হয়ত, মাত্র দু'এক বছরের বড় হবে— কিন্তু মনে হয়— যেন স্নেহে সে তার স্বর্গগতা মায়ের মতো! কথা কয়ে মনে হ'লো— যেন সে কত বড়, আব তার সঙ্গে যেন কতদিনের পরিচয়!

এমন পবিত্র আনন্দ শিবু তার জীবনে আর কোনও দিন পায়নি। বেশ প্রফুল্ল চিত্তে ও প্রসন্ন মনে সে বাড়ীতে এসে ঢুকলো। সদরেই দাদা দাঁড়িয়ে ছিলেন— জিজ্ঞাসা করলেন— এত বেলা পর্যন্ত কোথায় ছিলি?—

গম্ভীর ভাবে— ‘পাশের বাড়ীতে’ বলে শিবনাথ ভিতরে চলে গেল।

ভোলানাথ ভায়ার উত্তর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। বুঝলেন ছোকরা বিগড়েছে— নইলে এতবড় স্পর্ধা— এতখানি সাহস সে কোথায় পেলে?

শীঘ্রই যে একটা কড়া-রকম কিছু বিহিত করা চাই, ভোলানাথ এ বিষয়ে একেবারে দৃঢ়সঙ্কল্প হ'য়ে উঠলেন।

\* \* \*

বিকেলের দিকে শিবনাথ তার নিমন্ত্রণের কথা বৌদিকে জানানতে, বৌদি, জিজ্ঞাসা ক'রলেন— কোথা গো?

— অনেক দূর!

— তবু! আমরা কি শুনতে পাইনি!

— দাদাকে বলবে না বলো?

— এমন কোনও প্রতিশ্রুতি আমি দিতে পারবো না, ঠাকুরপো!

শিবনাথ একটু ভেবে বললে— আমাদের পাশের বাড়ীতেই আজ আমার নিমন্ত্রণ হয়েছে!— নীলা ‘পাশ’ হ’য়েছে— তাই তার দিদি আজ আমাকে খাওয়াবেন।

বৌদির ‘মুখের হাসি’ মিলিয়ে গেল। তিনি বললেন— ঠাকুরপো, ওদের বাড়ী আর যেও না। ওই রকম একটি গাইয়ে বাজিয়ে দেখে সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে উনি তোমার বিয়ে দেবেন ঠিক ক’বেছেন—! আজ সকালে নাকি তার অবাধা হ’য়ে তুমি পাশের বাড়িতে গিয়েছিলে, তাই উনি বড্ড রাগ করেছিলেন— শুনিছি ও বাড়ীর মেয়েরা না কি ভালো নয়!

— ভুল শুনেছো বৌদি, ওরা খুব ভালো—

— না ভাই, পুরুষমানুষদের মন ভোলাবার জন্য ওরা ওই-রকম ভালো সেজে থাকে— তাবপর তার যথাসর্বস্ব ভোগা দিয়ে নিয়ে তাকে পথেব ভিখারী ক’বে ছেড়ে দেয়—

-- আঃ! কি বলছো বৌদি! ওরা বিশিষ্ট ভদ্রলোকের মেয়ে!

— না— বিশ্বাস কোরনা ভাই, ওরা ওই-রকম ভদ্রলোকের মেয়ে সেজে থাকে। তুমি যেও না ঠাকুরপো, তোমার যথাসর্বস্ব কেড়ে নেবে—

শিবু বললে— সেইটেই তো আজ আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ বৌদি যে, ওদের দেবার মতো আজ আমার কিছু নেই। আমার যদি কিছু থাকতো, তাহলে ওদের কেড়ে নিতে হ’তো না, আমি নিজেই উপযাচক হ’য়ে আমার যথাসর্বস্ব ওদের বিলিয়ে দিতুম!

দুই চোখ কপালে তুলে বৌদি বললেন— তবে তো তোমার দাদা ঠিকই বলেছেন, ওরা তোমায় গের্গে ফেলেছে।

— পরকে আত্মীয় কবে নেওয়া— এর মানে যদি তোমাদের শাস্ত্রে ‘গের্গে-ফেলা’ বলে, তাহলে তোমাদের অনুমান মিথ্যে নয় বৌদি!

—ওই যে ছেনাল ছুঁড়ীটা রোজ ইস্কুলে যাবার সময় তোমায় ইসারা ক’রে ডাকতো— সেইটের সঙ্গেই বুঝি তোমার একটু নটশট হয়েছে?—

— ছিঃ ছিঃ— বৌদি, তোমরা ভদ্রবরের মেয়ে হ’য়ে এ-সব কি ভাষা ব্যবহার ক’রছে বালো তো— তোমাদের মুখে একটু বাধে না?

—আহা, রাগ করো কেন ঠাকুরপো! আমি তো আর তোমার ‘সুইটহার্টকে’ কোনও গাল দিইনি ভাই, অল্পবয়সী মেয়েদেব আমাদের মা-ঠাকুমা-আমল থেকেই ‘ছুড়ী’ বলা হয়, ওটা কিছু মন্দ কথা নয়।

— কিন্তু, তুমি তো বৌদি মা-ঠাকুমার আমলের মেয়ে নও— তুমি লেখাপড়া শিখেছো, ইংরিজি জানো, তোমার কি ওসব বর্বর যুগের ভাষা আর ব্যবহার করা উচিত?

— বর্বর যুগের ভাষা কি বলছো ঠাকুরপো! ইংরিজিতে তোমরা যাকে বলি girlie— আমাদের ‘ছুড়ী’ হ’চ্ছে অনেকটা তাই। তবু আমরা কুড়ি পেরুলে আর কাউকে ও নামে অভিহিত করিনি। কিন্তু ও-দেশে জানো তো চম্পশেও girlie!—

কিন্তু ওই আর একটা কথা?

শিবুর বৌদি হেসে উঠে বললে— ‘ছেনাল’ কথাটায় তোমার আপত্তি হ’চ্ছে ঠাকুরপো?— কিন্তু ইংরিজিতে যদি Coquette বলতুম, তাহলে কি তুমি আপত্তি ক’রতে?

শিবু বললে— সে তো Coquette নয়! তা ছাড়া বাংলায় ও কথাগুলো বড় বিশী শোনায়, — তুমি আর ব্যবহার কোরো না—

বৌদি বললেন— আচ্ছা, সে না হয় হোলো; কিন্তু তোমার দাদা বলেছেন, কাল তোমাকে একজনরা দেখতে আসবেন,— তুমি সকালে বাড়ী থেকে বেরিও না যেন—

শিবনাথের মুখ এবার আরও গম্ভীর হয়ে গেল, বললে— দাদা কি আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা না করেই আমার বিয়ে দিতে চান না কি? দাদাকে বোলো আমি এম-এ পাশ না ক'রে বিয়ে করবো না।

—তা বেশ তো, এখন দেখাশুনো এবং আশীর্বাদ-পত্র সব হয়ে থাক। তার পর এম-এ পাশের খবর বেরুলে না হয় চার হাত এক হবে— এখন ওটা মুলতুবী থাক। আর এম-এ পরীক্ষারও তো বেশী দিন দেবী নেই, সেদিন তো বলছিলে— আসছে মাসেব গোড়াতেই শুরু হবে।

শিবু একটু উত্তেজিত হ'য়ে বললে— না না— দাদাকে বোলো— আমি বিয়ে করবো না— আর যদি কখনও করি, তাহ'লে—ওই পাশের বাড়ীর মেয়েটিকেই বিয়ে করবো— এই কথা বলেই পলক না ফেলতে শিবনাথ বাড়ী থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

\* \* \*

শিবনাথ একেবারে নীলাদের ওখানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে বাড়ী ফিরলো যখন, তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারোটা। ভোলানাথ ঘুমিয়েছে। শঙ্কু বাইরের ঘরে শুয়েছিল। তাকে শিবনাথ জানলা দিয়ে চাপা গলায় আস্তে আস্তে অনেকবার ডাকলে, কিন্তু শঙ্কুর ঘুম ভাঙল না। দরজা খুলে দিলে একটা হারিকেন লণ্টন হাতে তার বৌদি এসে।

শিবনাথ ঢুকতেই, বৌদি বললে— বাকী রাতটুকুও তো ও বাড়ীতে থেকে এলেই পাবতে ঠাকুরপো! নিমন্ত্রণ কি এতক্ষণ ধরে খাচ্ছিলে? কী এতো হাতী-ঘোড়া খাওয়ালে শুনি?

—অপরায়ী মতো নিম্নস্বরে শিবনাথ বললে— খাওয়ার জন্য দেবী হয়নি বৌদি, দেবী হয়ে গেল আজ ওদের সুবোধবাবুর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে!— বড় ভালো লোক!

— হ্যাঁ, তোমার কাছে তো এখন ওদেব বাড়ীর বিড়ালটা কুকুবটা পর্যন্ত ভাল লাগবেই! কিন্তু— তোমার দাদা যে এদিকে কোনও কথা শুনবেন না বললেন! জোর কবে তোমাব বিয়ে দেবেন ব'লে কৃতসঙ্কল্প হয়েছেন।

—এই দেখো বৌদি— আমাদের অভিভাবকদের কতবড় অনায়াস!— বিয়ে যে করবে তার মতামতের যেন কিছুই প্রয়োজন নেই। নিজেদের খেয়াল মতো যেখানে হোক দিয়ে দিলেই হ'লো? এই জন্যে কত যে জীবন এ দেশে অসুখী হ'য়ে যাচ্ছে, তাব কোনও হিসেব রাখো কি?

— না ভাই, রাতদুপুরে আমাব আর অত হিসেব নিকেশের সময় নেই। আমরা হিঁদুর মেয়ে, বাপ-মা, গুরুজন, এঁরা যার হাতে মন্ত্র পড়ে সঁপে দেন, তাকেই আমরা মনে মনে ইষ্টদেবতা বলে বরণ করে নিই। স্বামী যদি ভালবাসেন— ভাগ্য বলে মানি, যদি অবহেলা করেন— অদৃষ্টের দোষ দিয়ে মুখ বুজে সারা জীবন শুধু নিজেদের কর্তব্যটুকু করে যাই।

শিবনাথ একটু উত্তেজিত হয়ে উঠে বললে— তার কারণ কি জানো বৌদি? ছেলেবেলা থেকে তোমাদের শেখানো হয়েছে যে— মেয়েমানুষ হ'য়ে যখন জন্মেছে তখন তোমার নিজের আর স্বাধীন ইচ্ছে বলে কিছু থাকতে পারে না!— তোমরা মেয়েমানুষ— ঙগতের অতি হয়ে জীব! পুরুষের ক্রীতদাসী হবার ভরনাই তোমাদের জন্ম। ছোটো বেলায় খেলনা-পুতুল বা খাবার-দাবার নিয়ে যখন ভায়েদের সঙ্গে সমান ভাগের দাবী ক'রতে —তখন থেকেই তোমাদের বলে দেওয়া হ'য়েছে যে— মেয়েমানুষের কিছু চাইতে নেই, নিষ্ঠুর নেই, খেতে নেই, ছুঁতে নেই। তাদের দয়া করে যা' দেওয়া হবে, তাই তাদের যথেষ্ট বলে মেনে নিতে হবে। আজন্ম এইসব শুন শুন, আর এই রকম ভাবে প্রতিপালিত হয়ে, তোমরা তোমাদের স্বাধীন সম্রাটুকু হারিয়ে ফেলেছো! যে নিষ্ঠুর— যে দুষ্টচিত্র— যে বাড়িচারী—



ঘটনাচক্রে সে যদি তোমাদের স্বামী হয়,— তোমরা অমনি তাকে দেবতার সম্মান দিয়ে বিশ্বদেবতার অপমান ক'রতে একটুও ইতস্তত করো না—

—রক্ষা করো ঠাকুরপো, তোমাব বড়তা থামাও। এত রাত্রে বাড়ী একেবারে গোলদীঘি করে তুললে দেখছি! তোমার সার কথা আমি বুঝতে পেরেছি— তুমি ওই মেয়েটাকেই বিয়ে করতে চাও।—

— নিশ্চয়!

— তাহ'লে তোমায় একটা কথা বলে রাখি ভাই, রাগ কোবো না, আমি ভদ্রবরের মেয়ে— ভদ্র পরিবারের কুলবধু, আমি আমার বাড়ীর অস্ত্রপুরে ওসব মেয়েদের ঢুকতে দিতে পারবো না।

— সে তোমার অভিরুচি বৌদি, কিন্তু এটা জেনে রেখো যে— সে মেয়েটিও ভদ্রবংশের কন্যা এবং স্ত্রীও হবে সে ভদ্রলোকেরই।

— বেশ, তোমার দাদাকে এ সব কথাই জানাবো। শুধু আমার একটি কথা তুমি মনে রেখো ঠাকুরপো, যে, এক অজ্ঞাতকুলশীলা, কলঙ্কের ছাপমারা, কুলটার কুহকে মুঞ্চ হয়ে যেন জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল কোরে বোসো না!

— তোমার এ উপদেশ বাছল্য মাত্র। আমি ওদের খুব ভাল ক'রেই জেনেছি বৌদি! তুমি একে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে বটে, কিন্তু, আজ যদি আমার মা বেঁচে থাকতেন, তাহলে তিনি তাঁর সন্তানের মনোনীত পুত্রবধূকে কখনই প্রত্যাখ্যান করতেন না— এ আমি নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি।

— মা থাকলে আজ কি করতেন না করতেন, সে আমি ঠিক বলতে পারিনি। পুত্র স্নেহের বশে হয়ত তুমি যা বলছো তিনি তা ক'রতে পারতেন, কিন্তু তাঁর অবর্তমানে আমাকে যখন এ গৃহের শুভাশুভের ভার নিতে হয়েছে, আমি তখন নিজের শিক্ষা, দীক্ষা, ধর্ম ও বিবেক এবং কর্তব্য-বুদ্ধি অনুসারে তাঁদের এ শুদ্ধাস্ত্রপুরের বিগুহতা রক্ষার জন্য, এ সংসারের কল্যাণ ও এ পরিবারের মঙ্গল বিধানের জন্য— যা করা উচিত ও প্রয়োজন বলে মনে করবো, তা যতই কঠোর ও অপ্রিয় হোক— পাষণে বুক বেঁধে আমাকে তা ক'রতেই হবে। যদি এতে তুমি তোমার প্রতি আমার স্নেহের অভাব বোধ করো— আমি নিরুপায়! কিন্তু, ঈশ্বর জানবেন ঠাকুরপো, যে কী বেদনার অন্তর্দাহ নিয়ে আমাকে সে কাজ করতে হবে!

শিবনাথ আর কোনও কথা না বলে শুতে চলে গেল—

\* \* \*

সকালে খেতে বসে ভোলানাথ শিবুকে বললে— তোমার বৌদির কাছে সব কথা শুনলুম। এ-রকমটা যে হবে তা আমি পূর্বেই আশঙ্কা করিছিলুম, তাই সময় থাকতে তোমায় পাশের বাড়ীর সংস্রবে থাকতে বিশেষ ক'বে নিষেধ করিছিলুম। কিন্তু তুমি আমার অবাধ্য হয়ে গোপনে ও-বাড়ীতে যাতায়াত রেখেছিলে, এমন কি, কাল নাকি ওদের বাড়ীতে রাত্রে নিমন্ত্রণ খেয়ে এসেছো। যাক্, সে যা করবার করেছো, এখন বড় হ'য়েছো, লেখাপড়া শিখেছো, মনে করেছিলুম মানুষ হয়ে উঠবে। অল্প বয়সে বাবা মারা গেছিলেন, আঠারো বছরের ছেলে আমি, আমার ঘাড়ে সমস্ত সংসারের ভার এসে পড়েছিল। ইচ্ছে থাকলেও বেশী কিছু লেখাপড়া শেখবার সুযোগ পাইনি, তাই নিজে না-খেয়ে-না-পরে তোমাদের ভাল ক'রে কলেজে পড়িয়েছি, কিন্তু, এখন বুঝতে পারছি— ভুল করছি। পাশ্চাত্য শিক্ষার দোষে তোমরা নিজেদের ধর্ম ও সমাজকে হেয়জ্ঞান ক'রতে শিখেছো, পূর্বপুরুষদের কৃত

বিধি-নিষেধগুলোকে বর্বরতা আখ্যা দিয়ে অমান্য করে চলো— কিন্তু, আমি মূর্থ মানুষ— আমি আমার বংশের পুরুষ-পরম্পরার ধারা— আমার পিতৃপিতামহদের নির্দেশিত বিধিব্যবস্থালিকে অস্বীকার করে চলতে পারবো না। তুমি যে কন্যাকে বিবাহ করবে ব'লে কৃতসঙ্কল্প হ'য়েছো, তাকে আমি এ গৃহে স্থান দিতে অক্ষম জানবে। তুমি যদি আমার অমতেও কোনও জানিত ভদ্রপরিবারের মেয়েকে বিবাহ ক'রে আনতে, তাহলেও আমি তোমার পত্নীকে আমার পরিবার-ভুক্ত করে নিতে কিছুমাত্র আপত্তি করতুম না, কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমি তোমার বদখেয়ালীর পোষকতা করে সমাজদ্রোহী হ'তে পারবো না, কারণ, আমার অনেকগুলি পুত্র-কন্যা রয়েছে, তাদের ভবিষ্যৎ অঙ্ককার করে দেওয়া, তাদের প্রতি অবিচার করা পিতার কর্তব্য নয়। সুতরাং তুমি যদি ওইখানে বিবাহ করাই একবারে স্থির সিদ্ধান্ত ক'রে থাকো, তাহলে আগে আত্মনির্ভরতা শেখো এবং পত্নীকে নিয়ে পৃথক থাকবার জন্য প্রস্তুত হও। কারণ, এ বাড়ী আমার স্বকৃত উপার্জনে প্রস্তুত হ'লেও, এর মালিক তোমার বৌদিদি। তার ইচ্ছে নয় যে ওরূপ কোনও স্ত্রীলোক তুমি এ বাড়ীতে এনে রাখো। বুঝলে?—

শিবনাথ কোনও কথা না ব'লে নিঃশব্দে আহার করছিলেন, শেষকালে শুধু একটি জবাব দিলে— যে আজে।

\* \* \*

এম-এ পরীক্ষা হয়ে যাবার পর শিবু যেদিন আবার নীলাদের বাড়ী বেড়াতে গেল— ইলা এসে কুশল প্রশ্ন ক'রে বললে— ইস্! একজামিনের পড়া পড়ে পড়ে ভায়া আমার রোগা হ'য়ে গেছে দেখছি।

শিবু বললে— হ্যাঁ, বড্ড খাটুনী গেছে— আপনাদের সব খবর কি বলুন।

— আর আমাদের খবর! তোমাদের পাড়া এইবার আমাদের ছাড়তে হচ্ছে শিবু! বাড়ীওয়ালা আমাদের আর রাখবেন না বলে নোটিশ দিয়েছেন। আর পাড়ার লোকেরা না কি আমাদের অভ্যাসে ব্যতিবাস্ত হয়ে, সবাই একসঙ্গে সই করে পুলিশ কমিশনারের কাছে এক লম্বা দরখাস্ত করেছে— যে, আমরা এ পাড়ার একটা Public Nuisance হয়ে উঠেছি। পুলিশের লোক সেদিন এসে enquiry ক'রে গেল। তোমার দাদাই না কি এসবের উদ্যোগী আর প্রধান পাণ্ডা শুনলুম। পুলিশের লোকের কাছে তিনিই সবার চেয়ে জোর সাক্ষা দিয়েছেন আমাদের বিরুদ্ধে!

শিবু বললে— কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়! কাবণ, আমরা পরীক্ষার কিছুদিন পূর্বে দাদা এক দিন আমাকে ডেকে স্পষ্টই বলে দিয়েছেন— পৃথক হয়ে যাবার জন্য। ও-বাড়ীতে আর আমার স্থান হবে না। অপরাধ— আমি এখানে আসি!

শিবুর মুখে সমস্ত ব্যাপার শুনে ইলা জিজ্ঞাসা করলে— তুমি তাহলে এখন কি করবে মনে ক'বছো?

শিবু বললে— সেদিন তো তোমায় বলেছি দিদি, সমস্তই নির্ভর করছে নীলার উপর। সে যদি এই গৃহহারা— বিস্ত্রীণ—নিঃস্ব—দরিদ্রকে বরমালা দিতে প্রস্তুত থাকে, তাহলে আমি বিশ্বে অবিচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে একটুও দ্বিধা বোধ করবো না—

— পারবে কি ভাই? বড় শক্ত! দেখতে পাচ্ছ তো চোখের উপর আমি একজন ভুক্তভোগী!

শিবু বলতে যাচ্ছিল— আপনার পায়ের ধুলো আর আশীর্বাদ মাথায় করে নিয়ে— এমন সময় নীলা সেদিকে আসছে দেখে সে চূপ করে গেল।

নীলা এসে বললে— এই যে, আপনি কখন এসেছেন চুপি চুপি। বেশ মজার লোক তো— সেদিন বলে পাঠালেন— হ্যাঁ আমার সঙ্গে বায়োকেপে যাবেন, অথচ এলেন না,

আর আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা ক'রে বসে রইলুম কতক্ষণ; শেষে কাপড়চোপড় সব খুলে ফেললুম। আপনিও গেলেন না, আমাকেও যেতে দিলেন না! আর আপনাকে নিয়ে আমি কোথাও যাবো না!

ইলা হাসতে হাসতে বললে— কি ক'রে শিবনাথ বাবু আসবে বল— ও যে এখন বিয়ের ভাবনায় অস্থির হয়ে পড়েছে।

কথাটা শুনে নীলার মুখখানি হঠাৎ একটু যেন বিবর্ণ হ'য়ে গেল, তবু তারই মধ্যে একটু কৰুণ হাসি ফুটিয়ে বললে— তাই না কি? আমাদের নিমন্ত্রণ করবেন তো? দেখবেন লুচিটা ফাঁকি দেবেন না—

ইলা বললে— তোমাকে তো এ বিয়েতে ও শুধু লুচি খাবার নিমন্ত্রণ করতে আসেনি, তোমাকেই গিয়ে যে শিবুর ক'নে হ'তে হবে, সে নিমন্ত্রণটাও তুমি নেবে কি?

নীলা লজ্জায় রাঙা হ'য়ে উঠলো, কোনও উদ্ভবই দিতে পারলে না, ঘাড়টি হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

ইলা শিবনাথকে বললে— তোমরা তাহ'লে দু'জনে বোঝাপড়া করো ভাই, আমার অনেক কাজ আছে, আমি চললুম।

\* \* \*

সেদিন তাদের দু'জনে কি কথা হ'য়েছিল তা কেবল তারা দু'জনে ছাড়া আর কেউ জানে না। কিন্তু তারই কিছুদিন পরে শিবনাথ হঠাৎ এক দিন বাড়ী থেকে নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেল। যাবার আগে সে তার ঘরে দাদার নামে একখানা চিঠি লিখে রেখে গেছিল।

ভোলানাথ সেই চিঠিখানা স্ত্রীকে প'ড়ে শোনাতে লাগল—

শ্রীচরণেশ্ব—

দাদা, আমি কৃষ্ণনগরের উকীল অনুকূলচন্দ্র রায়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী নীলা রায়কে গাম্ভীর্যে বিবাহ করেছি। আপনাদের মত ছিল না বলে— আপনাদের জানাইনি। আপনি আমার জন্যে চিন্তিত হবেন না, আমি রেসুন কলেজে একটা প্রফেসারী পেয়ে সস্ত্রীক সেখানে চললুম। প্রণাম জানবেন ও বৌদিব চরণে জানাবেন! শজুকে আমার স্নেহাশিস দিবেন। ইতি—

প্রণতঃ

শিবু

পত্র শুনে ভোলানাথ'র পত্নী বলে উঠলেন—ওমা! কৃষ্ণনগরের উকীল অনুকূল রায় যে মা'র পিস্ততো ভাই হ'তেন! তিনি যে আমাদের মামা। ও! ঠিক, ঠিক— বটেই ত! তার দুই মেয়ে ছিল পবনা সুন্দরী, বড়টি অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিল, কিন্তু মামাবাবু মারা যাবার আগে তার আবার বিয়ে দিয়ে যান। ও হরি! সেই 'এলি' নেলি' কি আমাদের পাশে এতদিন ভাড়া ছিল! ওমা তা কে জানে? ছিছি— কি লজ্জা! যাই আমি ওদের সঙ্গে গিয়ে দেখাওনো করে আসি। ঠাকুরপো 'নীলা-নীলা'— 'ইলা-ইলা' করতো বটে— তখন কে জানে ছাই যে সে আমাদের 'এলি-নে'লি'! ওই 'এলিকে' বিধবা ভেনেও বিয়ে করে নিয়ে গেল এক মস্ত বড়-লোক— এটর্নি স'বাধ বাঁড়ুয়ো! অবশ্য সেও দোস্তপক্ষের, কিন্তু শুনেছি তার বয়স বেশী নয়, দেখতেও কার্তিকের মতো, স্বভাব চরিত্রও ভাল। কিন্তু, প্রথম পক্ষের একটি ছেলে আর একটি মেয়ে আছে বলে 'এলি'কে বিয়ে করে বাড়ীতে এনে রাখেনি। ওদের না কি বড় কড়া সমাজ, পাছে এর পর ছেলেমেয়ের বিয়ে দিতে কষ্ট হয় বলে এলিকে নিয়ে আলদা বাড়ীভাড়া করে রেখেছে। কে জানে সে আমাদের পাশেই এয়েছে। যাই, দেখাওনো ক'রে আসি— কতদিন তাদের দেখিনি!

পত্নীকে পাশের বাড়ীতে যেতে উদাত দেখে ভোলানাথ গম্ভীরভাবে বললেন,— আমি তাদের নামে অপবাদ দিয়ে— পুলিশের সাহায্যে ওদ্রলোকের পাড়া থেকে তাদের তুলে দিয়েছি,— পাশের বাড়ীতে তাবা আব নেই—

## গরীব

### প্রেমাস্কুর আতর্ষী

লক্ষ্মণ জাতে মুচী, কিন্তু সে জাত-ব্যবসা করতো না। তেরো চৌদ্দ বছর বয়সে যখন তার বাপ মারা যায়, তখন সে পাঠশালে পড়ছিল। গাঁয়ের ভদ্রলোক মুকুন্দবীরা লক্ষ্মণের বাপ মুকুন্দকে প্রায়ই বলতো—মুচীর ছেলের আবার পাঠশালা কেন রে? জাত ব্যবসা শিখিয়ে নিজের কাজে লাগিয়ে দে।

ছেলেকে পাঠশালে দেওয়ার জন্য মুকুন্দ গাঁয়ের লোকদের কাছে প্রায়ই খোঁচা খেতো বলে তার মনের মধ্যে একটা জায়গা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল, এইখানে আঘাত লাগলেই সে সঙ্কুচিত হয়ে বলে ফেলতো—এইবার—এই কটা দিন গেলেই ছেলেকে কাজে লাগিয়ে দেবো।

মুচী হয়ে ছেলেকে লেখাপড়া শেখাবার এত আগ্রহ দেখে তার স্বজাতি ও গ্রামের অন্য লোকেরা বিরক্ত তো হতোই, বিস্মিতও বড় কম হতো না।

মুচীর ছেলে হোলেও অতি শৈশব থেকেই পড়াশুনা করার দিকে লক্ষ্মণের বিশেষ ঝোঁক ছিল। গাঁয়ের ছোট-ছোট ছেলেরা যখন তল্লা বগলে নিয়ে পাঠশালার গল্প করতে কবতে তাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে চলে যেতো, তখন লক্ষ্মণ তার মার কাছে গিয়ে আন্কার ধরতো—মা আমায় পাঠশালে নিয়ে চল।

বালকের আগ্রহ দেখে মুকুন্দ গ্রামের গুরুমশায় রঘুনাথ চাটুয্যের কাছে গিয়ে ধন্য দিয়ে পড়লো! তার ভয় ছিল যে, গুরুমশায় হয়তো মুচীর ছেলেকে তাঁর পাঠশালে নেবেন না। কিন্তু তিনি আগ্রহের সঙ্গে তার ছেলেকে নিতে রাজী হওয়ায় একদিন মুকুন্দ শিশু লক্ষ্মণের হাত ধরে পাঠশালায় দিয়ে এল।

রঘুনাথ চাটুয্যের তিন কুলে কেউ ছিল না। তাঁর কয়েক ঘর প্রজা ছিল, তারাই দয়া কোরে যা দিত তাই দিয়ে তাঁর গ্রাসাচ্ছাদন চলতো। ছেলে পড়ানো রঘুনাথের এক বাতিক ছিল। কবে থেকে যে তিনি এই কাজ করছেন তার সাক্ষী দেবার লোক গ্রামের মধ্যে ছিল না বন্ধেও চলে। এখনকার পিতামহ-সম্প্রদায়ের অনেকেই তাঁর ছাত্র। রঘুনাথ গ্রামের কারো সঙ্গে মিশতেন না। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি ছেলে পড়িয়ে তারপর নিজে হাতে রোঁধে খেয়ে অনেক রাত্রি অবধি পড়াশুনা কোরে তিনি শুয়ে পড়তেন। বহু দিন থেকে এই নিয়মই চলে আসছে। গ্রামের মধ্যে বাস কোরেও তিনি গ্রাম-ছাড়া গোছের লোক ছিলেন।

লক্ষ্মণ পাঠশালায় ভর্তি হওয়া মাত্র গ্রামের ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা সৌরগোল পড়ে গেল। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, বেনে, সোনার বেনে সকলের মুখেই এক কথা—এঁা! বল কি হে, মুচীর ছেলে পাঠশালায়!

গ্রামের কয়েক ঘর নমঃশূদ্র দু-পুরুষ থেকে লেখাপড়া শিখে ভদ্রলোকের পৈতৃক উঠেছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মোটা মাইনের সরকারী চাকরী কোরে দু-পয়সার সংস্থানও করেছে। মুচীর ছেলে পড়তে সুরু করেছে শুনে তারাও বিস্মিত হয়ে গেল—তাই তো বল কি হে?

গ্রামের মুন্সব্বীরা রঘুনাথকে গিয়ে বন্ধে—চাটুয্যে মশায় এটা কি ভালো হলো? বামুন, কায়েতের ছেলের সঙ্গে মুচীর ছেলে একসঙ্গে বসে পড়বে! রঘুনাথ হেসে বলেন— তাতে দোষটা কি হয়েছে। রঘুনাথের উত্তর শুনে আশ্চর্য হোয়ে তারা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলো যেন দোষটা অন্যের মুখের ওপর লেখা আছে। মুখ দেখাদেখির পালা সাঙ্গ হোলে হরিহর ভট্টাচার্য এগিয়ে এসে বন্ধে— তা হোলে আমাদের ছেলেদের আর এখানে রাখা চলে না।

হরিহরের কথা শুনে মুন্সব্বীদের মুখে একটা প্রসন্নতার হাসি ফুটে উঠলো, ভাগ্যে হরিহর সঙ্গে এসেছিল।

হরিহরের কথা শুনে রঘুনাথ কিছুক্ষণ শুন্ম হোয়ে বসে রইলেন। তার পরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিনি বলেন— সে তোমাদের অভিরুচি। ছেলে-পড়ানোর জন্য আমি কারো কাছ থেকে একটি কপর্দকও গ্রহণ করি না। মুকুন্দর ছেলের বুদ্ধি তোমাদের কারো ছেলের চেয়ে কম নয়, আর কমই হোক কি বেশীই হোক, আমার কাছে সে যখন পড়তে এসেছে তখন আমি তাকে শিক্ষা দেবোই। এতে যদি আমার এখানে ছেলে পাঠাতে কারো আপত্তি থাকে সে যেন না পাঠায়।

মুন্সব্বীবা আব বাক্য-বায় না কোরে ফিরে এলেন, তাঁদের ছেলেরাও পাঠশালাে যেতে লাগলো, কিন্তু কিছুদিনেব মধ্যেই গ্রামময় রাষ্ট্র হোয়ে গেল যে, লক্ষ্মণ মুচিনীর গর্ভে জন্মালে কি হবে, ও মুচীর ছেলে কখনই নয়। মুচীর ছেলের কখন অত বুদ্ধি হয়!

বাপের মৃত্যুতে লক্ষ্মণ দুনিয়া অন্ধকাব দেখলে। একে সে জাত-বাবসা শেখেনি, বাপের এমন সংস্থানও নেই যে, দু দিন বসে খাওয়া চলবে। মুকুন্দর কয়েক বিধে জন্মি ছিল, জাত-বাবসা ছাড়া সে ভাগে চাষও করতো। বাপের মৃত্যুতে লক্ষ্মণ নিজে চাষ-বাস সুরু করলে। সেই অল্পবয়সে সহায়হীন হোয়েও দুখে সুখে সে নিজের সংসার এক রকমে চালিয়ে নিয়ে চলেছিল, কাবো কাছে হাত পাততে হয় নি।

বাপের মৃত্যুতে পাঠশালায় যাওয়া বন্ধ করতে হোলেও লেখাপড়ার চর্চা লক্ষ্মণ কোনো দিনই ছাড়ি নি। অবসর পেলেই সে তার ওকমশায়ের কাছে গিয়ে বসতো, তাঁর কাছ থেকে নানা বিষয়ের বই নিয়ে এসে বাড়ীতে পড়তো, কোনো জায়গায় বুঝতে না পারলে রঘুনাথকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতো। রঘুনাথ কলকাতা থেকে খানকয়েক দৈনিক কাগজ আনাতেন, ইদানীং চোখের জ্যোতি কমে আসায় তিনি রাত্রে আর পড়তে পারতেন না। লক্ষ্মণ রোজ সন্ধ্যাবেলা ওরুর বাড়ী গিয়ে তাঁকে কাগজগুলো পড়ে শুনিয়ে আসতো। এই দুটি ওক আর শিষ্যে, ব্রাহ্মণ আর মুচীতে এমন একটা বাঁধন কোথায় লেগে গিয়েছিল যেটা কোনও দিনই ছেঁড়ে নি কিংবা আল্গা হয় নি। রঘুনাথের মৃত্যুর দিন পর্যন্ত লক্ষ্মণ সমান ভাবে তাঁর সেবা করেছিল।

গ্রামে আরও কয়েক ঘর মুচী ও হাড়ির বাস ছিল। এরা জাত-বাবসা ছাড়া সকলেই চাষ-বাস করতো। লক্ষ্মণ ছিল এদের মুন্সব্বী। কোনো বিপদে পড়লে অথবা কোনো কাজের জন্য পরামর্শ করতে হোলে আগে তারা গ্রামের ভদ্রলোকদের শরণাপন্ন হোতো, কিন্তু লক্ষ্মণ মাতব্বর হোয়ে ওঠাব পর এরা পরামর্শের জন্য তার কাছেই যেতো এবং লক্ষ্মণ তাদের জাত হোয়ে তাদের মধ্যে থেকেই এমন যে একজন লায়েক হোয়ে উঠেছে সে জন্য মনে মনে গর্বও অনুভব করতো।

উপরি-উপরি দু-বছর অজন্মা হওয়ার পর খাজনা আদায়ের আগে জমিদারের নায়েব যখন বলে দিলেন যে, জমিদারের ছেলের বিয়ের জন্য এবার চার আনা কোরে মাথট দিতে

হবে, তখন লক্ষ্মণের অনুগতরা এসে তাকে ধরে পড়লো— দাদা বাঁচাও, তুমি নায়েব মশায়কে বলে এ-বছরের খাজনাটা আমাদের রেহাই করিয়ে দাও।

অজন্মা হওয়া সত্ত্বেও লক্ষ্মণ জমিদারের খাজনাটা কোনো রকমে যোগাড় কোরে রেখেছিল। কিন্তু তার জাত-ভায়েরা বলে— তুমি যদি খাজনা দাও তা হোলে আমাদের ওপর অত্যাচার হবে, নায়েব আমাদের জ্যেত বেচে খাজনা আদায় করবে। তুমি আমাদের মুরুব্বী হোয়ে নায়েবকে গিয়ে বল।

ক-দিন ধরে পঞ্চায়েত বসবার পর একদিন বিকেলে লক্ষ্মণ নায়েবের সঙ্গে দেখা করবার জন্য-জমিদারী-কাছারীতে গিয়ে উপস্থিত হোলো। নায়েব তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন— সংবাদ কি বাপু?

— আক্ষেপে নায়েব মশয়, দু-বছর উপরি-উপরি অজন্মা গিয়েছে, এবাবও ফসল ভাল হয়-নি। আপনি সবই তো জানেন? এবারে আমাদের খাজনাটা রেহাই দিতে আজ্ঞা হোক।

নায়েব বলেন— হাসালে যে! ওদিকে জমিদার তাগাদা দিচ্ছেন খাজনার টাকা পাঠাও, মাথটের টাকা পাঠাও, আর এদিকে তোমরা বলছো খাজনা রেহাই দাও! ও সব হবে না, খাজনা যার যার দিয়ে যেতে বোলো। হাসামা কোরো না, হাসামা কবলে আমাদের সঙ্গে পেরে উঠবে না।

— আক্ষেপে টাকা না থাকলে কোথা থেকে খাজনা দেবো? পেটে খেয়ে তবে তো জমিদারের খাজনা—

লক্ষ্মণের কথা খামিয়ে দিয়ে নায়েব একটা হুক্মার ছেড়ে বলেন— চোপ্বাও শূয়োব! যত বড় মুখ ততবড় কথা! আগে উনি পেটে খাবেন তবে জমিদারকে খাজনা দেবেন! টাকা না থাকে হাল গরু বেচে খাজনা দাও।

লক্ষ্মণ হাত জোড় করে বলে—আক্ষেপে, এ বছর হাল গরু বেচে খাজনা দিলে ভবিষ্যতে যে কোনো দিনই খাজনা দিতে পারবো না।

লক্ষ্মণের কথা শুনে নায়েব স্তম্ভিত হোয়ে গেলেন। মুচীর সন্তানের এত বড় স্পর্ধা! তখনি তাকে জুতিয়ে সিধে করবার একটা দুর্দমনীয় ইচ্ছা তাঁর শিরায় শিরায় লাফালাফি করতে লাগলো। কিন্তু সদাশিব চৌধুরী নায়েবী কোরে চুল পাকিয়ে ফেলেছেন। জুতিয়ে সিধে করার আগে তিনি ভেবে দেখলেন যে, লক্ষ্মণ মুচীর সন্তান হোলেও লেখাপড়া জানা মুচী। তার ওপরে প্রায় দেড়শো-ঘর প্রজা তার বিশেষ অনুগত; এক্ষেত্রে সদবে সংবাদ না দিয়ে এমন একজন মাতব্বর প্রজাকে সিধে করাটা যুক্তিসঙ্গত হবে না। রাগটা কোনো বকমে হজম কোরে ফেলে তিনি বলেন— খাজনা যদি দেবাব ইচ্ছা না থাকে দিও না, কেমন কোরে খাজনা আদায় করতে হয় আমাদের তা জানা আছে।

এই কথার ওপরে আর কিছু বলা বুখা মনে কোরে লক্ষ্মণ কাছাবী থেকে ফিরে এসে সবাইকে জানিয়ে দিলে— খাজনা মাফ হবে না। যেমন কোরে পারো খাজনা দাও, হাল গরু বেচে খাজনা দাও। তোমাদের পেট ভরুক আর নাই ভরুক, জমিদাবের পেট ভরানো চাই।

বাড়ীতে ফিরে এসে লক্ষ্মণ ভাবতে বসলো— কি করা যায়! এই যে কয়েক-ঘর লোক, আমারই মত গরীব তাবা, তাদের দুঃখে সহানুভূতি পাবে বলে আমাকে এসে ধরেক্কে—এর কি কিছুই করতে পারবো না! একে ঘরে অন্ন নাই, মহাজনের সুদ গুণে পেট-ভরে ঝাণ্ডার কথা বেচারীরা ভুলেই গিয়েছে। কিন্তু এবার—? অর্ধাশন সহ্য করে বলে কি অনশন সহ্য হবে? বছরে-বছরে অজন্মা, অনাবৃষ্টি লেগেই আছে। দেবতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই যে গরীবরা বুকের রক্ত জল কোরে পাথরের মতন মাটি-চষে শস্য ফলায়, তাদের পেট কি কখনো ভরবে না! এর কি কোনো উপায় নাই? গরীব—তারা যে গরীব, তারা যে অভিশপ্ত।

জন্মের সঙ্গেই ঈশ্বর তাদের কপালে অভিসম্পাতের টীকা পরিণে দিয়েছেন। ভেবে সে কিছুই ঠিক করতে পারছিল না, তার মাথা ঘুরতে লাগলো।

লক্ষ্মণের ছেলে উদ্ধব কোথা থেকে খেলা কোরে বাড়ীতে ফিরে এসে বাপকে বিষয় মুখে দরজার কাছে বসে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। খানিকক্ষণ বাপের মুখের দিকে চেয়ে থেকে সে বল্লে— তামাক দেবো বাবা?

লক্ষ্মণ কোনো কথা না বলে ছেলের দিকে উদাস-দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। অন্ত-অচলের শিখরে তখন মহা-সমারোহে দিনের চিতা জ্বলে উঠেছিল; সেই অগ্নি শিখার জ্বালাময়ী স্পর্শে সমস্ত আকাশটা ঝলসে লাল হয়ে এই শ্যাম ধরণীর শীতল পরশ পাবার জন্য উন্মুখ হয়ে থব্-থব্ কোরে কাঁপছিল। সে ছেলের মুখ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে অবহেলায় একবার আকাশের দিকে চেয়ে আবার তাকে দেখতে লাগলো— ওরে আমার পাগলা ছেলে, ওরে আমার বংশের দুলাল, এই গরীবের ঘরে কেন এসেছিস্ বাবা? গরীবের কি দুঃখ তা তো তুই জানিস্ না। এই রক্তমাংসের শরীরে ক্ষিদের যন্ত্রণা যে কি যন্ত্রণা তা তুই এখনো বুঝিস্ নি, কিন্তু তোকে বুঝতেই হবে,— একদিন বুঝতেই হবে, কিছুতেই নিস্তার নেই। উদ্ধব বাপের অশ্রু-সজল চোখ দেখে আরও কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে— কি হয়েছে বাবা?

লক্ষ্মণের স্ত্রী বেঁচে নেই। সংসারে সে, তার মা ও একমাত্র ছেলে উদ্ধব। উদ্ধবকে বছর-খানেকের রেখে তার স্ত্রী মারা যায়, তার ঠাকুরমাকেই সে মা বলে জানতো। তাদের ঘরে নয়-দশ বছরের ছেলে সংসারের ও বাইরের অনেক কাজই করে; কিন্তু লক্ষ্মণ তাকে কিছু কবতে দিত না। গরীবের ছেলে বেঁচে থাকলে সারাটা জীবনই তো খেটে মরতে হবে, তবুও শেষ জীবনে কর্মকান্ত সন্ধ্যাবেলায় অতীতের কথা মনে কোরে দুর্ব্বল জীবনের কয়েকটা মুহূর্ত ও সুখে ভবে উঠবে, এই আশায় সে উদ্ধবকে এখনও কাজে লাগায় নি। এই স্মৃতি ভুপ কবা গরীবের জীবনে যে কত বড় বিলাসিতা তা লক্ষ্মণ ভাল কোরেই জানতো। উদ্ধব কাছে এলে লক্ষ্মণ তাকে বল্লে— এইখানে বস, মনটা বড় খারাপ হয়েছে গেছে বাবা, তাই চুপ কোরে বসে আছি।

— তুমি নায়েব মশায়ের কাছে গিয়েছিলে বাবা?

— হ্যাঁ, কিন্তু কিছুই হলো না, তিনি বলে দিলেন খাজনা সবাইকে দিতেই হবে, খাজনা জমিদার মাফ করবে না।

উদ্ধব কিছুক্ষণ চুপ কোরে রইলো। তারপর বল্লে— জমিদারের তো অনেক টাকা আছে বাবা, এইবারটি খাজনা মাফ কবতে পাবে না। লখীন্দর কাকা বলছিল তার ঘরে একমুঠো চাল পর্যন্ত নেই—

পারে না রে, পারে না। আমাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েই তবে না তার অনেক টাকা। সে তো আর আমাদের মতন গতর খাটিয়ে টাকা রোজগার কবে না।

উদ্ধব তার শিশুযুক্তিতে এ কথার কোনো উত্তর খুঁজে না পেয়ে বাপের পাশে আরও ঘেসে চুপটি কোরে বসে রইলো। তাদের চারিদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার ফ্রমেই ঘনিয়ে উঠতে লাগলো। লক্ষ্মণ তখনো ভাবছিল কি করি—

উদ্ধব হঠাৎ বল্লে — একবার বাবুদের গিয়ে বল না বাবা, তাঁদের তো অনেক টাকা আছে।

লক্ষ্মণের মনে অনেকক্ষণ থেকে এই কথাটা উঁকি মারছিল। নায়েব তো চাকর মাত্র, জমিদার ইচ্ছা কবলে সবই কবতে পারেন। উদ্ধবের মুখে কথাটা শুনে সে আর কোনো জবাব না দিয়ে তাকে নিয়ে বাড়ীর মধ্যে চলে গেল।

পরদিন সকালে লক্ষ্মণ সবাইকে জানালে যে, সে একবার জমিদারের সঙ্গে দেখা করবে, মিনতি কোরে বলে দেখবে; তাতে যদি কোনো ফল না হয়, তা হোলে কেউ এক পরসা খাজনা কিংবা মাথট দেবো না— প্রাণ থাকতে নয়, এতে তোমরা রাজী আছ?

সবার সম্মতি নিয়ে লক্ষ্মণ সেই দিনই জমিদারের সঙ্গে দেখা করবার উদ্দেশ্যে কলকাতায় চলে গেল।

কলকাতায় গিয়ে বাবুর সাক্ষাৎ পাওয়া যে বিশেষ সোজা ব্যাপার নয়, সেটা লক্ষ্মণের আগেই জানা ছিল। বাবুর কর্মচারীরা তার কলকাতায় আসার কারণ জানতে পারলে বাবুর সঙ্গে হয়তো দেখা নাও হোতে পারে, এই ভেবে সে জমিদারের নাপিতের সঙ্গে ভাব-সাব কোরে সকাল-বেলা তার সঙ্গে বৈঠকখানায় গিয়ে হাজির হোলো।

জমিদার রায় প্রদুম্নপ্রকাশ অধিকারী, সাহেব তখন সবোমাত্র ঘুম থেকে উঠে নীচের ঘরে এসে বসেছেন। বক্তচক্ষু তখনো স্বাভাবিক রং ফিরিয়ে পায় নি। লক্ষ্মণ গিয়ে একেবারে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কোরে হাত জোড় কোরে দাঁড়ালো। জমিদার একবার মুখ তুলে তার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন— কে? কি চাও তুমি?

লক্ষ্মণ হাত জোড় কোরে বললে— আজ্ঞে আমি আপনাদেরই আশ্রিত একজন প্রজা। আমার নাম লক্ষ্মণচন্দ্র দাস।

জমিদার সবে কাল যাদবপুর তালুকের নায়েবের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছিলেন যে, বিষ্ণুগ্রামেব লক্ষ্মণদাস নামে একজন মাতব্বর প্রজা বিদ্রোহী হয়েছে। নায়েব এ বিষয়ে কি কর্তব্য তার পরামর্শ চেয়েছিল। তিনি পত্রপাঠ তাকে জানিয়েছেন যে, বিদ্রোহীকে যেমন কোরে পার সায়েস্তা করো, না হোলে অন্য প্রজারাও খাজনা বন্ধ করবে। লক্ষ্মণের নাম শুনে জমিদার রক্তনেত্রে তার দিকে চেয়ে বল্লেন— তোমার নাম লক্ষ্মণ মুচী? তুমি খাজনা দেবো না বলেছো?

লক্ষ্মণ বললে—আজ্ঞে খাজনা দেবো না এমন কথা কি আমরা বলতে পারি। দু-বছর উপরি-উপরি অজন্মা হয়েছে, কিন্তু আমরা ধার কোরে খাজনা জুগিয়েছি, এবার মহাজনও টাকা দিতে চায় না, আর বীজধানও নেই যে বেচে টাকা দেবো। এ বছরের মত খাজনাটা মাফ কোবে দিতে আশ্চা হয়। ভগবান আপনার—

জমিদার ধমক দিয়ে বলে উঠলেন— দেখ, ছোটলোকের মুখে লম্বা-লম্বা কথা শুনলে আমার পিঠি জ্বলে যায়। উনি বলবেন তবে ভগবান আমার মঙ্গল করবেন— আম্পর্খা দেখো না।

লক্ষ্মণ ক্ষুব্ধ হয়ে বললে— আমরা ছোটলোক, আপনাদের মর্যাদা রেখে কথা বলতে ভানি না, মাফ করবেন।

— তারপর, কি বলতে চাও, খাজনা-টাজনা দেবে?

— হুজুর এবারের মত আমাদের মাফ করুন।

— মাফ হবে না বাপু, খাজনা আর মাথট দিয়ে দাও। সরকার তো আমায় মাফ করবে না।

— আজ্ঞে খাজনা কোথা থেকে দেবো! টাকা দূরের কথা, একমুঠো ধান যে কারো ঘরে নেই।

— খাজনা না দিলে বাস তুলতে হবে জেনে রেখো।

লক্ষ্মণ আব সহ্য কবতে পারছিল না, অনেক কথা তার বলবার ইচ্ছা হোতুে লাগলো। কিন্তু গ্রামের সেই ক্ষুধাতুর বন্ধুদের মিনতি-ভরা মুখগুলো মনে ধোরে সে নিজেই কোনো রকমে সম্বরণ কোরে শেষে বলে ফেললে—হুজুর দশ বছর হোলো এই তালুক কিনেছেন, আর আমরা দশ পুরুষ ধরে এই গ্রামে বাস করছি। আমাদের ভিটে ছাড়া করলে আপনাদের অকল্যাণ হবে।



লক্ষ্মণের কথা শুনে জমিদারবাবু তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। তিনি হাঁক ছাড়লেন—  
তবে রে। কে আছিল, পক্ষাশ জ্বতো গুণে মেরে একে বাড়ী থেকে বের কোরে দে।

তখনি কয়েকজন দরোয়ান এসে লক্ষ্মণকে মারতে মারতে বাড়ী থেকে বার কোরে দিলে।

রাস্তায় এসে লক্ষ্মণ স্তম্ভিত হোয়ে দাঁড়ালো। এতটা যে হবে তা সে ধারণায় আনতে পারে নি। রাগে, দৃষ্টে, অপমানে, স্কাভে, কাঁপতে কাঁপতে সে স্টেশনের দিকে এগিয়ে চল্লো। পথ চলতে চলতে ভাবতে লাগলো যে, সে কি এমন কথা বলেছে, যার জন্য তাকে জ্বতো মেরে এমন কোরে তাড়িয়ে দেওয়া হোলো? এর কি কোনো প্রতিবিধান নাই? কি প্রতিবিধান হবে? ধনী যে সে যুগ-যুগ ধরে গরীবকে এমনি ভাবে জ্বতোই মেরে আসছে। গরীবকে দলন করার প্রবৃত্তি যে তার মজ্জাগত হোয়ে গিয়েছে। মানুষের প্রতি মানুষের এই যে অস্বাভাবিক ব্যবহার, এ কি বিধাতারই নিয়ম।— দারুণ বিধাতা,—নিষ্ঠুর বিধাতা ! বাড়ী ফিরে গিয়ে দেখবো যে অসহায় বন্ধুরা আমার আশায় পথ চেয়ে বসে আছে, আমাকে দেখে আশায় তাদের অন্তর উৎফুল্ল হোয়ে উঠবে— তাদের গিয়ে কি বলবো?

লক্ষ্মণ যখন গ্রামে ফিরে এল তখনও সন্ধ্যা হোতে অনেক দেরী। সে উদ্ধবকে ডেকে বসে— তোর লখীন্দর কাকাকে বলে আয় আমি ফিরে এসেছি; আজ সন্ধ্যাবেলা আমাদের বাড়ীর সামনের মাঠে পঞ্চায়েত বসবে। সে সবাইকে যেন খবর দিয়ে এইখানে নিয়ে আসে।

লক্ষ্মণের মা জিপ্সেস করলে—জমিদার-বাড়ীতে গিয়ে কিছু সুবিধে করতে পারলি বাবা?

— কিছুই হোলো না মা, তারা আমাকে মেরে অপমান কোরে তাড়িয়ে দিলে।

বৃদ্ধা পুত্রের গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্লে— তারা বড়লোক, তাদের সঙ্গে কি ঝগড়া কোরে পারবি বাবা?

— ঝগড়া কোরে পারবো না, কিন্তু টাকা না থাকলে দেবো কোথা থেকে?

— নে তুই এখন নেয়ে খেয়ে নে। কাল সারাদিন নায়েব-কাছারি থেকে দু-বার পেয়াদা এসেছিল ডাকতে।

লক্ষ্মণ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বল্লে— আর নায়েব-কাছারী! খাজনার জন্য যে কটা টাকা রেখেছিলুম কলকাতায় যেতে আসতেই তো তার অর্ধেক খরচ হোয়ে গেল। এখন কেটে ফেল্লেও আর একটা পয়সা বেরুবে না।

লক্ষ্মণের মা তাকে তাড়া দিয়ে বল্লে— যা তুই নাইতে যা, আমি ভাত চড়িয়ে দিয়েছি।

সন্ধ্যার পর লক্ষ্মণের বাড়ীর সামনে মাঠের ওপর দলে দলে লোক এসে জুটতে লাগলো। পঞ্চায়েতের খবর সদাশিব চৌধুরীর কানে সন্ধ্যার আগেই গিয়ে পৌছেছিল। তিনি দশ-বারো জন পাইক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন; কিন্তু তারা ফিরে এসে খবর দিলে যে, সেখানে প্রায় দুশো লোক জমায়েৎ হয়েছে। দু-দশ জন পাইকের কর্ম নয়, তাতে ঘায়েল হবার সম্ভাবনা আছে। সংবাদ দিয়ে নায়েব তাদের নিজের কাজে যেতে বলে নিশ্চিত মনে ঘরে গিয়ে বসলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন বেশ নিবিড় হোয়ে এসেছে। লক্ষ্মণের চালা-বাড়ীর সামনে মাটির ওপর সব লোক বসে গিয়েছে। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না, কেউ মাথা নাড়লে তবে বুঝতে পারা যায় যে লোক আছে। লক্ষ্মণ ধীরে ধীরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে সবাইকে সম্বোধন কোরে বল্লে— বন্ধু সব, একটা কথা জানাবার জন্য তোমাদের আজ এখানে ডেকেছি—

অনেকগুলো গলা এক সঙ্গে চৈচিয়ে উঠলো— ব্রল, তোমার কথাই আমরা শুনবো—  
আমরা আর কাউকে জানি না—

লক্ষ্মণ বল্লভে—সবার আগে তোমাদের জানিয়ে রাখি, আমি যে জনা কলকাতায় গিয়েছিলুম সে কাজ কোরে আসতে পারি নি। জমিদার বলে দিয়েছেন, খাজনা দিতেই হবে— না দিলে বাস তুলতে হবে। তার ওপর জমিদার আমায় জুতো মেরে বাড়ী থেকে বের কোরে দিয়েছে।

— কি বল্লভে! জুতো মেরেছে?

একজন লোক দাঁড়িয়ে উঠে বল্লভে— জুতো মেরেছে?

জুতো মারার কথা শুনে সবার মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের সাদা পড়ে গেল। কেউ বলতে লাগলো— গরীব বলে জুতো মারবে? কেউ বল্লভে— আশ্চর্য্য দেখেছো?

দেখতে দেখতে সবাই উত্তেজিত হয়ে তৃণাসন ছেড়ে উঠে পড়লো। সকলের মুখে এক কথা— কিছুতেই খাজনা দেবো না—

হঠাৎ তাদের সকলের গলা ছাপিয়ে লক্ষ্মণের গলা উঠলো— শান্ত হও, মিথো আশ্বাসন কোরো না।

লক্ষ্মণের কথা শুনে আবার তারা বসে পড়লো, সভাস্থত্র আবার নীরব।

লক্ষ্মণ বল্লভে— ভাই সব, আমরা গরীব, আমাদের দু-বেলা পেট ভরে অন্ন জোটে না—

অন্ধকারের বুক চিরে সহস্র বৎসরের ক্ষুধা বরুণস্বরে আর্তনাদ কোরে উঠলো— গরীব, ভাই আমরা বড় গরীব, পেট ভরে খেতে পাই না আমরা —

লক্ষ্মণ বলতে লাগলো— চুপ করো, আগে আমার কথা শেষ হোতে দাও। আমরা গরীব বটে, কিন্তু একবার ভেবে দেখো, আমরাই পৃথিবীর সমস্ত লোককে লালন-পালন করছি। মানুষের জ্ঞান হবাব আগেই আমরা তাদের আনন্দের জন্য খেলনা তৈরি কোবে রাখি, তাদের সুখের জন্য দোলনা তৈরি কোরে দিই, নিজের ছেলে ফেলে বেখে ধনী ছেলেকে আমরা বুকে কোরে মানুষ করি। আমরা প্রাণপণ যত্নে খাবার তৈরি কোবে নিজে অনাহারে থেকে তাদের মুখের কাছে আমাদের অন্ন ধরে দিই। সমস্ত জীবন ধরেই তাদের বিলাসের সামগ্রী জুগিয়ে চলি। তাবা মরে গেলে আমরা গরীববাই তাদের শ্মশানে মূর্দাফবাসের কাজ কবি। আমরা মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাদের এইভাবে সেবা কোবে চলছি। এর বিনিময়ে আমরা ধনীর কাছ থেকে দাম পাই বাটে, কিন্তু আমরা যে বিপুলস্বতার সঙ্গে যুগ যুগ ধবে তাদের ষোড়শোপচারে পূজা কোরে আসছি— তার পুরস্কার আমরা কি পেয়েছি— তাদের কাছ থেকে?

অন্ধকারের মধ্যে থেকে কে একজন লাফিয়ে উঠে বল্লভে— জুতো— তার বদলে জমিদার তোমায় জুতো মেরেছে।

অশ্রুধ্বকণ্ঠে লক্ষ্মণ বল্লভে— ঠিক বলেছে ভাই, আমাকে জুতো মেরে জমিদার সমস্ত গরীবকে জুতো মেরেছে। প্রাণদাতা, অন্নদাতাদের প্রতি সে এইভাবে তার কৃতজ্ঞতা দেখিয়েছে।

— কিন্তু আর আমরা সহিবো না—

— না, আর সহ্য কববো না, জমিদার বলেছে খাজনা দিতেই হবে, নায়েব বলেছে মাথট না দিলে মাথা যাবে— আমরা মাথাই দেবো।

— হ্যাঁ আমরা মাথাই দেবো, মাথট দেবো না। টাকা না থাকলে কোথা থেকে দেবো! পেটে খেতে পাচ্ছি না, খাজনা দেবো কোথা থেকে।

সেদিনকার পঞ্চায়েতে ঠিক হোয়ে গেল, খাজনা কেউ দেবে না।

পরদিন সকালে লক্ষ্মণ কাজে বেরুচ্ছে এমন সময় কাছারী থেকে দু-জন পাইক এসে লক্ষ্মণকে ডেকে নিয়ে গেল। নায়েব আগেই জমিদারের কাছ থেকে হুকুম পেয়ে ঠিক হোয়ে বাসে ছিলেন, তার ওপর লক্ষ্মণ যে তাঁকে অবজ্ঞা কোরে জমিদারের কাছে গিয়েছিল ও

সেখান থেকে ফিরে এসে পঞ্চায়েত করেছিল, এ সমস্ত সংবাদই তিনি পেয়েছিলেন। লক্ষ্মণ আসতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কি, পঞ্চায়েতে কি ঠিক হোলো? খাজনা দেবে?

লক্ষ্মণ ধীরভাবে বল্লেন— আজ্ঞে খাজনা দেবার শক্তি আমাদের নেই, সে কথা তো আগেই জানিয়েছি।

নায়েব তাকে কোনো কথা না বলে হাঁক দিলেন— পদারং!

ডাক শুনে দু-তিন জন যমদুতের মত হিন্দুস্থানী এসে লক্ষ্মণকে ঘিরে দাঁড়ালো।

নায়েব বল্লেন— লে যাও ইস্কো।

হুকুম পাওয়ামাত্র তারা লক্ষ্মণকে ধরে নিয়ে গেল। কয়েক মিনিট পবেই তার আর্তনাদে কাছারী-বাড়ী বান্ধনিয়ে উঠলো— বাবা গো, মেরে ফেল্লে গো—

দেখতে দেখতে হাড়িপাড়ায় ও মুচিপাড়ায় খবর রটে গেল যে, জমিদারের পাইক এসে লক্ষ্মণকে ধরে নিয়ে গেছে, আর তাব ওপরে অমানুষিক অত্যাচার হচ্ছে।

খবর পেয়ে উদ্ধব ছুটে কাছারী-বাড়ী গেল। একটু দাঁড়িয়ে থাকতে না থাকতেই সে বাপের আওয়াজ পেলে— ও বাবা গেলুম—

সে ছুটে বাড়ী এসে তার ঠাকুরমাকে বল্লেন— মা, জমিদারের লোকেরা বাবাকে মেরে ফেল্লে।

লক্ষ্মণের লোকেরা অসহায়ের মত চারিদিকে ছুটোছুটি কোরে বেড়াতে লাগলো। কি করবে, কি করলে লক্ষ্মণকে এই অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচাতে পাবা যায়, কেউ স্থির করতে পারলে না। লক্ষ্মণের মাকে নানা লোকে নানা কথা বলে যেতে লাগলো।

কেউ বল্লেন— তাকে খুন কোরে মহানন্দায় ভাসিয়ে দেবে।

কেউ বা বল্লেন— জমিদারের সঙ্গে কি এঁটে ওঠা যায়—

লক্ষ্মণেব মা এই আশীবছর ধরে একটা দুটো কোরে পয়সা জমিয়ে সাতেরোটা টাকা জমায়েছিল। বৃদ্ধা বিকেল নাগাদ টাকা সমেত সিঁদুর-চুপড়ীখানা নিয়ে ছুটে গিয়ে সদাশিব চৌধুরীবা পায়ে ধবে দিয়ে কেঁদে পড়লো— নায়েব মশায়, এই টাকা নিয়ে আমার নখেঁকে ছেড়ে দাও। আর যা পাওনা থাকবে আমি বৌমাব তগা বিক্রি কোরে শোধ কোরে দেবো।

নায়েব গম্ভীর ভাবে টাকা ওণে দেখলেন যে, চুপড়ীতে সাতেরোটি টাকা আছে। নীতি খাভনা, মাথট, জরিমানা ইত্যাদি হিসাবে সব কটি টাকা নিয়ে লক্ষ্মণকে ছেড়ে দিতে হুকুম দিলেন।

বৃদ্ধা আজন্ম-সঞ্চিত টাকাগুলোর বদলে ছেলেকে ফিরে পেয়ে কাঁপতে কাঁপতে তাকে বুকে জড়িয়ে ধবলে।

লক্ষ্মণকে যখন ছেড়ে দেওয়া হোলো, তখন সে আব দাঁড়াতে পাবছে না। প্রহারে সমস্ত অঙ্গ জর্জরিত, বেদনায় পা থেকে মাথা পর্যন্ত কনকন কবছে। কোনো রকমে সে বৃদ্ধা জননী ও উদ্ধবের ওপব ভব দিয়ে বাড়ী এসে বিছানায় শুয়ে পড়লো।

তখনো সন্ধ্যা হয় নি, বাইরে একটু আলো আছে। লক্ষ্মণের ঘরের মধ্যে একটু একটু কোরে সন্ধ্যার আবছায়া ঘনিয়ে উঠছিল। মুর্ছিতপ্রায় বাপের নাথায় উদ্ধব জনপটি লাগিয়ে দিয়ে তাকে ধীরে ধীরে বাতাস করছিল আর ভাবছিল। কত কথাই ভাবছিল তার কিছু ঠিক ঠিকানা নাই। লক্ষ্মণের কোনো সাড়া-শব্দ না পেয়ে তাকে ঘুমন্ত মনে কোরে সে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে একেবারে নায়েবের কাছারীর দিকে ছুটলো। কাছারীর কাজ তখন শেষ হোয়ে গিয়েছে, নায়েব ও আরও দু-তিন কর্মচারী নিয়মগত সান্ধ্য-রসায়ন পান কোরে মেজাজটা একটু প্রফুল্ল করবার চেষ্টা করছেন। সদাশিবের মেজাজ আজ ভারী খুসী, লক্ষ্মণ শাযেস্তা হয়েছ, এখন আর কেউ খাজনা ফেলে রাখতে সাহস করবে না— এই ভেবে। এমন সময় উদ্ধব সেখানে গিয়ে তাক্রির হোলো। নায়েব তাকে দেখে একটু হেসে বল্লেন— কে রে? কি চাস এখানে?

উদ্ধব উদ্ধতসুরে বসে— তোমরা আমার বাবাকে মেরেছো কেন ?

নায়েব চক্ষু বিস্ফারিত কোরে জিজ্ঞাসা করলেন— কে রে তুই ? লক্ষ্মণ মুচীর ছেলে না ?

—হ্যাঁ, তোমরা আমার মাকে ফাঁকি দিয়ে টাকা চুরি করেছো,— চোর কোথাকার—

তবে রে। বলে নায়েব টলতে টলতে উঠে এসে উদ্ধবের গালে এক চড় কষিয়ে দিলে। উদ্ধব ঘুরতে ঘুরতে মাটিতে পড়ে গেল। কাছেই তামাক সাজবার জন্য আগুন-ভরা একটা মালসা ছিল, উদ্ধব উঠেই সেই মালসাটা তুলে নায়েবকে লক্ষ্য কোরে ছুঁড়ে মারলে। মালসা নায়েবের গায়ে পড়লো না বটে, কিন্তু দপ্তরের ফরাশের ওপর আগুন পড়তেই সেখানে একটা হৈ চৈ বেধে গেল,— সামাল সামাল। দরওয়ান, চাকর চারিদিক থেকে বেরিয়ে উদ্ধবকে ধরে ফেলে। তারপর তার ওপরে কীল, লাথি। শেষে মুর্ছিতপ্রায় উদ্ধবকে টেনে নিয়ে গিয়ে তারা কাছারী-বাড়ীর বাইরে ফেলে দিলে।

বাইরে বেরিয়ে দু-এক-পা যেতে না যেতেই সে অজ্ঞান হোয়ে একটা ঝোপের পাশে পড়ে গেল।

উদ্ধবের যখন জ্ঞান হোলো তখন অন্ধকার, চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার ! নিশীথিনী হাজার পায়জোর পায়ে দিয়ে পৃথিবী দাপিয়ে ছুটে চলেছে— ঝন্ ঝন্ ঝন্। উদ্ধব কোনো রকমে নিজের দেহটাকে টেনে নিয়ে সেই বিলম্বিত-মুখরিত বনপথ দিয়ে বাড়ী ফিরে চম্পো—মুচীব ছেলে— গরীবের ছেলে ! বাড়ীর দরজা খোলা ছিল, সে দেয়ালে ভর দিয়ে কোনো বকমে লক্ষ্মণের ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। এমনতেই সে চোখে দেখতে পাচ্ছিল না, তার ওপরে ঘরের মধ্যে গাঢ় অন্ধকার, তার মনে হোতে লাগলো বাইরের যত অন্ধকার যেন তার সঙ্গে ঘরের মধ্যে ঢুকে গিয়ে দাঁড়ালো, তারপব একখানা হাত বাপের বুকের ওপর রেখে ডাকলে—বাবা !

ঘুমন্ত লক্ষ্মণ চমকে উঠে তার দু-খানা আহত হাত দিয়ে উদ্ধবের হাতখানা চেপে ধবে বসে— কে উদ্ধব ? কোথায় গিয়েছিলি বাবা ?

উদ্ধবের গলাটা কে যেন দু-হাতে চেপে ধরতে লাগলো। অশ্রুবিজড়িত কণ্ঠে সে বসে— ওরা আমায় মেরেছে বাবা— বড্ড মেরেছে—

লক্ষ্মণ উদ্ধবকে পাশ থেকে তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধবে তাব জ্বরতপ্ত দেহ দিয়ে পুত্রের বেদনা শুষে নিতে লাগলো।

## আকাশ-প্রদীপ

### গিরিবালা দেবী

শরতের উৎসবে মণ্ডিত সোনার রৌদ্রমাখা দিনগুলিকে বিনু যেন দুই হাতে ঠেলিয়া সরাইয়া দিতে চায়। নিলনের মধুর বাঁশীর স্বাক্ষর ও ফুল ফোটার সমারোহের ভিতরে এক অবোধ বালিকার অশ্রুট হৃদয় অহরহ প্রতীক্ষা করে হেমন্ত-লক্ষ্মীর মৃদুমন্দ পদধ্বনির।

ঠাকুমার গলা জড়াইয়া বিনু প্রশ্ন করে, “আর কদিন পরে আকাশ-প্রদীপ জ্বলবে, ঠাকুমা?”

ঠাকুমা সম্মেহে উত্তর দেন, “আশ্বিন মাস তো চলেই গেল, দুইদিন পরে আকাশ-প্রদীপ। আকাশ-প্রদীপ দেখতে তুই এত ভালবাসিস বিনু?”

বিনু ঝাঁকড়া চুলে-ভরা মাথা দোলায়। “হ্যাঁ আমার খুব ভাল লাগে ঠাকুমা, কত উঁচুতে মিট মিট করে প্রদীপ জ্বলে। আকাশের পথ আলো হয়ে যায়। সেই আলোর পথ চিনে আসে তারা, যারা স্বর্গে চলে যায়।

ঠাকুমার চোখ জলে ভরিয়া যায়। বেশী দিনের কাহিনী নয়, মাত্র দু-বছর। গতবছর আকাশ-প্রদীপের পরে এ বছর আকাশ-প্রদীপ আসিলে দুইবছর পূর্ণ হইবে। বিনুর বছর দুই-এর বড় ছিল মিনু। এক বৃন্তে ফোটা ফুলের মতন। কিন্তু পূর্ণ প্রস্তুতিতে হইবার অবকাশ হইল না। কালের প্রবল ঝটিকায় মিনু অকালে ঝরিয়া গেল।

সাথীহারা অবোধ বালিকা সরল বিশ্বাসে কেবলই খুঁজিয়া বেড়ায় তার হারানো দিদিকে। সে অন্বেষণ ইহলোকে নয়। পরলোকে সুনীল গগন টেপ, উজ্জ্বল নক্ষত্রের মধ্যে।

শোকাচ্ছন্ন বালিকাকে শোকবিধুরা জননী একদা সান্ত্বনাচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে, মানুষ মরিলে অন্য কোথাও যায় না, আকাশে তারা হইয়া সারারাত্রি স্বপ্ননদের দিকে চাহিয়া থাকে।

সরলা বিনু মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, “একদিনও কি তারা পৃথিবীতে নামে না?”

“নামে বৈকি, রূপালী জ্যোৎস্না রাতে অনেক অনেক ফোটা ফুলের সুগন্ধে পূণ্য তিথিতে তারা আসে, আবার যায়। শুধু একটি মাস নিত্য আসা-যাওয়া করে। সে আকাশ প্রদীপের সময়।

সন্ধ্যায় আকাশ-প্রদীপ জ্বালানো মাত্র তারা নেমে এসে ফুল তোলে, মালা গাঁথে, খেলা করে। নীলাকাশে ভোরের আলো দেখা দিতে না দিতে ফের পালিয়ে যায়, তারা হয়ে আকাশে।” মার মুখে শোনা এতবড় সত্য ভাষণে বিনু অবিশ্বাস করে না, তাই আবার আগ্রহ লইয়া অসীম আশায় নিষ্ক সূশীতল হেমন্তের প্রতীক্ষায় থাকে।

জ্ঞান গোধূলিবেলায় ঠাকুমার কোল ঘেঁষিয়া বিনু শিখিয়া লইয়াছে তারকার নাম, কে আগে উদয় হইয়া অপরকে ডাকিয়া আনে, সভা সৌষ্ঠব করিয়া হাসে। সাঁঝ তারার পরেই কৃত্তিকা, রোহিণী, মঘা। একটির পর একটি আকাশের রঙ্গমঞ্চে ফুলঝুরি ফুটায়।

তাদের বাড়ীর সামনেই গ্রামের ছোট নদীটা, কুলুকুলু গানে তটভূমি মুখর করিয়া বহিয়া যায়। দিদি তারা হইয়া মুখ দেখে নদীর স্বচ্ছ জলে। স্নোতে এতফুল ভাসাইয়া দেয় কে? এ কীর্তি তারই। সে যে বড় দুরন্ত, দুষ্টু মেয়ে। ভাস্ক্যচোরা ছেঁড়া যত অকাজ করিয়া বেড়াইত।

সে অভ্যাস এখনও যায় নাই, তাই নদীর জলে গাছের ডাল ভাসিয়া, ফুল ছিড়িয়া ভাসাইয়া দেয়। কতদিন প্রভাত সূচনায় বিনু আধা ঘুম আধো জাগরণের মধ্যে যন তরু পদ্মে লুকায়িত পাখীর প্রভাতী কূজনে দিদির নিষ্টি মধুর হাসির শব্দ শুনিয়াছে। ইঁা, উনি বড় চালাক, লুকাইয়া ডালে ডালে বেড়ায়। এবার হইতে বিনুও বিচরণ করিবে পাতায় পাতায়। মিনুর বোন বিনু নিরেট বোকা নয়—

আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির প্রভাত হইতেই আকাশ প্রদীপের আয়োজন সুরু হইল। ঢালু নদীর পাড়ে বিনুর ঠাকুর্দা একটি পঞ্চবটীর বন রচনা করিয়াছিলেন। সেই পঞ্চবটী এখন বিশাল তরুশ্রেণীতে পরিণত হইয়া চারিদিকে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। পঞ্চবটীর অনতিদূরে চণ্ডীমণ্ডপ, তুলসীকুঞ্জ, পুষ্পোদ্যান। স্থানটি যেমন শান্তিপূর্ণ তেমনি মনোরম। কতকাল হইতে দুই শাল গাছের খুঁটি পোঁতা অবস্থায় রহিয়াছে। খুঁটির মাঝখানে প্রতি বছরেই একটি আকাশ-স্পর্শী বৃহৎ নূতন বাঁশের মাথায় কপিকল লাগাইয়া আকাশ-প্রদীপ বোলানো হয়।

কার্তিক-সংক্রান্তির পরদিন বাঁশ খুলিয়া আকাশ-প্রদীপের কাঁচ-বসানো নূতন লঠন ও নূতন টিনের-কুপী পুরোহিতকে দান করিবার নিয়ম। ঈশ্বর বা পূর্ব-পুরুষদের উদ্দেশ্যে যাহা উৎসর্গ করিয়া দেওয়া হয়, তাহা গৃহে রাখিতে না—

শালের খুঁটি দুটি আকাশ-প্রদীপের পর তেমনি দণ্ডায়মান হইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া থাকে। কাক চিল উড়িয়া আসিয়া তাহার মাথায় আশ্রয় লয়। আর নদীর জলে স্থির দুষ্টি নিবদ্ধ করিয়া শিকারী মাছ রাঙা পাখীরা ধানে বসিয়া থাকে, কখনো কখনো বনলতা বেটন করিয়া ধরে কঠিন শালের খুঁটিকে। শ্যামল চিকণ পত্রে আচ্ছাদন করিয়া থোকা থোকা পুষ্প সম্ভারে সুসজ্জিত করিয়া দেয়। পাশের শেফালী গাছের একটি ডাল খুঁটিব গায়ে হেলিয়া পড়িয়াছে। শরৎ সমাগমে পুষ্পবর্ষণ সুব হয়। গোটা কার্তিক মাসে সে বরিষণের বিরাম হয়না।

গৃহে আর আকাশ প্রদীপের অনুষ্ঠান হইতেছে, পুরোহিত আসিয়াছেন। ঠাকুরার প্রীতি প্রসন্ন মুখখানি মাষাঢ়ের পুঞ্জীভূত মেঘের মত গন্ধ গন্ধ করিতেছে। মাঝ স্নেহভরা আঁখি দুটি অশ্রুভরা ছলছল।

বিনুর ওইদিকে তেমন মনোযোগ নাই। সে মহাবাস্ত। আকাশ প্রদীপ জ্বালবাব সঙ্গে সঙ্গে আকাশ-গাঙের জ্যোৎস্নাতবী বাহিয়া দিদি ভূমিতে অবতীর্ণ হইবে। এই দিনেই সে ধবণীব বন্ধ হইতে চিরবিদায় লইয়াছিল। তাহাকে স্মরণ করিয়াই বৃষ্টি বেদমন্ত্র উচ্চাৰিত হইতেছে।

ওরা এত কবিতোছে আর সেকি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে? বিনু ধীর পায়ে পাড়ায় বাহির হইল। পল্লীগামে চালে চালে বসতি। বিনুর সখীর সংখ্যা কম নাই, কম না থাকিলেও বিনুর সর্বাপেক্ষা প্রিয়-সখী টুনু—। টুনু যে দিদিরও খেলার সাথী। সেই জন্য বিনু তাকে এত ভালবাসে, মনের যত গোপন বাস্তা উজাড় করিয়া ঢালিয়া দেয়। টুনুদের অঙ্গনে উপনীত হইয়া বিনু ভাকিল, “টুনু— ও টুনু।” টুনু বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আজ এন্টনি চান করতে যাবি না কি? নীলা, ভূণি, বাতাসীকে ডেকে এসেছি।” পাড়ার বালিকারা প্রতাহ দল বাঁধিয়া নদীর ঘাটে স্নান কবিতো যায়। টুনু ভাবিয়াছিল স্নানে যাইবার এ আহ্বান।

বিনু চকিতে চারিদিকে তাকাইয়া চুপে চুপে বলিল, “না, চানের বেলা গৌ হয়নি টুনু, আমি এসেছি তোকে নিয়ে পদ্মদীঘিতে যাব বলে।”

“পদ্মদীঘিতে কেন রে? পদ্মফুল দিয়ে কি করবি?”

“কি করব তাকি জানিসনে, টুনু? আজ না আকাশ প্রদীপের দিন? দিদি যে পদ্ম বড় ভালবাসত, মনে নেই?” বিনুর গলার স্বর বুজিয়া আসিল। আয়ত আঁখিপদ্মব বাহিয়া কয়েক ফোঁটা অশ্রুজল গণ্ডে ঝরিয়া পড়িল।

টুনুরও মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। সেও একবার সভয়ে চারিদিকে তাকাইয়া অনুচ্চস্বরে উত্তর দিল, “আমরা কি দীঘির মাঝখানে থেকে ফুল আনতে পারব, বিনু? কিনারার যত ফুল দুর্গাপূজার সময় সবাই তুলে নিয়েছে। একটা চাকরকে সাথে আনলেই পারতিস্, সেই সীতরে জল থেকে তুলে দিত।”

“তা হলেই যে মা ঠাকুমা জেনে ফেলতেন, টুনা। দিদির দেব জানলে ওঁরা কেঁদে ভাসিয়ে দিতেন। ওঁদের কান্নার ভয়ে আমি কখনো দিদির নাম করিনা পর্যন্ত। ওঁরা যেমন চাল কলা কি যেন সব তাকে নিবেদন করে দিচ্ছেন, আমরাও চুপে চুপে দেব তার ভালবাসার ফল ফুল।”

টুনা ক্ষণকাল ভাবিয়া সায় দিয়া গেল, “হ্যাঁ, আমাদেরও দিতে হবে বৈকি? তা একটা কাজ করিনা কেন? বুটুদা ওই যে পেয়ারা গাছের ডালে বসে পেয়ারা চিবুচ্ছে, ওকেই ডেকে নিয়ে যাই চন্।”

আশার আশ্বাসে দুই সখী পেয়ারা তলায় চলিল। টুনুর বীরপ্রবর বুটুদা বা বটকুম্। মাত্র তের বছর বয়সেই ডানপিটে নামে গ্রামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বীরোচিত কর্মসাধনে কেই কোনদিন তাকে বিরত হইতে দেখে নাই। মিনু ছিল বুটুরই সমবয়সী অন্তরঙ্গ বন্ধু। তার উদ্দেশ্যে করয়েকটা পদ্মফুল সংগ্রহেব প্রস্তাবে বুটুর উৎসাহের সীমা রহিল না।

পদ্মবিল গ্রামেব শেষ প্রান্তে। টুনুদের বাড়ী হইতে আধ মাইলের কম রাস্তা নহে। মাঝখানে সর্দীর্ণ গলিপথ। দুইদিকে ঘন বাঁশেব ঝাড় ও আগাছার জঙ্গল। অরণ্যের প্রান্তে হবিং শস্যক্ষেত্র, স্বর্ণকান্তি পাকা বাদ কাটিবাব সময় হইয়াছে। হেমন্তেব সুশীতল বাতাসে ধান গাছ নাচিতেছে হেলিয়া দুলিয়া, পাকা-ধানেব বান্ বান্ নৃপুর ধনিতে বন প্রান্তর মুগ্ধবিত হইতেছে, ক্ষেত্র আন-পথ ঢাকিয়া সন্তোজ কলমৌলতা ফুলে ফুলে ফুলনয় করিয়া বাখিয়াছে। ঘুঘুর-কণ্ঠ বিবাম বিহীন, কোকিলের পঞ্চম স্বর দিকে দিকে সুধা বিকিরণ কবিতোছে।

টুনুব অনুমান মিথ্যা নয়। সত্যি কাজলা দীঘিবে তীব্রবে কাছে একটা পদ্মফুলের চিহ্নও নাই। পদ্মপাতা পদ্মকল সমস্তই লোকে নির্মম ভাবে লইয়া গিয়াছে, দুর্গাপূজার জন্য। জলজ ঘাস ও শ্যাওলায় তটতীর সমাচ্ছন্ন। দীঘিবে মাঝখানে কতকগুলি শ্বেতপদ্ম পাতার ফাঁকে ফাঁকে মাথা তুলিয়া হাসিতেছে, ওন ওন্ রবে ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি একবার ছুটিয়া যাইতেছে আবার ফিবিয়া আসিতেছে। পাড়ের প্রাচীন ত্রৈলু গাছের কাণ্ডে তাবা চাক বাধিয়াছে।

বিনু ও টুনা দীর্ঘ পথ হাঁটিয়া ক্রান্ত হইয়াছিল, গাব গাছেব ছায়ায় তাহারা বসিয়া পড়িল।

পাড়ার গাছ ছিদাম আসিয়াছিল খর্বাকৃতি খেজুর গাছ পরিষ্কার করিয়া মাটির হাঁড়ি ঝুলাইতে। জিরেন কাটা খেজুর-রস ও পাটালি ওড়ের সময় আগতপ্রায়।

ছিদাম গাছ কয়েক পা অগ্রসব হইয়া সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করিল, “দা ঠাকুর, দি ঠাকুরগেরা কিসের লেগে আইচো ভরা দুপুরে? পদ্মফুল নেবা? ফুল কি রাখি দিচে কোন বাটা? নুড়িয়ে চুড়িয়ে শাষ করে দিচে?”

বুটু বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, “কিনারায় ফুল না থাকলেও বিলেব মাঝখানে ঢের আছে।”

“তা আছেক বটে, কিন্তুক আনিতে যাবে কে? একে অথই জল, তাতে গোন্ধুব সাপের আস্তানা।” বলিতে বলিতে ছিদাম ব্যাগাব খাটার ভয়ে চট করিয়া সরিয়া গেল। বিনু সক্রম স্বরে বলিল, “বুটুদা, চল ফিরে যাই, পদ্মের দরকার নেই। আলোব উপর থেকে এক কোঁচড় কলমী ফুল তুলে নিই তো। মালা গাথার জন্যে আমি এক ডালা শিউলি কুড়িয়ে রেখেছি। কলমী মালা আর শিউলি মালাতেই দিদি খুসী হবে।”

টুনু ষাড় নাড়িল, “আমাদের গাছে কত গন্ধরাজ ফুটে রয়েছে। পদ্মের চেয়ে গন্ধরাজ মন্দ নয়, আমি গন্ধরাজের মালা গাঁথে দেবো, কি হবে আর পদ্ম দিয়ে? বিলের মধ্যেখানে ষাওয়া তো আর মুখের কথা নয়।” বুটু সহসা উত্তেজিত হইয়া ডেংচি কাটিল, “মুখের কথা নয়, ভীৰু কোথাকার! পদ্ম নিতে এসে মেয়েরা ফিরে যায়, বটকৃষ্ণ ফেরে না। একজন দেবেন কলমী মালা, আর একজননা গন্ধরাজেব। মিনুকে আমি যেন ভালবাসিনা, সে যেন আমাদের বন্ধু ছিল না।” বলিয়া বুটু পরিধানের ধুতিখানা আঁটিয়া পরিল। গায়ে জড়ানো লাল গামছা থলির আকারে কোমরে জড়াইয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

তরুতলায় বসিয়া দুই সখী সৰ্ব্বশ্রমে তাকাইয়া রহিল বুটুর সলিলক্ৰীড়ার দিকে।

ঘণ্টাখানেক পরে বুটু তীরে আসিলে দেখা গেল তার গামছার থলি ভরিয়া গিয়াছে পদ্মচাকা, পাতা ও ফুল।

বিনু পুলকিত স্বরে বলিল, “এত পদ্মচাকা এনেছ, বিনুদা, এগুলি রেখে দিলে অনেকদিন চলবে।” বুটু গামছার থলি ঘাসের উপর নামাইয়া পা ছড়াইয়া বসিল। কয়েকটা পদ্মের চাকা বাহির করিয়া বলিল, “নে— তোরা, দুটো দুটো করে ভাগ করে নে, আমাকেও দে, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে। গিল্পিপণা করে তোদের আর বাসি পদ্ম রাখতে হবে না। মাত্র একটি মাস তো, আমি নিতি মিনুকে ভাল পদ্ম দিতে পারব। আর বসে থাকে না, দানা খেতে খেতে চল। বাড়ীতে বকুনির কথা ভুলে গেছি নাকি?”

বিনু কাজের মেয়ে। পথ চলিতে চলিতে আনমনা হইয়া বলিতে লাগিল, “দিদি পদ্মের দানা খেতে যেমন ভালবাসত, তেমনি কাশের”—

তার কথা শেষ না হইতেই টুনু বলিয়া উঠিল, “আর ঝাশা পেয়ারা। সকাল বেলা বুটুদা গাছে চড়ে ঝাশা পেয়ারাগুলো সব সাবাড় করে দিয়েছে, গাছে আব যদি না থাকে?”

পদ্মের দানা চিবাইতে চিবাইতে বুটুকের ভগিনীকে ডেংচি কাটিল, “আর যদি না থাকে? এক গাছে না থাকলে অন্য গাছে থাকবে। আমি কি গাঁয়ের সব গাছ উজাড় কবে পেয়ারা খেয়েছি? নে, এখন পা চালিয়ে চল, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে। নদীর ধারে গিয়ে আগে কাশের আখ খেয়ে চান করে বাড়ী যাব। তাইলে কেউ টের পাবে না— আমরা কোথায় গিয়েছিলাম।” “আমাদের সাথে যে গামছা নেই বুটুদা, তেল না মেখে চান করব কি? বুটু মুকুর্বিব চালে প্রচণ্ড ধমক দিল। “গামছা নেই তাতে কি হয়েছে? আঁচল বয়েছে তো? তোরা ভারী নবাব, একদিন তেল না মাখলে হয় কি?” ইহার পর আর কেহ প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না।

আকাশ-প্রদীপের তোড়লোড় করিতেই হেমন্তের স্বপ্নায় বেলার অবসান হইল। স্থলে, জলে, অন্তরীক্ষে অন্তগামী সূর্যের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা প্রতিফলিত হইয়া ঝক্‌ঝক্‌ করিতে লাগিল।

প্রকাণ্ড এক টিনের কুপীতে সরিষার তেল ভরিয়া নূতন কাপড়ের পল্লতে পাকাইতে রাখা হইয়াছিল। আকাশ-প্রদীপের গোড়ায় খুঁটির চারিপাশে গোবর-জলে নিকানো হইয়া তক্তক্ত করিতেছিল। সন্ধ্যাসমাগমে শব্দ বাজিল, উলুধ্বনি হইল। পুরোহিত ফুল ছিটাইয়া মন্ত্র পাঠ করিলেন। কপিকলের সাহায্যে প্রদীপ উৰ্দ্ধলোকে, আকাশ-লোকে আলো বিতরণ করিতে বাধিত হইল।

আলোর পাট চুকিয়া গেলে যে যার কাজে ফিরিয়া আসিলেন। শুধু ফিরিল মা তিনটি প্রাণী। বুটু, টুনু ও বিনু। ঝোপের ধারে বসিয়া আকাশ প্রদীপের প্রতি স্থির দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া রাখিল। মিনু প্রদীপের নিশানায় নিশানায় আকাশ-নদীর জ্যোৎস্না-তরী বাহিয়া যখন নামিয়া আসিবে?



বড়রা সরিয়া গেলে তারা তাদের কাজ সম্পূর্ণ করিয়া রাখিতে ভুলিয়া যায় নাই। নিকানো একটি ডায়গায় একটি পদ্মপাতা বিছাইয়া সাজাইয়া রাখিয়াছে। রসে পরিপক্ক এক আঁটি কাশ-ফুলের ডাঁটা, দুটি অর্দ্ধ-পক্ক পেয়ারা, পদ্মচাকা, কয়েকটা সাদা পদ্ম, দুইগাছা ফুলের মালা। একটি গন্ধরাজের, আর একটা শেফালীর।

ক্রমে সন্ধ্যার ঘোর কাটিয়া স্নান জ্যোৎস্নায় চরাচর ভরিয়া গেল, ঝোপে-ঝাড়ে ঝিল্লী তান করিল। হাটুরিয়া নৌকাগুলি নদীর বক্ষ আন্দোলিত করিয়া বৈঠার খটর খটর শব্দে ফিরিয়া চলিল স্বস্থানে।

জেলেপাড়া হইতে অকস্মাৎ বাজিয়া উঠিল গোপীযন্ত্রের সহিত ঝমঝম করিয়া করতাল। সেখানে মনসামঙ্গলের আসর বসিয়াছে। ভাঙ্গা বেসুরো গলায় মনসা-দেবীর প্রশস্তি চলিতে লাগিল, “সোনার খাটে গা না’র, রূপোর খাটে পা, তাতে শ্বেত চামরের বা।”

সংসারের জ্ঞানশূন্য তিনটি অবোধ বালক বালিকা আকাশ-প্রদীপের পানে অনিমেঘে তেমনি চাহিয়া রহিল— গুহ্রবেশা গুহ্রমালা-ধারিণী জ্যোতিষ্ময়ী মূর্তিতে কেহ তো নামিয়া আসে না? তবে কি বৃথাই তাদের পুষ্প-চয়ন, মালা রচনা, প্রিয়বস্ত্র সংগ্রহ?

মা আলো হাতে কি কাজে যেন মগ্ন-ঘরে আসিয়াছিলেন। ফিরিবার সময় আবছা অন্ধকারে তিন মূর্তিকে আকাশ প্রদীপের নীচে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া চমকিত হইলেন। ওখানে বসিয়া ওরা কি করিতেছে? পদ্মপাতায় কি উপকবণ সাজাইয়া রাখিয়াছে? মা হাতের আলো পঞ্চবটী বনের দিকে তুলিয়া মমতায় বিগলিত হইয়া বলিলেন, “বুটু, টুনু, বিনু, গেরা চলে যায়। রাত করে ভঙ্গলে বসে থাকিসনে। তাদের জন্য পূজোর প্রসাদ লেখেছি, খাব চন্।”

ওবা কথা বলিল না, নীববে মায়ের অনুসরণ করিল। পবদিন দিবসারস্তের সঙ্গে সঙ্গে তিনটি বালক-বালিকা সমবেত হইল পঞ্চবটী বনে। আকাশ-প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছে। চোকো সাদা কাচের গায়ে প্রভাতের আলো হীরক-দ্যুতি বিচ্ছুরিত করিতেছে।

পদ্মপাতা শূন্য, মালা হইতে খসিয়া-পড়া কয়েকটি পাপড়ি পড়িয়া আছে মাত্র। পদ্ম পাতার কাছে শিশবিস্তৃত মৃদিকাষ সুস্পষ্ট দুইটি সুকোমল পদাচরু। আনন্দে পরিতৃপ্তিতে তিনটি সবল হৃদয় উদ্বেলিত হইল। মিনু তাদের ভুলিয়া যায় নাই, আকাশ-প্রদীপের আলোয় পথ চিনিয়া সে আসিয়াছিল। মালা গলায় পরিয়া স্নেহোপহার লইয়া গিয়াছে।

বুটু, টুনু, মিনু জানে না,— তাদের জাগরণেব অনেক পূর্বে রজনীর শেষ যামে শোকাবহুলা কবগাময়ী জননী তাহাদিগকে শান্তি দিতে, সাত্বনা দিতে উপহারগুলি গোপনে নদীর ভলে ভাসাইয়া দিয়াছেন।

## পথের ধুলোয়

হেমেন্দ্রলাল রায়

সকালের রৌদ্রের ভেতর তখনো আওনের অসহ্য জ্বালাটা জেগে ওঠেনি। তবু আজকের দিনটা যে বিশেষ স্নিগ্ধভাবে কাটবে না, এই প্রভাতেই তার পরিচয়টাও একেবারে অস্পষ্ট ছিল না। বেলা মোটে সাতটা। কিন্তু এরি ভেতর আকাশের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলুম, ওখানে রৌদ্রের যে শুষ্ক রুক্ষ হাসিটা জ্বলছে, সে যদি এমনি ভাবেই বাড়তে থাকে তবে সে আজ রাস্তার পাথরে আওন ছোঁটাবে, আস্ফাল্টগুলোকে গালিয়ে তার আদিম অবস্থায় টেনে আনবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মানুষকে তো ঘরের ভেতর আটকে রাখবেই— পথের মানুষকেও পথে বেরুতে দেবেনা।

পথে ট্রেনটা অকারণে ‘লেট’ হ’য়ে গেছিল। রাগাঘাট আর নৈহাটিব মাঝখানে একখানা মালগাড়ির সঙ্গে একখানা যাত্রী-গাড়ির কলিশন হ’য়ে গেছে রাত দুটোয়। তার ফলে রাস্তা জাম হ’য়ে গিয়ে এই বিপ্রট বাধিয়ে ফেলেছে।

স্টেশন-মাস্টারের টুপি-পরা, জামায় রূপোর গিলটীকবা বোতামওয়ালা একজন ভদ্রলোককে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম— কেন কলিশন হ’ল মশায়?

তিনি বললেন— পয়েন্টস্‌মানের দোষে।

রাত দুটোয় লোকটার চোখে হয়তো একটু বিমুনি এসেছিল— তাই এত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল!

ফেব জিজ্ঞাসা করলুম— কত লোক মারা গেছে?

তিনি বললেন— লোক তো মাঝা যায়নি।

বিস্মিত হ’য়ে বললুম— তবে এতক্ষণ গাড়ি এখানে প’ড়ে রয়েছে কেন?

তিনি বললেন— লোক মরেনি বটে কিন্তু অনেকগুলো গাড়ি একেবারে ভেঙে বাস্তার ওপরে প’ড়ে ছুট পাকিয়ে আছে, তাদের না সবালে গাড়িই বা চলবে কি ক’রে?

মনে মনে ভাবলুম, তা বটে। কাঠ ও লোহালব্ধের গাড়িগুলোই দুমড়ে, মুচড়ে, ভেঙে তখন হ’য়ে যায় কিন্তু রক্তমাংসের মানুষগুলোর হাতও ছেঁড়ে না, পা-ও কাটে না, প্রাণটাও তাদের যথাস্থানেই আসর জাঁকিয়ে ব’সে থাকে।

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলুম— পাশের মেয়েদের গাড়ি থেকেও একটি তরুণী তাঁর মুখ বা’র ক’রে দিয়ে মাঠের দিকে চেয়ে আছেন। তার সে দৃষ্টির ভেতর দিয়েও প্রসন্নতার ঝর্ণা ঝরছে না। হঠাৎ পাশে এসে তাঁর সঙ্গে ভদ্রলোকটি দাঁড়াতেই তিনি বললেন— ব’লেছিলুম তখনই— বেস্পতিবারের বারবেলায় বেরিও না, অনেক দুর্ভোগ ভুগতে হবে। কেনন, এখন হ’লো তো?

ভদ্রলোক কি বললেন বুঝতে পারলুম না। কিন্তু মনের ভেতর জেগে উঠল আর একটা দিনের এমনিধারার নিষেধের কথা। তখন প্রলয়ের খাতায় নাম লিখে মৃত্যুর পথে বেরিয়ে পড়েছি। দলপতি বিভলভারটা হাতে ওঁজে দিয়ে বললেন— আজই তোমার

বেরিয়ে পড়তে হবে। কোথায়— কেন জিজ্ঞাসা ক'রো না, স্টেশনে গিয়ে পরেশের কাছে সব জানতে পারবে।

কোনো প্রশ্ন করতে পারলুম না, কারণ আমাদের মনের ভেতর কোনো রকমের কৌতূহল থাকতে নেই। বাড়িতে ফিরে বিদায় নেবার সময় মাকে প্রণাম করতেই তিনি বললেন — আজ বৈশাখের বারবেলা পড়ে গেছে, সুতরাং তোর তো আজ কোথাও যাওয়া হতে পারে না অমল।

মনে মনে হেসে ভাবলুম— ঝড়ের সাথে ভুড়ি বাজিয়ে যার চলার পথ, মৃত্যুকে হাতে ক'রে তুলে দিতে ও হাতে করে তুলে নিতে যার এক লহমা দেবী করা চলবে না তার কাছে আবার বৈশাখের বারবেলা। মার পা'র ধুলো মাথায় তুলে নিয়ে বললুম, থাকবার তো শক্তি আমাব নেই মা, কিন্তু তুমি যদি আশীর্বাদ কব— তবে এ বারবেলাই আনার পথে মাহেন্দ্রযোগেব শুভ ও ধ্রুবকে টেনে নিয়ে আসবে।

সেদিনকার যাত্রা শুভ হ'য়েছিল কি অশুভ হয়েছিল, কালের কষ্টি-পাথরে তার দাগ এখনো ঠিক হ'য়ে থাকা পড়েনি। আজও আবাব সেই বৃহস্পতিবারের বারবেলা! মনটা হঠাৎ যে কোথায় ছড়িয়ে পড়ল ঠিক পেলুম না। কিন্তু ধান যখন ভাঙল দেখি ট্রেন শিয়ালদা স্টেশনে এসে পৌঁছে গেছে।

ঘড়ি খুলে দেখলুম আটটা! যেখানে ভোর চারটায় পৌঁছবার কথা সেখানে পৌঁছতে আটটা বেজে গেছে দেখেই মনটা অত্যন্ত বিগড়ে গেল।

ভেবেছিলুম, কাঙালো তাড়াতাড়ি সেরে নিয়ে আজই আবার কলকাতা থেকে লম্বা পাড়ি দেবো। কিন্তু প্রাতঃকালটা তো পৌঁছতেই কেটে গেল— রৌদ্রের দিকে তাকিয়ে দুপুরটাও যে অকাঙ্ক্ষেই কেটে যাবে সে সম্বন্ধেও কোন সন্দেহ রইল না।

বিরান্তভরা মন নিয়ে স্টেশন থেকে বেরিয়ে মোড় ঘুরতেই দেখি মোড়ের ওপরেই ফুটপাথের খানিকটা যায়গা দড়ির বেড় দিয়ে ঘেরা, আর তারি ভেতরে কয়েকটা গোরা সেপাই দিবা আরামে হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছে এবং কয়েকটা বন্দুক আড়াআড়ি ভাবে একটার গায়ে আর একটা ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে তাদের পাহারা দিচ্ছে।

চিরদিনের অভ্যাসমত একান্ত অনামনস্কভাবেই পথটা পাড়ি দিচ্ছিলুম। হঠাৎ এদের দেখে তড়াক ক'রে মনে পড়ে গেল, খবরের কাগজে-পড়া কলকাতার এ কয়টা দিনের ইতিহাস। অসতর্ক মনটাকে সামলে নিয়ে পা দুটোর গতিটাকে একটু দ্রুত ক'রে তুলে এগিয়ে চললুম মেছুয়াবাজারের দিকে।

ভয় ভিনিসটা মনের ভেতর কোনদিনই খুব বেশি ছিল না। সেই জন্য ছোটবেলা থেকে ডার্নাপটে ব'লে আমার একটা দুর্ভাগ্য ছিল। তারপর নানা রকমের আখড়ায় ঘুরে ঘুরে শরীরটাকে তৈরি করবাব যত রকম দুঃসাধ্য কসরৎ ছিল, সবগুলোই অল্পবিস্তর আয়ত্ত ক'রে নিয়েছিলুম। তাছাড়া প্রলয়ের দোলায় এক যুগ ধরে দোলার ফলেও, আর কিছু না হোক মনটা ভয়ের হাত হ'তে সম্পূর্ণরূপেই মুক্ত হ'য়ে উঠেছিল। তাই পেছন থেকে ছোরা চালিয়ে 'সাহসী' হবার সুযোগটা কেউ কিনে না নেয়, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এগিয়েই চলেছিলুম। হঠাৎ মির্জাপুরের মোড়টা পেরিয়ে খানিকটা এগিয়ে আসতেই পা দুটো থমকে দাঁড়ালো। সামনেই চেয়ে দেখলুম, একখানা মোটরের চারপাশ ঘিরে পনের বিশজন লোক হল্লা শুরু ক'রে দিয়েছে। পাশ কাটিয়ে সরে পড়বার মতলব করছি এমন সময় হঠাৎ নারীকণ্ঠের চিংকারে সে সঙ্কল্প আমার এক মুহূর্তে কোথায় যে মিলিয়ে গেল টেরও পেলুম না। পা দুটোও মোটরখানার সামনে গিয়েই একেবারে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

চেয়ে দেখি একটি মেয়ে গাড়ির পাদানের কাছে দাঁড়িয়ে ঠক ঠক ক'বে কাঁপছে। বয়স তাব ষোল সতেরোর বেশি হবে না। বড় বড় কালো দুটো চোখের ভেতর অসহায় বেদনার

সে কি করুণ চাহনি! সে চাহনি একবার যেখানে পড়ে সেইখানেই যেন বিঁধে থাকে। গোলাপের দলের মতো পাতলা দুটো ঠোঁট রক্ত হারিয়ে একেবারে মরার দেহের মত সাদা হ'য়ে উঠেছে।

শোক এবং বাথার এই মূর্ত প্রতিমাটিকে দেখে কেউ যে তার ওপর অত্যাচার করতে পারে একথা কখনো বিশ্বাস করতে পারতুম না— যদি চোখের ওপর সেই অত্যাচারের দৃশ্যটা না দেখতুম। যে লোকটা জোর ক'রে গাড়ির ভেতর থেকে তাঁকে মাটির ওপর টেনে নামিয়েছে তখনো সে তার কর্কশ বিস্ত্রী হাত দুটোকে গুটিয়ে নেয় নি, তার স্পর্শের ভেতর দিয়ে একটা কুৎসিত বীভৎসতা বিদ্যুতের প্রবাহের মতো চারিয়ে গিয়ে মেয়েটার মুখখানাকে যেন আগুনের আঁচে শুকিয়ে যাওয়া ফুলের মতো পাংগু ও বিবর্ণ ক'রে তুলেছে। দলের সবগুলো লোকের চোখ সেই একই রকমের কদর্যতায় ছোপানো। 'সেনসাসের' রিপোর্টে না কিসে পড়েছিলুম মনে নেই যে, বাংলার শতকরা নব্বুই জন মুসলমানের দেহেই হিন্দুর রক্ত আছে। হিন্দুর রক্ত জাত খোয়ালেও যে এটা পাশবিকতার ধাপে এসে দাঁড়াতে পারে সে কথা মনে হতেই হিন্দুর ওপরেও অশ্রদ্ধায় মনটা ভ'রে গেল। হঠাৎ মনে পড়ল গীতার সেই শ্লোকটা, যাতে লেখা আছে— স্বধর্মে মরাও ভালো, তথাপি পরের ধর্ম নিযো না, কারণ সে ভারি ভয়াবহ। এই ভয়াবহ পরধর্ম গ্রহণের ছবিটা চোখের ওপর ফুটে উঠতেই শিউরে উঠলুম।

গাড়ির ভেতরে চেয়ে দেখলুম, মেয়েটার চাইতেও জড়ভরত হ'য়ে ব'সে রয়েছেন একটি ভদ্রলোক। তাঁর সমস্ত মুখের ভিতর দিয়ে একটা ভীকৃতার ছাপ, আমাদের জাতীয় চরিত্রের আর একটা দিককেই জীবন্ত করে ফুটিয়ে তুলছিল।

ঘৃণায় সমস্ত শরীরটা রি রি ক'রে উঠল। কথা বলবারও প্রবৃত্তি হ'লো না। কেবল হাতটা নিজে হ'তে ঘুবে গিয়ে যে গুণ্ডটার হাত মেয়েটাকে জড়িয়ে ধবেছিল তার কানের কাছটাতে এমনি ভাবে স্পর্শ করলে যে সে এক মুহূর্তেই মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ল। তারপরেই ঝাঁক'রে মেয়েটাকে গাড়ির ওপর তুলে দিয়ে গাড়িতেই পিঠ রেখে দাঁড়িয়ে বললুম— ভাই সব, বন্ধুর অবস্থা তো চোখের ওপরেই দেখলে, আর মিছেমিছি এখানে ভিড় পাকিয়ে তোমাদের যে বিশেষ লাভ হবে তা তো মনে হয় না। গায়ে তো আমার কতটা জোর আছে তা আমার এই দেহটা এবং লাঠিতেও যে আমি ওস্তাদ তা আমাব লাঠি ধবার কায়দাটার দিকে তাকালেই বুঝতে পারবে। সুতরাং যদি প্রাণের মায়া থাকে তো এই বেলাই সরে পড়।

কিন্তু তাদের কানে পৌছবার আগেই কথাগুলো তাদের হিংস্র ব্রহ্ম গর্জনের ভেতরেই নিরুদ্দেশ হ'য়ে হারিয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে দেখলুম, আট দশখানা লাঠি বোঁ বোঁ ক'রে আমাব মাথার ওপরে উদ্যত হ'য়ে উঠেছে।

এর পর লাঠির সঙ্গে লাঠির লড়াই শুরু হ'য়ে গেল। রক্ত তেতে মনটা তখন মাতালের মতো মত্ত হ'য়ে উঠেছে। দু'তিন মিনিট পার হ'তে না হতেই দেখলুম, দু'তিনটে লোক পথের ওপর শুয়ে পড়ল।

কিন্তু এ ধরনের অসম্ভব লড়াই যে আব বেশিক্ষণ চলবে না, সে কথাও বুঝতে দেবী হ'ল না। কাফেরের গায়ের গন্ধ পেয়েই সামনের মসজিদটা হ'তে ধর্মপ্রাণ মুশাফেরের দল, পিল্ পিল্ ক'রে বেরিয়ে এসে সেই গুণ্ডাদের দলের সঙ্গে আশ্চর্য রকমে এক হ'য়ে মিশে যেতে লাগল। চার পাশে কোথাও একটা হিন্দুর মুখ নেই। অথচ হিন্দুর ঝাড়ি যে আসে পাশে কম ছিল তাও নয়। আজ সত্য সত্যই মনে হ'ল হিন্দুহানটা হিন্দুশূন্য হ'য়ে যাওয়াটা অসম্ভব হয়তো নাও হ'তে পারে এবং যদি হয় সেটা হয়তো খুব বেশিরকমের কিছু অন্যায়াও হবে না। ক্রীবহের প্রায়শ্চিত্ত ধ্বংসের আগুনে জ্বলেই সব জাতকে গ্রহণ কর'ত হয় এবং বিধাতা নিজের হাতেই এসব অপরাধের দণ্ড বিধান করেন। তাই ভগবান

সকলের আগে এবং সব চেয়ে জোরে অর্জুনকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা হচ্ছে—  
ক্ৰৈবাং মাশ্ব গম পার্থঃ।

খানিকটা হতাশ হ'য়েই গাড়ির ভেতরকার ভদ্রলোকটিকে ডেকে বললুম,— ঠায় পুতুলের মত চুপ ক'রে বসে না থেকে, একখানা লাঠি কুড়িয়ে নিয়ে যদি আমার পাশে এসে দাঁড়ান, তাহ'লেও আমার বুকে খানিকটা জোর আসে।

কিন্তু সে মূর্তির ভেতরে কোনো রকমেরই ভাবান্তর দেখা গেল না। মেয়েটি শুধু অশ্রুভেজা কণ্ঠে বললে— কাকে বলছেন আপনি! ওঁর দ্বারা কোনো সাহায্যের আশা করা, আর এই পথের ধুলোগুলোকে ডেকে লড়াই করতে বলা সে তো একই রকমের কথা।

শেষের দিকের স্বরটার ভেতর দিয়ে যেন একটা ঘুণার ধিক্কার বৃষ্টির ধারার মতো ঝ'রে পড়তে লাগল। আমি আশ্চর্য হ'য়ে তার মুখের দিকে তাকাতাই স্বরটা কোমল ক'রে তুলে আবার বললে— কিন্তু কেন আমাদের জন্য নিশ্চিত মৃত্যুর ভেতর আপনি ঝাঁপিয়ে পড়ছেন? আমাদের ভাগ্য কি আছে জানি। কিন্তু ওটা তো আমাদেরই ন্যায় প্রাপ্য। আপনাব হাতের লাঠির জোর আছে, আমাদের ভাগাটা ভগবানের হাতে ছেড়ে দিয়েই আপনি আপনাকে বাঁচান।

শ্রান্তিতে কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল, তবু কষ্টটা একটু ঝেড়ে তাক্য ক'রে নিয়ে বললুম— চেষ্টা করলে হয়তো নিজেকে বাঁচাতে পারি কিন্তু সে তো হয় না। তোমার অনেক ভাই নিজেকে বোনকে অত্যাচারীর হাতে তুলে দিয়ে যে মহাপাপ করেছে ম'রে যদি তার এতটুকু প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি তবে তাতেই আমার জীবন সার্থক হবে।

মরতে রাক্তি ছিলুম কিন্তু মরতে হ'ল না। হঠাৎ ভিড়ের ভেতর হ'তে একটা লোক চিংকাব করে উঠে বললে— হুসিয়ার, ভাই সব। কেব্লা সে শালা গোবা পন্টন লোক সব আয়া গিয়া।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে লোকের দেহে গিজ গিজ করা সেই রাস্তাটা হঠাৎ এক মুহূর্তে একেবারে ফাঁকা হ'য়ে খালি হ'য়ে গেল। অতগুলো লোক কে যে কোথা দিয়ে উধাও হ'য়ে গেল বুঝে উঠতে পারলুম না। আঙুলের ডগা দিয়ে কপাল থেকে বামের ফাঁটাগুলো ঝেড়ে ফেলে লাঠিটাতে ভব দিয়ে স্থিৎ হ'য়ে দাঁড়াতেই দেখলুম— একটা ছোটখাট পন্টনের দল ফাঁকা রাস্তাটা জুতার টকরে এবং quick march-এর কসরতে কাঁপিয়ে তুলেছে।

দলটাকে Halt-এর স্বকুম দিয়ে সেনাপতি সাহেবটি আমাদের কাছে এগিয়ে আসতেই গাড়ির ভেতরকার ভদ্র লোকটির ভেতর একটা আশ্চর্য রকমের পরিবর্তন দেখা গেল। সে গাড়ির ভেতর থেকে লাফিয়ে নেমেই সাহেবটাকে পুরোদস্তুর একটা সেলাম ঠুকে বললে— Good morning Sir, you are just in time I had had an attack from the Mohamedan ruffians But I tell you Sir, I am quite innocent Here is my card - I am a servant of his Majesty' Service- a senior

মিলিটারী সাহেবটা তাকে বাধা দিয়ে একটু উত্তেজিত হ'য়েই ব'লে উঠলেন— Shut up Babu কিন্তু তার পরেই কি মনে করে ইংরেজি ছেড়ে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলাতেই বললেন Lady -দের honour বাঁচিয়ে চলবাব কুদরৎ যাদের না আছে এই দাসার সময় তারা Lady -দের নিয়ে পথে বেরিয়েছে কেন? This no time of peace

ভদ্রলোকটি হেসে বললেন— ও কথা বলোনা সাহেব। ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট peace রাখতে পারে না এ তো আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিনে, এই দেখনা, এখানে কোন সময়টাতে যে তোমাদের দরকার তাও তোমাদের ঠিক জানা আছে।

Nonsense! বলেই সাহেব তাঁকে ছেড়ে একটু এগিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন, তার পরেই তাঁর সাদা মোটা হাতখানা বাড়িয়ে আমার হাতটা তাঁর হাতের ভেতর তুলে বললেন— But you are an exception. my young friend! I saw you fighting It was grand. nay. marvellous But you must not go alone. I leave two men to escort you

বলেই যেমন চটপট তারা এসেছিল তেমনি চটপট করেই তারা চলে গেল। আমিও আমার পথের উদ্দেশে পা বাড়িয়ে দিলাম। হঠাৎ পা'র উপরে একটা কোমল স্পর্শ থলেপের মত স্পর্শ অনুভব করে নিচের দিকে তাকাতাই চোখ পড়ল ফুলের মতো অপূর্ব সেই মেয়েটির ওপরে। সে যে কখন আমার পার তলায় বসে পড়ে আমার পা'র ধুলো মাথায় তুলে নিচ্ছিল টের পাইনি। পাটা সরিয়ে নেবার চেষ্টা কবতেই সে জোর করে তাব মুখটা আমার পার ওপরে চেপে ধরে বললে— অমন করে পা যদি আপনি টেনে নেন তবে এই পথেই মাঝখানেই আমি মাথা খুঁড়ে মরব।

গাড়ির ভেতরকার ভদ্রলোকটির দিকে চেয়ে দেখলুম, তাঁর মুখ দিয়ে একটা অস্বাভাবিক বিরক্তি ও হিংসার জ্বালা বা'রে পড়ছে। বললুম— আমি কি জ্ঞাত তা তো জানেন না। তা ছাড়া আপনার স্বামীও বোধ হয় এ প্রণাম জিনিসটা পছন্দ করবেন না। তবে কেন অনর্থক— আমার কথাটাকে শেষ করতে না দিয়েই সে বললে “জ্ঞাত জানলেও এর চাইতে বেশি কিছু হতো না। আমার স্বামীর কথা বলছেন? — আমি জানি, এ নিয়ে আমার অদৃষ্টে অনেক লাঞ্ছনা আছে, কিন্তু এ প্রণাম না করলেও যে সে লাঞ্ছনা কিছুমাত্র কমত তা নয়। তাঁব হাকিমী ক্ষমতা আমাকে রক্ষা করতে পাবলে না অথচ পাথব একজন অজানা অচেনা লোক এসে আমাকে রক্ষা করে গেল— এ পবাজয়ের কথা তিনি কখনো ভুলবেন না। কিন্তু সেজন্য আমি ভাবছি। আপনার পা'র ধুলো আমাকে যে শক্তি দিয়ে গেল, তাতে তাঁর অপমান আমার অনায়াসেই সহ্য হবে। তা ছাড়া বাংলার মেয়েব পক্ষে ঘরে বাইরে সমান ভাবে লাঞ্ছনা সহ্য করা— সে তো কিছু নতুন জিনিসও নয়। দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে তার মনের ওপর যে কড়া পড়ে গেছে তাতে ওসব আঘাত আর আঘাত বলেই মনে হয় না। কিন্তু এ নিয়ে আপনি মিছেমিছি মাথা খারাপ করবেন না। এইবার আমি তবে আসি।” বলেই পা'র ধুলো আবার মাথায় তুলে নিয়ে সে ধীরে ধীরে উঠে গাড়িতে গিয়ে বসল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িও Start দিলে।

পা'র ধুলো নেবার পালা তো সারা হ'লো। কিন্তু এই যে পথের ধুলো উড়িয়ে অর্পাবিচিতা তরুণী চলে গেল, সে ধুলোর জের কি কখনো কোনো কালে মিটেবে আমার কাছে! ধুলোর মাঝে আজ একি আলোর বন্যা নেমে এলো— যাতে আমার চোখ তো জুড়ালোই, মরতে ভুলে গেল। ধুলোগুলোরই পানে চেয়ে চেয়ে যে কতক্ষণ কাটিয়ে দিয়েছিলুম মনে নেই, হঠাৎ একটা গোরা এসে বললে— Am sorry to disturb you Babu But we must go now. It will soon be raining

আকাশের দিকে চেয়ে দেখলুম— দিনের গোড়ায় সূর্যের যে দীপ্তি মনের ভেতর অগ্নিবৃষ্টির ছবিটা একে দিয়েছিল, তা কোথায় মিলিয়ে গেছে, আর তারি জায়গায় সারা আকাশ ছাপিয়ে জেগে উঠেছে কাজলের মতো কালো মেঘেরই ছায়া। আর সে ছায়া সেই অর্পাবিচিতা তরুণীর চোখের মতোই জলে ভরা অথচ তেমনি স্নিগ্ধ। দূরে এ আকাশেরই প্রান্তে মেঘের মাথায় ফুটে উঠেছে একটা অপূর্ব সুন্দর ইন্দ্রধনু। তারি রংগুলো জ্বলছে আমার মনের এক একটি পর্দার এক একটি রঙের রেখা একে দিয়ে। একটা রেখা তার চুলের মতো কালো,

আর একটা রেখা তার হাসির মতো সাদা, একটা রেখা আবার তার গোলাপের পাপড়ির মতো যে অধর সেই অধরেব মতোই লাল।

মনে হ'লো—হায় রে বাংলাদেশ, এ মুহুর্তে কি তোমার ঐ বানরটার গলায় না ঝুলিয়ে দিলেই চলত না!

গোবা দুটোর দিকে তাকিয়ে বললুম—তোমরা যাও, আমার সাহায্যের দরকার হবে না।

তারা বললে—সে হয়না বাবু, আমাদের ওপর যে তোমাকে পৌঁছে দেবার ঝকুম আছে।

ওপরে ছাদ থেকে একটি ভদ্রলোক ডেকে বললেন—এ পাড়ায় যতক্ষণ আছেন, ওদের বিদায় দেবার কল্পনাও করবেন না মশাই। ওরা আছে তাই আপনার দেহে প্রাণটা এখনও টিকে আছে, নতুবা যে কাজ করেছেন আপনি, এখান থেকে মাথা নিয়ে যেতে হ'ত না আপনার।

হেসে ভদ্রলোকটিকে ধন্যবাদ দিয়ে মনে মনে বললুম—এদের প্রতি এই ঋদ্ধাই তো াতাকে অক্ষয় করে রেখেছে এদেশের বুকে। এবা যা কবলে, পাড়ার দশজন হিন্দু এসে যদি আমার পাশে দাঁড়াত তবে তার ফলও ঠিক এই রকমেরই হতো।

তারপর পথের যে ধুলোর ওপরে তরুণী হাঁটু গেড়ে বসেছিল, তারি খানিকটা কুড়িয়ে নিয়ে, কাগজের ডাকে পুবে, বুকের পকেটে রেখে যে পথ বেয়ে চলেছিলুম সেই পথের স্রোতেই আবাব গা ভাসিয়ে দিলুম।

## একটা প্রকাণ্ড 'হাঁ'

জ্যোতির্ময়ী দেবী

রাত্তির তিনটে হবে। নীতি উঠে বসল বিছানায়। মনে হল স্বপ্ন, না, জেগেই ছিল? কিন্তু তিনদিন ধরেই এই প্রকাণ্ড হাঁ-করা চাঁদের মুখের মত হাসিভরা একটা মুখ ওকে যেন মনের মধ্যে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। যেন কি বলতে চায় অথচ বলছে না। শুধু বিস্তীর্ণ বায়ুভরা একটা হাঁ-করা হাসি ওর দিকে চেয়ে আছে। চাঁদের মুখের মত কাত-হওয়া মুখটা। তার সমস্ত গালটা হাসিতে বিভাসিত। যেন মানুষের মুখের স্বাভাবিক হাসি।

নীতির পাশে ভাইবোনরা ঘুমচ্ছে। তাদের গভীর শান্ত নিঃশ্বাসেব শব্দ শোনা যাচ্ছে। জানালার বাইরে আকাশটা দেখা যাচ্ছে। নীতি ভাবল চাঁদ কি উঠেছে? আজ কি তিথি? চাঁদটা কোন দিকে? উঠেছে, না উঠবে? জ্যোৎস্না কি আছে? কিন্তু কলকাতায় জ্যোৎস্না— তার আনাগোনার জায়গা খুবই সঙ্কীর্ণ। মাঝের তিথিতে অর্থাৎ পূর্ণিমার কাছাকাছি তিথিগুলোতে একটু আধটু আলো জানালার পাশে বারান্দার পাশে আর ছাতে আসে তাতে চাঁদকে যে সব সময় দেখা যাবে তা নাও হতে পারে। শুধু জ্যোৎস্নার আভাসটাই উঁকি মারে।

নীতি জানালার বাইরে একবার তাকালে। তারপর বিরস মনে টেবিল আলোটা ছেলে স্কুলের পরীক্ষার খাতাপত্র বিছানায় ছড়িয়ে বসল। আর চাঁদের হাসির চালাকির কথা ভাববার দরকার নেই—চাকরী তো আছে।

খাতা দেখে। সংশোধন কবে। নম্বর ফেলে।—ভালো বা মন্দ মন্তব্য লেখে। আর মাঝে মাঝে সর্বোত্তম হাসে ছাত্রীদের ভুল দেখে।

হঠাৎ পাশের ঘরে দরজার খিল খোলার শব্দ হল। মা উঠলেন হয়ত। ঘড়ির দিকে চোখ পড়ল—পৌনে পাঁচটা!

এতক্ষণে শরীরের কথা মনে হল। ওঃ পিঠটা আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে।

আর খাতা দেখে না। প্রায় শেষ করে এনেছে।

শুয়ে পড়ে। এবার জানালা দিয়ে আশ্বিনের শেষরাত্রের হাওয়া আসে। আর হ্যাঁ, কাত হয়ে পড়া চাঁদকেও পশ্চিম দিগন্তে দেখতে পেল।

হঠাৎ এই সমস্ত অস্বস্তিকর ভাবনাগুলোকে কঠিন ভাবে নেড়েচেড়ে তলিয়ে দেখতে ইচ্ছে হ'ল।

কোথেকে, কেমন কবে, কবে, কেন এই প্রকাণ্ড হাসির গহ্বরওয়ালা বায়ু হাসিভরা চাঁদের মুখ ওর মনে বাসা বাঁধল। ভ্রাগল। চাঁদ তো আজ বা কালই দেখছে। হয়ত মার কোলে থেকে 'আয় চাঁদ আয়' শুনেছে।

কিন্তু মনে মনে একটু হেসে ফেলে। মার কোলে? তিন ভাই চার বোনের একজন। মার কি কোনো মেয়ে নিয়ে আর 'আদিখ্যেতার' অবসর ছিল। আগে পল্লী আরো বোন আর ভাই।

যাক, সে তলিয়ে ভাবতে বসল সেই কবেকার কথা। যখন থেকে এই মনের মধ্যে প্রকাণ্ড



ফাঁক ঐ 'হাঁটা বাসা বেঁধেছে। তাকে দেখে নিয়ে হয় ঝেড়ে ফেলতে হবে, নয় কি করা যায় তাই করতে হবে।

২

হ্যাঁ, ওর ইস্কুলটা বেহালায়।

সেদিন ট্রামে ফিরছিল। মেয়েদের সিটের পাশের জায়গাটা খালি ছিল। বিকেলের রোদ্দুরে আকাশভরা আষাঢ় মাস। সে জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিল।

সহসা কে একজন জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে কি একটু বসতে পারি?'

মুখ না ফিঁরিয়েই সে বলল, হ্যাঁ বসুন। সারাদিনের ক্লান্তিতে গরমে চোখ যেন হালা করছিল। বাড়ী গিয়ে শুয়ে পড়তে পারলে বাঁচে ভাবছে। চোখ বুজেই কিম্বা না-দেখা চোখে সে বসেছিল।

যে পাশে এসে বসল, সে হঠাৎ বেশ একটু 'কিস্ত' 'কিস্ত' ভাবে বললে, 'কিছু মনে করবেন না। আপনি কি নীতি মৈত্র?'

নিজের নাম শুনে সে চমকে উঠে মুখ ফেরালো।

ক্ষীণকায় পাশের লোকটিও তার মুখটি দেখে চমকালো।

এভাবে বললে, 'তুমি—তুমি নীতি? আপনি নীতি মৈত্র তো?'

নীতি বললে, 'তুমি! আপনি? তুমি অমল ঘোষ? তোমাকে যে চেনা যায় না এমন হয়ে গেছে...।'

অমল একটু হেসে বলল, 'তোমাকেও তো ওই কথাটাই বলতে পারি।'

নীতি শুকনো ভাবে একটু হাসলে। কিছু বললে না।

দুজনেই চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। ঝাপসা ছবির মত অনেকগুলো দিন আর ঘটনা তরতর করে চোখের সামনে ভেসে এলো। দুজনের মনে দুভাবে।

নীতির থার্ড ইয়ারে পড়ার সময়ে দুজনের আলাপ হয়। ভাব হয়। ভালোবাসে পরস্পরকে। ভালো লাগাটা ভালোবাসার পরিণতি লাভ করে।

তারপর পিতার ক্রোধ, জননীর বিরাগ, প্রতিবেশীদের ইস্তিময় নিন্দার ওগুন, সব জড়িয়ে একটা জটিল অবস্থা।

অসবর্ণ বিয়ের কথা তারা বলে। প্রচণ্ড রাগে তাতে পিতা জননীকে দিয়ে বলেন, 'ওসব বিয়ে হতে গেলে কোমরে টাকার জোর থাকা চাই। বুঝলে, টাকার জোর বড় জোর। টাকার জোর থাকলেই ওসব 'প্রেম ট্রেন' করে বিয়ের ব্যবস্থা করা যায়। ওসব খেয়াল ছাড়তে বল। ওই করার জন্যে ওকে আমি কলেজে পড়াই নি। মন দিয়ে পড়ে পরীক্ষাটা দিয়ে আমার মাথা কিনতে বলো।'

ছোট বাড়ী।—পাশের ঘরে সরব কথা। মাকে আর বলতে হল না কিছু। ভাইবোনে সবাক্ভাবে বসে নীতি সব কথাই শুনতে পেল।

মা এসে কেঁদে ফেলে বললেন, 'আমি কি করে মুখ দেখাব পাড়ায়—সমাজে সকলেবি কাছে। তোরা এই করে আমাদের মুখ ডুবিয়ে দিবি.....।'

নীতি লজ্জায় থিকারে যেন মরে গেল। কিন্তু নাঃ। নীতি প্রেমের জন্যে আয়তহত্যাও করেনি। পালিয়েও যায়নি বাড়ী থেকে। ভালো করে মন দিয়ে পড়ে বি.এ. পরীক্ষা ভালোভাবেই পাশ করল।

তারপর বি.টি.। তারপর চাকরী। বাবার সংসারের কিছু ভার নেওয়া।

ট্রাম চলেছে রেসকোর্সের পাশ দিয়ে। নামবার সময় হয়ে এলো। তার চোখটা পাশে বসা  
অমলের দিকে পড়ল।

সেও ভাবছিল ঐ রকম সব কথা। পড়ায় ভাল। তার ভাগ্যে এসে পড়েছিল পিতার  
মৃত্যু, ফিফথ ইয়ারেই পড়া বন্ধ। মা ভাই বোন, সংসার। সকলের ভার। জীবিকার সন্ধান....।

একটা টপে ট্রাম থামল।

কিছু কথার আগেই একটি মেয়ে এসে সিটের পাশে দাঁড়াল। অমল উঠে দাঁড়াল।

ধর্মতলা এসে পড়ল। এবাব নামতে হবে। নীতি এদিক ওদিক তাকাল। অমল কোন্  
দিকে? নেনে গেল কি? না। অমল নামছে। সেও নামল।

সে একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি কোন্ দিকে?'

নীতি বললে, 'বেলেঘাটা। তুমি?'

'শ্যামবাজার'। দূরত্বে নামল।

'এদিকে তোমার কি আপস? ' নীতি বলে।

'খিদিরপুর ডকে একটা কেরানীগিরি' একটু হেসে অমল বলে। 'তুমি?'

'আমিও বেহালায় একটা স্কুলের টিচার।'

প্রতিদিনের একই পথের যাত্রী! এতদিন দেখা হয় নি। আশ্চর্য! দুজনেই ভাবে।

অমল। '—আচ্ছা। আন্ত যাই। তুমি কটায় বেরোও? কিছু কথা হল না আজ।'

নীতি। '—বড্ড ভিড় হয়ে যায় তাই প্রায় একটু সকালেই বেরুই। মাঝে মাঝে বাসেও উঠি।'

### ৩

তারপর থেকে এখন প্রায়ই দেখা হয়। যেন দেখা হবার জন্যেই দুজনেই সময়ের একটু  
বেশী আগে আসে। দু'একটা কথা কয়। হাসে।

নীতি ভাবে যেন কতদিন হাসেনি। কারো সঙ্গে গল্প করেনি।

দু'একদিন পরে জিজ্ঞাসা কবেছিল, 'সেই বাড়ীতেই আছ?'

অমল বললে, 'হ্যাঁ'।

নীতি জননত অমলের বিয়ে হয়েছে। একটু দ্বিধা করে বললে, 'কে কে আছেন বাড়ীতে?'  
ভাইরা মা কোথায়? ছেলেমেয়ে আছে?'

অমল বললে, 'মা আছেন। আর কেউ নেই, একটি ছেলে আছে শুধু।'

'—বৌ কোথায়?'

একটু খেমে অমল বললে, 'এই বছরখানেক হল হাসপাতালে বাচ্চা হতে গিয়ে আর  
ফিরে আসেনি।'

নীতি চুপ হয়ে গেল।—তারপর বললে, 'আহা। বাচ্চাটি?'

'সেও নেই।'

'বাড়ীতে তবে শুধু মা আছেন?'

'হ্যাঁ, আর বড় ছেলেটি আছে।'

অমল কথা শেষ করে বললে, 'নিজের কথাই বলছি, তোমার কথা তো কিছুই জিজ্ঞেস  
করিনি।' 'সিঁথির দিকে তাকালো। সন্ন সাদা সিঁথেটা।' বিয়ে করনি দেখছি?'

সে শুকনো ভাবে একটু হেসেছিল। কিছু বলে নি।

অমল একটু পরে জিজ্ঞাসা করল, 'ভাইবোনদের বিয়ে হয়েছে? প্রীতি, বীণা, গীতি?'  
প্রীতি তো তোমারি মত দেখতে অনেকটা। বেশ সুন্দর ছিল, না?'

ওর মতঃ সুন্দর দেখতে। নীতির চোখবসা ক্লান্ত মুখে একটা শীর্ণ হাসি উঁকি মেবে যায় যেন। মুখে বললে, 'হ্যাঁ, ওদের বিয়ে হয়েছে। দাদারও বিয়ে হল। শুধু গীতি বাকি।'

'ও!' অমল অবাক হয়। '—শ্রীতির কোথায় বিয়ে হল? বর ভালো হয়েছে?'

নীতি ওর দিকে ফিরে একবার তাকালো। তারপর বললে, 'হ্যাঁ খুব ভালো বর ঘর। পূর্ববঙ্গের এক জমিদারের ছেলে। সুখাংও মিস্ত্রির সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। দাদারও হয়েছে একটি দস্ত বাড়ীর মেয়ের সঙ্গে। অসবর্ণ, ওরাও একসঙ্গে পড়ত। ভাব হয়েছিল। সুখাংওরা খুব বড় লোক। এরা বড় লোক নয়। কিন্তু দাদা তো রোজ্জগার করে।'।

যেন নীতি রোজ্জগার করে না। অমল একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। অসবর্ণঃ দুটো অসবর্ণ বিয়ে দিলেন ওর বাবা মাঃ না, তাঁরা হয়ত নেই!

নীতি চুপ করেই ছিল। দুজনেই এককথাই ভাবছিল। সেই নিজেদের কথাই কিঃ

অমল এবার বললে, 'মা বাবা আছেনঃ মত দিলেন এই সব নিয়েতে?'

টাম ধর্মতলায় এসে পড়েছে। নামতে হবে। নীতি উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, 'হ্যাঁ। খুব বড় লোক তারা। বাবাব অমত হয়নি। চল নামি।'

.. তার মুখে নৃদ্য একটু হাসির রেখা ফুটল কিঃ অমল ভাবে।

## 8

নীতি শুয়ে শুয়ে আবার ভাবে! হ্যাঁ, খুব বড়লোক জমিদার সুখাংওরা। প্রায়ই গাড়ি কবে আসত। জমিদারী ব মাছ ফল আম কাঠাল ওড মিষ্টি সন্দেশ পাঠাত ঝাঁকা ঝুড়ি ভবে, থালা ভরে। বাড়ীতে উৎসব পড়ে যেতো। তাকে নিমন্ত্রণ কবা হত। সেও আবার সকলকে সিনেমা থিয়েটারেও নিয়ে যেতো। মাছ এলে সেদিন বাবা বাম্মাব মেনু করে দিতেন। রাত অবধি বসে তার সঙ্গে সকলের খাওয়া-দাওয়া হ'ত।

বিষেব প্রস্তাব আসার আগেই তাঁরা মনে মনে সব ঠিক করে রেখেছিলেন। ছেলে নিজেরই কর্তা।—বিধবা মা কোনো আপত্তি করবেন না। আভাস দিয়েছিল শ্রীতি।

\* \* \* \* \*

ছেলেব প্রস্তাবে মা আব বাবা বললেন, 'এত ভাগ্য শ্রীতির হবে তা কে জানত!..'

তারপর ঘোর ঘটা করে পাশের বাড়ীর ছাত সামনের বাড়ীর উঠান বাহিরের ঘর সব নিয়ে মহা ঝাঁকজমক কবে শ্রীতিব বিয়ে হয়ে গেল।—বাবা ভানাইকে হীরের আংটি দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। শ্রীতিকেও গহনাপত্র দিলেন। কিছু ধারদেনাও হ'ল। কিন্তু সে তো 'হাযরে' বয়ের হাতে দিতে গেলেও নগদে গহনায় দিতেই হত।!...।

এবার নীতির মুখে একটা হাসির রেখা ফুটে ওঠে। সে উঠে বসে খোঁপাটা ঠিক করতে কবতে ভাবে, কিন্তু এবার আর মা কেঁদে বলেন নি, কি করে মুখ দেখাব লোকের কাছে। বেশ মুখ মাথা উঁচু করেই লোকজন খাওয়ালেন। গর্বিত ভাবেই মুখ দেখালেন মা। প্রতিবেশীদের কাছে ভানাইয়ের ঐশ্বর্য এবং সৌন্দর্য নিয়ে কাহিনী বিস্তৃত করেই বলতে লাগলেন। তারা বিতৃষ্ণ ঈর্ষাতুর শুকনো মুখে শুনতে শুনতে নেমস্তম্ব খেল। খেয়ে বাড়ী গেল। নিন্দে করতে বা জাতের খোঁটা দিতে পারল না। অত বড় লোক, কম কথা!....কত বড় গাড়ীখানা, গলিতে ঢুকতেই পারে না।

আর চাঁদটা নিজের খুশীমত নীতির অবসর হলেই 'হাঁ' করে হেসে যায় তার মনে। সেটা বেশীর ভাগই নীতির রাব্রের নিশ্চিতি অবসরে। যখন বাবা মা নিশ্চিস্ত হয়ে শুয়ে পড়েন। ভাই ভাত্র পাশের ঘরে ওনওন করে গল্প করে। ভাইয়ের ভালো কাজ হয়েছে। সংসার সচ্ছল হয়েছে। বোনেরা শ্বশুরবাড়ী থেকে আসা যাওয়া করে। বাড়ীতে হাসিগল্পের ধুম। চায়ের আসর সন্ধ্যারাত্রে জমে। যখন নীতি খাতার বোঝা ছড়িয়ে খাতা দেখে। চাঁদটাও হাসে মনের ভেতরে।

পাশের ঘরে—এবার বাবা মা জাগলেন। নীতি শুয়ে ছিল, সেও এপাশ ওপাশ করে ক্লান্ত মুখে উঠে বসল।

ঝি এসে কড়া নাড়ল।—তারপর উনোনে আওন পড়ল।—ভাত্র উঠলো। মা রান্নাঘরে গেছেন। চায়ের কেতলী বসেছে। নীতি মনে মনে সব দেখতে পাচ্ছে। কার জন্য বিজুট, কার জন্য রুটি, কার জন্য জিলিপী আসবে। সিঙ্গাড়া আসবে কোনদিন তাও সে সব জানে।

তারপর প্রকাণ্ড হাঁড়ি করে সিদ্ধচালের ভাত বসবে, আলুভাতে আব হয়ত কুমড়া বিস্ফেও ভাতে দেওয়া হবে। হয়ত ডাল ভাতে। বাবা বাজারে যাবেন। মাছ আসবে তরকারি আসবে। ততক্ষণে নীতির স্নান কাপড় পরা হয়ে যাবে। ডাল ভাতই খেতে পাবে। মাছ কুটে বেছে দিতে ঝিয়ের সময় হয় না। বৌদিকেই কুটতে হয়। সে ছোট ছেলে নিয়ে সব দিন ঠিক সময়ে আসে না।

মা বলেন, 'একখানা মাছ ভাত্রা হলে হতো। রোজই ডাল ভাত আলুভাতে বেওন পটল ভাত্রা দিয়ে খাওয়া....।'

কিন্তু তাই খেতে হয়। খেতে দেন। সে আর কিছু বলে না। বেহালা তো কম দূর নয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাসে ট্রানে শরীর 'তন্ত্রা' হয়ে যায়।

মনে মনে হাসে—'তন্ত্রা!' হ্যাঁ তন্ত্রাই তো! সংসারকে দাঁড়াতে বসতে আশ্রয় দিতে সে তো 'তন্ত্রার' কাজই করছে।

কিন্তু হঠাৎ যেন কি রকম মনটা ভাল হয়ে যায়। সে ডালভাত খেয়ে বেরিয়ে পড়ে প্রতিদিনের চেয়ে কুড়ি মিনিট আগেই। অমলকে ধর্মতলায় পেয়ে যাবে তাহলে।

ভাই বলে, 'এত আগে ছুটছিস কেন?'

বাবাও বলেন, 'এখনো তো নটাই বাজেনি।'

তার মুখ কঠিন হয়ে ওঠে। 'যা ভিড় হয়ে যায় জানইতো।'

দুজনো দেখা হয়। হয় ফেরবার পথে, নয় যাবার মুখে।

দুজনোরই যে একই কথা অনেক বার ভেবেছে। আবারো ভাবে। কেউ কাউকে যদিও বলে না।

আবার একদিন অমল বলল, 'ছেলেটার পড়াশোনার জন্যে ভাবনায় পড়েছি। মা বড়ো হয়েছেন, সামলাতে পারেন না, রাস্তায় বেরিয়ে যায়। নিজের তো কিছু হল না, ছেলেটিকে যে কি করে দেখি শুনি। একটা ভালো বোর্ডিং-এর সন্ধান দিতে পার? কিংবা ভালো মাস্টার?'

নীতি বললে, 'আচ্ছা সন্ধান দেখব। কিন্তু বোর্ডিং-এ অনেক খরচ হবে। কত বড় হল?'

'এই ছয় হয়েছে।'

'বড্ড ছোট না বোর্ডিং-এর পক্ষে?'

'কিন্তু বাড়ীতে আর তো সামলাবার লোক নেই।'

বাড়ীতে বোনেরা এসেছে। হৈ হৈ উৎসব পড়ে গেছে তাদের ছেলেমেয়ে নিয়ে। বরদের অর্থাৎ জামাইদের নিয়ে।

নীতি শুকনো চোখে বসা ক্লান্ত মুখে এসে রান্নাঘরে পিঁড়িতে বসে চা আর যা হোক দুটি রুটি অথবা অতিথিদের জন্য আনা ভালোমন্দ খাদ্য খেয়ে উঠে পড়ে।

কোনো দিন পর্বতপ্রমাণ খাতার বোঝা নিয়ে বসে। কোনো দিন ক্লান্ত মুখে চোখ বুজে একটা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে।

ভাবে, ভাই টাকা রোজগার করে। বাবাও অর্জন করেন কিছু....। কিন্তু তার মত এই অবসাদ ক্লান্তি কষ্ট তাঁদের তো হয় না!

ভাই পরমোৎসাহে বৌকে নিয়ে সিনেমা চলে যায়। নয়তো বৌয়ের বাপের বাড়ী, মাসী পিসির বাড়ী যায় কিংবা যেখানে খুসি।

বাবা রকে বসে রাজনীতি সমাজনীতি করেন। পরম উদারভাবে এককালে তাঁরই নির্দিষ্ট ধিকৃত অসবর্ণ বিবাহকে এখন সমর্থন করে নিজের ঔদার্য প্রকাশ করেন।

বোনেরা যখন আসে মাব সঙ্গে শ্বশুরবাড়ীর জা ননদদের 'শ্রদ্ধ' করে। কিংবা বাড়ীর ঝি চাকরদের পিণ্ডদান করে অথবা সেজেওজে তারাও সান্ধ্যভ্রমণে বেবোয়।

সে তখন খাতা দেখে, নয়ত কোনো ছাত্রীকে পড়াতে যায়। চুপি চুপি এক একবার ভাবে যদি এম.এ.-টা দিত। আবার ভালো করে পাস করতে পারত। তাহলে এই খাতা দেখার বিরাট খাটুনিটা থেকে অব্যাহতি পেত।

নাঃ, এম. এ. পড়া হয়নি।

আস্থিনের সূর্য অস্তোন্মুখ। ধর্মতলা এলো।

দুজনেই ধর্মতলায় নামল। দুটো বাস না ট্রাম থেকে।

নীতির স্কুল গবর্মের ছুটির পরে খুলেছে। অনেক দিন দেখা হয়নি।

অমল এগিয়ে এল হাসিমুখে। সকালে ওঠবার সময় দেখা হয়নি। বিকালেও ভিড়েতে কেউ কাউকে খুঁজে পায় নি।

দুজনে দাঁড়াল একটু পথে। খুব ভিড়।

তারপর অমল বললে, 'একটু পরেই যাব না হয়—চল একটু ঘুরি ময়দানে।'

নীতি বললে, 'চল।'

অমল। 'কার্জন পার্কে বসবে? বেশ ঠাণ্ডা। যদিও ভিড়।'

'তা হোক। ভিড় আর কোথায় নেই—পথে পার্কে ঘরে। বাড়ীতেও তো ভিড়।'

অমল কিছু বলে না। তার বাড়ীতে ভিড় নেই।...

নীতির মনে হয় একটা ছোট শোবার ঘর। একগাদা বিছানা। ছোট বোন ছোট ভাইয়ের পড়ার একটু জায়গা। নিজের একটা টেবিল। মাটিতে রাখে তিনটে বিছানা পড়বে। তাকে টেবিলে নিজের বই। ভাইবোনদেরও বই আছে।

ঘাসের ওপরে বসে একটা একপাশে জায়গা দেখে।

নীতি বললে, 'তোমার ছেলের জন্য বোর্ডিং-এর খোঁজ করেছিলাম। ঐটুকু ছেলেব জন্যে বিলিভী বোর্ডিং খুব বেশী চায়। দেশীতেও কম নয় অথচ পড়া বা খাওয়াও ভালো নয়। মুসলিম। আর একটু বড় হলে না হয় অত খরচ করতে।'

অমল বললে, 'তা তো বুঝি। কিন্তু কেউ যদি দেখবার মত বাড়ীতে থাকত। মার পক্ষে তো দুরন্ত ছেলের ভাব নেওয়া সম্ভব নয়। তা পার তো একটি ভালো মাস্তার দেখো, যদি কোনো মেয়ে পড়াতে পারেন।'

'দেখব। কিন্তু সে তো এদিকের কাউকে পেলেই ভাল হয়। এদিকের মানুষ অতদূর যাওয়া আসার ঝঙ্কাট পোয়াতে যাবে না হয়ত। তা' একদিন ছেলেকে নিয়ে এসো না। দেখতে ইচ্ছে করে।'

'খোকাকে?' তারপর একটু হেসে বললে, 'কিন্তু কোথায় নিয়ে আসব?'

নীতি বললে, 'তহিতো। তা একদিন ময়দানেই নিয়ে এসো না।'

'সে বাড়ী ফিবে গিয়ে তো আর হয় না। তাহলে একদিন ছুটিব দিন আনব।'

'তাই এনো। দেখা যাবে পড়াশোনা ও কেমন কবে?'

'একটা ছোট স্কুলে পড়ে পাড়ায। ভালো পড়া কি আর হবে।'

'তবু এনো। চল বাড়ী ফেরা যাক।'

সন্ধ্যা শেষ হল। বাড়ী ফিরতে হবে। বাড়ী?

দুজনই অনামনে ট্রামে ওঠে। একজনের ভাইবোন বাপ মা সব আছে বাড়ীতে। আর একজনেরও মা ছেলে আছে। কিন্তু বাড়ী মনে হচ্ছে না যেন সেটা দুজনেরই। যেখানে স্বজন আছেন। শয্যা আছে। খাদ্য আছে। তবে?

৮

একটা বিবিবাবের বিকালে অমল ছেলেকে নিয়ে এসে ময়দানের পথে দাঁড়াল।

নীতিও নামল বাস থেকে। হাতে একটা বল চকোলেট খেজুরের প্যাকেট। কাগজে মোড়া।

ছেলে বাপের হাত ধরে দাঁড়িয়েছিল। অকৃষ্ট মুখে বলটা নিল। চকোলেটের মোড়ক খুলল। ছাড়িয়ে দু' একটা খেল।

তারপর বললে, 'তুমি কে?'

তার বাবা বললে, 'মাসী হয়।'

নীতি হাসল। বললে, 'তুমি কে?'

ছেলে বললে, 'আমি অনিল। বাবা খোক। বলে। আমি এবাবে বল খেলি।'

বল গড়িয়ে দেয় যেদিকে ইচ্ছে। কুড়িয়েও আনে! আবার অমল নীতি যেদিকে বসেছে সেদিকেও ছুঁড়ে ফেলে।

একটা বেলুনওয়ালা এলো। একটা চিনেবাদামওয়ালা। ঝালমুড়ি ফেরিওয়ালা আসে। কাজুবাদামওয়ালা আসে।

নীতি বেলুন কিনল। বাদাম কিনল। খোকা বেলুন ওড়াল এবং ফাটালো। আর খুব হাসল। নীতি ওব হাসি দেখে ওর সঙ্গে হাসে। অমলও হাসে।

অমল বললে, 'মাসী আর বেলুন কিনে দেবে না।'

খোকা নীতির দিকে চেয়ে বলে, 'দেবে না আর? সত্যি?' গুনতে নীতির ভারি ভালো লাগে। ওরা বসে বাদাম ছাড়ায় আর একটা দুটো করে খায়। সন্ধ্যা শেষ হয়ে রাত হয়ে গেল।

অমল উঠে দাঁড়াল, বললে, 'এবারে যাই, মা ভাববেন। খাবার সময় হল খোকার।'

অন্ধকার থেকে বল কুড়িয়ে নিয়ে ছেলে ফিরে এলো। নীতিও দাঁড়াল।

৯

মা বসেছিলেন রান্নাঘরে, আর সকলের খাওয়া হয়ে গেছে। এক বোন এসেছে ঝগুরবাড়ী থেকে। আঁতুড় হবে।

নীতি খেতে বসে। মাও বসেছেন।

মার লাল-পাড় শাড়ী। পরিষ্কার চুল বাঁধা সিঁদুর টিপ কপালে। আগের মত মুখে আব চিত্তার রেখা নেই। তিন ভাই-ই বড় হয়ে গেছে। দুজন ভাল কাজ করে। একজন পড়ে। ছোট বোনেরই শুধু বিয়ে হয়নি।

আর নীতিও। হঠাৎ আজই যেন নীতির মনে হল আর নীতিরও তো বিয়ে হয়নি।

মা ওকে ভাত দেন। দিখে নিজে বসেন।

নীতি ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করে মুখে তোলে অনামনস্বভাবে। কত কি ভাবছে। কূল মেনে না যাব। একটা ভাবনা থেকে আব একটা। তাবপব আর একটা। খেই হারিয়ে যায়। মূল সূত্রটা কি আবার ভাবতে বসে। মূল সূত্রটা কি অমল? অমলের অসহায়তা! না তার সুন্দর ছেলেটি! যে বললে অবাক হয়ে, ‘আর বেলুন দেবে না?’ অথবা সেই চাঁদের হাঁ-করা বাস্‌ভবা হাসি। যা রাখে ওকে ঘুমের সময় ঠাট্টা করে কি বলে কে জানে।

নীতি মুখ তুলে বললে, ‘মা!’

মা খাচ্ছিলেন। বললেন, ‘কিবে খেতে পারছিঁস না? বোজুই আজকাল রাত করে ফিরিস। খাটুনি বেড়েছে? আর একটু ঝোল নির্বি! নেবু দেব?’

মা ঝোল তুললেন কাঁসি থেকে। আর কি একটা ছোট্ট বস্তু বাড়ির মত। মাছ না বড়? নীতি সকালে মাছ খেতে পায় না। এটা সকালের ক্ষান্তপূরণ।

সে থালা সরিয়ে নিল। বললে, ‘আব কিছু লাগবে না মা।’

অবাক হয়ে মা বললেন, ‘তবে ভাতওলো কি করে খাবি?’

‘আর পারব না খেতে।’

মা শঙ্কিত মুখে বললেন, ‘শরীর ভালো নেই?’ এবার ভাবনা হল। রোজগারী মেয়ে।

নীতি বললে, ‘না ভাল আছি। আমি আর চাকবী করব না মা।’ তারপর খুব আস্তে বললে, ‘এবার তোমরা আমার বিয়ে দাও।’

সবটাই মা শুনতে পেলেন। কিন্তু বুঝতে পারলেন না। এমনই আশ্চর্য কথা দুটোই।

চোখ বড় কবে বললেন, ‘চাকবী করবি না! তাহলে কি করবি?’—বিয়ের কথাটা বুঝতেই পারলেন না।

এবারের নীতি মুখ তুলল। কথাটা একবার বলা হয়ে গেলে আর দ্বিতীয় বার মুখে আনা বা বলার জন্য বেশী সাহসের দরকার হয় না। সেটা বেরিয়ে ঘরের বাতাসে মিশে গেছে তখন।

বললে, ‘তোমরা আমার বিয়ের ব্যবস্থা করো।’

মা হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। বিয়ে! নীতি বিয়ের ব্যবস্থা করতে বলছে—নিজের!

কিছুক্ষণ পরে মুখে কথা এলো। ‘তোর বিয়ে? এই বয়সে? পাত্র কোথায় পাব! এত বয়সের মেয়েকে কে বিয়ে কববে?’

নীতির গলায় সাহস এসেছে। ‘পাত্র তোমায় খুঁজতে হবে না। আছে মা।’

পাত্র আছে! নীতি সব ঠিক করে ফেলোছে তাইলে।

মা আবার হতবুদ্ধি সুরে বললেন, ‘পাত্র আছে। কে পাত্র? খরচপত্রের কি হবে? বিয়ের তো খরচ আছে একটা। তার কি হবে?’

নীতির গলা স্পষ্ট হয়ে বললে, ‘পাত্র অমল ঘোষ। খরচপত্র? আমার প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা আছে। বেশী লাগবে না।’

মা স্তম্ভিত। সেই অমল ঘোষ। কায়স্থ! কায়স্থ বলার অসবর্ণ বলার আর মুখ নেই। উপায় নেই। কিন্তু দোজবরে! বললেন, ‘দোজবরে।’

নীতি স্পষ্ট গলাতেই বললে, ‘হ্যাঁ মা দোজবরে। ছেলেও আছে একটা! কিন্তু তখন আগে সেতো দোজবরে ছিল না। এবারে দোজবরেতেই দাও। নইলে তেজবরে হয়ে যাবে।’

মার মুখে কথা এলো না! নীতির বিয়ে হয়ে চলে যাবে! একটা আয়। মোটা আয় বন্ধ হয়ে যাবে। চাকরী কি করবে না সতি? আর করলেও তাঁদের কি লাভ। মনে ভয় জাগে।

বললেন, ‘দেখি ওঁর কি মত হয়।’

নীতি উঠল। বললে, ‘বাবাকে শুধু দিন ঠিক করতে বসো। মতামতের আর কিছু নেই। খরচের টাকা আমার আছে।’

অনেক রাত। শোবার ঘর অন্ধকার। ভাইবোনেরা ঘুমোচ্ছে।

জানালা খোলা! মনে হল চাঁদটার কথা। এখনো সে আত্ম ওঠেনি! কি তিথি কে জানে।

মনে হল না আর চাঁদের হাসির কথা। নীতি ঘুমিয়ে পড়ল সেদিন।

## ১০

অমল ট্রাম থেকে নামল। দেখতে পেল একটু দূরে নীতি দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাসিমুখে এগিয়ে গেল সেদিকে। বললে, ‘আমার আসতে আত্ম দেবি হয়েছে? কাজ ছিল একটু, আব ভিড়ে তিনখানা ট্রাম ছেড়ে দিতে হয়েছে। তুমি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ?’

‘বেশীক্ষণ নয়। চল একটু গঙ্গার ধারে যাই। যাবে?’

দুজনে হাঁটে। পথিক মানুষ। আপিস-ভাঙা ভিড়, যানবাহনের ভিড়। নীরবে এগোয়। সামনেই গঙ্গা। ঘাটের সিঁড়ি। জোয়ার এসে কখন নোমে যায় সে হিসাব ওরা রাখে না।

নীতি নেবে গেল, বললে, ‘এসো না। একটু গঙ্গাকে ছুঁই আত্ম—’

সিঁড়ির কাদা মাড়িয়ে গঙ্গাজল হাতে স্পর্শ করে নাথায় ঠেকাল। ওর দেখাদেখি অমলও তাই করল।—যেন দুজন ছোটবেলায় ফিরে গেছে হঠাৎ। নীতি বলে, ‘এসো বসি একটু।’

অমল বললে, ‘বড় কাদা।—’

নীতি বললে, কিন্তু এইখানেই একটু শুকনো দেখে বসব আত্ম।’

দুজনে বসে। পায়ের কাছে জল। বসার জায়গা শুকনো। নীতি একটু কাছাকাছি হয়ে বসল। অমল অবাক। সূর্য অস্ত গেছে। আকাশটা লাল। কোনোখানে ঘোর লাল। কোনোখানে কালো হয়ে আছে। গঙ্গার জলও কোথাও কালো কোথাও রঙীন।

দুজনে নীরব। হঠাৎ নীতি বললে, ‘তোমার সেই টীচার দেখতে বলেছিলে। পাইনি। অত দূর কেউ যেতে চায় না।’

অমল বললে, ‘যাক্গে। কি আর করা যাবে।’

নীতি একটু চুপ করে থেকে বললে, ‘ভাবছি আমি যদি পড়াই।’

পাশাপাশি বসা দুজন। তার দিকে চেয়ে অমল আশ্চর্য আনন্দে বললে, ‘তুমি? এত ভাগ্য ওর হবে? কিন্তু তোমার সময় হবে সেই বেলেঘাটা থেকে শ্যামবাজার। এই ভিড়ে যাওয়া আসা!’



নীতি জনের দিকে চেয়ে ছিল। ওর দিকে তাকায় নি। একটু চুপ করে থেকে বললে, 'যাওয়া আসা করতে হবে না।'

অমল আশ্চর্য। তারপর হেসে বললে, 'তার মানে? মজা করছ?'

একটু অপ্রতিভ ভাবে নীতি বললে, 'মাকে বলেছি কাল, আমি শ্যামবাজারে গিয়ে থাকব এখন থেকে। এই মাসেই একটা ভাল দিন দেখতে। তুমি তোমার মাকে বোলো ব্যবস্থা করতে।'

গঙ্গায় সন্ধ্যার অন্ধকার। অমল নীতির অত কাছে বসার মানে বুঝতে পারল এবার। সে তার একখানি হাত নিজের দু হাতে জড়িয়ে নিল।

কতক্ষণ গেল। কখন পায়ের কাছে কুলকুল করে জোয়ারের ঢল এসে ছায়াং ছায়াং করে ঘাটের সিঁড়িতে ঢেউ দিতে লাগল। নীতির শাড়ীর পাড় ভুতো জনে ভিজে গেল।

## সিঁথির সিঁদুর

শান্তা দেবী

২রা আষাঢ়। আজ কতদিন পরে যে আবার লিখতে বসেছি তার ঠিক নেই। বাঙের গোলমালে আমাদের সমস্ত রূপংটাই যেন ওলোট-পালট হয়ে গিয়েছে। কোথায় ছিলাম, কোথায় চলেছি, কি ছিলাম, কি হলাম, সব যেন হুতুড়ে কাণ্ড। তবু এতদিন পরে আমার পুরানো খাতখানি ফিরে পেয়ে মনে হচ্ছে, যেন অনেককালের পুরোনো সাথীটিকে ফিরে পেয়েছি। মন ভরে সব প্রাণের কথা তার কানে ঢেলে দেব। সে-কথা কেবল আমি বনব আর শুধু আমার বন্ধু গুণ্বে। আমাদের এই দুজনার মধ্যে আর অন্য তৃতীয় জন কেউ নেই। এই যেন আমার সখা, এ ত আমার বাণী কানে কবে শোনে না, এষে বৃকে কবে বাখে, তাই সে বাণী তার বৃকেই জেগে থাকে, আর কাক কানে কানে জগং ঘুরে খেলো হয়ে আসে না। তার গায়ে আমি যে রং ধরিয়ে দি, তাব প্রাণে আমি যে সুব জগিয়ে দি, সেই তাকে ঘিবে রাখে; হাটে পথে ঘুরে সে কালী মেখে আসে না।

বন্ধু আমার, তোমায় পেয়ে মনে হচ্ছে, মা যেন তার হারানো কোলের ছেলটিকে বৃকে ফিরে পেয়েছে। নববধূর প্রবাসী স্বামী যেন নিশীথ রাতে শুধু তাব জন্য অনন্ত তৃষ্ণা নিয়ে এসেছে। সত্যি, কত কি যে মনে হচ্ছে, তা আমি বলে উঠতে পারছি না। কিন্তু আব একটা কথা যে মনে হচ্ছে, সেটা না বলে পারছি না। এত দিন শুধু তুমি আর আমি, মাঝে কেহ নেই, কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি যে একজন এল বলে, তুমি নিশ্চয় তাকে দেখে রাগ কববে না, কারণ সে ত তোমাব দোসর হবে না। তুমি আমার যেমন বন্ধু, তেমনি থাকবে, শুধু সে আর একজন বাড়বে। এতদিন ধরে আমার মনের কথা তোমাব কাছে অঞ্জলি অঞ্জলি করে ঢেলে দিয়ে গিয়েছি, এর পর থেকে কিন্তু আমাবই এক হাত হতে তুমি দুই প্রাণের যুগলঞ্জলি পাবে।

উনি ত এলেন বলে। আমি কাকর কাছে কোনোদিন উনি বলিনি, কিন্তু কথাটা যে আমার কেবলি বন্তে হচ্ছে হয়, মুখে বন্তে যখন বাধে তখন কলমের মুখে তোমাব কাছেই বলে যাচ্ছি। আনন্দ হচ্ছে কি না কেউ যদি আজ আমায় জিজ্ঞেস কবে, তার উত্তবে যে আমি কি বন্ব তা আমি নিজেই খুঁজে পাচ্ছি না। আমার সমস্ত মন কিসে যে ভবে উঠেছে, সের্ক সাগরের জল, না স্বর্গের সুধা, তা আমি জানি না। দুখে আমার বানের মত ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, না সুখের অতল-তলে আমি ভলিয়ে যাব, তা বন্তে পারছি না। কিন্তু মনে হচ্ছে ধূপারতির মাঝখানে সন্ধ্যায় মন্দিরে যেমন দেবতার বিগ্রহ আবছায়া আবছায়া দেখা যায়, তেমনি যেন আমার সমস্ত সুখকল্পনার ছায়া লোকের মাঝখানে কার মুখতোতি ধীরে-ধীরে ফটে উঠবে। এই যে জগতে আমি খাই-দাই, ঘুরি-ফরি, সে জগংটা যে ঠিক তেমনি মাটির ধরণীর মত থাকবে, এটা মানতে আমার হচ্ছে করছে না। জানি পৃথিবীটা আমার জন্যে এক নিমেষে বদলে যাবে না, কিন্তু আমার মনোলোকে যে নূতন জগতের সৃষ্টি হবে তার আশাতেই আমি উৎফুল্ল হয়ে উঠছি। কিন্তু ভয় হচ্ছে, ছায়া-লোকের কল্পনা হয়ত ছায়ার মতই মিলিয়ে যাবে।

ছোড়িদি হঠাৎ এত ডাকাডাকি জুড়ে দিল কেন যে? যাই, আজ আর কিছু হল না।

১৭ই আষাঢ়। এই ক’দিনে আমার কি যে হল? ভেবেছিলাম, তেমন নয়, আর যাই হোক। অবিশি অমন আকাশ কুসুম ভাবাটাও আমার ঠিক হয় নি। আমি যদি নূতন বউ বলে লজ্জা করতে পারি, আমার খাতার খুড়ি খুড়ি কথা যদি মুখে একটাও ফুটে না বেরোয়, তবে তাঁরই বা এই ক’দিনের পরিচয়ে সমস্ত অন্তর আমার সামনে বিকশিত হয়ে দেখা দেবে কেন? পুরুষমানুষেরও ত লজ্জার আড়াল দূর করতে সময় লাগতে পারে? কিন্তু এ কথা স্বীকার করে নিয়েও আমার মন মানছে না। মনে হচ্ছে আমাদের মাঝখানের এই যে সূক্ষ্ম পরদাটুকু এটা প্রথম প্রণয়ের সে পলকা আড়াল নয়; একটি তুচ্ছ ঘায়ে ছিঁড়ে পড়ে যাবার জিনিস বলে একে বিশ্বাস হচ্ছে না। আমার ত বিশ্বাস ছিল, সকালবেলায় প্রথম আলো যে কুয়াসার ক্ষণিক আবরণ সৃষ্টি করে, এ যেন ঠিক তারই মতন, দুজনেরই মাঝখানের এই লজ্জাভীতির কুয়াসা দুজনকে আরো মধুর রহস্যে ভরে তোলে, উজ্জ্বল দিনের আলোর মত দুটি জীবন যখন দুজনের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়, তাদের সব বোঝাপড়া হিসেবনিকেশ যখন খোলাস হয়ে যায়, তখনকার চেয়ে এই আধেক-দেখা অল্প চেনারই মাধুরী বেশী, আকর্ষণ প্রবল। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে আমার সে বিশ্বাসের কোনো মূল্য নেই, আমি যেন সব রহসা এক নিমেষে ভেদ করে সব জেনেও নে নিতে পারলেই বাঁচি। কারণ আমার ভয় আছে যে আমাদের এ আড়াল চিরকালের জন্য গাঁথা শব্দ পাথরের দেয়াল। নয়ত এ বিচ্ছেদের অনন্ত জলসায়র আমি সাতার দিয়ে পার হতে পারব না।

উনি ও রোজই সন্ধ্যায় ঘবে আসেন, রোজই হেসে কথা কন, তবু কেন যে আমার এ ভয় জানি না! মনে হয় ওঁর যা কিছু সম্পদ— যাতে আমারই দাবী সবচেয়ে বেশী, তা যেন উনি সাবানিন ধবে পথে পথে কাকে বলিয়ে দিয়ে আমার জন্যে শুধু সেই পরিভ্রমের শ্রান্তটুকু নিয়ে এসেছেন, তাই ওঁর কথা হাসি, সবই ফাঁকা ঠেকে। সেই বিপুল অবসাদের বোঝা দুজনেরই চোখেব আড়ালে যেন উনি আমার ঘাড়ে নামিয়ে দিয়ে যান। কিন্তু তার বদলে দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে উনি কোনো উৎসাহের নির্ঝরের আশা রাখেন না, আমিও তাই কিছুই দিতে পারি না। সত্যি, আমার মধ্যে কি যে আছে, আমি যে কি দিতে পারি না-পারি, তা জনবার ইচ্ছা ওঁর এক বিন্দুও আছে বলে মনে হয় না। একটা নূতন মানুষের জীবনের মত এমন যে একটা রহস্য, তার ভিতরের খোঁজ নেবার জন্যে ওঁর এতটুকু কৌতূহল নেই। টাকা পয়সা রোজগার করে এনে, লোকে যেনন সযত্নে তুলে রেখে তার পর তাকে নাড়েও না, চাড়েও না, কেবল দরকার মত বের করে সংসারের কাজ চালায়, আমিও কি ঠিক তেমনি কিছু হবার জন্যে সেজেওজে এ সংসারে বড় বউয়ের স্থান দখল কবে বসতে এখানে এসেছি? হয়ত তা নয়, হয়ত সবই আমার মিথ্যা ভয় আর কল্পনা; কিন্তু এটা ঠিক যে আমার নূতন জীবনটা আমি যা মনে করে মনটাকে তার মত করে সাজাচ্ছিলাম, এটা তা নয়, সংসারও এমন হাওয়ায় ভেসে বেড়ায় না। মাটির স্পর্শ ভুলে যাবার মত দিন বোধ হয় লোকে কেবল আশাই করে, তাকে পায় না।

১৮ই আষাঢ়। কাল কত যে পাগলের মত লিখেছি, তার ঠিক নেই। আমার ভুল বোধ হয় ভাঙল। আজ সন্ধ্যাবেলা বেড়াতে যাবার আগে হঠাৎ উনি ঘবে এসে ঢুকলেন। কই, আগে ত আর কোনো দিন এমন সময় উনি এদিক মারান না। ভাবলাম, আজ বোধ হয় এদিকে কেউ লোকজন ছিল না, তাই একবার আমার সঙ্গে দেখা করে যাবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করবার জন্যে আমি উন্মুখ হয়ে ছিলাম বটে, তবু যেন ভরসা হচ্ছিল না। দেখলাম ওঁর মুখখানা যেন রাঙা হয়ে উঠেছে। বাবা, পুরুষমানুষের আবার এত লজ্জা!

ওঁর অত লজ্জা দেখলে আমার ত চোখ নাটি ছেড়ে উঠতে চায় না। আমার শরীরটা যেন কাঠ হয়ে গিয়েছিল, বুকটা শব্দ করে করে লাফিয়ে উঠছিল। একটা সাহেব-বাড়ীর গয়নার বাক্স আমার কোলের উপর ফেলে দিয়ে বললেন, “তোমার জনো।” উদ্ভরে কি বলা উচিত ছিল? উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়ান উচিত ছিল নাকি? আমি কিন্তু কিছু করি না। কেন জানি না, আমার ও-সব আসে না। লজ্জায় মুখই তুলতে পারছিলাম না। কিন্তু আনন্দে মুখ ফেটে যেন রক্ত পড়তে চাইছিল। চোখ তুলে দেখলাম উনি ঘর থেকে চলে গেছেন। কি জ্বালা, কথা বলি নি ত হয়েছে কি? না হয় দয়া করে আর দুমিনিট দাঁড়াতেনই। বাস্তব খুলে দেখলাম মুজো-বসান নেকলেস। মনটা যেন ভরছিল না, যদি একছড়া ফুলের মালা হত, কি ওঁর হাতের একটা লেখা হত, তা হলে বোধ হয় আরো খুসী হতাম। ওঁর লেখা উনি খগেন-হীরেনকে রাজি খুঁজে ডেকে এনে শোনাতে পারেন, কিন্তু আমায় একবার দেখতেও দেন না। যাক্, বড়-মানুষের ছেলে উনি যদি আমি খুশী হব মনে করে গয়না দিয়েছেন তবে সেই আমার অক্ষয় সম্পদ। একদিন বুঝবেন এর চেয়ে ওঁর দুমিনিটের আসাটার উপবেই আমার বেশী টান।

২০শে আষাঢ়। রাত্রে সেদিন গয়নাটা পরে ও ঘরে যাই নি। কিন্তু উনি ত কিছু বললেন না। আমি পরেছি কি না, সেটা আমার মনে ধরেছে কি না-ধরেছে, তার বিষয়ে একটা কথাও ত কইলেন না! যেন সে কথা ভুলেই গিয়েছেন। তবে সেটা দিলেন কি করতে, বাস্তব তুলে রাখতে নাকি? থাক্ বাস্তবে তোলা থাক, আমিও না বললে পারছি না, কোনো কথাও ওর বিষয়ে কইছি না। অদ্ভুত মানুষ! কে যে চেয়েছিল তার ঠিক নেই! সত্যি ওঁর যেন কুল পাবার জো নেই; উনি কি নিয়ে যে থাকেন, আব কি যে মাথা-মুণ্ড ভাবেন, তা উনিই জানেন। আমার ওসব রকম দেখলে কান্না আসে। যাক্গে ছাই, আর লিখতেও ইচ্ছে করছে না। আমার কি যে হবে!

৩০শে আষাঢ়। কি বিপ্টিই আজ নেমেছে! সকাল থেকে সেই যে ঝন্ ঝন্ করে জল ঝরছে তার ত বিরাম নেই। রাস্তার ধারে জানলায় বসে দেখছিলাম ফুটপাথের উপর একহাঁটু জল উঠেছে। মানুষের দুটো মাত্র হাত, বর্ষার দিনে তাই দিয়ে জুতো ছাতা কোঁচা বই খাতা সামলে ছেলেগুলো কি করে যে চলে তার ঠিক নেই। কাঁসারিদের ছেলেগুলো বেশ জলের মধ্যে লাফালাফি নাচানাচি জুড়ে দিয়েছে। পায়ে হেঁটে যারা যাচ্ছে তারা ত তবু ভাল, কিন্তু চারটে-চাকা ডোবা মড়াক্ষে-ঘোড়ায় টানা, ছ্যাকড়াগাড়ীতে যারা টাকা নষ্ট করে যাচ্ছে, তাদের বোধ হয় হাতের মুঠায় প্রাণটি। কখন ঘোড়া হুমড়ি খায়, কখন ডেনে ধসে পড়ে, তার কোনো ঠিকঠিকানা নেই। পাথরে-বাঁধা রাস্তার উপরে দুপাশের বাড়ীর সীমানাব মাঝখানে বৃষ্টি দেখে আমাদের সেই সাঁচা নাটির দেশের বৃষ্টি মনে পড়ছে। আজও হয়ত সেখানে চিরদিনের মত আকাশগঙ্গার বাঁধনহারা শতধারা মাঠে পথে অবিশ্রাম ঝরে পড়ছে। আমাদের বাড়ীর সামনে মাঠের উপর বৃষ্টি যেন বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটেছে, জল মাটিতে পড়েও পড়ে না, ছুটবার দিকেই তার রোখ বেশী। তার বালকের মত ছন্দহীন উদ্দাম নৃত্য আজ আমাদের মনকে সেইখানে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মাঠের উপর জলধারা সহস্রগতিতে উধাও হয়ে গলাগলি করে ছুটেছে। সেই তিনটে দুষ্টু ছেলে একটা বাঁশের ছাতার তলায় তেমনি কবে মাথা গুঁজে ইস্কুল থেকে ফিরছে। চাষী, পথিক শূনা হাতখালা দিয়ে মাথা আড়াল করে গায়ে গামছা জড়িয়ে উর্দ্ধশ্বাসে বাড়ী ছুটেছে। আমাদের রান্নাঘরের খড়ের ছাঁচার জল ঝিলমিলে পর্দার মত ঝুলে পড়েছে। কাকী-মা নিশ্চয় কোণের হাঁড়িগুলো এতক্ষণে মাঝখানে এনে ঠমা করছেন।

এঁর না শুনছিলাম আজ বন্ধুদের সঙ্গে রাস্তায় ভুল দেখতে বেরোবার কথা? গিয়েছেন কিনা কে জানে? থাক সে কথায় আমার কাজ কি? কিন্তু যত ভাবি ও-সব কথা আর ভাবব না, আমার সকল দুঃখের ভাগী খাতাটিকেও শোনাব না, তত কি ছাই ওই-সবই মনে আসে?

সেই যে মুক্তোর নেক্লেসটা সেদিন এনেছিলেন, ২২শে এদের বাড়ী বিয়েতে যাবার সময় পরিনি বলে শাশুড়ী বললেন, “বৌমা, অমন সাহেববাড়ীর গয়নাখানাও তোমাদের আত্মকালকার নজরে ফেলনা হ’ল। পরের বাড়ী যাচ্ছ, গলায় দাওনি যে?” আমি ত অবাক! উনি ভাঙ্গা একলা করে দিয়ে গেলেন, মা জানলেন কি করে? তবু বললুম, “পরছি।” মা বললেন “তাই পর। বলে বলে তবে গয়নাটা ঠিক সময় আনালুম। আমি বলি বুঝি ছেলে এখনো দেয়ই নি। বলি বৌমার বাপের বাড়ীর তেমন ত কিছু নেই, তা বলে বড়ঘরের বৌ এখনো দুখান পরবে না? লোকে আমায় বলবে কি?” হায় বে কপাল। এই আমার প্রথম উপহার! যাক, মিথ্যার মোহটুকু যাওয়াই ভাল। ইচ্ছে অবিশ্বাস করে আঁকড়ে থাকতে, কিন্তু তাতে আমার লাভটা কি?

আমি আমার এয়োতির চিহ্ন শাখাসিন্দুবের চেয়েও বেশী মূল্য দিয়েছিলাম, আমাব স্বামীব উপব দাবী, বিবাহ-মন্ত্রের চেয়েও যে বেশী নিশ্চয় হবে দিয়েছিল মনে করেছিলাম, সে যে আজ জমি-অক্ষর মালা হয়ে আমার কণ্ঠরোধ করবে তাকি সেদিন ভেবেছিলাম! উনি আমায় ঠিক উপহারই দিয়েছিলেন, কঠিন সোনার উপর বসান মুক্তার হার। আমাব চোখের জলের ধারা পদ্মপাতার জলেব মত গাড়িয়ে যাবে না বুঝি, সে কঠিন মুক্তা হয়ে আমাবই বুকে চিবিদন দুলবে। আমি ভ্রমিত, তাই মরীচিকার পিছনেই ছুটে খুসী হয়ে উঠেছিলাম।

সেদিন মনে করেছিলাম লজ্জায় ওঁর মুখ রাঙা হয়ে উঠেছিল। এখন বুঝলাম, তা নয়। নিজের হাতে পরের সওদা পৌছে দিতে আসতে হয়েছিল বলেই মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। মায়েরই বা এ সাধ কেন? ছেলে যদি বৌকে চায় না জানেন, তবু তাকে ফরমাসী সোহাগ পাঠাবার কি দরকার? ইচ্ছে করে বলি— আমি কিছু চাই না, তোমাদের শান্তি নিয়ে তোমরা থাক, আমিও যেমন ছিলাম আবার তেমনি করে খড়ের ঘরে বর্ষাসন্ধ্যায় মাটির প্রদীপ জ্বলে নিশ্চিন্তে দিন কাটাই। কিন্তু সে কথা যে বলতে পারব না, মুখও ফুটে না, মনও জানে কথাটা মিথ্যা। আমি যদি এ সংসারে আমার পাওনাটাই না পেলাম, তবে আমার মনে তার লোভটা অমন করে লাগিয়ে তুলতে কে বলেছিল? মাটির ঘরের দেয়ালেব আড়ালে কাঁথায় গুয়ে যে আরামে রাত কাটাত, পুকুরের ঘাটে হেসে খেলে যে সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সুখ পেয়েছে মনে কর্ত, অত আলো জ্বলে, অত রঙের বাহার দিয়ে, কাজে কথায় অত মাধুরী ঢেলে, তাব সুপ্ত মনের কোণের ও গোপন কক্ষটি খুলে না দিলে কি চলত না! জগতে যা পেয়েছিলাম, তার বেশী যে কিছু চাইবার কি পাবার আছে, তা ত জানতাম না; এই আমাদের পুরোনো পৃথিবীতেই যে একটা স্বপ্নলোক সকলের বুকের কাছে ঘুমিয়ে থাকে তাকে যে ওই সোনার কাঠির স্পর্শে সত্য করে তোলা যায়, সে কথা ত যেচেই আনায় তোমরা বলেছিলে। তবে এখন আমি কেমন করে ফিরব? জানি ফিরতে আমায় কেউ বলবে না, কিন্তু যা নিয়ে তৃপ্ত হয়ে থাকতে হবে মনে হচ্ছে, শুধু তাতে আমার সাধ মিটবে না। আমাব যা পাওনা তাই আমার মন চাইছে; সোনাধন্য দিয়ে আমার পাওনাব মূল্য চুকিয়ে দিলে ত হবে না, আমি দাম চাই না; খাঁটি জিনিস চাই।

দিদির কথা মনে হচ্ছে; দিদি স্বামীর গুধু ছবিটাকে ফুল দিয়ে সাজিয়ে সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে ধূপধুনোয় পূজো করে সুখ পেত বলত, কিন্তু আমার স্বামী যে মানুষ, সে ত গুধু ছবি নয়। ছবিকে ছবির মধ্যেই সবটা পাওয়া যায়।

মানুষ যে, তাকে ছবির মত করে নিতে মন চাইবে কেন? তারও সবটাই আমার মন চায়।

৩রা শ্রাবণ। ও বাড়ীর বড়দিদি বলে, “বৌ তুই অমন হাবা কেন? সারুসাজ্জা মনঅভিমান না করলে কি পুরুষমানুষের মন পাওয়া যায়? দেখ ত ঠাকুরপো বাইরে বাইরে ঘোরে, আর তুই রূপের ডালি নিয়ে হাবা-গোবার মত মুখ বুজে ঘরের কোণে বসে থাকিস্।” আমার কিন্তু অনারকম ধারণা ছিল। যে আমাকে ঘরে এনেছে সেই ত আমার মনের সন্ধানে ফিরবে ভেবেছিলাম। নয়ত গঙ্গা যেমন হাওয়ায় ভেসে এসে মৌমাছিকে ফুলের খবর দিয়ে যায়, তেমনি আমাদের দুজন্যর অজ্ঞাতে আমাদের মনের সৌরভ দুজন্যর কাছে পৌছবে ভেবেছিলাম। দেখছি কোনোটাই ঠিক নয়। তাই মনে হল, হয়ত বড় দিদির কথাটাই ঠিক হবে। আমি ত কোনোদিন ওঁর কাছে নিজে হতে কিছু বলতে যাই নি; তাই বুঝি উনি অমন উদাস। কিন্তু কি করব ছাই, তাও ত জানি না। বড়দি বলে মন জোগাতে। হায় রে কপাল! এত লাঞ্ছনাও ছিল কপালে! বড়দিদি ছাড়ে না। আজ তিনদিন ধরে আমায় নিত্য নুতন সাজে সাজাচ্ছে। আমি যেন কলের পুতুল হয়েছি, যা করে তাই করি। কিন্তু এই যে এতদিন ধরে আমি কিছুই করিনি, আর কদিন ধরে গায়ে গয়নাকাপড়ের দোকান সাজাচ্ছি, তা কৈ উনি ত এর মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখেছেন বলে মনে হয় না। বড়দি আমায় নিজেই সাজায়, নিজেই আমার রূপে মুগ্ধ হয়ে মুচ্ছা যায়। সাজানোর সময় তার যাত্রার সুবের গান শুনতে শুনতে আমার কান ঝালাপালা হয়ে ওঠে। কিন্তু যার জন্যে এত করা তিনি ভয়ে আঁতকে ও ওঠেন না। আনন্দে শিউরেও ওঠেন না। মনে হয় আমার সঙ্গে যে উনি কথা বলেন, তা যেন আমার দিকে না তাকিয়েই। আমি যে ছায়া কি কায়া তাও হয়ত ওঁর ঠিক নেই। ঘরের একটা জিনিস এদিক থেকে ওদিক করলে উনি খোঁজ নেন, অথচ মানুষের দিকে ওঁর চোখ পড়ে না। বড়দি বলে উনি একবার আধ-পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। সত্যি কিনা কে জানে?

৬ই শ্রাবণ। দিদির সঙ্গে ঝগড়া করে সংসার ছেড়ে দিয়েছি। তবু ত উনি আমার এ উদাসিনী মূর্তির কোনো খোঁজ করেন না। আমি ঠাকুরঝির ঘরে আড্ডা করছি, উনি যেন তাতে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন। দেখি ঝি একে একে আমার সব জিনিসপত্র এই ঘরেই এনে তুলছে। এ কাজ যে সে নিজে করে নি, উনিই যে তা করিয়েছেন, তা কি আর আমার বুঝতে বাকি আছে!

আচ্ছা, আমায় ওঁর এত কিসের ভয়? কেনই বা আমায় এত এড়িয়ে চলেন? এক সুতোতে চিরদিনের জন্যে গেঁথে দেওয়া হয়েছে বলেই কি সে বাঁধনে ওঁর এত অতৃপ্তি? আচ্ছা সে কথা আমায় বললেই ত হত! যাকে হৃদয়ের সমস্ত সঞ্চয় উজাড় করে ঢেলে দেবার কথা, তাকে একটি কথা বলতেও ওঁর ভবসা হয় না। উনি যদি আজ বলতেন, ‘তোমার দাবী-দাওয়া ছেড়ে দাও, আমায় মুক্তি দাও, তবে আমি আবার সেই আমাদের মাঠের পারেব আনন্দময়ী সাগরিকা হতে পার্শ্বতাম না জানি, কিন্তু আমি মুক্তি না পেলেও মুক্তি দিতাম। অতীত যে শিকল-কাটা পাখীর মত উড়ে গেছে, তাকে আর ফিরোতে পারি এমন সাধা আমার নেই, কিন্তু ভবিষ্যতের বোঝা মাথায় নিয়ে আমি সরে যেতে জানি।’

১০ই শ্রাবণ। ঠাকুরঝি আমার রকম-সকম দেখে দুই তিনদিন এমনি অবাক হয়ে গিয়েছিল যে কোনো উচ্চবাচ্য করেনি। তারপর যখন চেষ্টা করেও এ অদ্ভুত সমস্যার কোনো কারণ খুঁজে পেল না, তখন সে দিবা নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে আরম্ভ করে দিলে। সারারাত আমি বিছানায় জেগে পড়ে থাকি,— রাত্রের অন্ধকার যত ঘনিষে আসে, পথের লোকের পায়েব শব্দ যত মিলিয়ে আসে, বড় রাস্তার আলোব উপর চঞ্চল ছায়ার নাচন খেমে গিয়ে আলো যত নিঃশব্দ হুসে পড়ে, আমার মন যেন ততই সজাগ হয়ে ওঠে, কন্ঠনুখণ দিনের চঞ্চলতা যাকে ঘুম পাঁড়িয়ে বেখেঁড়িল, শ্রান্ত ধরণীৰ অলস নিশ্বাস যেন তাকে জাগিয়ে তোলে।

সারাদিন চোখের সামনে, মনের অলিতে গলিতে নানা লোকজন আর নানা ঘটনাবলি ঘটা একটা পর একটা করে মালার মত গড়ে উঠতে থাকে, মনে হয় হয়ত বা এই মালার গ্রস্থিতে আমরা দুটিও কখন বাঁধা পড়ে যাব, সেতুর মত এ আমাদের একজনকে আর একজনের কাছে পৌঁছে দেবে। কিন্তু দিনের ছবি যখন সব মুছে যায়, শূন্যতা যখন আশার সেতু ভেঙে ফেলে, তখন বিছানায় পড়ে-পড়ে আমার দৃষ্টির বাধা ঘুচে যায়, দেখি আমাদের মাঝখানের সেই অনন্ত বিরহসাগর যেন যুগে যুগান্তরে ক্রমে ছড়িয়ে চলে যাচ্ছে, একটি একটি জলের ডেউ এসে আশার ছবিগুলি সব ধুয়ে-মুছে সেই অতল বিচ্ছেদের সমুদ্রে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

অনেক বারই বিছানায় শুয়ে সেদিন কাকীমাকে চিঠি লিখেছিলাম, আমার একলাব কাম' শোনবার লোক ত এখানে কেউ নেই। তাই সকল কথা আমার সেই স্নেহময়ী কাকীমাকেই লিখেছিলাম। আমি অনেক দুঃখেই লিখেছিলাম, "মা-বাপের কাজ ছেলে-মেয়ের সংসার পাতিয়ে দেওয়া, সে ভার তাদের উপর ভগবান দিয়েছেন, তাই তারা সেইটুকু করেই খালাস। কিন্তু কারেক যে কার সঙ্গে গেঁথে দেয়, তাব খবর যারা গাঁথে তারাও রাখে না, যাদের গাঁথে তাবাও বাখে না। আশাপথ সবাই চেয়ে থাকে, ভাগ্যদেবী যাকে জোড়া মিলিয়ে দেন, সেই পায়। কাজেই আমার ভাগ্যের দোষ আর কারুর ঘাড়ের আমি চাপাতে পারব না।" কাকীমা চিঠির উত্তর দিয়েছেন, লিখেছেন, "মা, সাগরিকা, অনেক দুঃখের সঙ্গে তোকে আমার কোলে পেয়েছিলাম। তাই তুই আমাব সুখ, তুই আমাব দুঃখ। যেদিন তোব মুখখানা আমার সমস্ত দুঃখস্মৃতি জাগিয়ে আমার কোলে এসে পড়ল, সেদিন তোব মুখের মাঝাতাই সে স্মৃতিকে ঠেলে ফেলে দিতে হয়েছিল, কিন্তু সে একেবারে ফেলা ত যায়নি, কারণ একটি কণাব মত যে ছোট্ট মেয়েটি সেদিন আমাব উপর পূর্ণবিশ্বাস করে এসে আমার দরজায় দাঁড়িয়েছিল, আমার অতীতের সুখ দুঃখ সবের স্মৃতিই সেই কণাটুকুতে ছিল। দুঃখের কথা জাগাতেও তুই ছিলি, সুখের কথা জাগাতেও তুই। আমাদের অতবড় সংসারের চিহ্ন ত কেবল তুই, আর সেদিনকার সেই যে প্রলয় অভিশাপ তাকে উড়িয়ে-পুড়িয়ে দিয়ে গেল, তাব ভস্মশেষও ত তুই। বিধাতার অভিশাপ যেদিন সকলকে গ্রাস করলে সেদিন সে তোকে ছুলে না, কবলে পেয়েও ফিরিয়ে দিয়ে গেল। তাই ভেবেছিলাম, ভগবান তোর কপালে সুখ লিখেছেন। কিন্তু এখন দেখছি আমার দৃবদৃষ্টের কথা চিরকাল স্মরণ করিয়ে রাখ্‌বাব জনো নিষ্ঠুর বিধাতা আমাব হাতেগড়া কুসুমকলিটিকে এমনি করে তিলে-তিলে দন্ধ কর্‌বেন। তাই হোক, আমার বরের আওন আমিই বুকে পুবে রাখ্‌ব। তুই আমাব কাছে ফিরে আয়।"

কাকীমার চিঠি পড়ে আত্ম আমার ছেলেবেলার সেইসব কথা যেন চোখের উপর ভেসে উঠছে। কাকীমাব আদব, তাঁর যত্ন যে বাপ-মা-ভাইবোনকে ভুলিয়ে রেখেছিল, আত্ম যেন তারা সবাই আমাব একসঙ্গে তাদের সেই শীতল শয্যায় ডাক দিচ্ছে। ইচ্ছা কব্বছে ছোট্ট মাঁই সেইখানে যেখানে এক নিমেষ সেদিন অনন্ত হয়ে উঠেছিল, যেখানে প্রাণ সেদিন আতঙ্কে ভরে উঠেছিল, কিন্তু আজ যেখানে আমার সমস্ত আনন্দ ফুটে উঠেছে।

১৫ই শ্রাবণ। সেই আমাদের মাঠের পারের দেশে আবার চলেছি। কাকীমা নিতে লোক পাঠিয়েছেন। যাচ্ছি বটে, কিন্তু যেদিন ছেড়ে এসেছিলাম, সেদিন যে ঘর যে আনন্দ পিছনে ফেলে রেখে এসেছিলাম, ফিরে গিয়ে আজ আর তা পাব না। সেখানে যে সাগরিকাব ঘরদোর, যে সাগরিকাব কাকীমার কোল, যে সাগরিকার মুখের হাসি চোখের জল সেখানে অত কপ সৃষ্টি করেছিল, সে সাগরিকাই যে আব নেই। বিদায়ের দিনেব সেই হাসিকণা স্পর্শে যে তার নূতন জন্ম হয়েছে। বিগত জন্মের আনন্দখানি আব তাকে তেমনি আনন্দ দেবে কি করে?

এমন সময় হঠাৎ নিতে আসাতে মা বিরক্ত ও হয়েছিলেন, বিস্মিতও হয়েছিলেন; তিনি পাঠাতে বিশেষ রাজি ছিলেন না। কিন্তু উনি আমার কোনো কথায় কথা না কইলেও, মায়ের কথায় বাধা দিয়ে বললেন, “তোমাদের এ ভারি অনায়। এত সহজে পরের ঘর আপনার কর্তে কেউ কখনো পারে? যাদের মেয়ে তাদেরও মানুষের প্রাণ। তাদের কথাও রাখা উচিত।” উনি আবার প্রাণের কথা বলেন! হায়রে আমার কপাল! যাক্, যাওয়াই ঠিক হল। আমার যাওয়াই ত উনি চান। আমিও আর এখানে থাকতে চাই না। দেখি ছেলেখেলার মধ্যে গিয়ে আবার ধবা দিতে পারি কি না।

হাজ যেন উনি কেমন সহজ হয়ে উঠেছেন। সারাদিনই বাড়ীতে রয়েছেন; জিনিসপত্র গোছগাছ করে দিচ্ছেন, আমায় দেখে কনে বৌটির মত পালিয়ে বেড়াচ্ছেন না। আমি যাব বলেই বুঝি ওঁর এত স্ফুর্তি।

১৬ই শ্রাবণ। কি যেন একটা কি আমার মনে-মনে বলে যাচ্ছে, এই শেষ। মনে হচ্ছে, আব এখানে ফিব না, আর এ-ঘর দেখব না, যাব জোরে এখানের একজন হয়েছিলাম তার সঙ্গেও এই শেষ দেখা। তাই ভাবছি, যা শেষ হবেই তার একটু পরিচয় আমি রাখব। জীবনে যা ঘটেছিল, তাব স্মৃতি ত মুছেও মুছে না, তবে কেন তার নিদর্শন রাখতে এত ভয়?

কাল বাত্রে আমি ঠাকুরঝির ঘরে যাইনি। উনি যখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, তখন উঠে আমার ঘবের চারিদিকে ঘুরে-ঘুরে দেখছিলাম। জোৎস্নার আলো জানলার ভিতর দিয়ে সব এসে পড়ছিল। আবতায় আবছায়া সব দেখা যাচ্ছিল। হোক না অনাদবেব স্থান। তবু

খা ভাল করে দেখে নিতে সাধ হয়। ওঁর দেবাজের সামনে এসে দাঁড়িয়ে দেখলাম উপরেই একখানা মোটা খাতা, ওঁরই নাম লেখা। উনি কবিতা লেখেন, জানি। এমনি কি ওব উপর আমার লোভও খুব প্রবল। তাই খাতাখানা দেখেই চুপি করতে সখ হল। চুপিতে পাপ হয় লোকে বলে। কিন্তু যার সর্বস্ব আমার পাবার কথা তার একখানামাত্র খাতা চুপি পুন্নে আমার পাপ হতেই পাবে না। ওঁর অন্তরেব কোনো সম্পদ উনি আমায় স্বহস্তে তুলে দেন নি, কেন দেন নি, তাও বলেন নি। আজ যাবার দিনে তারই একটুখানি যদি এই কাগজ খানায় করে নিয়ে যেতে পারি, তাতে ওঁর স্মৃতি কিছুই হবে না, আমি হয়ত এমন কিছু পাব যা আমার চিরদিনেব মৌন মুখের সম্বল হবে। সম্বল না হয় এ দুটো কথাও ত ওতে পাব। যে বহসোর সঙ্গে আমার ভাগ্য এমন করে ভড়িত তার একটুখানি আবরণও ত এতে ঘুচেত পারে।

খাতাখানা আঁচলে জড়িয়ে রাত কাটিয়েছি। আজ স্বামীব দান কিছু পাই নি বলে শূন্য হাতে ফিরব না। নিজের হাতে নিজের ঘবের যেটুকু চুপি কবে বেখেছি তাই নিয়ে যাব। ভোরবেলা মান করে আসতেই উনি বললেন, “তোমার যতদিন থাকতে ইচ্ছে হবে থেকে, কেউ বাধা দেবে না।” আমি ঘাড় নেড়ে প্রণাম কবে চলে এলাম। ওঁর মুখের দিকে চোখ তুলে একবার চেয়েছিলাম। উনি কিন্তু আমার মুখে চোখ পড়তেই মুখ ঝাঁকিয়ে নিলেন।

২২শে শ্রাবণ। যে আমার মনের একটি কথাও শোনেনি, যার হৃদয়েব নিভৃত নিকেতনের একটি দবজাও আমার জন্যে খোলে নি, তারি অন্তরে চোবের মত সিঁদ দ্বীয়ে ঢুকতে লজ্জা করছিল, কিন্তু একবারটি চোখ বুলিয়ে আমাব ন্যায্য পাওনটুকু শুধু দেখে নিতে এতই কি দোষ? খাতাখানা দেখলাম, কবিতাব রাশি, হা-হতাশেব ছড়াছড়ি, কিন্তু সে যে কার উদ্দেশ্যে তার খেই ও লিখনেব মধ্যে কোথাও পেলাম না। নিজের গায়ে সে সর্ব আদর সোহাগ পক্ষেপ ফ্রন্দন মানিয়ে নিতে গেলাম, কিন্তু কিছুতেই খাপ খেল না। আমি হাঁ কবে বসে এলাম। এরকম কাণ্ড আমার জীবনে ত কখনও ঘটে নি, এর অর্থ খুঁজে নেব কবা আমাব পক্ষে দুস্কর। আমার চোখ দিয়ে ভাল ঠেলে উঠাছিল, মনে হচ্ছিল, বুঝছি, এ সব তাঁর



মানসীর বন্দনা। সে মানসমূর্ত্তির কাছেও আমি পৌঁছতে পারি না, তাই বুঝি এত। কিন্তু নাই বা পৌঁছলেম, আমি ত সাধ করে সে ঠাই জুড়ে বসতে যাই নি। এমনি তুচ্ছ জেনেই না নিলেও জাল করে ত আমি কিছুই দাবী করি নি।

যবে বসে ছেলেমানুষের মত ক্রমাগত চোখ মুছছিলাম, আর আকাশ-পাতাল ভেবে ভেবে অচেনা স্বামীর উপর অভিমানে গুরুত্বপূর্ণ ছিলাম। কাকীমা ডাক দিলেন, “ওরে সাগব, তোর মান বেড়েছে রে। তোর শাওড়ি যে তোকে এরি মধ্যে নিতে পাঠিয়েছে। আর দুই মায়ের ঘরে দুইখের অন্ন খেয়ে দিন কাটাতে হবে না।” চুরি-করা খাতাখানা খুলে যা দেখেছিলাম, তা আমার মনে যে কিসের ঢেউ তুলেছিল এখন তা ভাল করে বলতে পারব না। কিন্তু আব যাই হোক সেটা নিছক বিষয় নয়। খুশুরবাড়ীতে অল্পে অল্পে যে ও বিষেব টিকে হয়ে গিয়েছিল। আমি পবিত্রতার না জানলেও আমার অন্তরের অন্তর জেনেছিল, যে আমি যা চাই তা আমি পাবাব আশা রাখি না। তাই মনের চোখে ধুলো দিয়ে যেখানে তৃষ্ণাব জল চাইতে গিয়েছিলাম, সেখানে শূন্য পাত্র দেখে বুক ফেটে মরি নি।

কিন্তু আবার সেই ঘরে আমার ডাক কেন? এটা ত মনের অজ্ঞাতে স্বপ্নেও কখনও ভাবি নি। যে আশা ছেড়ে দিয়েছি, এ ডাকে তা জেগে উঠে আনন্দ ত দিচ্ছে না, ভয় বিষয় যেন বুক চোপে বসছে। আবার আমার কি পরীক্ষা শুরু হবে? আশার সোনার স্বপ্ন ত টুটে গিয়েছে, এবার কি বেদনার অগ্নিপরীক্ষা?

২৫শে আশ্বিন। গাড়ীতে উঠবার আগে কাকীমা আশীর্বাদ কবে সীঁথিতে চওড়া কবে সিঁদুর পরিয়ে দিয়ে আঁচলে সিঁদুরের কৌটা বেঁধে দিয়েছিলেন। এখনও তাঁব সেই আশীর্বাদ কানে বাজছে, “মা আমার, জন্ম জন্ম স্বামী-সোহাগিনী হও, তোমার সীঁথের সিঁদুর অক্ষয় হোক।”

আব একবার এই আশীর্বাদ নিয়ে এসেছিলাম, তখনকার কথা আজ আব বলে লাভ কি? খিড়কির দরজা দিয়ে যবে ঢুকতেই মা, ও-বাড়ীর বড় ঠাকুরবাঁধ, আর অন্যান্য অনেক মেয়েবা এসে দাঁড়ালেন। আমি মাথা না তুলেই একে একে সবাইকে প্রণাম করতে লাগলাম। বড়দিকে প্রণাম কর্তেই তিনি বললেন, “কি গো, বৈরাগিনী, পায়ে ধরে না সাধলে মন বুঝি ওঠে না? আপনার ঘব ছেড়ে গিয়ে কিসের তপস্যা হচ্ছিল? মেয়েমানুষের হাত গবব কিসের? ঠুনকো কাচের মান, এক যাও যে সেইবে না।” বড়দিদির মুখে এমন কথা কোনো দিনই ত ওনিনি। তবু মুখ না তুলে সবাইকে প্রণাম করতে লাগলাম। এক গা গয়না পরে, একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তার আলতা-পরা পায়ে প্রণাম কর্তে যাচ্ছিলাম, মা ভাবী গলায় বলে উঠলেন, “থাক থাক আর পেলামে কাজ নেই।” আমি অবাক হয়ে তাঁব মুখেব দিকে চাইলাম। শাওড়ী আমার প্রশ্ন বুঝে বললেন, “ও সম্পর্কে তোমাব ছোট হয়।” বড়দিদি আমায় একটান দিয়ে সরিয়ে নিয়ে বললেন, “ও তোমাব যম হয়।” বড়দিদিব আব তব সহ না। মুখ হাত পা ধুয়ে একটু জল খেতে না খেতে একবার গয়না কাপড় দিয়ে সেই পুবানো খেলা শুরু করে দিলে। আমার তখন কিছু যদি ভাল লাগছিল। আমি ভাবছিলাম সেই গয়নাপরা মেয়েটির কথা। তার পরিচয় যা পেলাম, তা ত চমৎকার! দিকে দিকে ভাল করে জিজ্ঞেস কর্তে সাহস হচ্ছিল না, কিন্তু জানবার জন্যে মন ছটফট করছিল। অনেক ভেবে চিন্তে কি একটা বলতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় সেই মেয়েটি ঘরের সামনে দিয়ে ঘুরে গেল। বড় বড় চোখ দুটো তুলে আমার দিকে একবার তাকিয়ে নিল। ঘর পার হয়ে চলে যেতেই বড়দিদি চোঁচিয়ে বলে উঠলেন, “আহা, আর দেখতে হবে না। ওঁব মত শাকচূর্মি মূর্ত্তি কিনা? পায়ের নখেব ডগার যুগি নয়, তার আবার এত জাঁক। দেখব আজ সাগরের কাছে কে দাঁড়ায়?” দিদির হাত থেকে চুলের গোছা ছাড়িয়ে নিয়ে আমি ছুটে ঠাকুরবাঁধ ঘরে চলে গেলাম। দেখলাম আশা ছাড়েও মান ছাড়তে পারি নি। এর আগে মরুলাম না কেন? এ

ঐ গ্রন্থপরীক্ষা নয়, এ যে রক্তলোহিত লোহা দিয়ে দাগা। বড়দিদি বিরক্ত গলায় ঝঙ্কার দিতে লাগলেন, “ওলো নেকি! আর নেকামো করে জ্বালাস্ নে। এক তিলের মুরোদ নেই, এত ফরফরানি কেন?”

ঠাকুরঝির বিছানায় পড়ে পড়ে কাঁদছিলাম; হঠাৎ ঠাকুরঝি ঘরে এসে আমায় টেনে তুললে। আমি এক পা নড়ি না দেখে বললে, “ছি বউ, অমন কি করতে আছে? বড় ঘরে অমন কত হয়। পুরুষমানুষের সব সাজে। মেয়েমানুষের অত ভেদ শোভা পায় না। এস উঠে এস। হেলায় লক্ষ্মী পায়ে ঠেললে আর ফিরবে না।” লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টিতে যে জ্বলে মরছিলাম।

সারারাত মেঝেয় পড়ে ছিলাম। চোখের জল ঝরে ঝরে নিঃশেষ হয়ে গেল, কিন্তু চোখে ঘুম এল না। ভাবছিলাম আমাব এ আদরের মানে কি? লোকদেখানো যে ঠাই ছিল, সেও যদি রইল না, তবে কিসের জন্যে আবাব এ টানাটানি?

ভোর বেলা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, বড়দিদি এসে ঠাস্ ঠাস্ করে গালে চড় দিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিলে। “আর ঘুমোতে হবে না। চোরে যে সিঁদ দিয়ে সব নিয়ে গেল।” আমি বললাম, “যাক্ না ভাই, চোব কিসেব? সেই ত মালিক।” বড়দিদি চটে গেল, “আহা আমার মালিক বে! সাত কালের ঝাঁটাখাকী বাঁদী! তুই লক্ষ্মীছাড়ীই ত গণ্ডগোল বাধানি। ঘর ছেড়ে যেতে কে বলেছিল? তাই না চেপে এসে বসেছে।” গঘনা বাক্তিয়ে সে এসে দরজায় দাঁড়াল। আমি এর আগে তার মুখখানা ভাল করে দেখি নি; একবার ভাল কবে দেখে নিলাম। আজও সে কথা না কয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল। আমি বড়দিদিকে বললাম, “ইঁা ভাই, ওর লোহা সিঁদুর নেই কেন?” দিদি বললেন, “ইস্ লোহার সিঁদুর পরবে? তুই ঘবণী গৃহিণী, তোর লোহা জন্ম জন্ম তোর থাক। ওর আবাব কিসের লোহা সিঁদুর? ও সে সব অনেক কাল খেয়ে বেখেছে। তাই না এমন সর্বনাশী।” আমি “আসছি” বলে উঠে গেলাম। তখনও কাকীমার ঝি বাড়ী ফেরে নি। তাকে গিয়ে বললাম “একখানা গাড়ী ডাক।”

কাকীমাব বাঁধা সিঁদুরের কৌটাটা তখনও আঁচলেই ছিল। জ্ঞান্‌তাম উনি যবেই আছেন। হঠাৎ সেই ঘরে গিয়ে দাঁড়াতেই উনি যেন চমকে ধড়মড়িয়ে উঠলেন। আমার গলা কেঁপে যাচ্ছিল, মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছিল না, কোনো রকমে বললাম, “একটা কথা আছে।” উনি পাশের দিকে চাইলেন। দেখলাম মেঝেতে একখানা রেকাবী হাতে কবে সে বসে আছে। আমি “থাক্” বলে হাত থেকে আমার বিয়ের লোহাটা ওঁর হাতে দিলাম, আঁচল থেকে সিঁদুর-কৌটা খুলে দিতে গেলাম, হাত কেঁপে ঘরে কাপড়ে সিঁদুর ছড়িয়ে পড়ে গেল। উনি কি বলতে যাচ্ছিলেন, আমি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।

ঝি গাড়ী এনেছিল, বেরিয়ে গিয়েই উঠে পড়লাম। শাওড়ী দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, হঠাৎ আমার এমন কাণ্ড দেখে কট্‌মটিয়ে তাকিয়ে রইলেন। একবার শুনলাম “হৃদয় হৃদয়” বলে ডাক দিচ্ছেন।

খালি হাতে শূন্য সিঁথি নিয়ে কাকীমার দরজায় যখন পৌঁছলাম, তখন কাকীমা চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন, “ওর এমন সর্বনাশ কবে হল রে?”

আমি কাকীমার পায়ে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করে বললাম, “অনেক দিনই হয়েছে কাকীমা, আমি জ্ঞান্‌তাম না।”

১লা ভাদ্র। কাল সকালবেলা রান্নাঘরের জান্নায়ায় বসে ছিলাম। আমার পূর্বজন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত এজন্মে এমন ভাবে কেন করতে হল তাই ভাবছিলাম, এমন সময় ডাক-হরকরা চিঠি দিয়ে গেল। ঠাকুরঝির চিঠি। আমায় যে কেন চিঠি লিখেছে ভেবে না পেয়ে কারণ অনুসন্ধান করতে খুলে দেখলাম—

“বৌ, তোমায় আর কি বলব জানি না, তাই বৌ বলেই লিখছি। কিন্তু তুমি আমাদেরও ডাকের মান রাখনি। ছি, ছি, তুমি এয়োত্তী মেয়ে, স্বামীর এমন অকল্যাণ করে গেলে কি করে? না তোমার কাণ্ড শুনে তোমার নাম মুখে করতে সবাইকে মানা করে দিয়েছেন। কিন্তু অনাদরে এ বাড়ীতে দিন কাটিয়েছ বলে আমাব তোমাব উপর কেমন একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল, তাই এ চিঠি লিখছি। এই কি তোমার উচিত কাজ হল? অত বড় ঘবেব বৌ হয়ে ভুলজাস্ত স্বামীটাকে ফেলে গুণহাত কবে যে ইষ্টিশানে গিয়ে উঠলে, সেটা কি কারব দেখতে শুন্তে বাকি আছে? যতই কেন অধম হোক, তোমাবই স্বামী, তোমারই শ্বশুরেব বংশ, পর নয়। তাদের মাথা এমন করে হেঁট করতে তোমার কি এতটুকু লজ্জা হল না? ও আপদ অনেক কালই ছিল; সে গৃহ শান্তি করে সতীলক্ষ্মীর মত ঘব আলো করে থাকবে বলেই না তোমায় ঘবে আনা। সেই তুমি কিনা একবারটি স্বামীব মঙ্গলচিন্তা না কবে অতনড় মানী ঘরেব মুখে কালী দিয়ে ঢাক বাড়িয়ে টি টি পিটিয়ে গেলে? তুমি যদি আত্ন ঘব ভুড়ে লোকের চোখের উপর থাকতে, তবে কি আত্ন ও কালীর আঁচড় কারুর চোখে পড়ত, না আমাদের মাথা এমন হেঁট হত? হয়ত সতীর পুণো একদিন সব বালাই দূর হয়েও যেতে পারত। যাক, ও সব কথা আর বলে কি হবে? কেবল এইটুকু জেনো যে যার কলঙ্ক এমন সচ্ছন্দে রটিয়ে তেজ দেখালে, যার অপমানের কথা একবার ভাবলে না, যার মুখের দিকে একবার তাকালে না, সে তোমারই স্বামী, তোমারই সর্বস্ব। তার অপযশে তোমারই সবচেয়ে বড় অপযশ। সতী মেয়ে স্বামীর এমন অপমান কবে না।”

ভাবছিলাম ঠাকুরঝিকে লিখি— “আমার স্বামী কোথায় যে তাব মান বাখব? থাকলে যে তুষের আগুনে পুড়োলেও তার মানের গায়ে ছুঁচ ফোটাতে দিতাম না।”

## মুকুর

### পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

এক

ভাই অনিলা, চিঠি লিখি নে বলে তুমি অনুযোগ করেছ। কিন্তু ভাই, তুমি তো জান, অঙ্কের পক্ষে নিয়মিত চিঠি লেখান কত মুশকিল।

ভাই, তোমরা কত সুখী, তোমরা চোখ চেয়ে এই সুন্দর পৃথিবীটা প্রাণভরে দেখতে পাও। দেখা,—হায় এই অসীম নীল আকাশ, সূর্য, চন্দ্র, তাদের বিভিন্ন রঙেব খেলা চোখে দেখতে পাওয়া কত সৌভাগ্যের কথা! একদিন সত্যসত্যই সেই সৌভাগ্য আমাব হয়েছিল, কিন্তু যখন এ পৃথিবীর অপকণ সৌন্দর্য থেকে ভগবান আমায় বঞ্চিত কবেন, তখন আমার বয়স বড়জোড় আট বছর। সে বয়সে দেখবার শক্তিটাও প্রবল হতে পার না। এখন আমার বয়স আঠাবো। গত সুদীর্ঘ দশ বছর ধরে আমার চারপাশের সব কিছুই গাঢ় জমাট অন্ধকারে আবৃত! প্রকৃতির দেওয়া সৌন্দর্য কল্পনার বলে উপভোগ করবাব কত বার্থ চেষ্টিই না আমি করেছি! আজ আমি প্রকৃতির সকল বর্ণ, সকল সৌন্দর্য— সব ভুলে বসেছি। আজ আমি গোলাপের গন্ধই শুধু শুকতে পাই, নেড়েচেড়ে তাব আকৃতিও অনুমান কবতে পারি, কিন্তু প্রাণভোলানো তার সেই অপরূপ সৌন্দর্য থেকে চিরদিনকার জন্যে আমি বঞ্চিত হয়েছি। এক-এক সময় এই গাঢ় কৃষ্ণ যবনিকার মধ্যেও আমার ক্ষুধিত প্রাণ সৌন্দর্য উপভোগেব বার্থ চেষ্টিয় ওমরিয়ে ওঠে। ডাক্তারবা বলেন, এটা বক্তচলাচলেব লক্ষণ, এবং একদিন আমার অন্ধত্ব দূর হতে পাবে। হায় বে আশা! যে লোক আজ সুদীর্ঘ দশ বছর ধরে ভ্রগত্বেব সমস্ত আলো সমস্ত সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত সে যে আর পবলোকে যাওয়াব আগে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে, এও কি সম্ভব!

সেদিন কেন জানি নে, হাতড়াতে-হাতড়াতে আমি একখানা অব্যবহার্য আয়না খুঁজে পেলুম। সেই আয়নাখানা সমুখে বেখে বসে পড়ে, আমার আনু থানু চুলওলি সুবিন্যস্ত করতে লেগে গেলুম। আমাব তখনকার মনেব অবস্থা যে কিরূপ, তা আজ আর তোমায় খুলে বলবার শক্তি আমাব নেই। আমাব মুখাবয়ব আয়নায় প্রতিফলিত দেখব,— ‘কেমন আমার মুখখানা, চোখ দুটো, জ, সব কিছু দেখবার আমার সে কি উন্মাদ আগ্রহ’ তখন সত্যিই আমার মাথা ঠিক ছিল না, — নইলে কেউ কি জেনে শুনে ওরূপ উন্মাদের মত কাজ করতে উদ্যত হয়!

ওঁরা আমায় তোমার চিঠিখানা পড়ে শোনালেন। তুমি জানতে চেয়েচ, আমার বাবার কাববার যে ফেল পড়েছে বলে প্রকাশ তা সত্য কি না। এ সম্বন্ধে আমি তো কিছুই জানি নে। ওঁরা আমায় কিছুই বলেন নি। কারবার ফেল পড়লে আমি বুঝতে পারতুম, কিন্তু আমার মনে হয়, ও সত্য নয়। কেন না আমার বিলাস-বাসনের এতটুকু কর্মত হয় নি। আমার কাপড়, জামা, শাড়ী— সবই দামী। প্রতি দিন নানাপ্রকার উপাদেয় খাদ্য, ফলমূল আমি খেতে পাই। এর থেকেই বুঝতে পারি যে, বাবার আর্থিক অবস্থার এতটুকু বিপর্যয় হয় নি।

মধ্যে-মধ্যে আমায় চিঠি লিখে। তোমাদের চিঠি পেলেও তবু আমার এ বার্থ দুর্বহ জীবনে ক্ষণকালের জন্য তৃপ্ত লাভ করে থাকি। আশা করি, এ অন্ধ হতভাগনীকে তুমি অন্তত যুগা করবে না। ইতি —

দুই

ভাই অনিলা, তোমার চিঠি পেয়ে অত্যন্ত খুশী হয়েছি। আজ তোমায় যে সংবাদ দিতে যাচ্ছি, তা শুনে তুমি নিশ্চয়ই হাস্য সম্বরণ করতে পারবে না। ভাববে, আমি নিশ্চয়ই উন্মাদ হয়ে গেছি। দৃষ্টিশক্তির সঙ্গে-সঙ্গে আমার বিচার-বুদ্ধিও আমি হারিয়েছি। শুনে আশ্চর্য হবে নিশ্চয় যে, আমায় একজন ভালবেসেছেন!

হী, সত্যি বলছি ভাই, অন্ধ আমি, আমাকেও আবার ভালবাসতে চায়! এর পর আর কি বলা চলে? প্রেম যে অন্ধ, সে কথাটি আজ মর্মে মর্মে অনুভব করছি। নইলে আমার ন্যায় রিত্র নিঃশেষ যে, তাকেও আবার কেউ শুধু ভালবাসতে নয়— বিয়ে করতে চায়।

কি করে যে তিনি বাবার সঙ্গে পরিচিত হলেন জানি নে। এমন কি, তিনি কে, কি করেন,— তাও আমার জানবার সুবিধা হয় নি। তবে সেদিন বাবাতে আর মা'তে আমার বিয়ে নিয়ে কথা হচ্ছিল, —আমি একখানা লাঠিতে ভর করে তখন গুটি-গুটি বারান্দায় এসে রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিলুম। তাঁবা আমার উপস্থিতি টের পান নি,—অথচ, আমি তাঁদের সব কথাই শুনতে পেয়েছিলুম। বাবা বলেন, প্রশান্ত বাবু কালই আমায় পাকা দেখা দেখতে চান। অনেক কথা-কাটাকাটির পব মা বাতী হলেন।

পরদিন তিনি আমায় দেখতে এলেন। বলা বাহুল্য যে, তাঁর চেহারা কিরূপ— কালো না ফর্সা, বেঁটে কি ঢেঙা,— কিছুই আমার জানবার ভোগ নেই। তিনি বিয়ে সম্বন্ধে আমার মতামত নেওয়া সম্ভব মনে করে, বিষেব কথা উত্থাপন করলেন।

আমি তাঁকে বল্লুম, “তা কি করে সম্ভব? অন্ধ আমি, আমায় বিয়ে করে লাভ কি?”

তিনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেন, “চক্ষুস্থান কি অন্ধ— তা নিয়ে আমি কি কবব? হও না তুমি অন্ধ, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। তোমার সৌন্দর্য—তোমার দেহের গঠন, আকৃতি, তোমার প্রকৃতি— আমায় মুগ্ধ করেছে। এটাই কি আমার তোমায় বিয়ে কববার কারণ হতে পারে না?” তাঁব স্ববে একটা দৃঢ়তা, সরল স্বাভাবিকতা ছিল।

তিনিই আমার অন্ধত্বকে বাদ দিয়ে আমার সৌন্দর্য সৌষ্ঠবের প্রশংসা করলেন। এরূপ প্রশংসায় অপবে কিছু বিশেষত্ব না পাক, আমার ন্যায় অন্ধের কাছে তা শুধু প্রেমিকের প্রেম জ্ঞাপন ছাড়া আর কিছু বলে মনে হয় না।

আমি আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলুম, “আমি কি সত্যিই ওরকম প্রশংসাব যোগ্য?”

— “নিশ্চয়ই, আমি শপথ করে বলছি।”

— “তবে এখন আমায় কি করতে বলেন?”

— “তুমি আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হও। আমি তোমায় আমার সহধর্মীকপে পেতে চাই।”

এ কথা শুনে আমি অবশ্য হাসব কি কাঁদব ভেবে পাই নি। একটু পরেই তাকে উত্তেজিত স্বরে বল্লুম, “আপনি কি এটা সত্যিই মনে করেন যে, এক দৃষ্টিহীনার সঙ্গে এক চক্ষুস্থানব, অর্থাৎ—দিনের সঙ্গে রাত্রির বিয়ে সম্ভব? আমি কেন আপনার জীবনটাকেও বার্থ করে দেব? না, না, না, তা হতে পারে না। আর আমার বাবার অবস্থা এত খাবাপ নয় যে, আমার একার ভার তিনি বহিতে পারবেন না। না, তা হতেই পারে না।”

তিনি আর কিছু না বলেই চলে গেলেন। তিনিই আমায় জানালেন যে, আমি সুন্দরী। কেন না, এ জ্ঞান আমার কোন কালেই ছিল না। আমি তখন এটা ভেবে পাই নি যে, তিনি

আমার জীবনে দর্পণের কাজ করছেন। কিন্তু পরে তা অন্তরে-অন্তরে অনুভব করেছি। তাই অজ্ঞাতে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা-ভক্তিটা বেড়ে গেছে। ইতি —

### তিন

ভাই অনিলা, তোমায় আর কি লিখব? কি অপ্রত্যাশিত দুঃখভার যে আমার জীবনে এসে গেছে, তা আর কি বলব। আমার যে কি হয়েছে, সে কথা লিখতে গিয়ে আমার চিরঅন্ধ চোখ দুটি থেকেও জল ধরে পড়ছে!

সেদিন প্রশান্তবাবুর সঙ্গে আলাপের পর একটা অজ্ঞাত কারণে আমার মনটা কেমন যেন উদ্ভ্রান্ত হয়ে গেল। ভাল কথা, বলতে ভুলে গেছি, প্রশান্ত বাবুই এখন আমার বাইরের ভগতের দর্পণ। সে যাই হোক, আমি সেদিন থেকে আর বড়-একটা ঘরের বাহির হই নে। আপনার মন নিয়ে আমার চির-অন্ধকার ঘরের এক কোণে বিছানায় পড়ে থাকি। সেদিনও আমি আমার ঘরে বসে-বসে আপনার অদৃষ্টের কথা ভাবছিলাম,—এমন সময়, আমার ঘরের জানালার দিকে যে পাশের বাড়ী, তারই একটা ঘরে দু'জনায় বসে যে কথাবার্তা হচ্ছিল, তাই আমার কানে এল। বলা বাহুল্য, তাঁদের কথাবার্তা যে কেউ শোনে, এটা অবশ্য তাঁদের ইচ্ছা নয়। তাঁরা ফিসফিস কবেই কথা কইছিলেন। তুমি এটা সম্ভবত বেশ জান,—যার একটা ইন্দ্রিয় নেই, তাকে তার সে লোকসান পুষিয়ে দেবার জন্যে সৃষ্টিকর্তা তার অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি একটু অস্বাভাবিক প্রখর করেই তৈরী করে দেন। তাই তারা চোখে দেখতে পায়, তাদের চাইতে, যারা তা না পায়, তাদের শ্রবণ-শক্তিটা অস্বাভাবিক প্রখর হয়েই থাকে।

তারা বলছিল।— “কি আশ্চর্য, মেয়েটাকে সুখী করবার জন্যে মা-বাপের কি না চেষ্টা! মেয়েটা এখনো বুঝতে পারে নি যে, তাব বাপের অবস্থা কত খারাপ! তাঁরা না খেয়েও অন্ধ মেয়ের খাওয়া দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদে কত টাকাই না ব্যয় করেন।”

— “এর অর্থ?”

— “এব আবার অর্থ কি? মেয়েটা তার অন্ধত্বের দুঃখেব উপব যেন দারিদ্র্যের দুঃখ না বুঝতে পারে, এজন্যে পারিবারিক দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা তার কাছ থেকে গোপন রাখা হয়েছে।”

ভাই অনিলা, এখন তুমি অবশ্যই আমার মানসিক দুঃখেব কাণে স্পষ্টই বুঝতে পেরেছ। মা, বাবা আমাকে সুখী কবাব জন্যে কি ভাগাই না কবছেন। আমি অন্ধ, তাই কত দুঃখ কষ্ট সযেই না তাঁরা আমার বিলাসিতার সামগ্রী ভোগাচ্ছেন। সন্তান মনে কি অসীম! পিতা নাতার এ ঋণ কখনো কোন সন্তান পরিশোধ কবিতে পারে কি? ইতি —

### চার

আমি যে এ গোপন কথা জানতে পেরেছি, তা অবশ্য কাউকেই জানতে দিই নি। কেন না, তা হলে আমাদের দারিদ্র্যের খবর আমার কাছ থেকে লুকোবার আশ্রয় চেষ্টা তাঁদের বার্থ হবে। ফলে মা, বাবা উভয়েই বিশেষ পীড়িত হবেন। তখনো আমার এ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আমাদের পারিবারিক অবস্থা বেশ সচ্ছল। কিন্তু এ সংবাদ শুনে আমি মনে মনে হির করলাম, তাঁদের মুক্তি দিতেই হবে যে করেই হোক।

কালও আবার তিনি এসেছিলেন। আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ হল। কথায়-কথায় আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, “এখনো কি আপনার আয় ভাল লাগে?”

— “নিশ্চয়। আমি আগেই বলেছি যে, তোমার মধ্যে যে স্বর্গীয় সুখ ও মাধুর্য আছে, তাতেই আমি মুগ্ধ, আর সেই কারণেই আমি আমাদের বিবাহ প্রস্তাব উপহিত করেছি।”

— “কিন্তু আমার আকার?”

— “সেও তো বলেছি আমায় মোহিত করেছে।”

এ কথা শুনে আমি হেসে উঠলুম। তিনি ভিজ্জেস করলেন, “হাসছ যে?”

— “এটা ভেবে হাসছি যে, আপনি যেন আমার কাছে ঠিক একখানি আয়না। আপনার কথায় আমি আমার আকারটি যেন সত্যসত্যি প্রতিফলিত দেখতে পাই।”

— “আমিও তো চাই চিরদিনেব তনো তোমাব দৰ্পণ হয়েই থাকতে। সে অধিকাৰ কি পাব?”

— “আপনি তবে সচিাই—”

— “হাঁ, তোমার দৰ্পণ হতেই চাই। তোমাব পিতা-মাতার সম্মতি পেয়েছি, এখন তোমাব সম্মতি পেলোই হয়। আমার কিছু পৈতৃক সম্পত্তি আছে। আমাদের কিছুই অভাব হবে না। আমবা দিবা সুখে শান্তিতেই থাকতে পাবব, আশা করি। তোমায় সুখী করতে পাবলে আমিও সুখী হব।”

কথাগুলি শুনে ভাবলুম, এর প্রস্তাবে সম্মতি দিলেই তো আমার মাতা পিতাকে দাবিদার দুর্ভোগ থেকে কতকটা অব্যাহতি দিতে পারি। আমি বল্লুম, “কিন্তু আমাদের এ বিষয়ে হলে আপনার যে ভারী লোকসান,—আমি যে অন্ধ!”

— “লাভ-লোকসানের কথা কি বলছ,— আমি যে তোমায় ভালবাসি। তোমায় প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আমি—।”

— “বলুন।”

— “ঋণতে বার্থতাব ভার নিয়েই জন্মেছি। আমার আকারে কোনরূপ মাধুর্য নেই, গাড়ি বোড়া ঐশ্বর্যও নেই। এক কথায় আমি কুৎসিত, তার উপর মধাবন্ত,—অর্থের প্রাচুর্য কোনকালেই ছিল না। তার উপর সম্প্রতি আমার বসন্ত হয়েছিল,— তাতে কবে সর্ব দেহে বসন্তের দাগ রয়ে গেছে। সুতরাং অন্ধকে বিয়ে করতে আমার অমত হওয়া তো ঠিক নয়ই, পরন্তু তাতে স্বার্থ ভাগও এতটুকু নেই।”

বলা বাহুল্য, এর পর আমি আমার সম্মতি জানালুম।

তিনি বন্ধন, ‘তুমি আমায় কুৎসিত দৰিদ্ৰ জেনেই গ্রহণ করো।’ তবে আমার ব্যবহাব যে কিছুতেই অন্য ব্যপ হবে না, এ কথা আমি তোমায় জোব কবেই বলতে পারি। আমার জীবনটা একটানা মরুভূমি,— তোমাব ভালবাসা সে মরুভূমিব মধ্যে ওয়েসিসের কাজ করবে।”

তিনি চলে গেলেন। ভাই, বুঝতে পারছি নে যে, বিষেতে সম্মতি দিয়ে ভাল করলুম কি মন্দ করলুম। সে যাই হোক, মাকে বাবাকে তো নিদ্রুতি দেওয়া হবে— তাতেই আমার শান্তি। আমার মনে হয়, আমি ঠিক পথেই পা দিয়েছি। আজ গ্রাসি। ইতি —

পাঁচ

তোমার প্রীতিপূর্ণ চিঠিখানার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি তা’ছাড়া, আমাদের বিয়েতে তোমার আন্তরিক সম্মতি আছে জেনে আবেগ প্রীত হয়েছি।

হাঁ, দু’মাস হোল আমাদের বিয়ে হয়েছে। আজ আমার মনে হয়, আমার চাইতে ভাগ্যবতী খুব কমই আছে। আমি খুব সুখেই আছি। কিছুই আমার চাইতে হয় না। আপনা থেকেই স্বামী আমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সব দিয়ে থাকেন। আমার মাকে বাবাকেও তিনি তাঁর বাড়ীতে এনে রেখেছেন,— যথেষ্ট শ্রদ্ধাও করেন। আগেই লিখেছি, ঠাঁব কিছু বিষয় সম্পত্তি আছে,— তার আয় থেকেই আমাদের একপ্রকার বেশ চলে যাচ্ছে। এখন আর আমার অন্ধত্বের জন্য কোন দুঃখ নেই, কেন না, আমি আমার অফুরন্ত ভালবাসা একান্ত করেই পাচ্ছি।

আমাদের বাড়ীতে ছোট একটি বাগান আছে। প্রতিদিন বিকেলে তিনি আমার হাত ধরে আমায় নিয়ে বেড়িয়ে বেড়ান। আমি নানারকম ফুলের গন্ধ পাই। কিন্তু তাদের সে অপরাপ সৌন্দর্য চোখে দেখার সৌভাগ্য আমার নেই। তা নাই থাকুক, স্বামী আমার সমস্ত ফুলের সৌন্দর্য্য এমন করে বুঝিয়ে দেন, যাতে না দেখার দুঃখ আর আমার থাকে না,— আমার মনশ্চক্ষের সুমুখে তারা স্পষ্ট হয়েই ওঠে। পাখীরা ডাকে আমি কান খাড়া করে থাকি,— সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি তাদের পরিচয়, রূপ, গুণ, সব জন্মের মত বুঝিয়ে দেন। কোন-কোন দিন আমরা থিয়েটারে যাই,— দেখার যা কিছু, তা আমি তাঁর চোখ দিয়েই দেখে থাকি। তাঁর কুরূপে আমার তো কিছুই এসে যাচ্ছে না। সুন্দরই বা কি কুৎসিতই বা কি, আজ আমার মনে আর তা কোন ভাবই এনে দেয় না। তবে প্রেম ও প্রীতির পরিচয় আমি বেশ ভাল করেই পেয়েছি।

আজ আর না। আশা করি, তোমাদের খবর সব ভাল। পত্র দিয়ে। ইতি—

ছয়

ভাই, অনিলা, শুনে খুশী হবে, আমাদের একটি খুকী হয়েছে। কিন্তু দুঃখ এই, তাকে দেখতে পেলুম না। সকলে বলে, খুকী খুব সুন্দর। সে না কি দেখতে ঠিক আমারই মত, কিন্তু আমি তো তাকে দেখতে পেলুম না। মাতুলের কত অসীম, আজ তা বেশ বুঝতে পারছি। আজ বুঝতে পারছি, আমি অন্ধ,—নীলাকাশের অসীম অনন্ত রূপ, ফুলের অপরাপ সৌন্দর্য্য, পিতা-মাতা, প্রিয়জন, এমন কি স্বামীর চেহারাও যে দেখতে পাই নে, সে কষ্টও ববং সহ্য করা সম্ভব, কিন্তু—কিন্তু আমার খুকীকে, যে আমার বুকের রক্ত থেকে বেবিযে এল, তাকে যে দেখতে পেলুম না, এ কষ্ট, এ বেদনা একেবারে অসহ্য! হায়, যদি এক মুহূর্তের জন্যে আমার দৃষ্টিশক্তি একবার বিদ্যুৎ-প্রকাশের মত শুধু একবার ফিবে পেতুম,— যদি সেই একটি মুহূর্তের জন্যে একবার খুকীর চাঁদমুখানা দেখতে পেতুম— তা'হলে সেই ক্ষণিকের তৃপ্তিতে সেইটুকু সুখেই আমি এ বার্থ জীবনটা স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দিতে পারতুম।

এবার আর স্বামী আমার দর্পণের কাজ করতে পারলেন না। খুকীকে আমার মনশ্চক্ষের সুমুখে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হল না। তিনি খুকীর আকৃতি-প্রকৃতি যতই কেন না বর্ণনা কবতে চেষ্টা করুন, আমার ক্ষুধিত মাতৃ-হৃদয় তাতে একটুকু তৃপ্তি পায় না। খুকীর না কি একমাথা কালো মিশমিশে কোঁকড়া কোঁকড়া চুল হয়েছে! কেমন সে পটপট করে তার ডাগর কালো কালো চোখে সকলের দিকে হাস-মুখে চেয়ে থাকে। এ শুনে আমার তৃপ্তি কোথায়! হায় অদৃষ্ট! হায় অন্ধত্ব! ইতি—

সাত

স্বামী আমার দেবতুল্য লোক। আজকাল তিনি কি করছেন জ্ঞান? তিনি আমাকে না জানিয়ে আমার জন্যে কত অর্থব্যয়, কত কষ্টই না সহ্য করছেন। দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনবার জন্যে কত প্রাণপাত পরিশ্রমই না করছেন। আমার চক্ষু-চিকিৎসার জন্যে তিনি নিজে বিশেষ করে চক্ষুবোগের চিকিৎসা-বিদ্যা আয়ত্ত কবেছেন। ইতিপূর্বেই তিনি স্বয়ং মেডিক্যাল কলেজের শেষ পরীক্ষায় সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন—এ সব খবর আমি এতদিন জ্ঞানতে পারি নি।

কাল কথায়-কথায় তিনি আমায় বলেন, “আমার কি আশা জ্ঞান?”

আমি উত্তর করলুম, “কি শুনি!”



— “আমি তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনতে চাই। তোমার মুখের সৌন্দর্য বাড়বে বলে যে ঔষধ তোমায় এতদিন ব্যবহার করিয়েছি, তা তোমার অস্ত্রোপচারের কাজে আসবে।”

— “কিসের অস্ত্রোপচার?”

— “তোমার চোখে যে ছানি পড়েছে তা সারাবার জন্যে চোখে অস্ত্রোপচার আবশ্যক হবে।”

— “তুমি অস্ত্র করতে পারবে? তোমার হাত কাঁপবে না?”

— “না, কাঁপবে না। আমি যে মনে-প্রাণে একান্ত করে তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে চাই।”

— আমি উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠলুম, “আমার ন্যায় নগণ্য হতভাগিনীৰ প্রতি তোমার এত করুণা!” তিনি আমায় আব কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে, আমাব মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে উঠলেন, “না, না, ও কথা বলো না গো। এ যে আমার স্বামীৰ কৰ্ত্তব্য, এ তো আমাব করতেই হয়। আশা করছি, শীঘ্র ভগবানের দয়ায় দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে।”

— “কিন্তু তাব পব—”

আমাব কথা শেষ না হতেই তিনি সরল হাসি হেসে বলে উঠলেন, “তাব পর আমাব কুরূপ দেখতে পাবে।”

কথা কয়টা যেন বন্দুকের গোলাব ন্যায় আমাব বুকে এসে বিঁধল। ওঁব এ কথাওলিতে যেন আমাব বুকে শত ব্যুঁশ্চক একসঙ্গে এসে দংশন কবলে। আমি তাঁকে বলুম, “আমাব ভালবাসায় যদি তোমাব এতটুকু সন্দেহ জন্মে থাকে, তো আমি যেন চিবকাল অন্ধ হয়েই থাকি। তোমাব কুরূপ আমাব মনে কল্পনায়ও এতটুকু পীড়াও দিতে পারে না। নগণ্য দাসীৰ প্রতি এত করুণা তোমাব!”

তিনি কথা বল্লেন না.— কেবল আমাব গালটা একটু জ্বোরে টিপে দিলেন।

মা বলেছেন এক মাসের মধ্যেই আমাব চোখে অস্ত্রোপচাব হবাব সম্ভাবনা আছে।

আমাব স্বামীৰ সম্বন্ধে যাকে ভিজ্ঞাসা করি, সে ই স্বামীৰ কথায সায দেয। মা বলেন, তিনি কুৎসিত কালো, বাবা বলেন, ওঁব মুখে বসন্তের দাগ অনেক, মাথায টাক, নোক্ষদা বিও বলে যে, ওঁব বয়স অনেক।

বসন্তের দাগ— একটা আকস্মিক ব্যাপাব, তাতে কারো হাত নেই, মাথায টাক— জ্ঞানবানোব লক্ষণ। এ কথা সেদিন মামা বলছিলেন। কিন্তু যদি সত্য-সত্যই তঁব বয়স বেশী হয়, তা হলে দুঃখের বিষয সন্দেহ নেই। তাব পব যদি তিনি আগেই চলে যান, তা হলে যে তাঁকে ভাল করে ভালবাসবাবও সুযোগ পাব না!

সত্য বলতে কি ভাই, তোমাব হয় তো মনে আছে, স্বপ্নে আমবা একটা গল্প পড়েছিলুম। তুমি পড়েছিলে চোখ দিয়ে স্বব দিয়ে, আর আমি মনে প্রাণে। সেই “সৌন্দর্যা ও পশুব” গল্প। আমাব অবস্থাটাও ঠিক সেইকপ নয় কি? ভগবানের কাছে প্রার্থনা কবো যে, তাঁব দয়ায় যেন শীঘ্রই আমি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাই। ইতি —

শেষ

অনিলা, এ চিঠিটা আগাগোড়া না পড়ে আমাব উপব আঁবচার কবো না। আব জীবনের দুঃখ, সুখ, পবিবর্তন — পব পর বুঝতে চেষ্টা করো, তা হলেই তা সমাক হৃদযঙ্গম কবতে পাববে।

এক পক্ষকাল আগে আমাব চোখে অস্ত্রোপচাব হয়ে গেছে। একখানা কৰ্ম্পিত হস্ত আমাব চোখের উপর রক্ষিত হয়েছিল, তা বুঝতে পেরেছি। আমি দুবার প্রাণপণে চাঁৎকাব

করে উঠি, তার পরেই যেন দিনের আলো, তার রং সমস্ত আমার কাছে প্রতিভাত হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ আমার চোখ বেঁধে দেওয়া হল। সেই দিনই আমি সুদীর্ঘ এক যুগ পরে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছি। একটু ধৈর্য ও সাহস আবশ্যক হয়েছিল। স্বামী আমাব, আমাকে সংসারের সাররত্ন—চক্ষুবড় দান করেছেন।

কিন্তু আমি একটা বোকামী করে বসেছিলুম, অবশ্য প্রাণের দায়ে। আমি তাঁর, আমার ডাক্তারের আদেশ অমান্য করেছিলুম। তিনি অবশ্য তা জানেন না। তা'ছাড়া আমার বোকামীতে অবশ্য তেমন ক্ষতিও হয় নি। সেদিন মোক্ষদা বি খুকীকে নিয়ে আমার কাছে এল। খুকু আমায় “মা” বলে ডাকতেই, আমি আর চোখের বাঁধন না খুলে পারলুম না।

আমি চীৎকার করে উঠলুম, “খুকুমণি, এই যে আমি, দেখতে পেয়েছি, দেখতে পেয়েছি তোমায়—” মোক্ষদা হাড়াহাড়ি আমার বাঁধন ঐটে দিলে। তা'হলেও তখন আর আমার মনে অন্ধদের কোন ব্যথাই রইল না। আমার মনে হল, আমার দৃষ্টির সকল সৌন্দর্য যেন আমি ফিরে পেয়েছি। যে মুহূর্তে খুকুর মুখখানা দেখতে পেয়েছি, সেই মুহূর্ত থেকেই আমার জীবনের অন্ধকার কালরাত্রির অবসান হয়েছে।

কাল মা আমায় বেশ করে সাজিয়ে-ওছিয়ে দিলেন, একখানা সুন্দর শাড়ী পবিয়া দিয়ে বসেন, “এবারে তোমার চোখের বাঁধন খুলে ফেলতে পার।”

মায়ের আদেশমত আমি বাঁধন খুলে ফেললুম। সে সময় সূর্য অস্ত যাচ্ছিলেন,— প্রায় অন্ধকার হয়ে আসছে। একবার চাবিদিকে চেয়ে দেখে আমাব মনে হোল, এর চাইতে সুন্দর কিছু আমি কখনো দেখি নি। আনন্দের আতিশয্যে মাকে বাবাকে খুকীকে আমার বুকে চেপে ধরলুম। বাবা বসেন, “তুমি নিভেকে ছাড়া আব সকলকেই তো দেখতে পেলে।”

— “উনি কোথায়?”

মা বসেন, “লুকিয়ে রয়েছেন।” মার কথায় ওঁর কুরূপ, টাক, মুখে বসন্তের দাগ— সব মনে পড়ে গেল।

— “তাকে ডেকে দাও। তাঁর চাইতে সুরূপ কি কিছু আছে।”

মা আমাব একটিবাব দর্পণ আমার চেহাবাখানা দেখতে বসেন। অদূরেই একখানা প্রকাণ্ড দর্পণ। আমি সেই দিকে ঝুঁকে পড়লুম, তাতে কতকটা কৌতূহল, আব কতকটা গর্বও যে ছিল না, এন কথ্য বলা চলে না। তাঁরা সঙ্গে-সঙ্গে আমার সঙ্গে দর্পণেব সুনুখে এসে দাঁড়ালেন। আমি দর্পণেব দিকে একবার চেয়েই আনন্দের আতিশয্যে চীৎকার করে উঠলুম। যদিচ আমি কতকটা কৃশকায়ই ছিলুম, কিন্তু আমার গায়ের রঙ, চোখ, ঞ, গঠন— হানিন্দনীয়। এক কথ্য, সত্যি বলতে গেলে, আমি প্রকৃতই সুন্দরী। কিন্তু দুঃখেব বিষয়, দর্পণে আমাব প্রতিকৃতিটা বেশ আবামের সঙ্গে দেখতে পারি নি,— কেন না, দর্পণখানা ফ্রনাগত কেবলি কাঁপছিল। তা দেখে মনে হচ্ছিল যেন, আনন্দে আমাব প্রতিকৃতিও দর্পণে নৃত্য কবছে।

দর্পণখানা কেন নড়ছে, তা দেখবাব জন্য আমি দর্পণের পিছন দিকে চাইতেই, সেখান থেকে একটি অপরিচিত যুবক বাব হয়ে এলেন। তিনি যে বেশ সুপুরুষ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই; তা'ছাড়া, তাঁর পোষাক-পবিচ্ছদও বেশ মানানসই ও দামী। আগন্তুককে দেখে লজ্জা আমাব মাথা কাটা যাচ্ছিল।

ভদ্রলোককে লক্ষ্য না করেই মা আমাব বসেন, “দেখ, তোমার আকৃতি কেমন সুন্দর!”

— “মা!—” আমার স্ববে একটা তাঁর ভর্ৎসনাব সুর বেজে উঠল।

মা সে দিকে মোটেই মন দিলেন না,— আপনাব মনে আমাব সৌন্দর্যের প্রশংসা করতে লাগলেন।

আমি মাকে বল্লুম, “আচ্ছা মা, তোনার কি এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান থাকতে নেই? তুমি ভাবছ কি বল দেখি, একজন অপরিচিত ভদ্রলোকের সমুখে—”

— “অপরিচিত ভদ্রলোক! বলিস কি? এ যে তোর দর্পণ!”

— “আমি দর্পণের কথা বলছি নে, আমি বলছি এই ভদ্রলোকের কথা।”

বাবা রেগে গিয়ে বলেন, “দূর হাবা মেয়ে, এ যে প্রশান্ত, — জানাই!”

এ্যা!... খানিকক্ষণ আমি আর কিছু বলতে পারলুম না, এক দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বইলুম। তিনি এত সুন্দর! আমার এত সৌভাগ্য! অন্ধ আমি, বিশ্বাসের উপরই তাঁকে ভালবেসেছি। এই দেবতা, তিনি আমার জন্য সুখশান্তি সকল বিসর্জন দিয়ে, এমন কি পাছে আমি দুঃখ পাই এই ভয়ে আপনার সুরূপকে কুকাপ বলে এতকাল আমার কাছে প্রকাশ করে এসেছেন। আমার অন্ধত্বে সাত্বনা দেবার জন্যই না তিনি এ উপায় অবলম্বন করেছিলেন।

মা অঁচলে চোখ মুছে ঘর থেকে চলে গেলেন, —বাবা আগেই চলে গিয়েছিলেন!

স্বামী আমার গদগদস্বরে বলেন, “কি সুন্দর তুমি!”

## পরিবর্ত

বিজয়রত্ন মজুমদার

॥ ১ ॥

কেমন করিয়া সম্ভব হইল— কে জানে! কিন্তু হইল।

সত্যেন্দ্র করিয়াছিল একটি কয়লা-চালানী আফিস। মিবিয়ম ডাইক্স ছিল সেই আফিসের দশ-পনেরোটি কেরানীর একটি। একটি টাইপিস্ট। মুখচোরা বেচারী,—না কয় বেশী কথা, না বেশী হাসে একটু,— না কিছু! আর সত্যেন্দ্র ছিল সেই ধরনের পুরুষ একজন, যে সারা জীবনটা স্ত্রী-জাতিকে ভয়, সম্ভ্রম, সমীহ করিয়া আসিয়াছে।

সেই সত্যেন্দ্রই মিবিয়ম ডাইক্সকে ভালোবাসিয়া ফেলিল। শুধু যে ভালোবাসিয়া ফেলিয়াই ক্ষান্ত হইল তাহা নহে,— বলিয়াও ফেলিল। মিবিয়ম শুনিল, শুনিতে-শুনিতে তাহার গোলাপের মত কপোলটি বস্ত্রবর্ণ ধারণ করিল,— নীল নয়ন-দুটি বার-দুই কাঁপিয়া হ্রিব হইয়া গেল। মিবিয়ম দুই হাতে একটা পেঙ্গল চাপিয়া নীচবে সত্যেন্দ্রের টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়া রহিল।

সত্যেন্দ্র চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল,— ঘুরিয়া আসিয়া, মিবিয়মের হাতখানি তুলিয়া লইয়া, আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে কহিল— মিবিয়ম, প্রিয়তমে মিবিয়ম, আমার অসীম উন্মুখ প্রেম উপেক্ষা করিও না প্রিয়ে,— তাহা হইলে আমি বাঁচিব না। বল-বল, প্রাণাধিকে, তুমি কি আমার ভালোবাসিতে পারিবে না?

মিবিয়ম নিঃশব্দ।

সত্যেন্দ্র অধীর হইয়া উঠিতেছিল। এক মুহূর্ত প্রেমিকের নিকট এক ঘণ্টার সমান বোধ হয়। সত্যেন্দ্র দুই হাতে মিবিয়মের মুখখানি তুলিয়া ধরিল। ধরিতেই কয়েক ফোঁটা তল সত্যেন্দ্রের হাতের উপর ঝরিয়া পড়িল। সত্যেন্দ্র ভয় পাইয়া গেল। ও বাবা! কাদে যে।

কিন্তু সে প্রবল ইচ্ছাবেগ সম্বরণ করিতেও পারিতেছিল না। মিবিয়মের সিঁদ্র মুখের পানে চাহিয়া, ব্যাকুল স্ববে তিস্তাশিল—মিবিয়ম, এ কি একান্তই দুবাশা?

এ কথায় সেই অশ্রুধৌত চোখেও বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়া উঠিল। মিবিয়ম কোন কথার উত্তর দিল না,— নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

সত্যেন্দ্রের বুঝা উচিত ছিল,—যুবতীর চোখে এমন সময়ে অশ্রু কেন? অশ্রু করে কি অমনি-অমনি! সুখে করে, দুঃখে করে! সে যে প্রস্তাব করিয়াছে, সে ত সুখেই প্রস্তাব,— দুঃখের কি আছে তাহাতে?

কিন্তু অত-শত সে বুঝিল না। দেবী দেখিয়া নিবাশায় তাহার হৃদয়টি ভরিয়া খাইতেছিল,— ক্ষণমাত্র বিলম্ব তাহার সহিতেছিল না। সে গুনিয়াছে, এমন অবস্থায় নতজানু হইয়া প্রার্থনা করিলে, বিফলতার সম্ভাবনা অল্প। যেনমন মনে হওয়া, অমনি সে তড়াক করিয়া হাঁটু গাডিয়া বসিয়া, কণ্ঠে করণে কণ্ঠে ডাকিল— মিবিয়ম, মিবিয়ম, প্রিয় আমার, ভালোবাসা আমার! কথা কও, বল বল

মিরিয়ম এইবার কথা कहिल, বলিল— ও হ, দিস্ ইজ সকিং! আমাকে ভাবিতে সময় দিন।

ভাবিতে সময়? মিরিয়ম...

হাঁ, এক সপ্তাহ সময় দিন।

ওঃ! এক সপ্তাহ!... সত্যেন্দ্র সত্যসত্যই হতাশ হইয়া গেল। বলিল— সময় কেন প্রিয়ে! তুমি কি তবে আমার ভালোবাস না?

বাসি।

তবে?

মিরিয়ম গদগদ কণ্ঠে कहিল, আমাকে মনস্থির করিতে দিন।

সত্যেন্দ্র বলিল—একান্তই সময় চাই?

মিরিয়ম ঘাড় নাড়িল।

বেশ—তাই, আজ শনিবার, আগামী শনিবারের পূর্বেই বলিবে?

বলিব।... মিরিয়ম প্রস্থানোদ্যত হইয়াছিল,— সত্যেন্দ্র আবার তাহার হাতটি ধরিল। বলিল — মিরিয়ম, শনিবারের আশায় রহিলাম। প্রিয়তমে! দেখিও, আমাকে নিরাশা-সাগরে ডুবাইও না যেন!

মিরিয়ম নিঃশব্দে একটি কটাক্ষ করিয়া, কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল। সত্যেন্দ্র নিজের চেয়ারটিতে বসিয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল। মিরিয়ম বলিয়াছে, ভালোবাসে! তবে আর সম্ভবত বিশেষ কোন ভাবনা নাই। যদিও সময় লওয়াটা সত্যেন্দ্রের মনে একটি খটকা তুলিয়াছিল,—কিন্তু ভাবিতে ভাবিতে মনটি সাক্ষ হইয়া গেল। ইংরেজে-বাঙ্গালীতে বিবাহ অনেক হইয়াছে বটে, এখনও হইতেছে; — কিন্তু ভয় প্রথম-প্রথম কাহার না হয়? স্বর্ণ নহে, স্বদেশীয় নহে, স্বজাতীয়ও নহে, স্বধর্মীও নহে, —এমন লোককে বিবাহ করিতে কি অমনি এক কথায় রাজী কেহ হইতে পারে? বেশ ত, মন ঠিক করিয়া লউক না,—সাত দিনে আর কি ক্ষতি হইতেছে? আর এ বিবাহে আপত্তি করিবার কেহ নাই,— কিছু নাই। মিরিয়ম বলিয়াছে যে আত্মীয়-পরিজন তাহার নাই,—অল্প বয়সেই সে পিতৃমাতৃহীনা;— এক ধর্মযাজক পরিবারের মধ্যেই সে মানুষ হইয়াছিল। কয় বৎসর হইল, তাঁহারাও দেহরক্ষা করিয়াছেন। এখন তাহার অভিভাবক সে স্বয়ং! একটা ক্লাব হাউসে অনেকগুলি চাকুরে মেয়ের সঙ্গে বাস করে। যা আশীটি টাকা মাহিনা পায়, তাহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট!

মিরিয়ম সটহ্যাণ্ড নোট লইতে আসিত। সত্যেন্দ্র ডিক্টেসন দিত না;— না দিয়া প্রশ্ন করিয়া, একে-একে এই সব জানিয়া লইয়াছিল।

আফিসে নিয়ম ছিল,— কর্মকারকগণ গৃহে গমনকালে স্বত্বাধিকারীকে শুভ-রাত্রি জ্ঞাপন করিয়া যাইত। সেদিন ছিল শনিবার। তিনটা বাজিতেই, একে-একে বাবুরা সু-সজ্জা করিয়া গেল। সকলের শেষে আসিল, মিরিয়ম।

স্বপ্নালোকিত কক্ষে সহসা একঝাড় রজনীগন্ধা দুলিয়া উঠিল। মিরিয়ম বলিল— শুভ-রাত্রি।

শুভ-রাত্রি। বাড়ী যাইবে ত মিরিয়ম? চলো না আমার সঙ্গে, কারে। নামাইয়া দিয়া যাইব। আমার প্রিয়র বাসস্থানটি ত দেখা হইবে।

ধন্যবাদ। চল।

সত্যেন্দ্র বেঞ্চরাকে ডাকিতে ঘণ্টা বাজাইল।

সপ্তাহ কাটিয়া গেছে, —আজ শনিবার।

সত্যেন্দ্র সকাল-সকাল স্নানাহার সারিয়া, দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কেশ-বাস সজ্জিত করিয়া লইল। তাহার সপ্তদশ-বর্ষীয়া পত্নী সুবাস নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিল, সত্যেন্দ্রের তিলমাত্র অবকাশ নাই, তাহার সহিত দাঁড়াইয়া দুইটি কথা কহে, বা একটু আদর করে। আর কি কথাই বা কহিবে? সে কি জানে কথা কহিতে? একটা রহস্য বুঝে না, —একটা রসিকতা সহ্য হয় না, — ঘ্যান-ঘ্যানে আর প্যান-প্যানে। সত্যেন্দ্র বরাবর ভাবিত, সে এমন কি অন্যায় করিয়াছে, যাহার জন্য বিধাতা তাহার ভাগ্যে এমন 'স্ত্রী-রত্ন' জুটাইয়া দিলেন। বেশীর ভাগ বাঙ্গালীই বিবাহিত জীবনে সুখী নয়। এই বিংশ শতাব্দীর নব সভ্যতার আলোকে বঙ্গীয় যুবকগণের চক্ষু ঝলসিয়া যাইতেছে, — গৃহের কোণে স্ত্রী ব অধর-সুধায় ও চোখের জলে আর তাহার তৃপ্তি নাই। তাহাতে না আছে এতটুকু বৈচিত্র্য, না আছে সজীবতা। কি সুখে জীবন যাপন করে জানি না, — সত্যেন্দ্র ত মরিয়া ইইয়াছে। সেই দৈনন্দিন একঘেয়ে জীবন। সেই আফিস ইইতে আসা, — সেই জলখাবারের রেকাবী, — সেই খাও-খাও, আমার মাথা খাও — অনেক ইইয়াছে, — আর চলে না, চলে না! অসহ্য।

আজ বঙ্গীয় যুবকগণের শরীরে স্বাস্থ্য নাই, দেহে বল নাই, মনে স্মৃতি নাই, কর্মে আগ্রহ নাই, — কেন? সে ঐ স্ত্রী! স্ত্রীর জন্য! স্ত্রীরা কি স্বামীদের তৃপ্তির জন্য অনাকপ ইইতে পারে না? তাহারা কি ইহ-পরকালের প্রভুকে সুখী করিতে চাহে না? সত্যেন্দ্র স্বীকার করিত, না, তাহাদের দোষ নাই, কিন্তু সমাজ। সমাজ যে চারিদিকে কান খাড়া করিয়া রক্তচক্ষু চাহিয়া আছে!

পারে যদি কেহ এই সমাজটাকে আঙ্গুল তুলিয়া বঙ্গসাগর গর্ভে নিক্ষেপ করিতে, তবেই, — তবেই আবার দেশে প্রাণ আসিবে, ছেলেরা মানুষ ইইবে। নতুবা সব যাইবে। কুজপৃষ্ঠ অধিকতর কুজ, — নাজ দেহ আরো ন্যূজ ইইবে। সত্যেন্দ্র সমাজ সংস্কারক নহে, — সমাজ বাঁচুক বা মরুক, সে চিন্তা করিয়া মস্তিষ্ক উষ্ণ করিবার তাহার প্রয়োজন নাই; নিজের পথ সে বাছিয়া লইয়াছে। তাহাতে যদি তাহার নিন্দা হয়, — হৌক, লোকে নিষ্ঠুর বলে, — বলুক। লোকের জন্য নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করিবে, এমন মূর্খ, বর্বর সে নয়।

সত্যেন্দ্র দশ মিনিটের মধ্যেই আফিসে আসিয়া পৌঁছিল। বেহারা হাত ইইতে ছড়ি ও টুপি লইয়া, আলনায খুলাইয়া, প্রভুর কামরায় পাখা খুলিয়া দিল। সত্যেন্দ্র কোটটি খুলিতে খুলিতে হাজিরা-বহি টানিয়া লইল — সকলেই আসিয়াছে, — আসে নাই — কেবল মিরিয়ম! সব আসা না আসা সমান ইইয়া গেল। সত্যেন্দ্র ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, ১০-৩৫। পাতা উন্টাইতে-উন্টাইতে সত্যেন্দ্র দেখিল, কখনও ১০-২৫ এর পরে মিরিয়ম আসে নাই। ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪ — ইহার বেশী একটি দিনও হয় নাই।

সত্যেন্দ্র চিন্তাশ্রিত মুখে চেয়ারে বসিল। বেহারা কাচের পিরিচের উপর কাচের গেলাসে কাচের মত বরফ-জল রাখিয়া গেল। সত্যেন্দ্র গেলাস তুলিয়া জল পান করিল বটে, — কিন্তু তাহার জিহ্বায় জলের স্বাদ আজ কিরূপ ঠেকিল, তাহা কি আর বলিতে ইইবে! সত্যেন্দ্র সিগারেট ধরাইল, এত প্রিয় যে সামগ্রী, আজ তাহার তাহা ভাল লাগিল না। কিন্তু কি করিবে! সিগারেট ছাড়া আর কিসে মনের ব্যাকুলতার কথঞ্চিৎ শান্তিও দিতে পারে? একটা, দুইটা, তিনটা — পুড়িয়া ছাই ইইয়া গেল, শান্তি মিলিল না।

বাহিরে খটা-খট টাইপ-কলের শব্দ ইইতেছে। থাকিয়া-থাকিয়া টুং-টুং করিয়া টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিতেছে। মধ্যে মধ্যে নিম্নকণ্ঠে বাবুদের গুঞ্জন-ধ্বনি শ্রুত ইইতেছে। টেবিলের উপর স্তবে-স্তরে চিঠিপত্র ও কাগজাদি সজ্জিত। সত্যেন্দ্র কিছুতেই মন দিতে পারিতেছে না।

দেখিতে দেখিতে ঢং ঢং ঢং ঢং করিয়া চারটা বাজিয়া গেল। আর এক ঘণ্টা, তার পরই ত আফিস বন্ধ হইবে। আর কি সে আসবে? নাঃ আজিকার দিনই যখন বৃথায় গেল, আসিল না, তখন নিশ্চয় মিরিয়ম আর আসিবে না। আকাশের গায়ে গত সাত দিন ধরিয়া যে সুরমা হর্মা গঠিত হইয়া উঠিতেছিল, ঐ বুঝি ভাঙ্গিয়া পড়ে। ঐ বুঝি তাহার সব আশা-আকাঙ্ক্ষা নির্মূল হইয়া যায়!...

টেলিফোঁর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। এক-মিনিট পরেই টেলিফোঁ-বাবু পরদা তেলিয়া সত্যেন্দ্রের সম্মুখীন হইয়া ইংরাজীতে কহিল— আপনাকে কেহ খুজিতেছেন মহাশয়!

সত্যেন্দ্র অত্যন্ত বিরক্তভাবে টেলিফোঁর কল তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসিল, কে তুমি!

উত্তর আসিল, আমি মিরিয়ম।

আজ সপ্তাহ শেষ হইল, তুমি ত আসিলে না?

উত্তর হইল— হা হতোম্মি! আমি আসিব। সেই কি রীতি? না, তুমি আসিবে।

সত্যেন্দ্র জিভ কাটিয়া কহিল— আমায় ক্ষমা কর, মিরিয়ম, আমি এখন যাইতেছি।

বেহাবা টুপি ও ছড়ি লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সত্যেন্দ্র জিজ্ঞাসিল, গাড়ী?

খাড়া—হজুর!

॥ ৩ ॥

প্রিয়া-নিকেতনে পৌছিতে, সারাদিনের উৎকর্ষা, অবসাদ, চিন্তা-গ্লানি বিদূরিত হইয়া গেল। মিরিয়ম অশ্রু-ছলছল চোখে বলিল— আমি কি তোমার উপযুক্ত হইতে পারিব?

সত্যেন্দ্র মিরিয়মের কৃশ দেহটিকে বক্ষে বাঁধিয়া সহর্ষ কণ্ঠে কহিল, ও-কথা বোলো না মিরিয়ম, ও-কথা বোলো না। তুমি আমার উপযুক্ত হইতে পারিবে না? তবে আমার কি ভয় হইতেছে, জান ডিয়ার? আমাকে লইয়া তুমি সুখী হইতে পারিবে ত? বল,—বল, আমাকে লইয়া তুমি সুখী হইতে পারিবে?

এ প্রশ্নের উত্তর মিরিয়ম আর মুখে দিতে পারিল না। দুটি চক্ষু দিয়া কোমল মুখের রেখার ভিতর দিয়া, দুটি স্নেহে বাহু-পাশ দিয়া এ কথার এবং অনেক কথার উত্তর দিয়া দিল।

প্রায় অর্ধঘণ্টা অতিবাহিত হইলে, মিরিয়ম বলিল— আমি শুনিয়াছিলাম, বাঙ্গালী যুবকদের খুব অল্প বয়সেই বিবাহ হয়। আমার কাছে দু'একখানি ছবি আছে,— বিলাতী মাগাজিনে বাহির হইয়াছিল— বাঙ্গালা দেশের বর-কনে। তাহাতে বরের মুখে গোঁফের রেখাটিও দেখা দেয় নাই,—আর কনে ত স্কুল গার্ল বলিলেই হয়।

হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঐরূপ আগে হইত বটে, এখন-ও দু'একটা হয়। কিন্তু আগের তুলনায় সে কিছুই নয়। এখন পরিণত বয়সের আগে কেহ বিবাহ করে না।

মিরিয়ম কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিল— তোমার আত্মীয়-স্বজন আছেন,— তুমি তাঁহাদের অনুমতি পাইবে?

সত্যেন্দ্র হাসিয়া বলিল—বিবাহে অনুমতি? তুমি কি বলিতেছ, প্রাণাধিকে! অনুমতি পাইব না! আর কাহারই বা অনুমতি আবশ্যক? এক বৃদ্ধা মা আছেন, — তিনি আমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন না।

তবুও মিরিয়মের মুখানির মলিনতা ঘুটিল না। সে ঈষৎ জড়িত কণ্ঠে বলিল— কিন্তু তিনি কি... কথাটা সে শেষ করিতে পারিল না। সত্যেন্দ্র কিন্তু তাহার মনের ভাবটি বুঝিল। বুঝিয়াও জিজ্ঞাসিল— কিন্তু কি বলিতেছিলে?

তিনি কি তোমার প্রতি রুগ্ন হইবেন না?

রুগ্ন হইবেন কেন? ইংরেজে-বাঙ্গালীতে বিবাহ এই প্রথম নয়,— পূর্বে অনেক হইয়া গেছে। আমারই ছোট-মামা বিলাতে মেম্ বিবাহ করিয়াছিলেন। আমার সে মামী এখনও জীবিত রহিয়াছেন।

তিনি কোথায়? এখানেই আছেন?

না, তাঁহারা থাকেন, লাহোরে। আমার মামা সেখানকার ইঞ্জিনিয়ার।

কিন্তু তিনি বোধ করি বাড়ী আসিতে পারেন না?

সত্যেন্দ্র শিস্ দিয়া উঠিল; বলিল— পুঃ— কেন পারিবেন না? এই ত সেবারও আমাদের বাড়ীতে সস্ত্রীক, সকন্যা তিনমাস থাকিয়া গেলেন।

মিরিয়ম নীরব। যুবতীটি অর্ধ-নিম্নলিত নেত্রে সুদূর ভবিষ্যতের অদৃষ্ট-জগতে উঁকি দিতেছিল,— কথা কহিল না।

সত্যেন্দ্র দুই মিনিট কাল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া গাঢ়স্বরে বলিল— মিরিয়ম, মিরিয়ম, কেন তুমি এত ভাবিয়া আকুল হইতেছ? আমি তোমাকে ভালোবাসি,— তোমাকে সুখী করিতে কি আমি ক্রটি করিব প্রিয়ে?

মিরিয়ম তথাপি নীরব, নতমুখ।

সত্যেন্দ্র বলিল— তুমি বুঝি আমাকে ভালোবাস না মিরিয়ম?... নিশ্চয়ই বাস না। বাসিলে কখনই তুমি এত সন্দেহ করিতে না। এই দেখ না, আমি তোমাকে ভালোবাসি, সেই আমার যথেষ্ট। কে অসম্ভব হইবে, কে মন্দ বলিবে— কৈ এ সব কথা ত একবারটিও আমার মনে আসিতেছে না! কেন আসিতেছে না, জান? তোমার প্রেমেই আমি সম্ভব। তুমি যদি আমার মত...

মিরিয়ম সহসা মুখ তুলিয়া, দুইটি পেলব শ্বেত বাহু-বল্লরীর দ্বারা সত্যেন্দ্রকে বক্ষ-সম্মিকটে টানিয়া, গদগদ কণ্ঠে কহিল, বোলো না, বোলো না, প্রিয়তম, আর বোলো না!... সে কাঁদিয়া ফেলিল।

সত্যেন্দ্র জানিত না যে, এইদিনই অঙ্গুরীয়ক পরাইয়া দিতে হয়। মিরিয়ম সে কথা বলিয়া দিল। তখনি উভয়ে হাওয়া-গাড়ী চড়িয়া লালদীঘির সামনে এক বাঙ্গালী জুয়েলার্স-এর দোকান হইতে বহুমূল্য-হীরকখচিত অঙ্গুরীয় ক্রয় করিয়া, ইডেন-গার্ডেন্সের কৃত্রিম হ্রদের তীরে একটা নির্জন স্থান দেখিয়া বেষ্টিত বসিল। শত চুম্বনে গণ্ড দুটি ভরাইয়া দিল। মিরিয়মের শ্বেত গণ্ডে এক-একটি চুম্বন দেয়, আর সত্যেন্দ্র ভাবে এত সুখ জীবনে আর কোন দিনই সে অনুভব করে নাই। শুধু দুই অধর-পুটে এত সুখ, এত সুখা যে উথলিয়া উঠিতে পারে,— সত্যেন্দ্র কবির কাব্যে, ঔপন্যাসিকের উপন্যাসে পাঠ করিয়াছে বটে,— কিন্তু এই সে প্রত্যক্ষ করিল। এই সে প্রথম বুঝিল,— কবির কল্পনা অলীক, অসত্য নহে, ঔপন্যাসিকের লেখার মধ্যে সত্যতা পূর্ণমাত্রায় বর্তমান আছে।

রাত্রে এক সঙ্গে খাইতে হয়,— উভয়ে গ্রেট ইস্টার্নে ঢুকিল। সত্যেন্দ্র গোটা-দুই পেগ খাইয়া, একটুখানি খাওয়াইবার অনেক চেষ্টা করিল; কিন্তু মিরিয়ম সাহস করিল না। সে খানিকটা ভার্মুখ পান করিল।

কথাবার্তা বাঙ্গালাতেই হইতেছিল। মিরিয়ম ছেলেবেলায় মিশনারী স্কুলে বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়াছিল। সত্যেন্দ্র বলিয়াছে, বিবাহের পর তাহাকে স্বয়ং উদ্ভমরূপে বাঙ্গালা শিক্ষা দিবে।

সেইখানে বসিয়া কথা কহিতে-কহিতে স্থির হইল যে, আগামী কল্যাই মিরিয়ম ক্লাবের বাস উঠাইয়া, কাশীপুরস্থিত সত্যেন্দ্রের উদ্যান-বাটিকায় চলিয়া আসিবে। এবং যতদিন না বিবাহ হয়, সেই স্থানে বাস করিবে। উদ্যান বাটিকাটি ভাগীরথীর কুলেই অবস্থিত,— নির্জন এবং অতি মনোরম! সকাল-সন্ধ্যায় নদীর হাওয়া, পাখীর কল-গুঞ্জন। এত ট্রামের ঘটা-যং



শব্দ নাই,— মোটরের ভোঁক্-ভোঁক্ নাই, মোটর-লরীর ধোঁয়া নাই; —শুনিতে-শুনিতে মিরিয়ম প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়া বলিল—চিরদিন কি সেখানেই বাস করা যায় না প্রিয়তম?

কেন যাইবে না মিরিয়ম! সে ত আজ হইতে তোমারই হইল। যতদিন আমরা বাঙ্গলা দেশে থাকিব, ততদিন সেখানেই থাকা যাইবে। তার পর তোমায় লইয়া ইয়োরোপ ঘুরিতে বাহির হইব।

মিরিয়মের চক্ষু দুটি মুদিয়া আসিল। এ যে তাহার কল্পনারও অতীত ছিল!

সে রাত্রে যখন উভয়ে উভয়ের নিকট বিদায় লইল, তখন মিরিয়মের বাসা-বাটির পার্শ্বে গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া তিনটা বাজিয়া গেল। গৃহে ফিরিতে সত্যোদ্ভের ইচ্ছা হইতেছিল না, কিন্তু তখনও আড়াই ঘণ্টা রাত্রি রহিয়াছে,— পথে-পথে ঘুরিয়া বেড়ানোও অসম্ভব। সত্যোদ্ভ গৃহে ফিরিয়া দ্বিতলে শয়ন-কক্ষে জামা কাপড় ছাড়িতে লাগিল।

সুবাস মেহগ্নি-খাটে দুষ্কণ্ড শয্যা গাঢ় নিদ্রামগ্ন। সত্যোদ্ভ বার-দুই স্তিমিত-বীৰ্য জীবটির পানে চাহিয়া, বৈঠকখানায় নামিয়া গিয়া, কোঁচে শুইয়া পড়িয়া, মিরিয়মের কথাই ভাবিতে লাগিল।

॥ ৪ ॥

সত্যোদ্ভ একটু মুষ্কিলে পড়িয়া গেল।

এলাহাবাদ হইতে তাহার জ্যেষ্ঠা শ্যালিকা শ্রীমতী আভাস লিখিয়াছেন, এই ১৭ই শ্রাবণ হিবনের বিবাহ। সুবাসকে আনিতে হিবণ স্বয়ং যাইতেছে। সুবাস যেন অতি অবশ্য আসে। হিবণ কালই সকালে পৌঁছিব, এবং সন্ধ্যার ডাক-গাড়িতে তাকে লইয়া পুনঃ যাত্রা করিবে।

সুবাস ত যাইবার আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছে। তবে সেইসঙ্গে একটা মুষ্কিলও বাধাইয়া ফেলিয়াছে। আজ আর কাল দুটি দিন সত্যোদ্ভকে আফিস কামাই না করাইয়া ছাড়িবে না। সত্যোদ্ভ প্রথমটা সম্মত হয় নাই; কিন্তু শেষে সুবাস যখন কাঁদ-কাঁদ স্বরে অনুযোগ করিল যে, আবার কত দিন দেখা হ'বে না, কিছু না— তখন রাজী না হইয়া পারিল না। সারাটা দিন সে অতি কষ্টেই 'এক সঙ্গে' কাটাইল। সময় কি কাটিতে চাহে? সত্যোদ্ভের মনটি তখন কোথায় পড়িয়া রহিয়াছে,— মাত্র দেহটা লইয়া কি সময় কাটান যায়! কিন্তু সুবাস ইহাতেই সন্তুষ্ট হইল। বেচারী সারা দিনমান ও রাত্রি অনর্গল গল্প করিয়া গেল। মাঝে-মাঝে এক আধটা হাঁ হাঁ শুনিয়াই তৃপ্তি পাইল। সত্যোদ্ভ ভোরের দিকে ঘুমাইয়া পড়িতে, তাহারই একখানা বাহুর উপর মাথাটি রাখিয়া সুবাস নিশি জাগিল।

হিবণ আসিয়া পৌঁছিতেই, সুবাস সত্যোদ্ভকে বলিল— সেই যে আমাদের ভিক্টোরিয়া স্মৃতি-সৌধ দেখবাব কথা আছে, ভালোই হয়েছে। হিবণ এসেছে, ও-ও দেখেনি বল্ছে।

সত্যোদ্ভ বলিল— ভালোই ত! আমি গাড়ী রেখে যাচ্ছি, তোমরা দু'জনে দেখে এস।

সুবাস মুখখানা গোমড়া করিয়া বলিল— যেতে চাই নে, যাও! ওঃ, কি আমার আফিসের টান গো... একটা দিন বই নয়,— তা'ও আবার কতদিন দেখা হবে না, কিছু না...

অগত্যা সত্যোদ্ভকে রাজী হইতে হইল। ঠিক দশটার সময় আহালাদি শেষ করিয়া তিনজনে গড়ের মাঠের উদ্দেশে যাত্রা করিল। স্মৃতি-সৌধের অমল-খবল মূর্তি নয়নগোচর হইবামাত্র সুবাস উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিয়া উঠিল, বাহ্ বাহ্। ভাগ্যে তোমার বিয়ের ঠিক হয়েছিল, হিবণ, নইলে ত দেখতে পেতে না।

হিবণ লজ্জাক্রম মুখে হাসিতে লাগিল। ছবি দেখিতে, প্রত্যেক ছবিটির ইতিহাস শুনিতে-শুনিতে তিন ঘণ্টা সময় লাগিয়া গেল,— দেড়টার সময় তাহারা আবার মোটরে উঠিল। মধ্যপথে একটা বিলাতী হোটেল লক্ষ্য খাইয়া, তাহারা যখন গৃহে ফিরিল, তখন পৌনে তিনটা।

সত্যেন্দ্র বেশ-পরিবর্তন করিয়া আফিস যাইতে প্রস্তুত হইয়া, সুবাসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল— আফিসের কাজ-কর্ম সেরে স্টেশনেই দেখা করব'খন।

সুবাস ছড়ি-শুদ্ধ হাতটি ধরিয়া বলিল— কেন, বাড়ী আস্তে পারবে না?

সত্যেন্দ্র কহিল— জানি কি। দু'দিন ত আফিস-ছাড়া। কাজ-কর্ম যদি বেশী জমে গিয়ে থাকে, সময় না-ও পেতে পারি—তাই বলছি।

সুবাস হাত ছাড়িয়া দিয়া, নত হইয়া প্রণাম করিল। সত্যেন্দ্র বলিল— এখনি কেন? আবার ত দেখা হ'বে স্টেশনে।

আর একবার কবব'খন। একটা বেশী পেরনাম করলে ত আব জাত যাবে না— বলিয়া সে মৃদু হাসিল।

আচ্ছা—আসি—বলিয়া সত্যেন্দ্র বিদায় লইতেছে,— সুবাস বলিল,— দেখ, যদি পার ত বাড়ীতেই সোজা চলে এস।

আচ্ছা।

সত্যেন্দ্র কথটা সত্য বলিয়াছিল—রাশীকৃত কাজ ভরিয়া গিয়াছে। বিনাতী মেল ডে—সে চিঠিগুলির উত্তর না দিলেই নয়। বিলাতের ব্যাঙ্কে কিছু টাকা পাঠাইবাব ব্যবস্থা করিতেই হইবে। আফিসে ঢুকিতেই বড়বাবু মস্ত এক লিস্ট দাখিল করিয়া বসিলেন। গুনিয়া সত্যেন্দ্র সাহেবের মাথা ঘুরিয়া গেল। এই সব সারিয়া, স্টেশনে উহাদের বিদায় দিয়া, কাশীপুব পৌছিতে কত রাত্রি যে হইবে, কে জানে!

না-জানি, মিরিয়ম কত ভাবিতেছে। দুই-দুই দিনের অদর্শনে না জানি সে কত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। কখন গিয়া সেই মলিন অধরে চুম্বন দিয়া, আবার সে মুখখানি আবৃত্ত করিয়া দিবে,— কখন বক্ষে ধরিয়া অস্থির বক্ষ শান্ত করিবে,— ভাবিতে-ভাবিতে সত্যেন্দ্র চেয়ারখানায় বসিয়া পড়িল।

বড়বাবু খাতা-পত্র হাতে ঘরে ঢুকিয়া বলিতে লাগিলেন— এই সময়ে আবার টাইপিস্ট ছুঁড়ীটা কামাই করিল। কি করিয়া যে কাজ চালাইতেছি, কি হাস্যমাই যে যাইতেছে, তাহা আর কাহাকে বলিব!—

বড়বাবুর উপর একটু রাগ হইল, আবার হাসিও পাইল। বাগ হইল, 'ছুঁড়ী' গুনিয়া, আর হাসি পাইল এই ভাবিয়া যে আর সে টাইপিস্ট নহে, এখন—এখন সে...

আচ্ছা, কাশীপুরের বাগান-বাড়ীটায় যদি টেলিফোন সংযুক্ত থাকিত! নাঃ, সারাইতে কষ্টাঙ্কুর লাগান হইয়াছে,— সারান শেষ হইলেই টেলিফোন লইতে হইবে। নহিলে আফিসের কয় ঘণ্টা সময় কাটানো দুঃসাধ্য হইয়া পড়িবে যে।

॥ ৫ ॥

সেই সেদিন রাত্রি ১টার সময় সেই যে চলিয়া গেছে, কাল সারা দিন-রাত্রি, আজ— এই তিনটা বাজে— ইহার মধ্যে একবারও কি সত্যেন্দ্র সময় পাইল না যে, একটুখানি শুধু দেখা দিয়া যায়। কাল কষ্টাঙ্কুর শৈলেন্দ্র বাবুর দ্বারা টেলিফোন করাইয়া জানিয়াছিল, সত্যেন্দ্র আফিসেও আসে নাই।

মিরিয়মের ভাবনা অস্ত ছিল না। অসুখ হইল না ত? সেদিন অত রাত্রি পর্যন্ত মোটর লঞ্চে চড়িয়া নদীর হাওয়া লাগাইয়াছে, সর্দি-টর্দি হয় নাই ত!... একটা চাকরও বাড়ী জানে না, যাহাকে পাঠাইয়া সংবাদ লওয়া যায়। এক নিজে আফিসে গিয়া সংবাদ লওয়া— কিন্তু সত্যেন্দ্র যে তাহাকে আফিসে যাইতে বার-বার নিষেধ করিয়া দিয়াছে। তবে উপায়?

বাগান-বাড়ীর বারান্দায় বসিয়া-বসিয়া মিরিয়ম আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিল। কেন অমন হইল? মিরিয়ম যে ক্লাবটিতে এতকাল বাস করিত, সেখানে তাহার অনেকগুলি বন্ধু-বান্ধব জুটিয়াছিল। তন্মধ্যে আবার দু'একটি অন্তরঙ্গ হইয়া গিয়াছে। তাহাদেরই একজন মিরিয়মের দুঃসাহসিকতার নিন্দা করিয়া বলিয়াছিল, এই নেটিভগুলোকে আমার বিশ্বাস হয় না মিরিয়ম। তুই মিঃ মিরের সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেছিস্ বটে, কিন্তু আমার মনে হয়, নেটিভ জাতটাই নীচ। তাহারা কথায়-কথায় হাতে চাঁদ ধরিয়া দেয়,— কাজের বেলায় লুকাইয়া পড়ে! —মিরিয়ম ক্লাব তাগ করিবার সময়, অন্তরঙ্গ লুসীর সহিত দেখাটি পর্যন্ত করে নাই। যাহাদের দেশে জন্মিয়া, যাহাদের দেশের মাটির অন্নকণায় শরীর ধারণ করিয়া, যাহাদের অর্থে বাঁচিয়া আছে— তাহাদের নেটিভ বলিয়া ঘৃণা করিতে বা তাহাদের সম্বন্ধে নীচ-ধারণা পোষণ করিতে বাস্তবিক চিরদিনই মিরিয়মের কষ্ট বোধ হইত। আজ না হয় সত্যেন্দ্রের সঙ্গে তাহার হৃদয়ত জন্মিয়াছে,— আজ না হয় সত্যেন্দ্রকে সে নিতান্তই আপনার বলিয়া জানিয়াছে: কিন্তু যখন কিছুই জানে নাই, শুনে নাই, তখনও এই শ্যামবর্ণ জাতির প্রতি তাহার শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। এমন সরলতা-মণ্ডিত মুখ যাহাদের, এত মিষ্ট যাহাদের কণ্ঠ-স্বর, অনাড়ম্বর বেশভূষা যাহাদের শাস্ত-শ্রী ফুটিয়া থাকে,— তাহাদের সম্বন্ধে নাবী-হৃদয় প্রস্তুত ছিল না, অন্তরঙ্গ লুসীর খাতরেও না।

তাই আজ তাহার মন তুফানে তরলীখানির মতই টল-মল করিতেছিল। সত্যেন্দ্রের না আসিবার কাবণটি কত রকমেই খুজিয়া বাহির করিতে গেল, কোনটাই মনেব মত হইল না,— কোনটাই অশাস্ত চিত্ত শাস্ত হইল না।

কন্ট্রোলার শৈলেন্দ্রবাবু মস্ত একটা সোলার হ্যাট পরিয়া মজুর খাটাইতেছিলেন,— মিরিয়ম বেহারা দ্বারা তাঁহাকে সেলাম জানাইল।

শৈলেন্দ্র বাবু ঘরে ঢুকিয়া, টুপিটি খুলিয়া কহিলেন— আজ সকালে মিঃ মিরের সঙ্গে দেখা কবিতো গিয়াছিলাম। দুর্ভাগ্যবশত তিনি দশটার সময়ই তাঁহার স্ট্রীকে লইয়া ..

মিরিয়ম বান হস্তে টেবিলের কোণ চাপিয়া ধরিল।

...ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল দোঁখতে গিয়াছেন,— দেখা হইল না।

মিরিয়ম পাংশুমুখে জিজ্ঞাসিল— কাকে লইয়া? ...আপনি কাহার কথা বলিতেছেন মিঃ কার?

মিঃ মিরের কথাই বলিতেছি। কিছু টাকার আমার বিশেষ দরকাব পড়িয়াছিল।

মিরিয়ম পার্শ্বস্থিত চেয়ারখানায় বসিয়া পড়িল। অস্ফুট-কণ্ঠে বলিতে লাগিল— মিঃ মিত্র, মিঃ মিত্র! ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল—

শৈলেন্দ্র বাবু বলিলেন— হাঁ। সেইখানেই গিয়াছেন, শুনিলাম।

মিরিয়ম হঠাৎ চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া বাগ্রকণ্ঠে কহিল— মিঃ—মিঃ কার, আপনি নিশ্চয় জানেন, শুনিতে আপনার ভুল হয় নাই?

না,—না, ভুল হইবে কেন? আমি ঠিকই শুনিয়াছি, তিনি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল দোঁখতে গিয়েছেন...

আমি সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না, মিঃ কার, আমি—আমি জানিতে চাই যে— যে— তিনি ঐ মিঃ মিত্র একেলা...

না, তাঁহার স্ত্রী ও শ্যালক দু'জনকে লইয়া গিয়াছেন। তাঁহার বেহারা আমাকে বলিল— বাবু দুইটার সময় ফিরিবেন, বলিয়া গিয়াছেন।

মিরিয়ম নিঃশব্দে ফিরিয়া চেয়ারটায় বসিল। আশ্চর্য্য একটি কথাও সে বলিতে পারিল না। হৃদয়-মধ্যে যে বেদনা পূঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে, অপর একজন লোকের সামনে তাহা

গোপন করিবার জন্য সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বসিল, কিন্তু গোপন ত থাকে না। বুক যে ফুলিয়া-ফুলিয়া উঠিতেছে, নিঃশ্বাসের শব্দ যে ক্রমশই গভীর হইতেছে,— চক্ষের জল ত আর বাধা মানে না; —মিরিয়ম দক্ষিণ হস্তটি তুলিয়া করণ কণ্ঠে কহিল— শুড আফটার্ন...

শৈলেন্দ্রবাবু ‘শুড আফটার্ন’ করিলেন বটে, কিন্তু প্রথা-মত তখনি কক্ষ ত্যাগ করিতে পারিলেন না। মিরিয়মের অশ্রু-সজল মুখের কতকাংশ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল,— তিনি অতি ধীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসিলেন— একটা কথা কি বলিতে পারি মহাশয়?

না,— না, কোন কথা না— আপনি যান... শুড আফটার্ন...

শৈলেন্দ্র বাবু আর দ্বিধাক্রান্তি করিলেন না, ধীরে-ধীরে কক্ষ ত্যাগ করিয়া কর্মস্থলে ফিরিলেন।

মিরিয়ম অনেকক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। এই বাঙ্গালী! সে’ও এত শঠ, এত প্রবঞ্চক! তাহার কাছেও নারী খেলার সামগ্রী? কেবলমাত্র ভোগের বস্তু? মিবিয়ম যে কত গ্রন্থে এই ধর্মপরায়ণ জাতির সপক্ষে কত কথাই পাঠ করিয়াছে,— সে সকল মিথ্যা? ইহাদের জন্য ত্যাগের আদালতের প্রয়োজন হয় না,— ইহাদের পারিবারিক জীবনের কুংসা খবরের কাগজে ছাপা হইয়া পৃথিবীময় হৈ-চৈ পড়ে না। মিরিয়ম যে শুনিয়াছিল, ইহাদের দাম্পত্য জীবনে বিচ্ছেদ নাই, ত্যাগ নাই, বিরহ নাই— মিলন, মিলন— শুধুই মিলন! সে সব মিথ্যা! আর অমন মিথ্যা!

বাহির হইতে মিথ্যা-পরিপূর্ণ ইহাদের সনাজকে সে কি সত্য, কি সুন্দরই না দেখিত! মুখে অসামান্য সরলতার মুখোশ পরিয়া কি বীভৎসতাই না গোপন কবিয়া রাখিয়াছে—উঃ!

মিরিয়ম হঠাৎ এক সময় দাঁড়াইয়া উঠিল। তখনি আবার নতজানু হইয়া বসিয়া অশ্রুসিক্ত মুখে জগদীশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়া, সেই বারান্দাটিতে ফিরিয়া আসিল। শৈলেন্দ্র বাবু তখনও মজুরদের সঙ্গে ঘুরিতেছিলেন। মিরিয়ম তাড়াতাড়ি তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিল— প্লিজ মিঃ কার, আপনি এখানে কতক্ষণ থাকিবেন?

যড়ি দেখিয়া শৈলেন্দ্রবাবু বলিলেন— পাঁচটা পর্যন্ত ত বটেই,— একটু দেরীও হইতে পারে।

তবে আপনার কারখানি আমাকে একবার দিবেন?

নিশ্চয়ই!

ধন্যবাদ! আমি পাঁচটা ব ভিতরই আসিতেছি।

না আসিতে পারিলেও ক্ষতি নাই, আমার ছোট ভাইও— তিনি আমার সহকারী— আসিবা পড়িয়াছেন,— আমি তাঁহার কারেই ফিরিতে পারিব।

মিরিয়ম তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইয়া, তাঁহার গাড়ীতে বসিয়া সোফেয়াবকে বলিল— মিঃ মিস্ট্রের বাড়ী!

\* \* \* \*

বেহারী দীর্ঘ কুর্নিশ করিয়া কহিল— তাহার প্রভু গৃহে নাই, আসিতে বাত্রি হইবে।

সুবাস কি-একটা কাজে রামলক্ষ্মণকে ডাকিতে আসিয়াছিল; — মিরিয়মকে দেখিয়া বলিল,— সেলাই কলের মেম্ বৃথি রে! বলে দে’ বাবুর সঙ্গে আফিসে দেখা করতে!— মিরিয়ম শান্ত দৃষ্টিতে সুবাসকে দেখিতে দেখিতে বলিল— বেহারী, ইনি কে আছেন?

বেহারী একগাল হাসিয়া বলিল— মায়িকী!

সুবাস ইংরেজ মেয়েটিকে বাঙ্গলায় কথা বলিতে শুনিয়া কাছে আসিয়া বলিল— তুমি কে গা?

তোমার স্বামীর আফিসের টাইপিষ্ট!... তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

এস,— সুবাস তাহার হাত ধরিয়া নিজ কক্ষে লইয়া গেল।

সত্যেন্দ্র কাজ-কর্ম সারিয়া উঠি-উঠি করিতেছে,—চশমা-চোখে বড়বাবু কামরায় ঢুকিয়া বলিলেন— কি-রকম ওভার-টাইম দেব, বলুন। সবাই গজ-গজ করছে,— বলে, লোক রয়েছে,—উইদাউট নোটিশে (বিনা খবরে) কামাই করবে,— আর আমরা শালারা খেটে-খেটে মরব!

সত্যেন্দ্র বলিল— দিয়ে দিন না, যা হয়!... সে সিগারেট ধরাইল।

বড়বাবু বলিলেন— তা না হয় দিয়ে দিচ্ছি— কিন্তু উইদাউট নোটিশে যে এতদিন কামাই করেছে, তাকে রাখবার আর দরকার দেখি নে!

সত্যেন্দ্র চুরুটটিকে দাঁতে চাপিয়া মনে-মনে ভাবিল, বলিয়া ফেলিল যে আফিসে তাহাকে রাখিবার আর কোন দরকারই নাই। না থাক্— আরও কিছু দিন থাক্— অন্তত সুবাস চলিয়া যাক্— তার পব!

বড়বাবু সত্যেন্দ্রকে নীরব দেখিয়া বোম্বয়ন্ত স্বরে কহিলেন— ও রকম ফচুকে ছুঁড়ী-ফুঁড়ি দিয়ে কাজ চলে না। একদিন নয়— দু'দিন নয়, একেবারে দশ-পনেরো দিন কামাই,— না খবব, না কিছু! আমি কালই তার জায়গায় লোক নিতে চাই;— এমন করে আর কাজ চলে না। কি বলেন? কালই একটা লোকের চেষ্টা করি...

অক্লেশে করতে পারেন!.

বড়বাবু ফিরিতেই সত্যেন্দ্র দেখিল, মিরিয়ম। সত্যেন্দ্র প্রফুল্লিত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু বেরসিক বৃদ্ধের সাক্ষাতে তাহা প্রকাশ করিল না, মৃদু হাসিল মাত্র।

বড়বাবু মাথা চুলকাইতে-চুলকাইতে বলিলেন— তোমার এই পনেরো দিন কামাই,— আমি বাপু কাজ চালাই কি কবে? তাই কি একটা খবব দিয়েছিলে? এমনধারা করলে কাজ কি ক'বে চলে বল। লোক একটা ত দেখতেই হ'বে..

আমি একটি লোক দিতে পারি।

আবার তোমার লোক?

সত্যেন্দ্র বাঙ্গলায় বলিল— উহার সার্বিস্টিট্যুট উহার লোককেই করা উচিত।

মিরিয়ম নতমুখে গম্ভীর কণ্ঠে বলিল— এক মিনিট অপেক্ষা করুন, তাহাকে আনিয়া দিতেছি। মিঃ মিত্র, আপনি তাহাকে নিশ্চয়ই নির্বাচন করিবেন।

হাঁ—হাঁ— নিশ্চয়ই...

বড়বাবু বলিতেছিলেন—দাঁড়াও, লোক আসুক, দেখি, টেস্ট করি... কিন্তু কথা শেষ হইবার পূর্বেই মিরিয়ম বাহির হইয়া গেল এবং নিমেষমধ্যে এক অবগুপ্ততা নারী সহ ফিরিয়া আসিয়া বলিল— মিঃ বড়বাবু, আপনি এক মুহূর্তের জন্যে বাহিরে আসিবেন কি?

সত্যেন্দ্রের মাথা ঝিম্-ঝিম্ করিতেছিল,— লাফাইয়া উঠিয়া বলিল— কে!!

দেখ— মিঃ মিত্র। চিনিতে পার কি?... সে বাহির হইয়া গেল।

\* \* \* \*

হতভাগ্য শৈলেন্দ্র বাবু আর সত্যেন্দ্রের নিকট কোন কাজ আদায় করিতে পারেন নাই। মেসার্স মার্টিন কোং এখন সত্যেন্দ্রের কন্ট্রাক্টার্স!

## মেঘমল্লার

### বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দশপারমিতার মন্দিরে সেদিন যখন সাপুড়ের খেলা দেখবার জন্য অনেক মেঘেপুরুষ মন্দির-প্রাঙ্গণে একত্র হয়েছিল, তারই মধ্যে প্রদ্যুম্ন প্রথমে লোকটিকে দেখে।

সেদিন ছিল জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি। চারিপাশের গ্রাম থেকে মেয়েরা এসেছিল দশ-পারমিতার পূজা দিতে! সেই উপলক্ষে অনেক সাপুড়ে গায়ক বাজিকর মন্দিরে একত্র হয়েছিল; অনেক মালাকার নানা রকমের সুন্দর সুন্দর ফুলের গহনা গ'ড়ে মেয়েদের কাছে বেচবার জন্যে এনেছিল। একজন শ্রেষ্ঠী মগধ থেকে দামী রেশমী শাড়ি এনেছিল বেচবার জন্য। তারই দোকানে ছিল সেদিন মেয়েদের খুব ভিড়। প্রদ্যুম্ন গুনেছিল, জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তির উৎসব উপলক্ষে পারমিতার মন্দিরে একজন বিখ্যাত গায়ক ও বীণ-বাজিয়ে আসবেন। সে মন্দিরে গিয়েছিল তাঁরই সন্ধানে। সমস্ত দিন ধ'রে খুঁজেও কিন্তু প্রদ্যুম্ন তাঁকে ভিড়ের মধ্যে থেকে বার করতে পারেনি।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে মন্দিরের উঠানে একজন সাপুড়ে অদ্ভুত-অদ্ভুত সাপের খেলা দেখাতে আরম্ভ করলে, আর তারই চারিধারে অনেকগুলি কৌতুকপ্রিয়া মেয়ে জমে গেল। ক্রমে সেখানে খুবই ভিড় হয়ে উঠল। প্রদ্যুম্নও সেখানে দাঁড়িয়ে গেল বটে, কিন্তু তার মন সাপখেলার দিকে আদৌ ছিল না। সে ভিড়ের মধ্যের প্রত্যেক পুরুষমানুষকে মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করছিল, যদি চেহারায়ে ও হাবভাবে বীণ-বাজিয়ে ধরা পড়েন। অনেকক্ষণ ধ'রে দেখবাব পর তার চোখে পড়ল একজন শ্রীচ ভিড়ের মধ্যে তাব দিকেই চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর পরনে অতি মলিন ও জীর্ণ পরিচ্ছদ। কি জানি কেন প্রদ্যুম্নের মনে হ'ল, এই সেই গায়ক। প্রদ্যুম্ন লোক ঠেলে তাঁর কাছে যাবার উদ্যোগ করতে তিনি হাত উচু ক'বে প্রদ্যুম্নকে ভিড়ের বাইরে যেতে ইঙ্গিত করলেন।

বাইরে আসতে শ্রীচ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন— আমি অবস্তীর গাইয়ে সুবদাস, তুমি আমাকে খুঁজছিলে না?

প্রদ্যুম্ন একটু আশ্চর্য হ'ল। তার মনের কথা ইনি জানলেন কি ক'রে?

প্রদ্যুম্ন সসম্মত জানালে, হ্যাঁ, সে তাঁকেই খুঁজছিল বটে।

শ্রীচ বললেন— তুমি আমার অপরিচিত নও। তোমার পিতার সঙ্গে একসময় আমার যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল। আমি কাশী গেলেই তোমার পিতার সঙ্গে দেখা না ক'রে আসিতাম না। তোমাকে ছেলেবেলায় দেখেছি, তোমার বয়স তখন খুব কম।

— আপনি এখানে এসে কোথায় আছেন?

— নদীর ধারে একটা ভাঙা মন্দির আছে জান?

— হ্যাঁ, জানি। ওখানে একজন সন্ন্যাসী পূর্বে থাকতেন না?

— তিনি এখনও ওখানেই আছেন। তুমি যে-কোন একদিন গিয়ে ওখানে আমার সঙ্গে দেখা ক'রো। তুমি এখানে কোথায় থাক?

— এখানকার বিহারে পড়ি, তিন বছর আছি। আপনি মন্দিরে কতদিন থাকবেন?  
 — সে তোমাকে বলব। তুমি এরই মধ্যে একদিন যেও।  
 প্রদ্যুম্ন প্রণাম করে বিদায় নিল।

সন্ধ্যা তখনও হয়নি, মন্দিরটা যে ছোট পাহাড়ের উপর ছিল, তারই দুপাশের ঢালু রাস্তা বেয়ে মেয়েরা উৎসব থেকে বাড়ি ফিরছিল। প্রদ্যুম্নের চোখ যেন কার সন্ধানে একবার নেয়েদেব ভিড়ের মধ্যে ইতস্তত ধাবিত হ'ল, পরেই সে আবার তাদের পিছনে ফেলে দ্রুতপদে নামতে লাগল। আচার্য্য শীলব্রত অত্যন্ত কড়া মেজাজের মানুষ, একেই তিনি প্রদ্যুম্নের মধ্যে অনান্য ছাত্রদের চেয়ে বেশি চঞ্চলতা ও কৌতুকপ্রিয়তা লক্ষ্য ক'রে তাকে একটি বেশি শাসনের মধ্যে রাখতে চেষ্টা করেন— তার উপরে সে রাত ক'রে বিহার ফিবলে কি আর রক্ষা থাকবে?

বাঁক ফিরতেই বাঁ পাশের পাহাড়ের আড়ালটা সূরে গেল। সেখানে সোঁদকটা ছিল খোলা। প্রদ্যুম্ন দেখলে দূবে নদীর ধাৰে মন্দিরটার চূড়া দেখা যাচ্ছে। চূড়ার মাথার উপবকার ছায়াছন্ন আকাশ বেয়ে ঝাপসা ঝাপসা পাখার দল ডানা মেলে বাসায় ফিবছিল। আবও দূরে একখানা সাদা মেঘের প্রান্ত পশ্চিমদিকের পড়ন্ত রোদে সিঁদুরের মত রাঙা হয়ে আসছিল, চারিধাৰে তার শীতোজ্জ্বল মেঘের কাঁচুলি হালকা করে টানা।

হঠাৎ পিছন থেকে প্রদ্যুম্নের কাপড় ধ'রে কে ঈষৎ টানলে।

প্রদ্যুম্ন পিছন ফিবে চাইতেই যে কাপড় ধ'রে টেনেছিল তার চোখে কৌতুকের বিদ্যুৎ খেলে গেল। সে কিশোৰী, তাব দোলন-চাঁপা রং এৰ ছিপছিপে দেহটি বেড়ে' নীল শাড়ী ঘূৰিয়ে ঘূৰিয়ে পরা। নতুন কেনা একছড়া ফুলের মালা তাব খোঁপাটিতে জড়ানো।

প্রদ্যুম্ন বিশ্বাসেব সূরে ব'লে উঠল— কখন তুমি এসেছিলে, সুনন্দা! আমি তোমাকে এত খুঁতলাম, কৈ দেখতে পেলাম না তো?

প্রথমটা কিশোরীর মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, তারপরে সে একটি অভিমানের সুবে বললে —আমাকেই খুঁজতে যেন এখানে এসেছিলে আব কি! যত রাজ্যের সাপুড়ে আর বাড়িকরদের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে ঘূৰাছিলে, সে আর আমি দেখিনি!

— সত্যি বলছি সুনন্দা, তোমাকে খুঁজেছি। নামবার সময় খুঁজেছি, এর আগেও খুঁজেছি: তুমি কাদের সঙ্গে এলে?

এমন সময় দেখা গেল একদল মেয়ে পাহাড়ের উপর থেকে সেই পথে নেমে আসছে। সুনন্দার সোঁদকে চোখ পড়তেই সে তখনি হঠাৎ প্রদ্যুম্নকে পিছনে ফেলে দ্রুতপদে নামতে লাগল।

পিছনেই একদল অপরিচিতা মেয়ে, এ অবস্থায় আর সুনন্দার অনুসরণ করা সম্ভব হবে না ভেবে সে প্রথমটা খানিকক্ষণ চূপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তার পর হতাশা-মেশানো ক্রোধে ঘাড় উঁচু ক'রে সে সদর্পে লাফিয়ে লাফিয়ে পথ চলতে লাগল।

সন্ধ্যার ঈষৎ অন্ধকার কখন মিলিয়ে গিয়েছে, অন্ধকারটাই তরল থেকে তরলতর হতে হতে হঠাৎ কখন জ্যোৎস্নায় পরিণত হয়েছে, অনামনস্ক প্রদ্যুম্ন তা মোটেই লক্ষ্য করেনি। যখন তার চমক ভাঙল, তখন পূর্ণিমার শুভ্রোজ্জ্বল জ্যোৎস্না পথ-ঘাট ধুইয়ে দিচ্ছিল। দূর মাঠের গাছপালা জ্যোৎস্নায় ঝাপসা দেখাচ্ছিল। পড়াশুনা তার হয় কি করে? আচার্য্য পূর্ণবর্দ্ধন ত্রিপিটকের পাঠ অনায়ত্ত দেখে তাকে ভৎসনা করলেই বা কি করা যাবে? এ রকম রাত্রি যে যুগেযুগের বিরহীদের মনোবেদনা তার প্রাণের মধ্যে জমে ওঠে, তার অবাধ্য মন যে এই সব পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নারাত্রি মহাকোটটি বিহারের পাষাণ অলিন্দে মানসসুন্দরীদের পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়ায়, এর জন্য সে-ই কি দায়ী!

দশপারমিতার মন্দিরে সন্ধ্যারতির ঘণ্টার ধ্বনি তখনও মিলিয়ে যায়নি, দূরে নদীর বাঁকের ভাঙা মন্দিরে ক্ষীণ আলো জ্বলে উঠল, উৎসব-প্রথাগত নর-নারীর দল জ্যোৎস্না-ভরা মাঠের মধ্যে ক্রমে বহুদূরে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রদ্যুম্নের গতি আরো দ্রুত হ'ল।

পথের পাশে একটা গাছ। গাছের নিকট যেতে প্রদ্যুম্নের মনে হ'ল গাছের আড়ালে কেউ যেন দাঁড়িয়ে আছে— আর একটু এগিয়ে গাছের পাশে যেতেই তার অত্যন্ত পরিচিত কণ্ঠের হাস্য মিষ্টি হাসির টেউয়ে সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল,— দেখলে গাছতলায় সুনন্দা দাঁড়িয়ে আছে, গাছের পাতাব ফাঁক দিয়ে চিকচিকে জ্যোৎস্নার আলো প'ড়ে তার সর্ব্বাঙ্গে আলো-আঁধারের জাল বুনেছে। প্রদ্যুম্ন চাইতেই সুনন্দা ঘাড় দুলিয়ে ব'লে উঠল— আব একটু হলেই বেশ হ'ত! গাছের তলা দিয়ে চ'লে যেতে অথচ আমায় দেখতে পেতে না।

সুনন্দাকে দেখে প্রদ্যুম্ন মনে মনে ভারি খুশী হ'ল, মুখে বললে— নাঃ, তা আব দেখব কেন? ভারি ব্যাপাবটা হয়েছে গাছতলায় লুকিয়ে! আর না দেখতে পেলেনই বা কি? আমি তোমার ওপব ভারি রাগ করেছি, সুনন্দা, সত্যি বলছি।

সুনন্দা বললে— দোষ করবেন নিজে আবার রাগও করলেন নিজে। সেদিন কি কথা বলছিলে মনে আছে? তা না, যত রাজ্যেব সাপুড়ে আর বাজিকর—মাগো! ওদের কাছে যাও কি ক'রে? এমন ময়লা কাপড় পরে! আমি ওদের ব্রিসীমানায যাইনে।

প্রদ্যুম্ন বললে— তুমি বডমানুষের মেয়ে— তোমার কথাই আলাদা— কিন্তু কথাটা কি ছিল বলছিলে?

সুনন্দা বললে— যাও! আর মিথো ভানে দবকার নেই। কি কথা মনে ক'রে দেখ। সেই সেদিন বললে না?

প্রদ্যুম্ন একটুখানি ভেবে ব'লে উঠল— বুঝতে পেরেছি— সেই বাঁশী?

সুনন্দা অভিমানের সুরে বললে— ভেবে দেখ বর্লোছেল কিনা। আমি দুপুর বেলা থেকে মন্দিরে এসে ব'সে আছি। একে ত এলেন বেলা ক'রে, তার ওপর— যাও!

প্রদ্যুম্ন এবার হেসে উঠল। বললে— আচ্ছা সুনন্দা, যদি তুমি আমায় দেখতেই পের্যোছেল তো আমায় ডাকলে না কেন?

সুনন্দা বললে— আমি কি একা ছিলাম? দুপুর বেলায় আমি একা এসেছিলাম বটে, কিন্তু তখন ত আর তুমি আসনি? তার পর আমাদেব গায়ের মেয়েরা সব যে এল। কি ক'রে ডাকব?

প্রদ্যুম্ন বললে— আচ্ছা ধ'বে নিলাম আমার দোষ হয়েছে, তবে তুমি যে বাব বার সাপুড়ে হার বাজিকরদের কথা বলছ সুনন্দা,— সাপুড়ে আর বাজিকরদের আমি খুঁজনি। শুনেছিলাম অবস্তী থেকে একজন বড় বীণ-বাজিয়ে আসবেন, তুমি তো জানো, আমার অনেক দিন থেকে বীণ শেখবার বড় ইচ্ছা। তাই তাঁর সন্ধানে ঘুরছিলাম, তাঁর দেখাও পেয়েছি। তিনি এখনকার নদীর ধারের দেউলে থাকেন। ভালো কথা— তোমার বাবা কোথায়?

সুনন্দা বললে— বাবা তিন চার দিন হল কৌশাঘী গিয়েছেন মহারাজেব ডাকে।

প্রদ্যুম্ন হঠাৎ খুব উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল, বললে—ওহো তাই! নইলে আমি ভাবছি এত রাত পর্যন্ত সুনন্দা কি—

সুনন্দা তাড়াতাড়ি প্রদ্যুম্নের মুখে নিজের হাতদুটি চাপা দিয়ে লজ্জিত মুখে বললে— চূপ চূপ, তোমার কি এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই? এখুনি যে সব আরতি দেখে লোকফিরবে।

প্রদ্যুম্ন হাসি থামিয়ে বললে— এবার কিন্তু তোমার বাবা এলে ব'লে দেব নিশ্চয়—

সুনন্দা রাগের সুরে বললে— দিও ব'লে। এমনি আমি মন্দিরে আরতি পর্যন্ত থাকি, তিনি জানেন।

প্রদ্যুম্ন সুনন্দার সুগঠিত পুষ্পপেলব দক্ষিণ বাহুটি নিজের হাতের মধ্যে বেষ্টন করে নিলে, তারপর বললে— আচ্ছা থাক, ব'লে দেব না। চল সুনন্দা, তোমায় বাঁশী শোনাই,



আমার সঙ্গেই আছে— সত্যি বলছি, তোমায় শোনাবার জন্যেই এনেছিলাম। তবে ঝঁকে খুঁজছিলাম, বীণটা ভালো ক'রে শিখব ব'লে।

নদীর ধারে এসে কিন্তু প্রদ্যুম্ন বড় নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল। সে বাঁশী বাজালে বটে কিন্তু সে যেন ভাঙ্গা ভাঙ্গা। সুরের সঙ্গে তাতে তার প্রাণের কোন যোগ রইল না। তারা দুজনে নিঃশব্দে আরও কতবার বসেছে, প্রদ্যুম্নের বাঁশী শুনতে সুনন্দা ভালোবাসত ব'লে প্রদ্যুম্ন যখনই বিহার থেকে বাইরে আসত, বাঁশীটি সঙ্গে আনত। প্রদ্যুম্নের বাঁশীর অলস স্বপ্নময় সুরের মধ্যে দিয়ে কতদিন উভয়ের অজ্ঞাতে রোদভরা মধ্যাহ্ন গিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে, কিন্তু দুজনে এক হ'লে প্রদ্যুম্নের এ রকম নিরুৎসাহ ভাব তো সুনন্দা আর কখনো লক্ষ্য করেনি।

কি জানি কেন প্রদ্যুম্নের বার বার মনে আসছিল সেই জীর্ণ পরিচ্ছদপরা আত্মতদর্শন গায়ক সুরদাসের কথা। তাদের বিহারের কলাবিৎ ভিক্ষু বসুরতের আঁকা ভরার চিত্রের মতই লোকটা কেমন কুশ্রী লোলচর্ম শীর্ণদর্শন! পুরাতন পুথির ভূর্জপত্রের মত ওর পরিচ্ছদের কেমন একটা অপ্রীতিকর মেটে লাল রং।

তার পরদিন সকালে প্রদ্যুম্ন নদীর ধারের ভাঙা মন্দিরে গেল। সেটার দেব-মূর্তি বহুদিন অন্তর্হিত। সমস্ত গায়ে বড় বড় ফাটল, সাপখোপের বাস। নিকটবর্তী গ্রামবাসীরা সেদিকে বড় একটা কেউ আসত না। একজন আজীবক সন্ন্যাসী আজ প্রায় সাত আট মাস হ'ল সেখানে বাস করছেন। তাঁরই দু'চার জন অনুগত ভক্ত মাঝে মাঝে আসত যেত ব'লে মন্দিরের পথ আজকাল অপেক্ষাকৃত ভালো আছে।

অর্ধ-অন্ধকার মন্দিরের মধ্যে প্রদ্যুম্নের সঙ্গে সুরদাসের সাক্ষাৎ হ'ল। সুরদাস প্রদ্যুম্নকে দেখে খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন, তারপর বললেন— চল, বাইরে গিয়ে বসি, এখানে বড় অন্ধকার।

বাইরে গিয়ে সুরদাস আলোতে প্রদ্যুম্নের মুখ ভালো ক'রে দেখলেন, তার পর যেন আপন মনে বলতে লাগলেন— হবে, তোমার দ্বারাই হবে! আমি তা জানতাম।

প্রদ্যুম্ন সুরদাসের মূর্তি দূর থেকে দেখে যে অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেছিল, তাঁর নিকটে এসে কিন্তু প্রদ্যুম্নের সে ভাব কেটে গেল। সে লক্ষ্য করলে সুরদাসের মুখশ্রী একটু কুদর্শন হলেও প্রতিভাব্যঞ্জক।

সুরদাস বললে— আমি ভাবছিলাম তুমি আজ আসবে। হাঁ, তোমার পিতা তো একজন প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন, তুমি নিজে কিছু শিখেছ?

প্রদ্যুম্ন লজ্জিত-মুখে উত্তর দিলে— একটু-আধটু বাঁশী বাজাতে পারি।

সুরদাস উৎসাহের সুরে বললেন— পারা তো উচিত। তোমার বাবাকে জানত না এমন লোক এদেশে খুব কম আছে। প্রতি উৎসবেই কৌশাস্ত্রী থেকে তোমার বাবার নিমন্ত্রণপত্র আসত। হাঁ, আমি শুনেছি তুমি নাকি বাঁশীতে বেশ মেঘ-মল্লার আলাপ করতে পার।

প্রদ্যুম্ন বিনীতভাবে উত্তর দিলে— বিশেষ যে কিছু জানি তা নয়, যা মনে আসে তাই বাজাই, তবে মেঘ-মল্লার মাঝে মাঝে বাজিয়েছি।

সুরদাস বললেন— কই দেখি তুমি কেমন শিখেছ?

বাঁশী সব সময়েই প্রদ্যুম্নের কাছে থাকত। কখন কোন্ সময় সুনন্দার সঙ্গে দেখা হয়ে পড়ে বলা যায় না।

প্রদ্যুম্ন বাঁশী বাজাতে লাগল। তার পিতা তাকে বাল্যকালে যত্ন করে রাগ-রাগিণী শেখাতেন, তা ছাড়া সঙ্গীতে প্রদ্যুম্নের একটা স্বাভাবিক ক্ষমতাও ছিল। তার আলাপ অতি মধুর হ'ল। লতাপাতা ফুলফলের মাঝখান বেয়ে উদার নীল আকাশ আর জ্যোৎস্নারাতের মর্ম্ম ফেটে যে রসধারা বিশ্বে সব সময় বয়ে পড়ছে, তার বাঁশীর গানে সে রস যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠল, সুরদাস বোধ হয় এতটা আশা করেন নি, তিনি প্রদ্যুম্নকে আলিঙ্গন করে বললেন— ইন্দ্রদ্যুম্নের ছেলে যে এমন হবে, সেটা বেশি কথা নয়। বুঝতে পেরেছি, তুমিই পারবে, এ আমি আগেও জানতাম।

নিজের প্রশংসাবাদে প্রদ্যুম্নের তরুণ সুন্দর মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

অন্যান্য দু'এক কথার পর, প্রদ্যুম্ন বিদায় নিতে উদ্যত হ'লে, সুবদাস তাকে বললেন - শোন প্রদ্যুম্ন, একটা গোপনীয় কথা তোমার সঙ্গে আছে। তোমাকে একথা বলব ব'লে পূর্বেও আমি তোমার খোঁজ করেছিলাম। তোমাকে পেয়ে খুব ভালোই হল, একটা গোপন কথা তোমাকে বলি, কিন্তু তার আগে তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, একথা তুমি কারও কাছে প্রকাশ করবে না।

প্রদ্যুম্ন অত্যন্ত বিস্মিত হ'ল। এই প্রৌঢ়ের সঙ্গে তার মোটে এক দিনের আলাপ, এমন কি গোপনীয় কথা ইনি তাকে বলবেন?

সে বললে— কি কথা না শুনে কি করে—

সুরদাস বললে— তুমি ভেব না, কোনো অনিষ্টজনক ব্যাপার হলে আমি তোমাকে বলতাম না।

কি কথা জানবার জন্যে প্রদ্যুম্নের অত্যন্ত কৌতূহলও হ'ল, সে প্রতিজ্ঞা কবলে সুবদাসের কথা কাবো কাছে প্রকাশ করবে না।

সুরদাস গলার স্বর নামিয়ে বলতে লাগলেন— নদীর ঐ বড় বাঁকে যে চিবিটা আছে জানো? তার সামনেই বড় মাঠ। ওই চিবিটায় বহু প্রাচীন কালে সরস্বতী দেবীর মন্দির ছিল, শুনেছি এদেশের যত বড় বড় গায়ক ছিলেন, শিক্ষা শেষ করে সন্মুখেই আগে ওই মন্দিরে এসে দেবীর পূজা দিয়ে তুষ্ট না করে ব্যবসা আরম্ভ করতেন না। সে অনেক দিনের কথা, তার পর মন্দির ভেঙে-চূরে ওই দাঁড়িয়েছে। ঐ চিবিতে ব'সে আষাঢ়ী পূর্ণিমার রাতে মেঘ-মল্লার নিখুঁতভাবে আলাপ করলে সরস্বতী দেবী স্বয়ং গায়কের কাছে আবির্ভূতা হন। এ সংবাদ এদেশে কেউ জানে না। আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র এই তিন মাসের তিন পূর্ণিমায় প্রতিবাব যদি তাঁকে আনতে পাবা যায়, তবে তাঁর বরে গায়ক সঙ্গীতে সিদ্ধ হয়। তাঁর বরে সঙ্গীত সংক্রান্ত কোনো বিষয় তখন গায়কের কাছে অজ্ঞাত থাকে না। তবে একটা কথা আছে, যে গায়ক বর প্রার্থনা করবে সে অবিবাহিত হওয়া চাই। তা আমি বলছিলাম, সামনের পূর্ণিমায তুমি আর আমি এই বিষয়টা চেষ্টা করে দেখব, তুমি কি বল?

সুরদাসের কথা শুনে প্রদ্যুম্ন অবাক হয়ে গেল। তা কি ক'বে হয়? আচার্য্য বসুত্রত কলাবিদ্যা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে দিতে অনেক বার যে বলেছেন কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর যে মূর্ত্তি হিন্দুরা কল্পনা করেন, সেটা নিছক কল্পনাই, তার সঙ্গে বাস্তবের কোন সম্পর্ক নেই। সত্য সত্য তাঁকে দেখতে পাওয়া— এ কি সম্ভব?

প্রদ্যুম্ন চুপ করে রইল।

সুরদাস একটু ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলেন— এতে কি তোমার অমত আছে?

প্রদ্যুম্ন বললে— সে জন্মে না। কিন্তু আমি ভাবছিলাম, এটা কি করে সম্ভব যে—

সুরদাস বললেন— সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিত থাকো। এর সত্যতা তুমি নিজের চোখে দেখো। তোমার অমত না থাকলে আমি সামনের পূর্ণিমায সব ব্যবস্থা করে রাখি।

সুরদাসের কথার পর থেকেই প্রদ্যুম্ন অত্যন্ত বিস্ময়ে ও কৌতূহলে কেমন এক রকম হয়ে গিয়েছিল। সে ঘাড় নেড়ে বললে— আচ্ছা রাখবেন, আমি আসব।

সুরদাস বললেন— বেশ, বড় আনন্দিত হলাম। তুমি মাঝে মাঝে একবার ক'রে এখানে এস, তোমাকেও তৈরী হ'তে হ'লে দু-একটা কাজ করতে হবে, সে ব'লে দেব।

প্রদ্যুম্ন আর একবার সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়বার পর সুরদাসের কাছে বিদায় চাইলে।

তারপর সে চিন্তিতভাবে বিহারের পথ ধরল।

তার মনে হচ্ছিল— দেবী সরস্বতী স্বয়ং? স্বেতপদ্মের মত নাকি রংটি তাঁর, না জানি কত সুন্দর তাঁর মুখশ্রী! আচার্য্য্য বসুত্রত বলেন বটে...

ভদ্রাবতী নদীর ধারে শাল-পিয়াল-তমাল বনে সেবার ঘনঘোর বর্ষা নামূল। সারা আকাশ জুড়ে কোন বিরহিণী পুরসুন্দরীর অযত্নবিন্যস্ত মেঘবরণ চুলের রাশ এলিয়ে দেওয়া, প্রাবৃত-রজনীর ঘনাক্ষকার তার প্রিয়হীন প্রাণের নিবিড় নিঃস্রব্দতা, দূর বনের ঝোড়ো হাওয়ায় তার আকুল দীর্ঘশ্বাস, তারই প্রতীক্ষাশ্রান্ত আঁখি-দুটির অশ্রুভারে ঝরঝর অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণ, মেঘমেদুর আকাশের বৃকে বিদ্যুৎচমক তার হতাশ প্রাণে ক্ষণিক আশার মেঘদূত।

আষাঢ়। পূর্ণিমার রাতে প্রদ্যুম্ন সুরদাসের সঙ্গে নদীর ঘাটে গেল। তারা যখন সেখানে পৌছল, তখন মেঘ নেমে সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলেছে, চারিদিক তরল অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখাচ্ছে।

প্রদ্যুম্ন সুরদাসের কথামত নদী থেকে স্নান ক'রে এসে বস্ত্র পরিবর্তন করলে। সঙ্গীর ক্রিয়াকলাপে প্রদ্যুম্ন বুঝতে পারলে তিনি একজন ত্রাস্ত্রক। তাদের বিহাবে একজন ভিক্ষু ছিলেন, তিনি যোগাচার্য্য্য পদ্মসম্ভবের শিষ্য। সেই ভিক্ষুর কাছে তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের কথা কিছু কিছু সে শুনেছিল। সুরদাস অনেকগুলো রক্তজবার মালা সঙ্গে ক'রে এনেছিলেন, তার মধ্যে কতকগুলো তিনি নিজে পরলেন, কতকগুলো প্রদ্যুম্নকে পরতে বললেন। ছোট মড়ার মাথার খুলিতে তেল সল্তে দিয়ে প্রদীপ জ্বাললেন। তাঁর পূজার আয়োজনে সাহায্য করতে করতে প্রদ্যুম্ন হাঁপিয়ে পড়ল। ব্যাপারটার শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়ায় দেখবার জন্যে তাব মনে এত কৌতূহল হচ্ছিল যে অন্ধকার রাতে একজন প্রায়-অপরিচিত তান্ত্রিকের সঙ্গে একা থাকবার ভয়ের দিকটা তার একেবারেই চোখে পড়ল না। অনেক রাত্রে হোম শেষ হ'ল।

সুরদাস বললেন— প্রদ্যুম্ন, তুমি এবার তোমার কাজ আরম্ভ করো, আমার কাজ শেষ হয়েছে। খুব সাবধান, তোমার কৃতিত্বের ওপর এর সাফল্য নির্ভর করছে।

তাঁর চোখের কেমন একটা ক্ষুধিত দৃষ্টি যেন প্রদ্যুম্নের ভালো লাগল না। কিন্তু তবু সে ব'সে একমনে বীণীতে মেঘ-মল্লার আলাপ আরম্ভ করলে।

তখন আকাশ-বাতাস নীরব। অন্ধকারে সামনেব মাঠটায় কিছু দেখবার উপায় নেই। শালবনের ডালপালায় বাতাস লেগে একরকম অস্পষ্ট শব্দ হচ্ছে। বড় মাঠের পারে শালবনের কাছে দিকচক্রবালের ধারে নৈশ প্রকৃতি পৃথিবীর বুকের অন্ধকার শম্পশয্যায় কচি ঘাস তার অঞ্চল বিছিয়েছে। শুধু বিশ্রাম ছিল না ভদ্রাবতীর, সে কোন্ অনন্তের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দেবার আকুল আগ্রহে একটানা বয়ে চলেছে, মৃদু গুঞ্জে আনন্দ-সঙ্গীত গাইতে গাইতে, কূলে তাল দিতে দিতে। ইঠাৎ সামনের মাঠটা থেকে সমস্ত অন্ধকার কেটে গিয়ে সাদা মাঠটা তরল আলোকে প্লাবিত হয়ে গেল! প্রদ্যুম্ন সবিস্ময়ে দেখলে— মাঠের মাঝখানে, ৪১ পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মত অপরূপ আলোর মণ্ডলে কে এক জ্যোৎস্নাবরণী অনিন্দ্যসুন্দরী মহিমাময়ী তরুণী! তাঁর নিবিড় কৃষ্ণ কেশরাজি অযত্নবিন্যস্ত ভাবে তাঁর অপূর্ব গ্রীবাদেশের পাশ দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, তাঁর আয়ত নয়নের দীর্ঘ কৃষ্ণপশ্চু কোন স্বপ্নীয় শিখীর তুলি দিয়ে আঁকা, তাঁর তুষারধবল বাহুবল্লী দিবা পুষ্পাভরণে মণ্ডিত, তাঁর ক্ষীণ কটি নীল বসনের মধ্যে

অর্ধলুপ্তায়িত মণিমেখলায় দীপ্তিমান, তাঁর রক্তকমলের মত পা দুটিকে বুক পেতে নেবার জন্যে মাটিতে বাসন্তী পুষ্পের দল ফুটে উঠেছে...হাঁ, এই তো দেবী বাণী! এঁর বীণার মঙ্গল স্বরধ্বারে দেশে দেশে শিল্পীদের সৌন্দর্য্যভূষণ সৃষ্টিমুখী হয়ে উঠেছে, এঁর আশীর্ব্বাদে দিকে দিকে সত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হচ্ছে, এঁরই প্রাণের ভাঙারে বিশ্বের সৌন্দর্য্যসম্ভার নিত্য অফুরন্ত রয়েছে, শান্ত এঁর মহিমা, অক্ষয় এঁর দান, চিরনূতন এঁর বাণী।

প্রদ্যুম্ন চেয়ে থাকতে থাকতে দেবীর মূর্ত্তি অল্পে অল্পে মিলিয়ে গেল। জ্যোৎস্না আবার স্নান হয়ে পড়ল, বাতাস আবার নিস্তেজ হয়ে বইতে লাগল।

অনেকক্ষণ প্রদ্যুম্নের কেমন একটা মোহের ভাব দূর হ'ল না। সে যা দেখলে— এ স্বপ্ন না সত্য? অবশেষে সুরদাসের কথায় তার চমক ভাঙল। সুরদাস বললে— আমার এখনও কাজ আছে, তুমি ইচ্ছা করলে যেতে পার— কেমন, আমার কথা মিথ্যা নয় দেখলে ত?

সুরদাসের কথা কেমন অসংলগ্ন বোধ হতে লাগল, তাঁর মুখের দিকে চেয়ে প্রদ্যুম্ন দেখলে, তাঁর চোখ দুটো যেন অর্ধ অন্ধকারের মধ্যে জ্বল্ জ্বল্ করছে।

তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে যখন বিহারের দিকে রওনা হ'ল, পূর্ণিমার চাঁদকে তখন মেঘে প্রায় ঢেকে ফেলেছে। একটু একটু জ্যোৎস্না যা আছে, তা কেমন হল্দ্দে রং-এব, গ্রহণের সময় জ্যোৎস্নার এ রকম রং সে কয়েকবার দেখেছে।

মাঠ খুব বড়, পার হ'তে অনেকটা সময় লাগল। তারপর মাঠ ছাড়িয়ে বড় বনটা আরম্ভ হ'ল। খুব ঘন বন, শাল দেবদারু গাছের ডালপালা নিবিড় হয়ে জড়াজড়ি ক'রে আছে, মধ্যে অন্ধকারও খুব। পাছে রাত ভোর হয়ে যায়, এই ভয়ে সে খুব দ্রুতপদে যাচ্ছিল। যেতে যেতে তার চোখে পড়ল বনের মধ্যে এক স্থান দিয়ে যেন খানিকটা আলো বেরুচ্ছে। প্রথম সে ভাবলে, গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়ে থাকবে, কিন্তু ভালো ক'রে লক্ষ্য ক'রে দেখে সে বুঝলে যে, সে আলো জ্যোৎস্নার আলোর মতন নয়, বরং... কৌতূহল অত্যন্ত হওয়াতে পথ ছেড়ে সে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। যে পিঙ্গল গাছের সারির ফাঁক দিয়ে আলো আসছিল, তার কাছে গিয়ে গাছের গুঁড়ির ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে প্রদ্যুম্ন অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

এ কি! একেই তো সে এইমাত্র মাঠের মধ্যে দেখেছে, এই সেই অপরূপ সুন্দরী নারী তো!

অদ্ভুত! সে দেখলে যাকে এইমাত্র মাঠের মধ্যে দেখেছে, সেই অপরূপ দ্যুতিশালিনী নারী বনের মধ্যে চারিধারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, জোনাকী পোকার হল্দ্দ থেকে যেমন আলো বার হয়— তাঁর সমস্ত অঙ্গ দিয়ে তেমনি একরকম স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলো বেরুচ্ছে, অনেকদূর পর্য্যন্ত বন সে আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, আর একটু নিকটে গিয়ে সে লক্ষ্য করলে, তাঁর আয়ত চক্ষু দুটি অর্ধনিম্নীলিত, যেন কেমন নেশার ঘোরে তিনি চারিপাশে হাতড়ে পার হবার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু তা না পেয়ে পিঙ্গল গাছগুলোর চারিধারে চক্রাকারে ঘুরছেন, তাঁর মুখশ্রী অত্যন্ত বিপ্লবের মত।

প্রদ্যুম্নের হঠাৎ বড় ভয় হ'ল। সে ভাবলে মাঠে সরস্বতী দেবীর দর্শন থেকে আর এ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনাটা আগাগোড়া ভৌতিক, এই নিশীথ রাত্রে শালের বনে নইলে এ কি কাণ্ড!

সে আর সেখানে মোটেই দাঁড়াল না। বন থেকে বার হয়ে দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে যখন সে বিহারের উদ্যানে এসে পৌঁছল, স্নান চাঁদ তখন কুমারশ্রেণীর পাহাড়ের পিছনে অস্ত যাচ্ছে।

ভোর রাত্রে শয়্যায় শুয়ে ঘুমিয়ে প'ড়ে সে স্বপ্ন দেখলে— ভদ্রাবতীর গভীর ঝালো জলেব তলায় রাতের অন্ধকারে কে এক দেবী পথ হারিয়ে ফেলেছেন; তিনি যতই উপরে ওঠবার চেষ্টা পাচ্ছেন, জলের ঢেউ তাঁকে ততই বাধা দিচ্ছে, নদীর জলে তাঁর অঙ্গের জ্যোতি ততই

নিবে আসছে, অঙ্ককার ততই তাঁর চারিপাশে গাঢ় হয়ে আসছে, নদীর মাছগুলো তাঁর কোমল পা দুখানি ঠুক্ করে রক্তাক্ত করে দিচ্ছে... ব্যথিতদেহা, বিপন্ন, বেপথুমতী দেবীর দুঃখ দেখে একটা বড় মাছ দাঁত বার করে হিংস্র হাসি হাসছে, মাছটার মুখ গায়ক সুরদাসের মত !

প্রদ্যুম্ন ভোরে উঠেই আচার্য্য পূর্ণবর্দ্ধনের কাছে গিয়ে সুরদাসের সঙ্গে প্রথম দেখার দিন থেকে গতরাত্রি পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপার খুলে বললে। আচার্য্য পূর্ণবর্দ্ধন বৌদ্ধ দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন, মঠের ভিক্ষুদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও বিজ্ঞ, এজন্য সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করত। তিনি সব শুনে বিস্মিত হলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখের দৃষ্টি শঙ্কাকুল হয়ে উঠল। গিজ্ঞাসা করলেন— একথা আগে জানাওনি কেন ?

— তিনি নিষেধ কবেছিলেন। আমি তার কাছে প্রতিজ্ঞা—

— বুঝেছি। তবে এখন বলতে এসেছ কেন ?

— এখন আমার মনে হচ্ছে, আমি কার যেন কি অনিষ্ট করেছি।

পূর্ণবর্দ্ধন একটুখানি কি ভাবলেন, তাবপর বললেন— এই বকম একটা কিছু ঘটবে তা আমি জানতাম। পদ্মসম্ভব আব তার কতকগুলো কাণ্ডজ্ঞান হীন তাত্ত্বিক শিষ্য দেশেব ধর্ম্ম-কর্ম্ম লোপ কবতে বসেছে। স্বার্থসিদ্ধির জন্যে এরা না কবতে পারে এমন কোন কাজই নেই — আর আমি বেশ দেখছি প্রদ্যুম্ন যে, তোমার এই অবাধ্যতা ও অযথা কৌতুকপ্রিয়তাই তোমার সর্ব্বনাশের মূল হবে। তুমি কাল রাত্রে অত্যন্ত অনায্য কাজ করেছ, তুমি দেবী সরস্বতীকে বন্দি করবার সহায়তা করেছ।

এবার প্রদ্যুম্নের বিস্মিত হবার পালা। তার মুখ দিয়ে কোনো কথা বার হ'ল না। পূর্ণবর্দ্ধন বললেন — এই সব কুসংসর্গ থেকে দূরে রাখবাব জন্যেই আমি বিহারের কোনও ছাত্রকে বিহারেব বাইরে যাবার অনুমতি দিইনে, কিন্তু যাক্, তুমি ছেলেমানুষ, তোমারই বা দোষ কি। আচ্ছা, এই সুরদাসকে দেখতে কি বকম বল দেখি ?

প্রদ্যুম্ন সুরদাসের আকৃতি বর্ণনা করলে।

পূর্ণবর্দ্ধন বললেন— আমি জানি। তুমি যাকে সুরদাস বলছ, তাব নাম সুরদাস নয় বা তাব বাড়ী অবস্থীতেও নয়। সে হচ্ছে প্রসিদ্ধ কাপালিক ওণাঢ়। কার্য্যসিদ্ধির জন্যে তোমার কাছে মিথ্যা নাম বলেছে—

প্রদ্যুম্ন অধীর ভাবে বলে উঠল, কিন্তু আপনি যে বলেছেন—

পূর্ণবর্দ্ধন বললেন, সে ইতিহাস বলছি শোন। নদীর ধারে যে সরস্বতী মন্দিরেব ভগ্নস্তূপ আছে, ওটা হিন্দুদের একটা অত্যন্ত বিখ্যাত তীর্থস্থান। প্রায় দুশত বৎসর পূর্বে একজন তরুণ গায়ক ওখানে থাকত। তখন মন্দিরের খুব সমৃদ্ধির অবস্থা ছিল না। কিন্তু প্রবাদ এই যে, সে গায়কটি মেঘ-মল্লারে এমন সিদ্ধ ছিল যে, আষাঢ়ী পূর্ণিমার রাতে তার আলাপে মুগ্ধা হয়ে দেবী সরস্বতী স্বয়ং তার কাছে আবির্ভূতা হতেন। সেই থেকে ওই মন্দির এক প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান হয়ে ওঠে। সে গায়ক মারা যাওয়ার পরেও কিন্তু পূর্ণিমার রাতে সিদ্ধ গায়ক মল্লার আলাপ করলেই দেবী যেন কোন টানে তার কাছে এসে পড়েন। এই ওণাঢ় একবার অবস্থীব প্রসিদ্ধ গায়ক সুরদাসের সঙ্গে ওই টিবিতে উপস্থিত ছিল। সুবদাস মেঘনম্লার-সিদ্ধ ছিলেন। তার গানে নাকি সরস্বতী দেবী তাঁর সম্মুখে আবির্ভূতা হয়ে তাঁকে বর প্রার্থনা করতে বলেন। সুরদাস প্রার্থনা করেন, তিনি যেন দেশের সম্মীতজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন প্রাপ্ত হন। সরস্বতী দেবী তাঁকে সেই বরই দেন। তার পর দেবী যখন ওণাঢ়াকে বর প্রার্থনার কথা বলেন, তখন সে দেবীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকেই প্রার্থনা করে বসে। সরস্বতী

দেবী বলেছিলেন, তাঁকে পাওয়া নিশ্চয়ের কাজ নয়, সে নামে গুণাঢ্য হ'লেও কার্যত তার এমন কোনো কলাতেই নিপুণতা নেই যে তাঁকে পেতে পারে, অনেক জীবন ধ'রে সাধনার প্রয়োজন। সরস্বতী দেবী অন্তর্হিত হওয়ার পর মূর্খ গুণাঢ্যের মোহ আরও বেড়ে যায়, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে দেবীর উপর তার অত্যন্ত রাগ হয়। সে তস্তোত্তম মন্ত্রবলে দেবীকে বন্দনী করবার জন্যে উপযুক্ত তান্ত্রিক গুরু খুঁজতে থাকে। আমি জানি সে এক সন্ন্যাসীর কাছে তন্ত্রশাস্ত্রের উপদেশ নিত। সন্ন্যাসী কিছুদিন পরে তার তন্ত্রসাধনার হীন উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তাকে দূর করে দেন। এসব কথা এদেশের সকল প্রাচীন লোকেই জানেন। আমি অনেকদিন তারপর গুণাঢ্যের আর কোনও সংবাদ জানতাম না। ভেবেছিলাম সে এদেশ থেকে চলে গিয়েছে। কিন্তু এখন তোমার কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে কাল রাত্রে সে কৃতকার্য হয়েছে বোধ হয়। এতদিন ঐ উদ্দেশ্যেই সে কোথাও তন্ত্রসাধনা করছিল। যাক তুমি এখনি গিয়ে সন্ধান করো মন্দিরে সে আছে কিনা, থাকে যদি আমায় সংবাদ দিও।

প্রদ্যুম্ন সেখানে আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না। সে ছুটে গিয়ে বিহারেব উদ্যানে পড়ল। তখন রোদ বেশ ফুটে উঠেছে, বিহারের পাঠাখীদের সমবেত কণ্ঠের স্তোত্রগান তার কানে আসছিল :—

যে ধম্মা হেতুপ্পভবা

তেসং হেতুং তথাগতো আহ

তেসঞ্চ যে নিরোধো

এবংবাদী মহাসমনো...

যেতে যেতে সে দেখলে উদ্যানের এক প্রান্তে একটা বড় আমগাছের ছায়ায় চিত্রকর ভিক্ষু বসুত্র হরিগচর্মের আসনে ব'সে বোধ হয় কি আঁকছেন, কিন্তু তাঁর মুখে অতৃপ্তি ও অসাম্যের একটা চিহ্ন আঁকা।

প্রদ্যুম্ন যা ভেবেছিল তাই ঘটল। মন্দিরে গিয়ে সে দেখলে— সেখানে কেউ নেই, গুণাঢ্য তো নেইই, সেই আজীবক সন্ন্যাসী পর্যাপ্ত নেই। দু'একটা যবাগৃপানের ঘট, আঙুন জ্বালবার জন্যে সংগৃহীত কিছু শুকনো কাঠ মন্দিরের মধ্যে এদিক ওদিক ছড়ানো প'ড়ে আছে।

সেইদিন গভীর রাত্রে প্রদ্যুম্ন কাউকে কিছু না ব'লে চুপি চুপি বিহাব পরিত্যাগ করলে।

তার পর এক বৎসর কেটে গিয়েছে।

বিহার পরিত্যাগ করবার পর প্রদ্যুম্ন একবার কেবল সুনন্দার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেছিল, সে বিশেষ কোন কাজে বিদেশে যাচ্ছে, শীঘ্রই ফিরে আসবে। এই এক বৎসর সে কাঞ্চী, উত্তর কৌশল ও মগধের সমস্ত স্থান খুঁজেছে, কোথাও গুণাঢ্যের সন্ধান পায়নি।

তবে বেড়াতে বেড়াতে কতকগুলি কৌতূহলজনক কথা তার কানে গিয়েছে।

মগধের প্রসিদ্ধ ভাস্কর মিহিরগুপ্ত রাজার আদেশমত ভগবান তথাগতের মূর্তি তৈরী করতে আদিষ্ট হয়েছিলেন। এক বৎসর পরিশ্রম ক'রে তিনি যে মূর্তি গড়ে তুলেছেন, তার মুখশ্রী এমন রূঢ় ও ভাববিহীন হয়েছে যে তা বুদ্ধের মূর্তি কি মগধের দুর্দান্ত দস্যু দমনকের মূর্তি, তা সেদেশের লোক ঠিক বুঝতে পারছে না।

তক্ষশীলার বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত যমুনাচার্য মীমাংসাদর্শনের ভাষা প্রণয়ন করতে নিযুক্ত ছিলেন, হঠাৎ তাঁর নাকি এমন দুর্দশা ঘটেছে যে তিনি আর সূত্রের অর্থ ক'রে উঠতে না পেরে আবার বৈদিক ব্যাকরণের সুবৃত্ত প্রকরণ থেকে পড়তে আরম্ভ করেছেন।

মহাকৌটলী বিহাবের চিত্রবিদ্যা-শিক্ষক ভিক্ষু বসুত্রত “বুদ্ধ ও সৃজাতা” নামক তাঁর চিত্রখানা বৎসরাবধি চেষ্টা করেও মনের মত ক'রে ঐকে উঠতে না পেরে বিরক্ত হয়ে ওদিকে একবার ছেড়ে দিয়ে সম্প্রতি নাকি শাকুনশাস্ত্রের চর্চায় অত্যন্ত উৎসাহ দেখাচ্ছেন।

একদিন প্রদ্যুম্ন সন্ধান পেলে উরুবিশ্ব গ্রামের কাছে একটা নিভর্জন স্থানে একজন গো-চিকিৎসক এসে বাস করছেন। তাঁর চেহারার বর্ণনার সঙ্গে সুরদাসের আকৃতির অনেকটা মিল হ'ল। তখন সে গ্রামে গিয়ে অনেককে জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু গো-চিকিৎসকের সন্ধান কেউ দিতে পারলে না।

সেদিন ঘুরতে ঘুরতে অবসন্ন অবস্থায় উরুবিশ্ব গ্রামের প্রান্তের একটা বড় বট গাছের ছায়ায় সে বসেছে। সন্ধ্যা তখনও নামেনি, ঝিরঝিবে বাতাসে গাছের পাতাগুলো নাচছে, পাশে মাঠে পাকা শস্যের শীষগুলো সোনার মত চিক্‌মিক্‌ করছে, একটু দূরে একটা ডোবার মত জলাশয়ে বিস্তারিত কুমুদ ফুল ফুটে আছে, অনেক বনাহংস তাব জলে খেলা করছে।

সাননে একটু দূরে একটা ছোট পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে একটা বনগা। পাহাড়ের নীচে এক জায়গায় ঝরনার জল খানিকটা আটকে গিয়ে ওই ডোবার মত জলাশয়টা তৈরী করেছে। প্রদ্যুম্নের হঠাৎ চোখ পড়ল, পাহাড়ের গা বেয়ে ধাপে ধাপে ঘটকক্ষে এক স্ত্রীলোক নেমে আসছেন।

দেখে তার মনে কেমন সন্দেহ হওয়াতে সে এগিয়ে গেল। ডোবার একদিকের উঁচু পাড়ে গিয়ে দেখেই তার মাথাটা যেন ঘুরে উঠল— এই তো! এই তো তিনি। ভদ্রাবতীর তাঁরে শালবনে ইনিই তো পথ হারিয়ে ঘুরছিলেন, মাঠের মধ্যে জোতাঙ্গারাতে একেই তা সে দেখেছিল -- তবে তাঁর অঙ্গের সে জোতীর এক কণাও আর নেই, পরনে অতি মলিন এক বস্ত্র। কিন্তু সেই চোখ, সেই সুন্দর গঠন।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে তার আর কোন সন্দেহ রইল না যে, এই তিনি। তার মনের নঞ্চ গোলমাল বেধে গেল। সে উত্তেজনার মাথাষ বিহাব ছেড়ে সুরদাসের খোঁজ ক'রে বেড়াচ্ছিল বটে, কিন্তু দেখা পেলো কি করবে তা সে ভাবেনি। কাজেই সে এবকম লুকিয়েই সেখান থেকে চ'লে এল।

রোজ রোজ সন্ধ্যায় প্রদ্যুম্ন এসে বটগাছটার তলায় বসে। রোজ সন্ধ্যার আগে দেবী পাহাড়ের গায়ের পথ বেয়ে নেমে আসেন, আবার সন্ধ্যার সময় ঘটকক্ষে ধাপে ধাপে উঠে চ'লে যান— সে রোজ ব'সে দেখে।

এই বকম কিছু দিন কেটে গেল। একদিন প্রদ্যুম্ন মাঠের গাছতলায় চুপ ক'রে ব'সে আছে, সেই সময় দেবী জলাশয়ে নামলেন। সেও কি ভেবে ডোবার এদিকের পাড়ের দিকে দাঁড়াল— দেখলে দেবী খট নাঁমায়ে রেখে কুমুদ ফুল সংগ্রহে বড় ব্যস্ত। একটা বড় ফুল জলাশয়ের এপারের দিকে এগিয়ে বেশি জলে ফুটেছিল, তিনি সেটা সংগ্রহেব জন্য খানিকটা বৃথা চেষ্টা করবার পর চোখ তুলে অপব পারে প্রদ্যুম্নকে দেখতে পেয়ে হঠাৎ একটু অপ্রতিভেব হাসি হাসলেন— তারপর হাসিমুখে তার দিকে চেয়ে বললেন— ফুলটা আমায় তুলে দেবে?

— দিই যদি আপনি এক কাজ করেন।

— কি বলো?

— আমায় কিছু খেতে দেবেন? আমি সমস্ত দিন কিছু খাইনি।

দেবীর মুখে ব্যথার চিহ্ন দেখা দিল। বললেন—আহা! তা এতক্ষণ বলনি কেন?— এপারে এস, থাক্‌গে ফুল।

প্রদ্যুম্ন জলে নেমে ফুলটা সংগ্রহ ক'রে ওপারে গেল।

দেবী বললেন, তুমি মাঠের মাঝের ওই বড় গাছটার তলায় রোজ ব'সে থাক, না?

প্রদ্যুম্ন তাঁব হাতে ফুলটা দিয়ে বললে— হাঁ, আমিও দেখি আপনি সন্ধ্যার সময় রোজই জল নিতে আসেন।

দেবী হাসিমুখে বললেন, ওই পাহাড়ের ওপরই আমাদের ঘর— এস তুমি আমার সঙ্গে— তোমায় খেতে দিইগে।

হঠাৎ দেবী কেনন একপ্রকার বিহুল চোখে চারিদিকে চাইলেন। তারপর পাহাড়ের গায়ে কাটা ধাপ বেয়ে উঠতে লাগলেন, প্রদ্যুম্ন পিছনে পিছনে চলল। পাহাড়ের উপর উঠে গিয়ে—একটু দূরে বুনা বাঁশঝাড়ের আড়ালে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটা ছোট কুটীর। দেবী বন্ধ দুয়ার খুলে ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রদ্যুম্নকে বললেন— এস।

প্রদ্যুম্ন দেখলে কুটীরে কেউ নেই, জিজ্ঞাসা করলে— আপনি কি এখানে একা থাকেন? দেবী বললেন— না। এক সন্ন্যাসী আমায় এখানে সঙ্গে ক’রে এনেছেন, তিনি কি করেন জানিনে, কিন্তু মাঝে মাঝে এখান থেকে চ’লে যান,— পাঁচ-ছদিন পরে আসেন। তুমি এখানে ব’সো।

দেবী মাটির ঘট পূর্ণ ক’রে তাকে যবাগু পান করতে দিলেন, স্বাদ অমৃতের মত, এমন সুস্বাদু যবাগু সে পূর্বের কখনো পান করেনি।

প্রদ্যুম্নের মনে হ’ল, যদি আচার্য পূর্ণবর্দ্ধনের কথা সত্য হয়, আর যদি সে স্বচক্ষে যা দেখেছে তা ইন্দ্রজাল না হয়, তবে এই তো দেবী সরস্বতী তার সামনে। তাব জানবার কৌতূহল হ’ল, ইনি নিজের সম্বন্ধে কি বলেন।

সে জিজ্ঞাসা করলে— আপনারা এর আগে কোথায় ছিলেন? আপনাব দেশ কোথা? দেবী কাঠের বড় পাত্রে সযত্নে সুপ ও অন্ন পরিবেশনে ব্যস্ত ছিলেন, প্রশ্ন শুনে বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে তিনি প্রদ্যুম্নের দিকে চেয়ে বললেন— আমাব কথা বলছ? আমার দেশ কোথায় জানিনে। আমি নাকি বিদিশার পথের ধারে এক ভাঙা মন্দিরে অচেতন অবস্থায় প’ড়ে ছিলাম, সন্ন্যাসী আমায় এখানে উঠিয়ে এনেছেন! সেই থেকে এখানেই আছি— তার আগে কোথায় ছিলাম তা’ আমার মনে পড়ে না।

তিনি অনামনস্কভাবে বাইবে সাঁঝের রক্তিম আকাশে যেখানে উরুলিখ গ্রামের প্রান্তবে বনরেখার মাথায় সূর্য্য হেলে পড়েছেন, সেই দিকে চেয়ে রইলেন—চেয়ে চেয়ে কি মনে আনবার চেষ্টা করলেন, বোধ হয় মনে এল না! হঠাৎ কি ভেবে তাঁব পদ্মের পার্শ্বের মত চোখ দুটি বেয়ে বরবর ক’রে জল বরে পড়ল।

তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছে তিনি প্রদ্যুম্নের সামনে অল্পে পূর্ণ কাঠের থালা রাখলেন। বললেন— খাবার জিনিস কিছুই নেই। তুমি রাত্রে এখানে থাকো, আমি পদ্মের বীজ গুকিয়ে রেখেছি, তাই দিয়ে রাত্রে পায়স তৈরী ক’রে খেতে দেব। সকালে যেও।

প্রদ্যুম্নের চোখে জল আসছিল। ..ওগো বিশ্বের আত্মবিস্মৃতা। সৌন্দর্যালক্ষ্মী, বিদিশাব মহারাজের আর মহাশ্রেষ্ঠীর সমবেত রত্নভাণ্ডার তোমার পায়ের এক কণা ধুলোরও যোগ্য নয়, সে দেশের পথের ধূলা এমন কি পুণ্য করেছে মা, যে তুমি সেখানে প’ড়ে থাকতে যাবে? খাওয়া শেষ হ’লে প্রদ্যুম্ন বিদায় চাইলে।

দেবীর চোখে হতাশার দৃষ্টি ফুটে উঠল, বললেন— থাকো না কেন রাত্রে! আমি রাতে পায়স রোধে দেব।

প্রদ্যুম্ন জিজ্ঞাসা করলে— আপনার এখানে একা রাত্রে থাকতে ভয় করে না?

— খুব ভয় করে। ওই বেতের বনে অন্ধকারে কি যেন নড়ে, ভয়ে আমি দোর খুলতে পারিনে! ঘুম হয় না, সমস্ত রাত ব’সেই থাকি।

প্রদ্যুম্নের হাসি পেল, ভাবলে রাত্রে একা থাকতে ভয় করে ব’লে পায়সের লোভ দেখিয়ে দেবী তাকে সঙ্গে রাখতে চান। সে বললে,— আচ্ছা রাত্রে থাকব।

দেবীর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হ’ল।

সমস্ত রাত সে কুটীরের বাইরে খোলা হাওয়ায় ব’সে কাটালে। দেবীও কাছের ব’সে রইলেন। বললেন— এমন জ্যোৎস্না, আমি কিন্তু ভয়ে বাইবে আসতে পারিনে, ঘরের মধ্যে ব’সে রাত কাটাই।



দেবীর ব্যাপার দেখে প্রদ্যুম্ন অবাক হয়ে গিয়েছিল। হ'লেই বা মন্ত্রশক্তি, এতটা আত্মবিশ্বাস হওয়া, এ যে তার কল্পনার বাইরের জিনিস।

নানা গল্পে সমস্ত রাত কাটল, ভোর হ'লে সে বিদায় চাইলে।

দেবী ব'লে দিলেন— সম্মাসী এলে একদিন আবার এস।

সেইদিন থেকে প্রতিরাত্রে সে দেবীর অলক্ষিতে পাহাড়ের নীচে ব'সে বুটারের দিকে চেয়ে পাহারা রাখত। তার তরুণ বীরহৃদয় এক ভীরা নারীকে একা বনেব মধ্যে ফেলে রাখার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তুলেছিল।

দশ-পনের দিন কেটে গেল।

এক-একদিন প্রদ্যুম্ন শুনত, দেবী অনেক রাতে একা গান গাইছেন—সে গান পৃথিবীর মানুষের গান নয়, সে গান প্রাণ-ধারার আদিম স্বর্ণাণ্ড গান, সৃষ্টিমুখী নীহাবিকাদের গান, অনন্ত আকাশে দিক্‌হারা কোন পৃথক তারার গান।

একদিন দুপুর বেলা কে তাকে বললে— তুমি যে গো-বৈদ্যের কথা বলছিলে, তাকে এইমাত্র দেখে এলাম, পথের ধারে পুকুরে সে স্নান করছে।

শুনে ছুটতে ছুটতে গিয়ে পুকুরের ধারে উপস্থিত হ'ল। দেখলে সত্যি গুণাঢ্য, পুকুরের ধারে বস্ত্রাদিবা পুটলি নামিয়ে রেখে, পুকুরে স্নান করতে নেমেছেন। সে অপেক্ষা করতে লাগল।

একটু পরে গুণাঢ্য বস্ত্র পরিবর্তন ক'রে উপরে উঠে প্রদ্যুম্নকে দেখে কেমন যেন হয়ে গেলেন। বললেন— তুমি এখানে?

প্রদ্যুম্ন বললে— আমি কেন তা বুঝতে পারেন নি?

গুণাঢ্য বললেন— তুমি এখন বলছ ব'লে নয় প্রদ্যুম্ন, আমি একান্ত করবাব পর যথেষ্ট অন্ততপ্ত আছি। প্রতি বাত্রে ভয়ানক স্বপ্ন দেখি— কারা যেন বলছে, তুই যে কাজ করবেইস এর শাস্তি অনন্ত নরক। আমি এইজন্যই আজ এক পক্ষের ওপব আমার গুরু সেই আজীবক সম্মাসীর কাছে গিয়েছিলাম। তাঁরই কাছে এ বশীকরণ মন্ত্র আমি শিক্ষা করি। এর এমন শক্তি যে মনে কবলে আমি যাকে ইচ্ছে বাঁধতে পারি, কিন্তু আনতে পারিনে। মন্ত্রের বন্ধন-শক্তি থাকলেও আকর্ষণী শক্তি নেই। এইজন্যে আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়েছিলাম, আমি নিজে সঙ্গীতের কিছুই জানিনে যে তা নয়, কিন্তু আমি জানতাম যে তুমি মেঘ-মল্লারে সিদ্ধ, তোমার গানে দেবী ওখানে আসবেনই, এলে তারপর মন্ত্রে বাঁধব। এর আগে আমার বিশ্বাসই ছিল না যে, এমন একটা ব্যাপার হওয়া সম্ভব। অনেকটা মন্ত্রের গুণ পরীক্ষা করবার কৌতুহলেই আমি এ কাজ করি।

প্রদ্যুম্ন বললে— এখন?

গুণাঢ্য বললেন— এখন আমার গুরুর কাছ থেকেই আসছি। তিনি সব শুনে একটা মন্ত্র শিক্ষা দিয়েছেন, এটা পূর্ব মন্ত্রের বিরোধী শক্তিসম্পন্ন। সেই মন্ত্রপূত জল দেবীর গায়ে ছড়িয়ে দিলে তিনি আবার মুক্ত হবেন বটে, কিন্তু তার কোন উপায় নেই।

প্রদ্যুম্ন জিজ্ঞাসা করলেন— উপায় নেই কেন?

—যে ছিটিয়ে দেবে, সে চিরকালের জন্য পাষণ হয়ে যাবে। আমার পক্ষে দু'দিকই যখন সমান, তখন তাঁকে বন্দি নী রাখাই আমার ভালো। রাগ কোরো না প্রদ্যুম্ন, ভেবে দেখ, মৃত্যুর পর হয়তো পরজগৎ আছে, কিন্তু পাষণ হওয়ার পর? তা আমি পারব না।

আত্মবিশ্বাস বন্দি দেবীর চোখ দু'টির করুণ অসহায় দৃষ্টি প্রদ্যুম্নের মনে এল। যদি তা না হয় তা হ'লে তাঁকে যে চিরদিন বন্দি থাকাতে হবে।

যুগে যুগে যে উদার উচ্চ প্রেরণা আগে এসে তরুণদের নিৰ্মল প্রাণে পৌঁছয়, আজও প্রদ্যুম্নের প্রাণের বেলায় তার চেউ এসে লাগল। সে ভাবলে, একটা জীবন তুচ্ছ। তাঁর রাঙা পা-দুখানিতে একটা কাঁটা ফুটলে তা তুলে দেবার জন্যে আমি শতবার জীবন দিতে প্রস্তুত।

হঠাৎ ওগাঢ়ের দিকে চেয়ে সে বললে— চলুন, আপনার সঙ্গে যাব, আমার সে মন্ত্রপূত জল দেবেন।

ওগাঢ়া বিশ্বয়ে প্রদ্যুম্নের দিকে চেয়ে বললেন— বেশ ক'রে ভেবে দেখ। এ ছেলেখেলা নয়। এ কাজ—

প্রদ্যুম্ন বললে— চলুন আপনি।

তারা যখন কুটীরের নিকটবর্তী হ'ল ওগাঢ়া বললেন— প্রদ্যুম্ন, আর একবার ভালো ক'রে ভেবে দেখ, কোন মিথ্যা আশায় ভুলো না, এ থেকে তোমায় উদ্ধার করবার ক্ষমতা কারুর হবে না— দেবীরও না। মন্ত্রবলে তোমার প্রাণশক্তি চিরকালের জন্যে জড় হয়ে যাবে, বেশ বুঝে দেখ। মন্ত্রশক্তি নিৰ্মম অমোঘ, কাউকে রেহাই দেবে না।

প্রদ্যুম্ন বললে— আপনি কি ভাবেন আমি কিছু গ্রাহ্য করি?— কিছু না, চলুন।

কুটীরে তারা যখন গিয়ে উপস্থিত হ'ল, তখন রোদ বেশ প'ড়ে এসেছে। দেবী কুটীরের বাইরে ঘাসের উপর অন্যানমনস্কভাবে চুপ ক'রে ব'সে ছিলেন— প্রদ্যুম্নকে আসতে দেখে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন, হাসিমুখে বললেন— এস, এস! আমি তোমার কথা প্রায়ই ভাবি। তোমায় সেদিন কিছু খেতে দিতে না পেরে আমার মন খুবই খারাপ হয়েছিল। এখন তুমি এখানে কিছুদিন থাকো।

তিনি দু'জনকে খেতে দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে কুটীরের মধ্যে চ'লে গেলেন।

প্রদ্যুম্ন বললে— কই আমায় মন্ত্রপূত জল দিন তবে?

ওগাঢ়া বললেন— সতাই তা হ'লে তুমি এতে প্রস্তুত?

প্রদ্যুম্ন বললে— আমায় আর কিছু বলবেন না, জল দিন।

দেবী কুটীরের মধ্যে আহারের স্থান ক'রে দু'জনকে খেতে দিলেন— আহারাদি যখন শেষ হ'ল তখন সন্ধ্যার আর বেশি দেরি নেই। বেতসবনে ছায়া নেমে আসছে, রাঙা সূর্য্য আবার উরুবিষ্ম গ্রামের উপর ঝুলে পড়েছে।

গোধূলির আলোয় দেবীর মুখপদ্মে অপরূপ শ্রী ফুটে উঠল।

তারপর তিনি ঘটকক্ষে প্রতিদিনের মত নীচের ঝরণায় জল আনতে নেমে গেলেন।

ওগাঢ়া বললেন— আমি এখান থেকে আগে চ'লে যাই, তারপর এই ঘটপূর্ণ জল দেবীর গায়ে ছিটিয়ে দিও।

তাঁর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হ'ল। আবেগভরে তিনি প্রদ্যুম্নকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন— আমি কাপুরুষ, আমার সে সাহস নেই, নইলে—

তিনি কুটীরের মধ্যে তাঁর দ্রব্যাদি সংগ্রহ ক'রে নিলেন। তারপর সরু পথ বেয়ে বেতবনের ধার দিয়ে পাহাড়ের অপর পারে চ'লে গেলেন, তারই নীচে একটু দূরে মগধ ঝুঁক থেকে বিদিশা যাওয়ার রাজবর্গ্য।

প্রদ্যুম্ন চারিদিকে চেয়ে ব'সে ব'সে ভাবলে, ঐ নীল আকাশের তলে বিশ বৎসর আগে সে মায়ের কোলে জন্মেছিল, তার সে মা বারাণসীতে তাদের গৃহটিতে ব'সে ঝাতায়ন-পথে সন্ধ্যার আকাশের দিকে চেয়ে হয়তো প্রবাসী পুত্রের কথাই ভাবছেন— মায়ের মুখখানি একবারটি শেষবারের জন্যে দেখতে তার প্রাণ আকুল হয়ে উঠল। ঐ পূর্ব আকাশের নবমীর

চাঁদ কেমন উজ্জ্বল হয়েছে। মগধ যাবার রাজপথে গাছের সারির মাথায় একটা তাবা ফুটে উঠল। বেতবনের বেতডাঁটাগুলো তরল অন্ধকারে আর ভালো দেখা যায় না।

প্রদ্যুম্নের চোখ হঠাৎ অশ্রুপূর্ণ হ'ল।

সেই সময়ে সে দেখলে— দেবী জল নিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে আসছেন। মস্তপুত্ৰ জলপূর্ণ ঘট সে মাটিতে নামিয়ে রেখেছিল; দেবীকে আসতে দেখে সে তা হাতে তুলে নিলে।

দেবী কুটীরের সামনে এলেন, তাঁর হাতে অনেকগুলো আধ-ফোটা কুমুদ ফুল।

প্রদ্যুম্নকে জিজ্ঞাসা করলেন— সন্ন্যাসী কোথায়?

প্রদ্যুম্ন বললে — তিনি আবার কোথায় চ'লে গেলেন। আজ আর আসবেন না।

তারপর সে গিয়ে দেবীর পায়ের ধূলো নিয়ে তাঁকে প্রণাম ক'রে বললে — মা, না জেনে তোমাব ওপর অতান্ত অনায় আমি করেছিলাম, আজ তালই শাস্তি আমাকে নিতে হবে। কিন্তু আমি তার জন্যে এতটুকু দুঃখিত নই। যতক্ষণ জ্ঞান লুপ্ত না হয়ে যায়, ততক্ষণ এই ভেবে আমার সুখ যে, বিশ্বের সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে অনায় বাঁধন থেকে মুক্ত করাব অধিকার আমি পেয়েছি।

দেবী বিস্মিত দৃষ্টিতে প্রদ্যুম্নের দিকে চেয়ে রইলেন।

প্রদ্যুম্ন বললে— শুনুন, আপনি বেশ ক'রে মনে ক'বে দেখুন দেখি, আপনি কোথা থেকে এসেছিলেন?

দেবী বললেন— কেন, আমি ত বিদিশার পথেব ধাবে—

প্রদ্যুম্ন এক অঞ্জলি জল তাঁর সর্বাস্পে ছিটিয়ে দিলে।

সদ্যোনিদ্রোথিতাব মত দেবী যেন চমকে উঠলেন।

প্রদ্যুম্ন দৃঢ়হস্তে আর-এক অঞ্জলি জল দেবীর সর্বাস্পে ছড়িয়ে দিলে! নিমেষের জন্যে তার চোখের সামনে বাতাসে এক অপূর্ব সৌন্দর্য্যের মিশ্র প্রসন্ন হিল্লোল ব'য়ে গেল। তার সারা দেহমন আনন্দে শিউরে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে তার মনে এল— বাবাণসীতে তাদের গৃহে সন্ধ্যার-আকাশে-বন্ধ-আঁখি বাতায়নপথবর্জ্বিনী তাব না!

কুন্ডাবশ্রেণীর বিহাবে আচার্য্য শীলব্রতের কাছে একটি মেয়ে অল্প বয়সে দীক্ষা গ্রহণ করে। তার নাম সুনন্দা, সে হিরণ্যনগরের ধনবান্ শ্রেষ্ঠী সামন্তদাসের মেয়ে। পিতামাতার অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও মেয়েটি নাকি বিবাহ করতে সম্মত হয়নি। অতান্ত তরুণ বয়সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করায় সে বিহারের সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী হয়ে উঠেছিল। সেখানে কিন্তু কারো সঙ্গে সে তেমন মিশত না, সর্বদাই নিজের কাজে সময় কাটাত আর সর্বদাই কেমন অনামনস্ক থাকত।

জ্যোৎস্নারাত্রি বিহারের নিৰ্জ্জন পাষণ অলিন্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে আপন মনে প্রায়ই কি ভাবত; মাঠের জ্যোৎস্নাজাল কাটিয়ে অনেক রাতে কাউকে বিহারের দিকে আসতে দেখলে সে একদৃষ্টে সেদিকে চেয়ে থাকত, যেন কতদিন আগে তার যে প্রিয় আবার আসবে ব'লে চ'লে গিয়েছিল, তারই আসবার দিন ওণে ওণে এ শ্রান্ত শান্ত ধীর পথ-চাওয়া.... প্রতি সকালে সে কার প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে বহিত, সকাল কেটে গেলে ভাবত বিকালে আসবে, বিকাল কেটে গেলে ভাবত সন্ধ্যায় আসবে— দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এরকম কত সকাল সন্ধ্যা কেটে গেল— কেউ এল না...তবু মেয়েটি ভাবত, আসবে .আসবে, কাল আসবে ...পাতার শব্দে চমকে উঠে চেয়ে দেখত— এতদিনে বুঝি এল!

এক এক রাত্রে সে বড় অদ্ভুত স্বপ্ন দেখত। কোথাকার যেন কোন্ এক পাহাড়ের ঘন বেতের ঝুঙ্গল আর বাঁশের বনের মধ্যে লুকানো এক অর্দ্ধভগ্ন পাষণমূর্তি। নিঝুম রাতে সে-পাহাড়ের বেতগাছ হাওয়ায় দুলছে, বাঁশবনে সিব্‌সির্ শব্দ হচ্ছে, দীর্ঘ দীর্ঘ বেতডাঁটার ছায়ায় পাষণমূর্তিটার মুখ ঢাকা পড়ে গেছে। সে অন্ধকার অর্দ্ধরাত্রে জনহীন পাহাড়টার বাঁশগুলোর মধ্যে ঝোড়ো হাওয়া ঢুকে কেবল বাজছে মেঘ-মল্লাব!...

ভোরে উঠে রাতের স্বপ্ন ভেবে আশ্চর্য্য হয়ে যেত— কোথায় পাহাড়, কোথায় বেতবন, কার ভাঙা মূর্তি, কিসেব এসব অথহীন দুঃস্বপ্ন!.

## শিশির গোকুলচন্দ্র নাগ

পশ্চিম আকাশে ধূসর মেঘের আবরণের ভিতর দিয়ে নির্ঝাণোন্মুখ প্রদীপের ক্ষীণ শিখাটির মত দিনশেষের স্নানআলো, শ্বেত করবীর পাপড়ির উপর বারিবিন্দুগুলির সঙ্গে মিশে লক্ষ চুনীপান্নার মতই পৃথিবীর বুকে ঝরে পড়ছে! যেন প্রিয়বিরহিনীর অশ্রুক্ষণা! পূর্ববী রাগিণীর মীড়ের মত সে আলো, বেণুকুঞ্জে কেঁপে কেঁপে লুটিয়ে পড়ছে! সে আলোকসঙ্গীত, রুদ্ধস্বরের আগল ভেঙে আমায় বাইরে নিয়ে এল।

আমার জীর্ণ মলিন বসনখানি, এ কোন্ অপূর্ব রংএ রঙিন হয়ে উঠল? এ বঙিন আলোকে স্নান করে আমার কি হবে? এখনি যে অন্ধকারের সমস্ত কালি আমার দেহে মাখা হয়ে যাবে। কালোর বুকেই যে আমার ঠাই। আমার বুকজুড়ান কালো, আমার অনিদ্র আঁখির ঘুমপাড়ানো অঞ্জন। ঐ ত আমার সব। কিন্তু আজ আঁধাব-সাগরের তীরে দাঁড়িয়ে, আলোর মাধুরী দেখবার জন্যে চোখ দুটি জলে ভরে উঠছে কেন? মনুষ্যের কানে নবজীবনের আশার বাণী গুনিয়ে, প্রকৃতির একি নিষ্ঠুর পবিহাস।

প্রভাতে মল্লিকার নির্মাল্যখানি হাতে নিয়ে যখন বাইরে এসে দাঁড়িলাম, সে কি তীব্র আনন্দের আবেগে আমার হৃদয়খানি মাতাল হয়ে উঠল! নবরবিকিরণেব প্রথম চুম্বনে, আমার দেহ যেন মুচ্ছিত হয়ে পড়ছিল।

প্রাণপণ শব্দভেদে হাতদুখানি তুলে আমার মালাখানি কার গলায় পরিয়ে দিতে গেলাম? কার স্নিগ্ধ বাহুবন্ধনে আশ্রয় নেবার জন্যে আমাব শ্রান্ত মাথাটি ধীরে ধীরে নত হয়ে পড়ছিল? কে সে?

আমাব মালাখানি যেখানে এসে পড়ল, সে ত আমার প্রিয়তমার পুষ্পপেলব কণ্ঠ নয়, সে যে তড়িৎশিখা! আমাব মাথাটি যেখানে গিয়ে ঠেকল, সে ত তার স্নেহকোমল বক্ষ নয়, সে যে বজ্রেব কঠিন পাষণপ্রাচীর।

তারপর কোথা হতে দারুণ ঝঞ্ঝা উন্মত্ত আবেগে ছুটে এসে আমার বুকের উপর আছড়ে পড়ল। ঐ যে মরণ-কলরোল, সহস্রবাথিতের বুকভাঙা আর্দ্রনাদ আমার চারিদিকে ধ্বনিত হয়ে উঠছে, ওরই মাঝে কি আমাব প্রিয়তমার মধুরবাণী লুকানো আছে? যে দারুণ আঘাতে আমার হৃদয়খানি শতখণ্ডে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল সে কি আমার প্রিয়ার স্পর্শ?

কোথায় গেল আমার নবমল্লিকার মালা? ঘূর্ণি হাওয়ার আবর্তের সঙ্গে পথের ধুলার মতই কোথায় সে ভেসে গেছে কে জানে। কোথায় আমাব নয়নভুলানো আলো? চোখ মেলে দেখি কালো, কালো কেবলই কালো! অন্তহীন বিরাট অন্ধকার পৃথিবীর বুক হতে সমস্ত আলোক লেখা মুছে নিয়েছে।

আমার জীর্ণ ঘরের দুয়ারখানি যতবার ঝড়ের বিপুল আঘাতে কেঁপে উঠেছে, মনে ভেবেছি, এইবার বুঝি সে এল। ছুটে দুয়ার খুলে দিতে গিয়ে শুধুই আঘাত পেয়েছি। সে ত আসে নি।

দিনের অন্ধকার কখন রাতের অন্ধকারের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে জানতে পারি নি। আমাব নিরান্না ঘরের প্রদীপখানি জ্বালা হয় নি। কি হবে আলোতে? এ অনন্তরাত্রির অনন্তকালি আমার একটি প্রদীপে কি উজ্জ্বল হয়ে উঠবে?

এই ত শান্তি, এই ত আমার বুকভরা তৃপ্তি। অন্ধকারের নিবিড় বাহুবেষ্টনের মধ্যে শুধু আমি, একা আমি। পেয়েছি গো, পেয়েছি। এই ত আমার প্রিয়া! ওগো অসিতা, তোমার ঐ কালো রূপ নিয়ে আমার চোখের আলোর নেশা চিরদিনের মত যুঁচিয়ে দাও।

\* \* \* \* \*

কোথা হতে দোয়েলের মিঠে গান আমার কানে ভেসে আসছে, যেন নিশীথের বিদায়-সঙ্গীত—বড় করুণ বড় মধুর! আমার খোলা জানালাব ভিতর দিয়ে নিশ্চল আকাশে উষাব রঙিন বসনখানির এক প্রান্ত দেখা যাচ্ছে। ছোট ছোট সাদা মেঘগুলি সোনালীর রং মেখে ভেসে বেড়াচ্ছে। আজকের এই শরৎ-প্রভাতটি যেন কাল্মা-হাসিব সুরে বাঁধা একটি মধুর সঙ্গীত।

দুয়াব খুলে বাইরে এলাম। আমার আঙিনার কুন্দ-ফুলের ঝাড়ের পাশে, ও কে গো! ঠোঁটের উপর মধুর হাসির রেখাটি ফুটে আছে। কিন্তু চোখের পাতাদুটি যে বেদনাব অশ্রুতে এখনও ভিজ়ে রয়েছে! বৃকের উপর হাত দুটি চেপে বললাম—কে তুমি? জলভরা চোখদুটি আমার মুখের উপর তুলে সে বলল—আমি শিশির।

তুমি শিশির? আমি বুঝি তোমারই আশায় সমস্ত রাত্রি বিনদ্র কাটিয়েছি। আমি তাব পাশে গিয়ে দাঁড়িলাম। নাড়া পেয়ে ঝরঝর করে শিশির-মাথা কুন্দফুল আমাদের চাবিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

সে বলল—আমি যে তোমারই আঙিনায় সারা রাত পড়ে ছিলাম, তুমি দুয়ার যে বন্ধ রেখেছিলে। আমি বললাম—ও গো, এবাব এস, দেখ সকল বন্ধন খুলে দিয়েছি। কি করুণ হাসি তার মুখের উপর ফুটে উঠল! হাতদুটি প্রভাত-তপনের দিকে বাড়িয়ে বলল—আর ত সময় নেই, এবার যে যেতে হবে। আমি যে শিশির।

তার অমল শুভ্র আঁচলখানি ছোঁবার জন্যে হাত বাড়িলাম—কোথায় আমার শিশির?

## টারা রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

বছর যোল আগেকার কথা। তেতাল্লিশ নম্বরের কলেজ মেস। সারারাত্রি অভিনয়দর্শনে বহুচক্ষু রামহরিবাবু সকালবেলায় ডাকে চিঠিখানা খুলিয়াই চাঁৎকার কবিয়া উঠিলেন, “হব্বে!”

পাশের ঘবে দিগম্বরবাবু মোস্তারী পরীক্ষার নোট মুখস্থ করিতেছিলেন, ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি ব্যাপার?”

“সুখবব হে, সুখবব! গৃহিণী—”

“খাওয়াও তাইলে! ছেলে হ'য়েছে?”

রামহরিবাবু আর একবার চাঁৎকার করিয়া উঠিলেন, “পুত্র নয় হে, কন্যা। তবু খাওয়াব, ছেলেমেয়ের কোনো তফাৎ নেই আমার কাছে। মিছির!”

মিছির ঠাকুর আসিল এবং হুকুম পাইয়া মোড়ের সন্দেশেব দোকানে চলিয়া গেল।

আধ-ঘণ্টার পর মেসসুদ্ধ লোক নবজাতার কল্যাণ-কামনা করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে নিজ নিজ কামবায় প্রস্থান করিলেন। রামহরিবাবু তখন চিঠিখানা একবার ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিলেন— মেয়ের রং ফর্সা, তবে একটু টারার।

রামহরিবাবু শ্যামা মুদির গলিব স্ত্রীস্বাধীনতা প্রচারিণী সভার সদস্য ছিলেন—এ সংবাদে দমিলেন না—হাসিয়া কহিলেন, “তা হোক! ওণে সব ঢাকবে। লেখা-পড়া গান-বাজনাতে এমন তালিম ক'রে তুলব মেয়েকে—” ভাবিতে ভাবিতে উঠিয়া বৌবাজারের একটি বাদ্যযন্ত্রের দোকানে ছোট সেতাবের কত দাম পড়িতে পারে সেটা সুদ্ধ তখনই জানিয়া আসিলেন।

(২)

স্ত্রীশিক্ষা প্রচাব ছাড়া আর একটি লক্ষ্য রামহরিবাবুর ছিল, সেটা নিতান্ত ব্যক্তিগত। আইন পাস কবিয়া হাইকোর্টে ওকালতী করিবেন। কিন্তু দৈববিড়ম্বনায় বার-তিনেক বি এ ফেল করিয়া স্বগ্রাম তেঁতুলিয়া হাইস্কুলে থার্ডমাষ্টারীতে ভর্তি হইলেন। মাসিক বেতন ত্রিশ টাকার সিকি পরিমাণ কল্যায় শিক্ষার জন্য ব্যয়-বরাদ্দ করিলেন, কিন্তু রামহরিবাবুকে আদর্শভ্রষ্ট করিতে পারিলেন না। প্রথম প্রথম রঙীন ছবির বই, ক্রমে ক্রমে ছবি আঁকবার সরঞ্জাম ও একটি ছোট সেতার সমস্তই কন্যাকে যোগাইলেন।

গৃহিণী রুখিয়া কহিলেন, “ও ছাইপাঁশগুলো দিয়ে হবে কি? তার চেয়ে—”

রামহরিবাবু কহিলেন, “সে ভাবনা আমার আছে।”

গৃহিণী অতঃপর আর কিছু কহিলেন না।

বারো বৎসর বয়সের বীণা সেতার বাজায়; রামহরিবাবু চক্ষু মুদিয়া শোনে, আর গৃহিণী রন্ধনশালায় ডাল সিদ্ধ করিতে বসিয়া কল্যায় ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আতঙ্কিত হইতে থাকেন। ভাবিতে ভাবিতেই বীণার বয়স তেরোর কোঠায় গিয়া পৌছিল। গৃহিণী আর স্থির

থাকিতে পারিলেন না; তাঁহার মাতামহের স্বশুর বংশ পুরুষানুক্রমে পণ্ডিত, সে ছোঁয়াচ গৃহিণীরও লাগিয়াছিল; একদিন স্পষ্টই রামহরিবাবুকে কহিলেন, “এইবার মেয়ে পার করবার ব্যবস্থা কর। আমি বেঁচে থাকিতে আমার বাপ-ঠাকুর্দা নরকে পচবে!”

রামহরিবাবু শুদ্ধ কহিলেন, “সে হবে।” কিন্তু সে বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমান্ন ব্যস্ততা দেখা গেল না।

গৃহিণী বাস্তব হইয়া উঠিলেন। রামহরিবাবুকে অনেক কহিয়া দিনকয়েক ছুটি লওয়াইয়া পাত্রের সন্ধান পাঠাইলেন।

রামহরিবাবু সতেরো জায়গা ঘুরিয়া বাড়ী আসিয়া পাত্রমণ্ডলীর নাম-ধাম গাঁই গোত্র ও সেই সঙ্গে কন্যা-গ্রহণের পারিশ্রমিকের অঙ্ক সমস্ত এক তালিকা-ভুক্ত করিয়া গৃহিণীর সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, “যা হয় কর।”

গৃহিণী মেয়ে দেখার দিন স্থির করিয়া পত্র লিখিতে বসিলেন।

মঙ্গলহাটীর ভট্টাচার্য বাড়ী হইতে পাত্রের মাতুল আসিয়া কন্যার বিশেষ প্রশংসা করিয়া ভলযোগান্তে ফিরিয়া গেলেন, বাড়ী গিয়া মেয়েদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া পত্র দিবেন। শিবতলায় রায়-বাড়ীর লোক মেয়ে দেখিয়া গেল। পাকা কথা হইল না। বাঁশকুড়ুলের চৌধুরী বাড়ী হইতে পাত্র স্বয়ং বন্ধুবান্ধবসহ দেখিতে আসিল; বাজনা শুনিয়া মৃদুস্বরে একটু বাহবাও দিয়া গেল। রামহরিবাবু গোপনে পাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাবাজী তা হ’লে—”

ছেলেটি বিনয়ী। মাথা নীচু করিয়া কহিল, “আজ্ঞে মা সব আপনাকে লিখবেন। আমি ফিরে গিয়েই তাঁকে বলব।”

এইরূপে রামহরিবাবু কিছুদিনের মত উৎপাত হইতে রক্ষা পাইলেন। এদিকে গৃহিণী দিনকয়েক তাঁহার ভবিষ্য-জামাতৃবর্গের অভিভাবকগণের পত্রের প্রতীক্ষা করিয়া তাহার পব জোড়া পোস্টকার্ড লেখা আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে জবাব আসিতে লাগিল। মঙ্গলহাটীর পাত্রের পিতার অসুখ, শিবতলার পাত্রের পরীক্ষার বৎসর ইত্যাদি। বাঁশকুড়ুল হইতে যে পত্রখানি আসিল সেটা একটু স্পষ্ট। পাত্রের মাতা লিখিয়াছেন, কন্যাটি টারা— ছেলের পছন্দ হয় নাই।

পত্র পাইয়া গৃহিণী ক্ষেপিয়া উঠিলেন, চিঠিখানা হাতে করিয়া যেখানে রামহরিবাবু বসিয়া বীণার সেতার বাজনা শুনিতেছিলেন, সেখানে গিয়াই উপস্থিত হইয়া কহিলেন, “কেমন হ’ল তো। শুণে সব ঢাকবে না! দেখ।”—বলিয়া রামহরিবাবুর নাকের ডগায় চিঠিখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া কন্যার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, “যে রূপের ছিরি, তাব আবাব গান-বাজনা। যা ঘুঁটে দিগে যা!”

বীণা সেতার রাখিয়া নীরবে উঠিয়া গেল।

ইহার পর পিতা ও মাতার কি কথাবার্তা হইল তাহা বীণা শুনিতে পাইল না, কিন্তু সমস্ত দিন ধরিয়া মাতা অবিরত বলিতে লাগিলেন, “আহা রূপ! চোখ নয় ত নাটার বিচি!”

মাতা দ্বিপ্রহরে ঘুমাইতেছিলেন, সেই অবসরে বীণা আরশী লইয়া বসিল। এতদিন চোখে পড়ে নাই, আজ দেখিল বাস্তবিকই ডান চোখটা অত্যন্ত টারা। নিজের মুখ আরশীতে দেখিতে নিজেরই লজ্জা করিতে লাগিল। নানা রকম আরশী ধরিয়া দেখিল; কোনো দিক হইতেই মুখখানিকে স্ত্রী দেখা গেল না। তখন আরশী ফেলিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বোচারী বসিয়া রহিল। সেইদিন হইতেই বীণার বয়স যেন সহসা বাড়িয়া গেল। পিতা স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া যখন ডাকিলেন, তখন সে তাড়াতাড়ি ভলের ঘটি লইয়া আসিল বটে, কিন্তু তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে পারিল না। রামহরিবাবু কন্যার ভাবান্তর লক্ষ্য



করিলেন। কথা कहিলেন না। এদিকে গৃহিণীর পিতৃপুরুষকে নরকের দিকে আরও কয়েক পা অগ্রসর করাইয়া দিয়া আরও দু'টি বৎসর চলিয়া গেল।

ইতিমধ্যে বীণার প্রকৃতিতে একটি বিশেষ পরিবর্তন দেখা গেল। সে মুখ নীচু করিয়া কথা বলা আরম্ভ করিল। বাধা হইয়া কখনও মুখ তুলিতে গেলে চোখের পাতা আপনা হইতেই মুদিয়া আসে— পাছে কেহ টারা চোখটি দেখিয়া ফেলে। রামহরিবাবুর অবসব ছিল না; ছুটি হইলেই গৃহিণীর তাগিদে সম্ভব-অসম্ভব পাত্রের সন্ধানে গ্রাম-গ্রামান্তরে ছুটিয়া বেড়াইতেন। ফিরিয়া আসিয়া আবার সেই স্কুলের কাজ। সাহস করিয়া আর বীণার বাজনা শুনিতেও চাহিতেন না। সেতাবের ঝঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে গৃহিণীও ঝঙ্কার দিয়া উঠিতেন। বীণাও সেতার ফেলিয়া উঠিয়া যাইত। মাঝে মাঝে সম্ভাবিত কোনও পাত্র আসিলে সেদিন আব বীণার লাঞ্ছনার অবধি থাকিত না। তাহার চোখের সহিত নাটার বিচি হইতে আরম্ভ কবিয়া পৃথিবীর যাবতীয় গোলাকার বস্তুর তুলনা চলিতে থাকিত এবং কোনও মতে বিদায় হইয়া গেলেই যে পিতামাতার পিতৃপুরুষ নরক হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন, তাহাও বীণা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিত।

সেদিন গৃহিণীর মেজাজ অত্যন্ত রুষ্ট ছিল। প্রভাতে নূতন একটি পাত্রের অভিভাবক মেয়ে দেখিয়া যাইবার সময় স্পষ্ট ভাষায় মেয়ে না-পছন্দ করিয়া গিয়াছেন। হেতু মেয়েটি টারা। রীতি অনুযায়ী বীণার লাঞ্ছনার অবধি বাহিল না। সমস্ত দিন না খাইয়া বীণা বিছানায় পড়িয়া বহিল, রামহরিবাবু স্কুল হইতে ফিরিয়া নিতান্ত উদাসীনভাবে দাওয়ায় বসিয়া তামাক টানিতেছিলেন। এদিকে গৃহিণীর কষ্টস্বর ক্রমেই বাড়িতেছিল। ঠিক এমন সময়ে অঙ্গনে নূতন একটি লোকের আবির্ভাব হইল, আগন্তুককে দেখিয়াই গৃহিণীর স্বর অকস্মাৎ খাদে নামিয়া আসিল, তিনি প্রশ্ন করিলেন, “এস বাবা, এস। কতদিন দেখিনি তোমাকে, ভাল ছিলে তো?”

আগন্তুক গৃহিণীর পায়ে ধুলা লইয়া কহিল, “এক রকম ছিলাম মাসী-মা, আপনাবা আছেন কেমন? মাষ্টাব-মশাই কোথা?”

রামহরিবাবু গলাব আওয়াজ পাইয়া উঠিয়া বসিলেন, “কে, সুকুমার! এস, বস এইখানটাতে। তাই ভাবছিলাম গরমের ছুটিটা গেল, এলে না। সহরে গিয়ে ভুলেই গেলে বুঝি আমাদের?”

সুকুমার বাববী একটু ঝাঁকাইয়া কহিল, “ভুলতে পারি আপনাদের মাষ্টাব-মশাই। যে স্নেহ-মমতা পেয়েছি আপনাদের কাছে, তা কি ভুলবার। বীণা কই? আছে কেমন সে?”

রামহরিবাবু না ডাকিতেই বীণা ধীরে ধীরে আসিয়া সুকুমারকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। রামহরিবাবু নানা বিষয়ে কন্যাকে শিক্ষা দিতেছিলেন, সুকুমার জানিত।

কুশল প্রশ্নের পর সুকুমার জিজ্ঞাসা করিল, “এখন কি শিখছ বীণা?”

বীণা মৃদুস্বরে কহিল, “সেতার শিখছি—”

সুকুমার উৎসাহিত হইয়া কহিল, “দুর্ভাগা দেশ! ঘরে ঘবে যদি তোমাব মত বীণা জন্মাতো তবে—”

কথাগুলি বীণাব বড় মিষ্ট লাগিল। সমস্ত দিন তিরস্কার শোনার পর সুকুমারের এই ম্লিঙ্ক কথা কয়টি শুনিয়া তাহার চোখে জল আসিল। সে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল। কিছুকাল নানা কথার পর সুকুমার উঠিয়া গেল এবং যাইবার সময় বীণাকে উদ্দেশ্য কবিয়া কহিয়া গেল যে, কাল বৈকালে সে সেতার শুনিতে আসিবে।

পাশের গ্রামের তালুকদারের একমাত্র পুত্র সুকুমার। যখন তেঁতুলিয়া স্কুলে পড়িত তখন বামহরিবাবুর বাড়ীতে সে একরূপ প্রতাহের অতিথি ছিল। তাহার পর পাশ করিয়া কলিকাতায় পড়িতে আসিলেই সে রামহরিবাবুর সহিত দেখা করিয়া যাইত।

গত বৎসর দেশে আসে নাই, দেশের যুগ্ম 'অন্তরলক্ষ্মী'-কে জাগাইবাবু জন্য জনকয়েক বন্ধু মিলিয়া 'জাগ্রৎ যৌবন-সমিতি' নামে একটি সমিতি গড়িয়াছিল, তাহারই কাজে সে ব্যস্ত ছিল। এই সমিতিরই স্থানীয় একটি শাখা স্থাপনের উদ্দেশ্যেই সম্প্রতি দেশে আসিয়াছে।

পরদিন যথাসময়ে সুকুমার আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার বগলে 'জাগ্রৎ যৌবন-সমিতি'র একগাদা ছাপা ইস্তাহার। সুকুমার বসিতেই রামহরিবাবু নিজেব দুঃখ-কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন। বলা বাহুল্য, প্রসঙ্গের মূল-বিষয় বীণার বিবাহ। বিবাহেব প্রসঙ্গ, সেইসঙ্গে রামহরিবাবুর মুখে কন্যাব গুণ-ব্যাখ্যান শুনিতেই বীণার মা আসিয়া উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "রূপেই যে সব গুণ খেয়েছে। তুমি ত বাবা কলকাতায় থাক, একটা যেমন-তেমন দেখে শুনে মেয়েটাকে পার করে দাও।"

সুকুমার কহিল, "সে কি মাসী-মা! যেমন-তেমন ছেলে কি হবে? তবে ওব যোগা ছেলে আমি দেখব, আপনি ব্যস্ত হবেন না।"

গৃহিণী চলিয়া গেলেন, যাইবার সময় কহিয়া গেলেন, "ওর যোগা ছেলে ব্রিভুবনে জন্মানি। অমন ডানাকাটা পরী—"

রামহরিবাবু কহিলেন, "শুনছ! গঞ্জনা শুনে শুনে মেয়েটা একেবারে মুষড়ে গেল। এখন লজ্জায় কারোও সামনে বেরোতেই চায় না। তুমি একটু ডেকে—"

"আচ্ছা, তা করব। বীণা কই?"—সুকুমার জিজ্ঞাসা করিল।

রামহরিবাবু ডাকিলেন, বীণা তাহার পড়ার ঘরে বসিয়া আহ্বানেবই অপেক্ষা করিতেছিল, ধীরে ধীরে একখানা বই হাতে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

রামহরিবাবু কহিলেন, "সুকুমারকে একটু বাজনা শুনিয়ে দে।"

বাজনা শুনিয়া সুকুমার অবাক হইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল, "বাজনা কে শিখাল বীণা?"

বীণা মুখ না তুলিয়াই বলিল, "নিজেই শিখেছি।"

রামহরিবাবু কহিলেন, "মাষ্টার রাখবার পয়সা কোথায় বাবা? তা নইলে ইচ্ছা ছিল মেয়েটাকে ইংরাজী আর সংস্কৃতের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সব চলতি ভাষা একটু একটু শেখাই। তা জান তো উথায় হুদি লীযন্তে—"

সুকুমার কহিল, "আমি বাজনা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছি মাষ্টাবমশাই! ভাবছি শুধু শিক্ষার সুযোগ থাকলে বীণা কি হ'তে পারত।"

কথা শুনিয়া বীণা তাহার পড়ার ঘরে ঢুকিল। সুকুমার একবার অপাঙ্গে তরুণীর দিকে চাহিয়া হতভাগ্য দেশের মুক্তির জন্য বীণার নায় নারীর সাহায্য কতখানি প্রয়োজন, তাহা পল্লবিত-ভাষায় উচ্ছ্বাসের সহিত কহিয়া গেল।

রামহরিবাবু শুনিয়া সুকুমারের মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, "দীর্ঘজীবী হও বাবা, দেশের মুখ উজ্জ্বল কর।"

পড়ার ঘরে দরজার আড়ালে বীণা দাঁড়াইয়া ছিল, সুকুমারের কথাগুলিতে সে যেন এক নূতন জগতের আহ্বান শুনিল, তাহার সমস্ত মন আনন্দে ও ভরসায় সজীব হইয়া উঠিল।

বীণাকে দেশ-বিদেশের নারী-প্রগতির কাহিনী শুনাইতে রামহরিবাবু সুকুমারকে বলিয়াছিলেন। সুকুমার প্রত্যহ নিয়মিত আসিত এবং তাহার সমিতিব উদ্দেশ্য, নারী-পুরুষের

অধিকার প্রভৃতি জটিল বিষয়ের সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম আলোচনা করিয়া বীণার অন্তরলক্ষ্মীকে জাগাইবার চেষ্টা করিত। বীণা কতক বুঝিত, কতক বুঝিত না, যে-কথা বুঝিত না তাহাও তাহার ভাল লাগিত। সুকুমারের কথা শোনা নেশার মত ক্রমে ক্রমে তাহাকে পাইয়া বসিল। সেদিন কি কারণে সুকুমারের আসিতে বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল, বীণাব কিছু ভাল লাগিতেছিল না। এমন সময় সুকুমার আসিয়া উপস্থিত হইল।

বীণা জিজ্ঞাসা করিল, “আজ এত দেরি হ’ল কেন?” কথার সুরে অভিমান প্রচ্ছন্ন ছিল, সুকুমার বুঝিল।

বীণার চিবুক ধবিয়া কহিল, “আমি না আসলে কষ্ট হয় তোমার বীণা?”

বীণা মুখ না তুলিয়াই বলিল, “হ্যাঁ।”

সুকুমার মৃদু হাসিল, তাহার পরে বীণার দুই কাঁধের ওপর হাত রাখিয়া কহিল, “আর আমি দেরি ক’রে আসব না বীণা, কিন্তু তোমাকে আমার একটা কথা রাখতে হবে, বল বাখবে?”

বীণা কহিল, “রাখব। কি কথা?”

সুকুমার কহিল, “আমাকে ‘তুমি’ ব’লে ডাকতে হবে, ‘আপনি’ বলতে পারবে না।”

বীণা সঙ্কোচিত হইয়া কহিল, “সে আমি পারব না, আমার লজ্জা করবে।”

কিন্তু বীণার লজ্জা বেশীক্ষণ রহিল না, সুকুমার সেইদিনই বীণাকে ‘তুমি’ বলাইয়া ছাড়িল।

সেদিন বীণাব মনে হইল সুকুমার বড় আপনার হইয়া গিয়াছে। পড়াব ঘবে বসিয়া সুকুমারের মূর্তি মনে মনে চিন্তা করিয়া ক্রমাগতই বীণা তাহাকে ‘তুমি’ বলিয়া ডাকিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে কখন বীণা ঘুমাইয়া পড়িল, স্বপ্নে দেখিল, সুকুমার তাহার হাত ধরিয়া এক নূতন দেশে লইয়া চলিয়াছে।

ক্রমে সুকুমারের ছুটি ফুরাইল, বিদায় লইতে আসিয়া দেখিল, বীণা কাঁদিতেছে।

“কাঁদছ কেন বীণা?” সুকুমার জিজ্ঞাসা করিল।

“তুমি চলে যাচ্ছ যে!” বীণা অতি মৃদুস্বরে কহিল।

“সামনের ছুটিতেই আবার আসব বীণা, তুমি কেঁদো না।”— বলিয়া সুকুমার কমান বাহির করিয়া বীণার চোখের ভল মুছাইয়া দিল।

বীণা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সুকুমারের ডান হাতখানি দুই হাতে মুঠা করিয়া ধবিয়া কহিল, “আমাকে ঘৃণা করবে না বল।”

সুকুমার আশ্চর্য হইয়া বলিল, “ঘৃণা কেন তোমাকে করব বীণা? কি করেছ তুমি?”

বীণা কিছুক্ষণ নীবব থাকিয়া মুখ নীচু করিয়াই কহিল, “আমি যে টারা, আমাকে—” বলিয়াই বীণা আবার কাঁদিয়া ফেলিল।

সুকুমারের ওষ্ঠপ্রান্তে কৌতুকের মৃদু-হাস্য খেলিয়া গেল, পর মুহূর্তেই বীণাব চিবুক ধরিয়া তুলিয়া সে কহিল, “তুমি টায়া বলেই তো আবও বেশী কবে তোমায় ভাল লাগে বীণা!”

কথা শুনিয়া বীণার মুখে হাসি দেখা দিল। সে উঠিয়া সুকুমারকে প্রণাম করিল।

যাইবার সময়ে গৃহিণী সুকুমারকে একটি পাত্র দেখিতে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন। রামহরিবাবু সুকুমারের সম্মুখেই কহিলেন, “তুমি বাস্তব হইয়া না, সুকুমার যখন কথা দিচ্ছে, তখন কাজ করবেই। ওরা অসাধাসাধন করতে পারে।”

সুকুমার চলিয়া যাইবার পর হইতেই বীণা যেন একটা স্বতন্ত্র মানুষে রূপান্তরিত হইয়া গেল। পূর্বে মায়ের ভর্ৎসনা শুনিয়া পিতার কাছে মাঝে মাঝে সে নালিশ করিত, আজকাল গালাগালি শুনিলে পড়ার ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করে।

জবাব না পাইলে গৃহিণীর বকুনী ভাল জন্মিত না। ক্রমাগত বকিতে না পারিলে উদ্ভেজনায তাঁহার মাথা ধরিত, কাজেই একদিন বীণাব অকারণ ঔদাসীন্যে বিরক্ত হইয়া তিনি রামহরিবাবুকে বলিলেন, “ওগো শুনছ? মেয়ের যে আর একটা গুণ বাড়ল। ছিল টারা, হ’ল বোবা। গালাগাল দিলেও কথা বলে না আব।”

রামহরিবাবু বীণার এ আকস্মিক পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়াছিলেন, হেতুও প্রায় অনুমান করিয়াছিলেন, সেই সঙ্গে কয়েক দিন হইতে কন্যার একটি চমৎকার দাম্পত্য-জীবনের চিত্র তাঁহার মনে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল, তিনি গৃহিণীর অভিযোগের উত্তরে মৃদু হাসিয়া কহিলেন, “মেয়ে বড় হ’য়েছে, এখন আর রূপের খোঁটা দিও না। তোমার অদৃষ্টে ভাল জন্মাই আছে, ব’লে দিচ্ছি।”

গৃহিণীর হঠাৎ রামহরিবাবুর কথা কয়টি কেন যেন অত্যন্ত ভাল লাগিল, বলিলেন, “তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক।”

রামহরিবাবু আশ্চর্য্য হইলেন, গত তিন বৎসব মধ্যে গৃহিণীর মুখে এমন মধুর কথা তিনি শোনে নাই; নিবস্ত কলিকটি ঝঁকাব মাথায় বসাইয়া তিনি প্রাণপণে ক্রমাগত টানিতে লাগিলেন।

সুকুমার নিজের নাম ও ঠিকানা লেখা কয়েকখানা খাম রাখিয়া গিয়াছিল, আদেশ ছিল, বীণা যেন সপ্তাহে দু’খানি করিয়া চিঠি লেখে।

কয়েক দিন তুচ্ছ খুঁটিনাটি লইয়া কোনমতে দিন কাটাইয়া সেদিন বীণা সুকুমারকে চিঠি লিখিতে বসিল।

ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া সমস্ত প্রাতঃকাল ধরিয়া বীণা চিঠি লিখিল এবং চিঠিখানা ডাকে পাঠাইয়া বীণার মন অনেকটা লঘু হইয়া গেল।

টেবিলের উপরে বড় আয়না রাখিয়া সুকুমার মুখে ‘স্নো’ মাখিতেছিল। তাহার চৌকীতে বসিয়া তাহাদের সর্মিতির ভাইস-প্রেসিডেন্ট নৃপেন দত্ত একখানি বৃহদাকার ডিম্বনারী বাজাইয়া গজল গাহিতেছিল। এই সময় দারোয়ান ডাকের চিঠি আনিয়া উপস্থিত করিল।

নৃপেন চিঠির উপরে চোখ বুলাইয়া কহিল, “এ কি হে সুকুমার, তোমারই হাতের লেখা ঠিকানা দেখছি যে।”

কাহার চিঠি সুকুমার বুঝিল। তাড়াতাড়ি ‘স্নো’র শিশিটা টেবিলে নামাইয়া রাখিয়া হাত বাড়াইল।

নৃপেন চিঠিখানা মুঠা করিয়া ধরিয়া কহিল, “কার চিঠি আগে বল।”

সুকুমার কহিল, “দাও আগে পড়ে নি, তারপর দেখাব।”

বলা বাহুল্য, চিঠিখানি বীণার। সুদীর্ঘ পত্র। সুকুমার একবার চিঠিখানা তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া মুখে ‘স্নো’ মাখিতে মাখিতে বলিল, “তুমি একবার ভাল ক’রে জোরে পড় নৃপেন, আমি শুনছি।”

নৃপেন পড়িল।

বীণা লিখিয়াছে—

“তুমি চলিয়া গিয়াছ, আমার কিছু ভালো লাগিতেছে না। লেখাপড়া করিতে ইচ্ছা করে না, তুমি রাগ করিবে বলিয়া জোর করিয়া পড়িতে বসি।

যে পথ দিয়া তুমি আসিতে, সেই পথের দিকে জানলা দিয়া চাহিয়া থাকি, তুমি শীঘ্র আসিবে। না আসিলে লেখাপড়া সমস্ত ভুলিয়া যাইব, ইত্যাদি।”

এই কথা-কয়টিই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বীণা পাঁচ পাতা চিঠি লিখিয়াছে।

নূপেন চিঠি পড়িয়া কহিল, “খুব গেঁথেছ যা হোক! কে ইনি?”

সুকুমার তোয়ালে দিয়া মুখ ঘষিতে ঘষিতে কহিল, “সে খবর এখন শুনো না। চিঠিটা দাও দোখ, চটপট একটা ভাবাব লিখে দিই।”

“শেষটা কি হয় একবার জানিয়ো ভাই।”— বলিয়া চিঠি রাখিয়া নূপেন সুকুমারের পিতা চাপড়াইয়া বাহির হইয়া গেল।

সুকুমারের চিঠি পাঠাইবার পব হইতে কেবলই বীণার মনে হইয়াছে যাহা লিখিবার ছিল তাহা লেখা হয় নাই। নিজেই এই ক্রটিতে ক্রমাগতই সে লজ্জিত হইতেছিল। ভাবিতোছিল, সুকুমার হয়ত রাগ করিবে এবং চিঠির ভাববই দিবে না, কিন্তু যথারীতি ভাবাব আসিল। ঘরের দ্বার বন্ধ কবিয়া বাব বার বীণা চিঠিখানা পড়িল। উৎসবের ঝাঁপীর সুরের মত চিঠির কথাগুলি তাহার কানের মধ্যে সমস্ত দিন বাজার দিতে লাগিল।

চিঠিতে অনেক কথাই ছিল, প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে সুকুমারের মন উদাস হইয়া যায়, পড়িতে বসিলে একজনের মিশ্র-আঁখি বহিব পাতায় ভাসিয়া ওঠে, তাহারই হাতেব সেনাই বমানখানা বুকপকেটে নাবব ওজ্বলণে গান গাহিতে থাকে। সুকুমারের এই প্রকাব মারাত্মক অবস্থার বর্ণনায় চিঠিখানার আদ্যোপান্ত পূর্ণ ছিল, শেষের দিকে গুটিকয়েক উপদেশও ছিল।

সন্ধ্যায় চিঠিখানা বাক্সে তুলিয়া রাখিবাব পূর্বে তাহার উপরে মাথা রাখিয়া বীণা আপন-মনে বলিল, “আশীর্বাদ কর, আমি যেন তোমাব উপযুক্ত হতে পারি।”

বামহাবিবাব মেরিনকাব কথা গৃহিণীর মনে ছিল, এ পর্যাস্ত কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে কোনও আলোচনা তিনি করেন নাই। কাজেই স্বামীব তাম্বকুট-সেবন ও কন্যাব সঙ্গীত-চচা একপ্রকাব অব্যাহতই চলিতোছিল, কিন্তু সহসা সেদিন তিনি আবাব সেই প্রসঙ্গ উপস্থিত করিলেন। সুকুমারের বীণাব নিকট চিঠি লেখা, রামহাবিবাব তাহা জানিতেন। কহিলেন, “সুকুমার ঠিক কববে বলে গেছে। দেখ তো—”

গৃহিণী অবিশ্বাসের সুরে কহিলেন, “হ্যাঁ, তাব আবার সেবখা মনে আছে। বড়মানুষের ছেলে— গবীবের কথা ভাবতে দায় পড়েছে তাব।”

বীণা দবভাব আডালে দাঁড়ইয়া ছিল, মাযের কথা শুনিয়া নুদ হাসিল।

বামহাবিবাব চণমা ভোড়া মুছিতে মুছিতে কহিলেন, “দেখ তো আব মাসখানেক, সে তো সামনের ছুটিতেই আসছে, বোঝা-পড়া তার সঙ্গেই কোবো।”— বলিয়াই পরম নিশ্চিত মনে পুনরায় তামাক টানিতে আরম্ভ করিলেন।

সুকুমার পাত্র স্থির কবিয়া দিবে এ সম্বন্ধে গৃহিণীব সন্দেহমাত্র ছিল না, সে শীঘ্রই আসিতেছে শুনিয়া তিনি খুশী হইয়া চলিয়া গেলেন।

বড়দিনের ছুটিতে সুকুমারের আসিবাব কথা। পেটেন্ট ঔষধের বিজ্ঞাপন সম্বলিত একখানি পকেট পঞ্জিকা ভেগোড করিয়া বীণা— প্রতাহ বড়দিনের তাবিখ দেখিত। দিনগুলি স্নাত মস্থব গতিতে কাটিতোছিল। ক্রমে বড়দিন আসিল। সেই সঙ্গে সুকুমার আসিল। সন্ধ্যায় সুকুমারের সহিত বীণার সাক্ষাৎ হইল।

সুকুমারের বুকে মুখ রাখিয়া বীণা কহিল, “তুমি বাবাকে বোসো, আমি কলকাতা পড়ব। তোমাকে না দেখে থাকতে পারব না।”

সুকুমার কহিল, “তোমার বাবার যদি মত না হয়?”

বীণা মুখ তুলিয়া কহিল, “আমাকে জোর করে নিয়ে যেকোনো।”

সুকুমার মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া কহিল, “আচ্ছা আগে ইন্সুল ঠিক করি, তারপর জিজ্ঞেস করব।”

গৃহিণী প্রতাহই সঙ্কল্প করেন, বীণার পাত্রের কথা সুকুমারকে জিজ্ঞাসা করিবেন, কিন্তু অবকাশ হয় না। বিশেষ রামহরিবাবু পত্নীকে বলিয়াছিলেন, সুকুমার নিজে বীণার বিবাহেব প্রসঙ্গ না তুলিলে তিনি যেন সুকুমারকে কিছু জিজ্ঞাসা না করেন। দিনকয়েক গৃহিণী স্বামীর আদেশ অতি কষ্টে পালন করিয়াছিলেন, কিন্তু কলকাতা যাত্রার পূর্বদিন যখন সুকুমার তাঁহার নিকট বিদায় নইতে গেল, গৃহিণীর আর ধৈর্য্য রহিল না। সুকুমার কবে ফিরিবে সে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াই তিনি বীণার বিবাহের প্রসঙ্গ পাড়িলেন।

সুকুমার কহিল, “তার এত তাড়াতাড়ি কিসের মাসী-মা! লেখাপড়া শিখুক।”

গৃহিণী কহিলেন, “তাড়াতাড়ি কিসেব বলিসনে বাছা, আমার বিয়ে হয়েছিল আট বছরে—”

এ কথা সুকুমার পূর্বেও শুনিয়াছে, জানিত গৃহিণীর নিজের বিবাহের কাহিনী অস্তুতঃ ঘটনাখানেকের পূর্বে শেষ হইবে না। তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া সুকুমার কহিল, “পাত্র এক রকম দেখেই রেখেছি মাসী-মা. ব্যস্ত হবেন না। সামনের পবীক্ষাটা হয়ে গেলেই ঠিক করব।”—বলিয়া সে আগ্নিনায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

গৃহিণী ঘরের মধ্যে হইতেই কহিলেন, “পাস-ফাশে কাজ নেই বাবা, যেমন-তেনন একটা দেখে-শুনে —”

সুকুমার যাইতে যাইতে জবাব দিল, “বীণাকে যদি ফেলে দিতেই হয় মাসী-মা, তবে না হয় আমাকেই — দেবেন।” বলিয়াই সে বাহির হইয়া গেল। কথা কয়টি সুকুমার খেয়ালের মুখেই কহিয়া গেল এবং কি কহিল পথে যাইতে তাহা চিন্তাও করিল না। অথচ এই কথায় রামহরিবাবুর ক্ষুদ্র গৃহস্থালী তুমুল আন্দোলিত হইয়া উঠিল।

গৃহিণী বাঞ্ছনের কড়াইটা ধুপ করিয়া নামাইয়া খুস্তি হাতে করিয়াই বানহরিবাবুর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, “হ্যাঁগা! সুকুমার যেন কি বলে গেল।”

রামহরিবাবু সহসা উত্তব দিতে পারিলেন না, গলাটা অত্যন্ত ধরিয়া আসিয়াছিল, বার-দুই কাসিয়া কহিলেন, “শুনতে তো পেলেন! আমি আর—”

গৃহিণী খুস্তিখানা রামহরিবাবুর গালে ঠেকাইয়া আদর করিয়া কহিলেন, “বলই না শুন, আমার যে গা কেমন-কেমন করছে।”

রামহরিবাবু বলিলেন, “বললে যে মেয়ে ফেলে দিতে হ'লে তাকেই দিতে। এখন যাও জল আন, মুখটা তো ঐটো করে দিয়েছ।”

গৃহিণী হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

বীণা সুকুমারের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হয় নাই। বিধাতার চোখে সে যে সুকুমারেরই স্ত্রী একথা সুকুমারের মুখেই সে সহস্রবার শুনিয়াছে, কিন্তু সকলের সম্মুখে সুকুমার এই কথা কহিয়া গেল দেখিয়া তাহার আর লজ্জার পরিসীমা রহিল না। সে-রাত্রে আর সে কাহারও সম্মুখে বাহির হইল না, খাইতে ডাকিলেও উঠিল না।

বানহরিবাবু কহিলেন, “থাক ডেকো না— লজ্জা পেয়েছে!”

সেদিন রাত্রে মৃদুশুপ্তনে স্বামী-স্ত্রীর পবামর্শ চলিল এবং দিন দুই পর একদিন পাঁজি দেখিয়া বানহরিবাবু সুকুমারের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। নানা কথাব পর সুকুমারের বিবাহের কথা পাড়িতেই তাহার পিশ পজদুলালবাবু কহিলেন, “ছেলের বিয়েতে আমার কোনো হাও নেই। ছেলের মত হ'লেই হ'ল। জানেন ত আজকালকার ছেলে।”

কথা শুনিয়া রামহরিবাবু আশ্চর্য হইলেন এবং অনেক বিনীত অনুরোধ সহকারে সুকুমারের পিতাকে কন্যা দেখিবার নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। ব্রজদুলালবাবু মুখে বলিলেন না, বামহরিবাবু চলিয়া গেলে অন্তঃপুরে যাইয়া সুকুমারের মাতাকে সমস্ত করিতেই তিনি দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া কহিলেন, “ওমা! সে কি কথা! বামহরি মাপ্তারের মেয়ের সঙ্গে!” তাঁহার আর কথা যোগাইল না।

ব্রজদুলালবাবুর সাংসারিক অভিজ্ঞতা অত্যন্ত প্রখর ছিল। বামহরিবাবুর পরিবারের সহিত সুকুমারের হৃদয় ছিল একথা তিনি জানিতেন। সুকুমারের মাতাকেও তাহা জানাইয়া দিলেন। সুকুমারের মাতা সকল কথাও শুনিয়া পাত্রী দেখিতে আপত্তি করিতে পারিলেন না। কিন্তু সমস্ত দিন মুখ ভার করিয়া রহিলেন।

বাঁগা নিবিষ্ট হইয়া সুকুমারকে একখানি পত্র লিখিতেছিল, মাতা আসিয়া কহিলেন, “লেখাপড়া থাক না আজ, সাবান মেখে স্নান করে নে। তোকে দেখতে আসবে।”

কিছুদিন হইতে বাঁগা নির্ভয়ে মায়ের সহিত কথা বলিত, চিঠির কাগজখানি উন্টাইয়া বাঁখা করিল, “আমাকে কি কেউ কোনো দিন দেখোন মা, যে নতুন করে দেখতে আসবে?”

কথাব ঝোঁকটা কাহাব উপর গিয়া পড়িল, গৃহিণী তাহা বুঝিলেন, বাঁগাকে হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া কহিলেন, “নে মা, আজ এই একটা দিন ছাড়া আর তোকে বলব না, ওহ! বাপেবও তো পছন্দ চাই—”

বাঁগা গরু গরু করিতে করিতে উঠিয়া গেল।

বাঁহিবে যবে ব্রজদুলালবাবু সুকুমারের মাতুলের সঙ্গে বসিয়া তামাক টানিতেছিলেন। বাঁগা ধাবে ধাবে আসিয়া উভয়কে প্রণাম করিল। ইতিপূর্বে কাহাবও সম্মুখে আসিতে এত ভয় তাহাব কোনো দিন হয় নাই। কেবলই মনে হইতেছিল যদি পছন্দ না হয়। এতদিন পরে আবাব টাবাচোখটা সন্দেহে সে অত্যন্ত সচেতন হইয়া পড়িল। সুকুমারের পিতা সীক্ষদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া ছিলেন, তাহাও সে দেখিয়াছিল। ডান-চোখের তারাটিকে ঠিক চোখের মাঝখানে আনিবার জন্য সে ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছিল এবং এই অসম্ভব প্রয়াসে তাহাব সমস্ত মুখ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

ব্রজদুলালবাবু বাঁগার অবস্থা বুঝিলেন, কিছু না জিজ্ঞাসা করিয়া একটা মৃদু আশীর্বচনের সঙ্গে তিনি তাহাকে বিদায় দিলেন।

বাঁগা চলিয়া গেল রামহরিবাবুর সহিত সুকুমারের মাতুলের যে কথাবার্তা হইল তাহাতে তিনি বুঝিলেন যে, তাহাবা মেয়ে দেখানো নিয়ম রক্ষা করিতে আসিয়াছেন মাত্র—বিবাহ-বিষয়ে ছেলের মতই চরম এবং তাহাকে শীঘ্রই লেখা হইবে। যবের পিছনে বাঁগা দাঁড়াইয়া গুনিল এবং এই কথায় তাহাব বুকের দুর্ভাবনাব বোঝা নামিয়া গেল।

সেদিন দুপুর বাত্রি পর্যন্ত লিখিয়া বাঁগা অসমাপ্ত চিঠিখানা শেষ করিল। সুকুমারের পিতা আসিয়া যে তাহাকে দেখিয়া গিয়াছেন, সে-কথাব উল্লেখ করিতেও ভুলিল না।

(৬)

সেদিন সুকুমারের গ্রন্থকাণ আদৌ ছিল না। সন্ধ্যায় তাহাদের সমিতিতে বহুতা দিবাব কথা ছিল। সুকুমার তাহাই লিখিতেছিল এবং নূপেন দত্ত স্টোভ ধরাইতেছিল। এই সময়ে ডাকের চিঠি আসিল। বাঁগার চিঠিখানা খুলিয়া সুকুমার পড়িতে বসিল। সমস্তই পুরাতন কথা। সেই ভাল না লাগা, দিবারাত্রি অস্বস্তিবোধ—প্রতি সন্ধ্যায় চোখের জল ফেলা—সুকুমার পাতাগুলি একবার উন্টাইয়া গেল। চিঠিব শেষের দিকে একটা কথা ছিল, পড়িয়া সে একটু আশ্চর্য হইল, বাঁগা লিখিয়াছে, “শুণুর আমাকে দেখিয়া গিয়াছেন।” সেই সঙ্গেই তাব একজন্ত্রে লেখা আছে, “বলিয়াছেন তোমার মতই তাঁহাদের মত।”

চিঠিখানা ফেলিয়া রাখিয়া দ্বিতীয় পত্র পড়িতেই সুকুমারের মাথা খারাপ হইবার উপক্রম হইল। চিঠিখানা তাহার মায়ের। সে-চিঠিতে রামহরিবাবুর সহিত তাহার পিতাব সাক্ষাতের কথা এবং রামহরিবাবুর অনুরোধে তাহার কন্যাকে দেখার বিশদ-বিবরণ লেখা ছিল। তৃতীয় পত্র রামহরিবাবুর। তিনি লিখিয়াছেন যে, সুকুমারের কথাতো ভরসা পাইয়া তিনি ব্রজদুলালবাবুকে কন্যা দেখাইয়াছেন। যে মাসে তাহার পড়াশুনার বিঘ্ন না হয় সেই মাসেই শুভকর্ম সম্পন্ন করিবার ইচ্ছা। সুকুমারের পত্র পাইলেই ইত্যাদি। এই পর্য্যন্ত পড়িয়াই সুকুমার তারম্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, ‘ননসেন্স!’

নূপেন দত্তের হাত হইতে ডিমের প্লেট পড়িয়া গেল, সে কহিয়া উঠিল, “বাপার কিহে সুকুমার?”

কতকগুলি ইংবেলী ভাষায় গালাগালি বকিতে বকিতে সুকুমার চিঠি তিনখানা মুঠা করিয়া নূপেন দত্তের দিকে ছুড়িয়া দিল।

নূপেন ধীরভাবে চিঠিগুলি পড়িয়া কহিল, “এতদূর এগিয়েছ যখন—”

সুকুমার রুখিয়া উঠিল, কহিল, “কি বলছ বিয়ে করব!”

নূপেন মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, “অগত্যা! তা নইলে গায়ে কাদা মাখলে কেন, বল?”

সুকুমার রুক্ষম্বরে কহিল, “দোষ কার? ফাঁড়ি আওনে ঝাপ দিয়ে পাখনা পুড়িয়েছে, দোষ কি আওনেব? বেশ বলচ? তুমি আমার হ’য়ে মাকে চিঠি লিখে দাও, আমি বলে যাচ্ছি।”

নূপেন দত্ত কহিল, “ও-সব ক’রো না সুকুমার! তার চেয়ে ‘অশ্বখামা হত ইতি’ ক’বে একটা চিঠি লিখে পশ্চিমে বেরিয়ে পড়। আস্তে আস্তে বেচারী সব ভুলে যাবে।”

সুকুমার কহিল, “তুমি জান না তাকে, হয়ত বাপের সঙ্গে এসেই পড়বে। সে এক কেলেকাবী! মুখ দেখাতে পাবব না! তার চেয়ে যা বলছি তা ই কব। জেঁড়া নেকড়ার আঙন নিবিয়ে দাও। আজকেই মিটিংটাই মাটি হ’ল দেখছি!”— বলিয়া সুকুমার চিঠিব কাগজ বাহির করিল।

নূপেন নিজ নামে সুকুমারের পত্রামর্শ মত সুকুমারের মায়ের কাছে পত্র লিখিল। বর্তমানে বিবাহের বিরুদ্ধে নানাকপ মূল্য — শেষে রামহরিবাবুর কন্যাকে বিবাহ করিতে আপত্তি বচিত্র কাষণ দেখাইয়া সে চিঠি শেষ করিল। মেয়েটি যে অত্যন্ত ঢালা এ কথাটিও নূপেনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সুকুমার লিখিয়া দিল। চিঠিখানা নিজ হাতে ডাকে পাঠাইয়া সুকুমার মূল্যব নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, “বাচলাম হে! বড়ই যোরালো হয়ে উঠেছিল।”

নূপেন দত্তের চিঠি পড়িয়া সুকুমারের মাতা ব্রজদুলালবাবুকে সগর্বে কহিলেন, “দেখলে তো! তেমন ছেলেই গর্ভে ধরিনি। দাও পাঠিয়ে মাষ্টারের বাড়ী।”

ব্রজদুলাল বাধা দিয়া কহিলেন, “ছিঃ, তাব চেয়ে লোক দিয়ে কুলে পাঠাও— এখন বিয়েতে ছেলের মত নেই।”

সুকুমারের মাতা কহিলেন, “উহু, মাষ্টারের মেয়ে ছেলেকে তাহ’লে ‘ওণ’ কববে।” — বলিয়াই তিনি চনিয়া গেলেন এবং নূপেন দত্তের চিঠিখানা ক্ষান্ত দাসীর হাতে প্রাতঃকালেই যথাস্থানে রওনা হইয়া গেল।

বীণা সুকুমারের জন্য একটা বালিশের ওয়াড় সেলাই করিয়া তাহাতে একটোড়া গোলাপ ফুল তুলিতেছিল। এমন সময় মায়ের ব্রহ্মদক্ষিণি গুনিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, দেখিল তাহার মাতা মাটিতে মাথা খুঁড়িতেছেন আর চীৎকার করিতেছেন, “ওলে! আমার পোড়া কপাল!” দাওয়ায় শুদ্ধমুখে রামহরিবাবু একটি খুঁটি ধরিয়া নসিয়া দাছেন আর ক্ষান্ত দাসী একখানা চিঠি হাতে করিয়া হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।



সুকুমারের অনঙ্গল আশঙ্কা করিয়া বীণা ছুটিয়া আসিয়া মাতাকে জড়াইয়া ধরিয়া শঙ্কা-  
‘হুলস্থলে কহিল, “কি মা!”

গৃহিণী বীণাকে দূর করিয়া তেলিয়া দিয়া কহিলেন, “দূর হ! কালানুখী! দূর হ! মুখ  
দেখাসনি আর! দেখগে যা চিঠিতে কি লিখেছে।”

বীণা ক্ষান্ত দাসীর হাত হইতে চিঠিখানা লইয়া চলিয়া গেল।

বেলা তখন দুপুর গড়িয়া গিয়াছে, তখনও বীণা কাঠের পুতুলের মত নুপেন দত্তের  
চিঠিখানা হাতে করিয়া বসিয়া ছিল। তাহার যে কি হইয়াছে তাহা সে ভাবিতেও পাবিতেছিল  
না। গত কয়েক মাসেব বড় জেট সকল ঘটনা, সুকুমারের প্রত্যেকটা কথা মনেব মধ্যে  
আবর্তিত হইয়া উঠিতেছিল। সকল কথাব মধ্যে একটি কথাই বিশেষ কবিয়া মনে পড়িতেছিল,  
সুকুমার বলিয়াছিল— “টাবা বলেই তোমাকে আবও বেশী ভাল লাগে।”

সুকুমার আজ লিখিয়াছে সে টাবা! ভাবিতে ভাবিতে দেখিলে টাঙানো সুকুমারের  
ছবিখানার দিকে তাহার চোখ পড়িল; ভাবিল সুকুমারের সম্মুখের উঁচু দাঁত দু’টি তো তাহাব  
চোখে কোনো দিন কুশী লাগে নাই, কেবলই মনে হইয়াছে দাঁত দু’টি উঁচু না হইলে যেন  
মোটাই মানাইত না। কিন্তু তাহাব টাবা চোখটি সুকুমারের চোখে বিশী লাগিল কি করিয়া!

‘নাও, হযেছে! খুব চলিয়েছ, এখন দু’টো গিলে নাও!’ বলিয়া গৃহিণী যবে ঢুকিলেন।  
যবে ঢাকিয়া বীণাব মুখের দিকে চাহিয়া গৃহিণী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পব কন্যার  
গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

বীণা মাগেব বৃকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া পড়িয়া রহিল।

সন্ধ্যাকালে রামহরিবাবু ফিরিয়া অতি গুদস্তবে বীণাকে ডাকিলেন, সে সাড়া দিল না।  
খাইবাব ভনী গৃহিণী ডাকিলেন, মাথাধবাব আছিলায় সে বিছানায় পড়িয়া রহিল।

বামহরিবাবু শুধু কহিলেন, “ওকে আর আজ ডেকো না।”

বাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত ভাগিয়া বীণা সুকুমারের চিঠিগুলি পড়িল, তাবপর সুকুমারের ছবিখানার  
দিকে চিঠিগুলি আগাইয়া ধরিয়া কহিল, “এ-সব তাহ’লে মিছে কথা! আমি শুধু টাবা!”

টাবা! টাবা! কথাটি মনে করিতেই মাথার মধ্যে তাহার কেমন ওলট-পালট হইয়া  
গেল। মনে হইল চোখটাব সঙ্গে যেন সমস্ত দেহের কোনও সম্পর্ক নাই, ভাবিতে ভাবিতে  
টেবিলের উপব হইতে কখন বীণা পেন্সিল কাটা ছুরিখানা তুলিয়া লইল।

আত্ননাদ শুনিয়া রামহরিবাবু ও তাহার পশ্চাৎ গৃহিণী ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন, বীণাব  
সমস্ত মুখখানা ভাসাইয়া রক্তেব শ্রোত বহিতেছে আর ছবিখানা ডান চোখেব মধ্যে আমূল  
বিল্ব হইয়া আছে।

সংসাদটি যথাবীণা সুকুমারের নিকট গিয়া পৌছিল, তবে অন্য ধরনে। তাহার মাতা  
লিখিয়াছেন, “ছুরির খোঁচা লাগিয়া রামহরি মাস্টারের মেয়ের ডান-চোখটা একেবারে কাণা  
হইয়া গিয়াছে।”

সুকুমার দাড়ি কামানো বন্ধ রাখিয়া সংবাদপত্রপাঠে রত নুপেন দত্তের দিকে চিঠিখানা  
ফেলিয়া দিয়া কহিল, “দেখলি নুপেন, ভাগ্যস—”

## সাদা ঘোড়া রমেশচন্দ্র সেন

দাঙ্গার সময়ের একটি ঘটনা।

ক্রমান্বয়ে কয়েকদিনের রক্তমান্নের পব কলিকাতার অবস্থা একটু শান্ত হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান নিজ নিজ পন্থীতে কিছুটা নিঃসঙ্কোচে বাহির হয়। কিন্তু কেমন যেন থমথমে ভাব।

একদিন বিকালে শূন্য ঠিকাগাঁড়ের স্ট্যাণ্ডে সাদা একটি ঘোড়া দেখা গেল। ধবধবে সাদা, শরীরের কোথাও একটা দাগ পর্যন্ত নাই। চামরের মতন তার সুন্দর ল্যাঙ্গেব গোছার উপব রোদ ঝলমল করে।

প্রাণীটি যেন পথভোলা এক পথিক। এ পাড়ায় আগে কেহই তাকে দেখে নাই। আশ্রয় হারাইয়া, আশ্রয়দাতাকে হারাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে এইখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ক্ষুধাব জ্বালায় খালি রাস্তা শোকে। তার নিশ্বাসে পথের ধূলা ওড়ে। কিন্তু বেচাৰী কোথাও কিছু পায় না। শুধু আবর্জনার দুর্গন্ধময় স্তূপ গুলিয়া গুলিয়া মুখ ফিরাইয়া নেয়।

জনাল দিয়া দেখিয়া শীলার মা বলিলেন, আহা বেচাৰী হয়ত কিছুই খেতে পায় না। সেইস কোচোয়ান ফেলে পালিয়েছে।

তার নববিবাহিতা মেয়ে শীলা কাছেই দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিল, কেউ হয়ত তাদের মেবে ফেলেছে।

এ্যা!—শীলার মার মুখখানা একেবারে কালো হইয়া যায়।

এই মহিলা কয়দিনে একটা মৃত্যুও দেখেন নাই। কিন্তু নিজেব চোখে দু'একটা নৃশংস ব্যাপার ঘটিতে দেখিয়াছেন। আর হত্যার কাহিনী শুনিয়াছেন অজস্র, হত্যা এবং হত্যাব চেয়েও নির্মম।

শুনিয়া শুনিয়া গা ঘিনঘিন করে, অরুচি হয়। আসে অনিদ্রা। তবুও মানুষ যে এত নৃশংস হইতে পাবে তিনি তাহা বিশ্বাস করিতে চান না। বলেন, সেইস কোচোয়ান বেচে থাকতেও ত পারে।

দাঙ্গা-বিধ্বস্ত পল্লীতে সাদা এই জনোয়ারটা যেন নূতন প্রাণেব সঞ্চার করিল। তাকে লইয়া ছেলের দল মাতিয়া উঠিল।

একেবারে ছোটরা দূর হইতে দেখিয়াই খুশি হয়। বড়রা তার গায়ে হাত বুলায়। ঘাড়ে হাত দিলে ঘোড়াটাও আনন্দে চিহি চিহি করে।

তাকে লইয়া জল্পনা চলে নানারকম। প্রায় সকলেই সিদ্ধান্ত করে কোন রাজা কিংবা জমিদারের ঘোড়া হইবে। তারপরেই ওঠে খাদ্যের কথা, বড়লোকের ঘোড়া কি খায়, খায় কতটা পরিমাণ। একজন বলে, জনিস ওরা মদ খায়, বিলাসী মদ।

নস্ত্রে মত্তবা করে, মদ না খেলে আর অত তেজী হয়?

একটি ছেলের দুর্বুদ্ধি হইয়াছে। সে বলিল, ঘোড়াটা সম্ভবত ছেকবা গাড়ীবা।

সঙ্গে সঙ্গেই হাসির রোল ওঠে। নস্ত্রে বলে, কত ঘোড়াই না তুই দেখেছিস। তাদের বলেন দেশে ভুড়ি-চৌবুড়ি চলে কিনা।

এই আলোচনার মধ্যেই ঘোড়ার মুখে লাগাম পরাইয়া যমুনাপ্রসাদ তার পিঠে চাপিয়া বসিল। হাতে নিল একখানা ছোট্ট ছড়ি।

ছেলেটির বয়স বাইশ-তেইশ, কালো রং। ছিপাছিপে গড়ন। গায়ে একটি গোঞ্জি। সে বায়োস্কেপের টিকিট কিনিয়া বুকে ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া চড়া দামে বেচে। ফুটপাথের উপর জুয়া খেলিয়া আধ ঘণ্টার মধ্যে লাভের কর্ডি উড়াইয়া দেয়। কিছু অবশিষ্ট থাকিলে খাটি খাইয়া চিল্লাচিলি করে।

কিন্তু দাস্তার এই কয়দিনে সে বেশ লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। যখনই পল্লী বা নিকটবর্তী দেবমন্দির আক্রান্ত হয় তখনই সর্বাগ্রে শোনা যায় যমুনার কণ্ঠস্বর। সে সকলের আগে আগে ছুটিয়া চলে।

গোরা সৈন্যদের চা ও সিগ্রেট খাওয়াইয়া যমুনা তাদের সঙ্গেও বেশ ভাব করিয়া ফেলিয়াছে।

কিন্তু এই দুইদিন আর কিছু করার তার অবকাশ হয় নাই। প্রায় সব সময়েই ঘোড়া উপর থাকে। বলে--হাম সার্জিন বন গিয়া।

ছেলের দল তার পিছন পিছন ছোট্ট। দু'একবার কেহ হয়ত বলে, তুমি নেমে পড় যমুনা, এবার আমবা উঠি।

যমুনা কোন জবাব দেয় না, স্কেপ কবে না, শুধু তালুতে জিভ ঠেকাইয়া শব্দ কবে, টক্ টক্।

হাবুল বলিল, বাঃ রে, তুমি ঘোড়ায় চড়বে আর আমরা বসে বসে দেখবো? তা হবে না।

যমুনা বলে, যা---মোড়ের দুকানসে পান ঔব সিগ্রেট লিয়ে আয়। তারপর চড়বি।

পয়সা?

হামারা নাম করবি। বলবি—যোমুনাপারসাদ মাংছে।

মিনিট দুই-তিন পরে হাবুল ফির্বয়া আসিয়া বলিল, দিলে না, বললে, পৈসা লে আও।

শালা, ভেড়ীক! বাচ্চা, শালাব দু'কান বাঁচিয়েছিলাম, জুয়াসে ভি কত পয়সা নাফা কবল। আভি পানকো ওয়াস্তে দোঠো পয়সা মাংছে—বলিয়া যমুনা পানের দোকানের দিকে ঘোড়া চালাইয়া দিল। হাবুলের আব ঘোড়ায় চড়া হইল না।

অন্যাব এই সময় ছেলেরা সার্বজনীন পূজামণ্ডপে ভিড় করে। পটুয়া খড়্ দিয়া কাঠামো গড়ে, মাটি ছানে, কাঠামোয় মাটি দেয়। ছেলের দল দাঁড়াইয়া দেখে। টুকিটাকি জিনিসপত্র আগাইয়া দিয়া পটুয়াকে সাহায্য করিয়া কতই না আনন্দ পায়।

এবার এখনও মণ্ডপ ওঠে নাই, ছেলেরা সাবাদিন ঘোড়াটাকে লইয়া বাস্ত। তাবা তাব নাম দিয়াছে চাঁদ।

চাঁদের রং-এর ওস্তুল্লা ও কাস্তি দিনের পর দিন স্নান হয়। সে পা টানিয়া টানিয়া চলে। পিছনের বাঁ পায়ে ছোট্ট কিন্তু দগদগে একটা যা।

শীলার বাবা হযীকেশবাবু পাড়ার প্রবীণ লোক, ছেলেদের মুকব্বী-স্থানীয়, তিনি হাবুলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঘোড়াটাকে খেতে দিস্ ত বে?

হাবুল বলিল, নস্তেদা দিয়েছে বোধ হয়।

নস্তেকে প্রশ্ন করিলে সে কহিল, আমি ত জানি না। যমুনা বলতে পাবে।

স্বামীর নিকট ব্যাপার শুনিয়া শীলার মা ছেলে সন্তকে দিয়া বাড়িব নিচের দোকান হইতে কিছু ভুবি কিনিয়া পাঠাইয়া দিলেন। ঘোড়াটা অল্প একটু মুখে তুলিয়াই আর খাইল না। সন্তর বন্ধু খোকন বলিল, চাঁদেব গলায় আটকে গেছে। আয জল নিয়ে আসি।

দুই জনেই জল আনিল কিন্তু একজনের ভাঁড়ের মুখ ছোট হওয়ায় এবং অপরের মগের তলায় ছাঁদ থাকায় ঘোড়াটার আর জল খাওয়া হইল না।

হাতের কাছে অন্য পাত্র না পাইয়া বালক দু'টি পাশের চায়ের দোকান হইতে একখানা ভাঙা ডিসে খানিকটা চা আনিয়া বলিল, খা চাঁদু খা, গোকুলের চা খুব ভাল, খেয়ে দেখ।

কিন্তু গোকুলের চায়ের মাহাত্ম্য চাঁদকে মোটেই আকৃষ্ট করিতে পারিল না। দু'একবার ডিস শুকিয়াই সে মুখ ফিরাইয়া নিল।

ঘোড়াটা আরও বোগা হইয়া গিয়াছে, কেমন যেন জ্ব্বথবু ভাব, ঘাঘের অবস্থাও আগের চেয়ে খারাপ। কিন্তু যমুনার চড়ার বিরাম নাই, হ্রষীকেশ তাকে কহিলেন, ঘোড়াটাকে একটু বেহাই দিও যমুনা, নইলে যে মরে যাবে।

যমুনা মদ খাইয়া বুদ্ধ হইয়াছিল। সে আধা-হিন্দী আধা-বাংলায় যাহা বলিল তার সাবাংশ এই, যেখানে হাজার হাজার মানুষ মরিল সেখানে সামান্য একটা জানোয়ারের জন্য আব দুঃখ কবা কেন?—বলিয়াই হাসিল, শাণিত ছবির ফলাব মত তীক্ষ্ণ হ্রু হ্রাসি।

সন্ধ্যার সময় ছেলেদের সাহায্যে হ্রষীকেশ ঘোড়াটাকে সামনের ফাঁকা গ্যারেজে তুলিয়া দিলেন, সঙ্গে দিলেন এক বালতি জল ও কিছু বিচালি। সবেনাত্র তাবা বাহিরে আসিয়াছেন এমন সময় চলমান লরি হইতে শান্তিরক্ষীব দল ফুকরিয়া গেল, ভিতরে যাও, ভিতরে যাও।

পরদিন সকালে দেখা যায়, গ্যারেজে তালি লাগানো, দরজার পাশেই হ্রষীকেশের বালতি, অদূরে ঘোড়াটা নিষ্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া। চোখে একটু দীপ্তি নাই, লেজ নাড়াইয়া মাড়ি তাড়াইবারও শক্তি নাই। মনে হয় এখনই পড়িয়া যাইবে।

সস্ত তড়াতাড়ি চারটি ছোলা আনিয়া দিল। চাঁদ তাহা মুখে তুলিল না। নন্তে বলিল, দে ত সস্ত, দেখি আমার হাতে খায় কিনা। অনেক ঘোড়াকে আমি খাইয়েছি। জানিস আমাদের ঘোড়ার গাড়ী ছিল?

কিন্তু মূক শ্রাণীটি তার এই আশ্ববিশ্বাসেও আঘাত করিল। নন্তে বলিল, রোগটাব সিরিয়সটি দেখছি খুবই।

শীলার মা দুঃখ করিতে লাগিলেন, আহা বেচারার দেখছি দাঁড়াবারও ক্ষমতা নেই। কিন্তু একবার গুলে আর উঠবে না।

শীলা জিজ্ঞাসা করে, ঘোড়া নাকি দাঁড়িয়ে ঘুমোয়?

হ্রষীকেশ বলিলেন, কে বললে? আট-দশ দিন বাদে ওবাও একবার গড়িয়ে নেয়।

বেলা দশটা। কড়া বোদ যেন গায়ে চাবুক মাঝে। চাঁদ ছটফট করে, ছেলেরা তাকে ধাবে ধাবে হাঁটাচলা টেবুদের গাড়ী বারান্দার তলায় নইয়া যায়। নন্তে তাদের আশ্বাস দেয়, সাদা জানোয়ারগুলোর রোদ সহ্য হয় না, ওতে ভয়ের কিছু নেই।

এই সময় বড় রাস্তাব মোড়ে বেঁটে খাটো একটা মানুষের আবির্ভাব হয়। এদিক ওদিক চাহিয়া লোকটি রাস্তায় ঢোকে। একগাল পাকা গৌফ-দাড়ি, খালি গা, পরনে ময়লা লুঙ, মাথায় ফেজ, হাতে টিনের মগ। মগটা রোদে চকচক করিতেছিল।

এমনিতেই সে দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তার উপর এই সময় এই পাড়ায় তাকে দেখিয়া সকলেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল, হ্রষীকেশবাবু বলিয়া উঠিলেন, ইস, ও এখন এ পাড়ায় এল কেন?

• কিন্তু লোকটির কোন দিকেই ড্রফেপ নাই। সে কি যেন খোঁজে, দীর্ঘ পথের উপর বার দুই চোখ বুলাইয়া নেয়।

প্রথমে লক্ষ্য করে নাই, একটু পরে সাদা ঘোড়াটিকে দেখিয়া তার চোখ যেন জ্বলিয়া ওঠে। দ্রুতপদে কাছে যাইয়া তার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বৃদ্ধ তাদের দেশী ভাষায় বলে, আঃ সুরাব, তোর এমন দশা হয়েছে!

পরিচিত সেই স্পর্শে প্রাণীটি চঞ্চল হইয়া ওঠে। সেও চোখ তুলিয়া চায়, মানুষের চাহনির মত অর্থপূর্ণ সেই দৃষ্টি অনেক কিছুই প্রকাশ করে। ভাষায় হয়ত ততটা বলিতে পারিত না।

বুদো ভাড়া হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিল, এব নাম বুঝি সোরাব? আমরা ডাকি চাদ।

বৃদ্ধ সহিস করিল, উত্ত একই হায়।

নামে জিজ্ঞাসা করিল, ঘোড়াটা তোমার?

না বাবু, ভাড়া গাড়ীর ঘোড়া। আমি সহিস কোচোয়ান দুইই।

নামে বলিল, তার মানেই তোমার ঘোড়া।

ঠিক হায় — বলিয়া বৃদ্ধ একটু হাসে। তাবপব কল হইতে মগটায় তল ভরিয়া আনিয়া ঘোড়ার মুখে কাছে ধবে। ঘোড়াটা তলটুকু নিঃশেষে খাইয়া ফেলিলে ছেলের দল চিৎকার করিয়া ওঠে, গুয় হিন্দ।

সহিস লুঙ্গিব ভেতরে গৌড়া একটা ঠোঙায় ছোলা আনিয়াছিল। সেই ছোলা সে ঘোড়াটাকে হাত করিয়া খাওয়াইল। ছোলা ফুবিয়া গেলে ছেলের বলিল, ঠের চাবঠো চানা মিলেগা বাবু?

জরর — বলিয়া নামে ছুটিল। সঙ্গে ছুটিল হাবুল ও গবাব দল। এক সঙ্গে ছোলা আসিল চাব ঠোঙা।

জানোযাবটা আর একটু চাপা হইলে বৃদ্ধ বলিল, বেমাব হলে সুরাব আমার হাতে ছাড়া খায় না।

তাব মনে পড়িল অনেক কথা, ঘোড়াটাকে কত টাকায় কেনা হইয়াছিল, তাব বয়স তখন কত, কয়টা দাঁত উঠিয়াছিল, এই সব।

সোরাবের চলন দেখিয়া লোকে তাকে জিজ্ঞাসা করিত, বাক্তি জিতিবাব এই ঘোড়াটাকে সে ঠিকা গাড়িতে জুড়িয়াছে কেন?

নিজের কপালে হাত ছোঁয়াইয়া সে উত্তর করিত, নসীব। মানুষের মতন ঙানোয়ারেরও নসীব আছে কিনা।

একটু পরে সে জমীকেশকে প্রণাম করিল, কব সব ঠাণ্ডা হোবে বড় বাবু? ফিল ঠিকা গাড়ী চালু হোবে? বাস্তামে ডর-ডর কুছ থাকবে না?

লোকটি আগের মতন শান্তিপূর্ণ দিনের কথা ভাবিতেছিল। জমীকেশ তাব প্রশ্নের কোনো উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না।

হঠাৎ যেন দানবের নিদ্রাভঙ্গ হয়। অদূরে চৌরাস্তার মোড়ে সে আড়মোড়া ভাঙে। ঝঞ্ঝাব বেগে খবর ছুটিয়া আসে, লাল পট্রিতে খুনাখুনি শুরু হইয়াছে। খালের মধ্যে নদীর বেনো জলের মতন বড় রাস্তার জনশ্রোতের একটা অংশ হু-হু করিয়া রাস্তায় ঢুকিয়া পড়ে। আরম্ভ হয় ছুটাছুটি, কলরব, মার মার শব্দ।

বুড়া সহিস এদিক এদিক চায়, এক একবার ছেলের মুখের দিকে তাকায়। সোরাবের চোখেও ফুটিয়া ওঠে অপরাধ কবণ দৃষ্টি। সে তার পালকের বিপদ বুঝিতে পারে।

নামে সহিসকে বলে, কিছু ভয় নেই তোমার।

কিন্তু অপরিচিত শত শত হিংস্র চোখের সামনে সহিস কেমন যেন ভরসাও পায় না।

কয়েকটি লোক আগইয়া আসে। যমুনা, নন্তে, হাবুল প্রভৃতি তরুণের দল বৃদ্ধের চারধারে কর্দন করিয়া দাঁড়ায়। হাবিকেশ আক্রমণকারীদের শাস্ত করিবার চেষ্টা করেন। বলেন, একটা নিরীহ লোক, ওকে মারবে না।

জনতার মধ্য হইতে নানা ভাষায় প্রতিবাদ আসে, মানুষ নেই, উ শয়তান আছে।

এর মধ্যে মেটিয়াবুরুজ ভুলে গেলেন মশায়?

টুথ ফর এ টুথ।

হাবিকেশ বলিলেন, কত জায়গায় ওরা আমাদের বাঁচিয়েছে জানেন?

আমরাও ঢেব বাঁচিয়েছি। ওসব ছেঁদো কথা ছেড়ে দিন।

বুঝাইবাব চেষ্টা বুথা। তর্ক করা শুধু নিরর্থক নয়, ক্ষতিকরও বটে। তাই যমুনা ও নন্তে বলে, চুপ করুন কাকাবাব। ... বলিয়াই দুজনে বুক ফুলাইয়া দাঁড়ায়। যমুনা বলে, আও মাবনেওয়ালা কোন হায়, আও।

একটা ছোকরা চেষ্টাইয়া উঠিল। আমাদের সাদা ঘোড়ার সহসকে, আমাদের চাঁদেব সহসকে কেউ মারতে পাববে না।

জনতা একটুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়ইয়া থাকে। তার পবই আবার কলরব শুরু হয়। ছেলেদের গায়ে ঢিল পড়ে।

এই সময় মোড়ের বাড়ির ছাদে একজন চিংকাব কবিয়া উঠে, মিলিটারি আ গিয়া।

আরম্ভ হয় দৌড় প্রতিযোগিতা! আশে পাশের গান খুঁজি, খোলা দরজা যে যেখানে সম্ভব ঢুকিয়া পড়ে। বৃদ্ধ সহসকে পাতাকোলা করিয়া যমুনাপ্রসাদ হাবিকেশের বাড়ীর মধ্যে ছুটিয়া যায়।

ওন্ ওডম ওন্।

গাড়ি হইতে নামিয়া সৈনিকরা রাজপথে টহল দেয়। তাদের জুতোর শব্দ ভিন্ন সাবাটা পল্লীতে আর কোনও শব্দ নাই।

সে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। দরজা জানালা বন্ধ। জানালার খুঁজি ফাক কবিয়াও কেহ কৌতুহল নিবৃত্ত করিতে ভবসা পায় না। সবারই মুখে অজানা উদ্বেগের ছাপ।

ঘণ্টাখানেক পবের কথা। -

প্রথমে বাহিব হয় নন্তে ও যমুনাপ্রসাদ। পিছনে বৃদ্ধ সহস। দরজা খুলিতেই তাদের চোখে পড়ে রৌদ্র-দক্ষ রাজপথের রিস্ত রূপ, যেন মহাশ্মশান।

বা দিকে মুখ ফিরাইয়া তিনজনেই শিহবিয়া উঠে।

এ কী! ঘোড়াটা পথে পড়িয়া আছে। কালো পিচেব মধ্যে তার সাদা রং আবো খুলিয়াছে। দেহ পথের উপর, মাথাটা ফুটপাথে। ডান কানের পাশে গোল একটা ক্ষতচিহ্ন।

বুড়া সহস ডাকিল, মেরা সোরাব।

সোরাব কোনও উত্তর করিল না। বৃদ্ধের ডাকে সোরাবের সাড়া না দেওয়া এই প্রথম।

সোরাব তখন আকাশের দিকে চাইয়া আছে। হীরকস্বচ্ছ আকাশেরই মতো নির্মল দৃষ্টি, সে চাহনিতে কোনও বেদনা নাই, গ্লানি নাই। হাবিকেশও পাশে আসিয়া দাঁড়ইয়াছিলেন। ঘোড়াটার চোখের দিকে চাইয়া তিনি একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

## কপূরের মালা

### শৈলবালা ঘোষভায়া

এক

গোলমালে ভিড়ের ভিতর মাসীমাব হাত ছাড়াইয়া ছবি যে কখন পিছাইয়া পড়িয়াছিল তাহা সে কিছুই টের পায় নাই, হঠাৎ অপরিচিত লোকের ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ান মাঝে আপনাকে নিঃসহায় বেপথুমানা দেখিয়া ভয়ে সে কাঁদিয়া ফেলিল।

দোলযাত্রা উপলক্ষে সেদিন ভগ্নমাথ দেবের শ্রীমন্দিরে লোকে লোকারণ্য। সকলেই কনুইয়ের থাকায় লোক হটাইয়া অগ্রসর হইতে উদগ্রীব। যাত্রী পবিচালক পাণ্ডা ও ছড়িদাবদেব হাঁকডাকে কানে তলা ধরিয়া যাইতেছে। এয়োদশবর্ষীয়া পাতলা ডিগডিগে মেয়ে ছবি—লোকের হুড়াহুড়ান ঠেলায় পিছু হটিতে হটিতে একেবারে মন্দিরের দরজার গোড়ায় আসিয়া পৌঁছিল।

ছবি আকুল হৃদয়ে ঘণ্টার ইহা উঠিল। কে কাহাকে দেখে, কে কাহাব কথা শোনে? তাহাব পানে কেহ ফিবিয়া থাকিল ও না। আত্ম দেবতা দর্শনে তাহারা আসিয়াছে—দেবতা দেখাবে, দুঃস্থকে দেখিবার অবকাশ নাই, দেবতার দর্শনে স্বর্গলাভ হয়—সে স্বর্গ যদি বাহুবলেব প্রভাবে ওতাওঁতির দ্বারা দুর্বল দলনে পাওয়া যায়, তবে কোন বুদ্ধিমান তাহাকে ইতস্তত করে? কে এমন স্বার্থভাগী নির্বোধ আছে, নির্লজ্জ আছে, যে পরের খোঁজ লইতে গিয়া নিজের অনায়াসলভ স্বর্গ হারাইতে আপত্তি করে না? কেহই না! আতঙ্কপীড়িতা বালিকাব ক্ষীণরোদন প্রচণ্ড কোলাহলের মাঝে ডুবিয়া তলাইয়া গেল।

“কি হয়েছে খুকি, কি হয়েছে তোমাব—কেন কাঁদছ গা?” শ্যামবর্ণ, একহারা, কপালে চন্দনের ফঁটা, গলায় মালা, কোমরে গামছা জড়ান, ঈষদীর্ঘাকৃতি একটি তরুণ কোমল মূর্তি, ছবির মুখের উপর ঝুকিয়ে পড়িয়া স্নেহময় স্বরে ভিজ্জাসা কবিল, “কেন কাঁদছ খুকি?” চারিদিকে অদ্ভুত বৈচিত্র্যময় কটকটী ভাষার কিড়িমিড়ির মাঝে, হঠাৎ পরিষ্কার বাংলা প্রশ্ন শুনিয়া ছবির কান্না বন্ধ হইল, ছবি চলভবা বড় বড় চোখ দুটি তুলিয়া সবিস্ময়ে প্রশ্নকর্তার মুখপানে চাহিল, আহা, কি সুন্দর মমতাময় সরল মুখখানি! সদাশাস্তিতা ছবি অনেকটা আশ্বস্ত হইল।

আবাব স্নেহময় স্বরে সেই ব্যগ্র প্রশ্ন।

সহসা পিছনের সজোব থাকায়, সোলাব পুতুলের মত ক্ষীণকায় ছবি, ছিটকাইয়া সেই লোকটির উপর গিয়া পড়িল। ক্ষিপ্ৰহস্তে পতনোন্মুখ ছবিকে ধরিয়া ফেলিয়া সেই লোকটি অতি যত্নে তাহাকে বান হাতের বেগনে আগলাইয়া লইয়া, বিপুল বিক্রমে অমিত প্রত্যাপে লোক ঠেলিয়া মন্দির প্রাঙ্গণে একটু তফাতে আসিয়া দাঁড়াইল।

ছবি এতক্ষণ প্রাণপণে অস্তিম অবলম্বনের মত সেই অপরিচিত লোকটির হাত চাপিয়া ধরিয়া ছিল। এখন ফাঁকা জায়গায় আসিয়া সঘন উচ্ছ্বসিত নিঃশ্বাস ফেলিয়া, লোকটির হস্তবদ্ধ নিঃশব্দ ঘর্মান্ত হাতখানি খুলিয়া লইয়া সলজ্জ সঙ্কোচে একটু সবিয়া দাঁড়াইল।

লাবণ্যময়ী কিশোরীর মুখপানে শ্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া, তরুণ যুবাটি ককণা-কোমল কণ্ঠে শুধাইল, “কার সঙ্গে মন্দিরে এসেছিলে খুকি?”

থামিয়া থামিয়া শুদ্ধ কণ্ঠে ছবি বলিল, “আমার না, মাসীমা, মেসোমশাই, ঝি—সবাই এসেছে। আমি মাসীমার হাত ধরে ছিলাম, তাবপর মন্দিরে ঢুকে—” ছবি আবার কাঁদিয়া ফেলিল।

“চূপ কর, চূপ কর, এখনি তাদের পাবে, কান্না কি? তোমাদের ছাড়িদাব কেউ নেই?”

“হ্যাঁ আছে, কপালে ফোঁটা পরে একজন—”

“তার নাম কি বল দেখি?”

“তা জানিনে, তার মাথায়—এ তোমার মত চুলজটা নেই ত—বড় বড় চুলে চূড়ো বাঁধা আছে।”

সরলা বালিকার এই অশ্রুত যুক্তিপূর্ণ অভিজ্ঞান নির্দেশে লোকটিব মুখ হাসিতে ভরিয়া উঠিল, চারিদিকেই তো শত শত চূড়া বাঁধা মাথা, তাহাব মধ্য হইতে একটি চূড়াচিহ্নিত ও পরিচিত মাথা খুঁজিয়া বাহিব করা নিতান্তই সহজ!

“আচ্ছা, পাণ্ডুর নাম কি জান?”

“না, মায়েরা কেবল সেই লোকটার সঙ্গেই ঠাকুর দেখতে ঢুকেছেন।”

“মন্দিরে ঢুকেছেন তো? আচ্ছা তবে কোন ভয় নেই, এখনি বেরলেই পাওয়া যাবে। তোমাব নামটি কি খুকি?”

“আমার নাম ছবি।”

সেই রবিকরোজ্জ্বল মধুর প্রভাতে, সেই মিশ্র লালিত্যময় সুন্দর মুখখানিব প্রতি চাহিয়া চাহিয়া মুগ্ধ-হৃদয় যুবা ভাবিল, “ছবি বটে!”

কোলাহল করিতে করিতে যাত্রীদল জনপ্রবাহবৎ যাওয়া-আসা করিতেছে। চার্নতে চলিতে কেহ বা তাহাদের দিকে কৌতুকোজ্জ্বল কটাক্ষ হানিয়া যাইতেছিল—ছবি নত দৃষ্টিতে সসন্মোহে ভুড়সড় হইতেছিল। অদূরে আবিব-লিপ্ত, অদ্ভুতদৃশ্য কয়েকজন ছোকরা তাহাদের লক্ষ্য করিয়া, গোপন বিদ্রোপে চোখ টেপাটিপ করিয়া বেজায় হাসিতেছিল। তাহাদের মধ্যে একজন দণ্ড-দুয়েকের জন্য সরিয়া গিয়া মন্দির দ্বারে ভিড়ে মিশিল। তাহার পব সহসা অশ্রুত বাস্তবাবে আসিয়া আচম্বিতে ছবিব হাত ধরিয়া এক হ্যাঁচকা মাঝিল। “আলে আমাব যাত্রীব মেয়ে, ভিড়ে হারিয়েছে, আয়।”

সেই সর্বদর্শী তরুণ যুবা এই লোকটাব আচরণ আগাগোড়া সব লক্ষ্য করিতেছিল, বহুকষ্টে এতক্ষণে সংযত ছিল, আব পারিল না, সদাকৃত ধৃষ্টতার প্রভাণ্ণে অকস্মাৎ রুদ্রমূর্তি ধরিয়া সেই অসভ্যতার গালে সশব্দে এক চড় বসাইয়া দিল। বিশ্বস্তব পাণ্ডুর হাতে গড়া চেলা, ছাড়িদাবদের সর্দার সে, বঞ্জন মিশ্র তার নাম, তাব কাছে বেয়ার্দাব!

অশ্রুত্যাশিত চপেটাঘাতে বিপর্যস্ত হইয়া আলোড়িত মস্তিষ্কে বুদ্ধিমান লোকটি যন্ত্রণাকাতব মুখে গালে হাত বুলাইতে বুলাইতে তাড়াতাড়ি ভিড়ে ভিড়িয়া পড়িল, আর পিছু ফিরিয়া চাহিল না। ভয়াকুলা ছবিকে শাস্ত্রশব্দে আশ্রিত করিয়া রঞ্জন তাহাকে আবার আগলাইয়া দাঁড়াইল।

“মেয়ে কই, মেয়ে কই”—কোলাহল করিতে করিতে একদল লোক মন্দির হইতে বাহিব হইয়া ব্যগ্র ব্যস্ততায় চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। “ওগো, এইদিকে একটু মেয়ে দেখেছ গা—এই এতটুকু মেয়ে—পাংলা চেহারা—সুন্দব মতন, কেউ দেখেছ গা—”

চারিদিকে প্রাণোন্তরের উচ্ছৃঙ্খল কলরব পড়িয়া গেল।



“আরে এই হক্কয়া—এই ধারে ফের, আরে—এই বোকা, এদিকে দেখ, এই, কি খুঁজছি—”

“আরে মেয়ে হারিয়েছে; মেয়ে হারিয়েছে, আমার যাত্রী!”

“দেখ দেখি, এই কি সেই?”

“হাঁ হাঁ, এই এই! ভয় নেই বাবু, পাওয়া গেছে, এই দিকে, এই দিকে আসুন, আসুন—  
এই যে গো এই!”

ভয়ঙ্কর ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ির ভাব ধূম পড়িয়া গেল, কে কাহাব ঘাড়ে পড়ে ঠিক নাই। অনেক লোক ছুটিয়া আসিয়া বঙ্গ ও ছবি কে ঘিরিয়া ফেরিল, বোরদামানা আকুল বিপদা জননী ছবিকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া ঘন ঘন, নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। সদা আশঙ্কা-মুক্ত আশ্রিত অন্তরে ভগদম্বব উদ্দেশে তাহাব চক্ষু হইতে পূর্ণ আবেগে অশ্রু উছলিয়া পড়িতে লাগিল।

॥ দুই ॥

তাহাব পব দিন কয়েকের মধ্যেই সেই পরিবাবের সহিত অপরিচিত যুবাব ঘনিষ্ঠতা খুব পাকাপাকি হইয়া দাঁড়িল। কিন্তু সেটা সকলের প্রীতিকর হইল না। সংসারে এক শ্রেণীর কতকগুলি ঙ্গাব আছে, যাহাবা নিজেবাও হাসিতে পাবে না আব পরের হাসিও সহ্য করিতে পাবে না, গোপন অন্ধকাবে, বার্থ ঈর্ষাকে ক্রমাগত কঠিন বিদ্বেষে শানাইয়া বড়ই তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল কবা যায়, কিন্তু সেটা যে কেবল পবের চর্মই ভেদ করিবে—এমন কথা নিঃসংশয়ে কেহ বলিতে পাবে না। বরং সেটা বিপবীত মুখে প্রক্ষিপ্ত হইয়া অনেক সময় একে আব হইয়া দাঁডায়, এবং যদ্বণাব ঝালটা বাড়িতে থাকে সেই লক্ষ্যচ্যুত পরের উপব।

দুই গ্রহেব অনুকম্পায় বঙ্গনেব সেইকপ কতকগুলি সূত্র হুটিল। পাণ্ডাব ছাঁড়াবাববা তাহাব উপব মর্মান্তিক চটিয়া গেল। বার্তাবিক এত উচ্ছ্বলিত কি সহ্য করিতে পারা যায়? কোথাকাব কে? সম্পূর্ণ অপবিচিত, অনাভূত, অন্য পাণ্ডাব এক লক্ষ্মীছাড়া ছাঁড়ার— সে লোকটা সহসা অতর্কিতে উড়িয়া আসিয়া ভুড়িয়া বসিয়া তাহাদের একান্ত ইজাবা করা যাত্রী পরিবাবকে ছোঁ মাঁরিয়া যে অসদ্বোধে নিজেব খাস দখলের অন্তর্ভূত কবিব? নতুন—ইহা কখনই কোন সহিষ্ণু ব্যক্তি ক্ষমা করিতে পাবে না। আব বঙ্গনেব উপবই বা ইহা? এমন টান কেন বে বাপু! ছোঁড়া যাদু জানে না কি?

বার্তাবিকই, সবল হাস্যমণ্ডিত মুখে এই প্রিয়দর্শন যুবাটি যাহাব কাছে গিয়া দাঁড়াইত তাহাবই প্রাণে একটা স্নিগ্ধ মাধুরী ফুটাইয়া তুলিত, বমণীবা ছলছল নয়নে তাহাব মুখপানে চাহিয়া ভাবিতেন, আহা, ছেলটি কি মায়াবা। পুষ্যেরা ভাবিত আবামেব সঙ্গী বটে। দাবিদেব প্রতি চিব-তাঁচ্ছল্যশানী ত্বর দান্তিক অন্তঃকরণও এই আয়ুসম্মনে উদাসী সুকোমলকাণ্ড যুবাটির নম্র সবলতায় অকপট স্নিগ্ধতায় চমৎকৃত হইত। রঞ্জন কাহারো খাতিব রাখিত না, নিজেও খাতিবেব জন্য লালায়িত ছিল না, কিন্তু সকলের উপবই তাহাব অগাধ অপবিসীম ভালবাসা। বঙ্গনের একটা মহৎ গুণ ছিল, সে সকলের সঙ্গেই অবাধে মানাইয়া চলিত, কখনো কোথাও দ্বিধাপীড়িত হইয়া কেহ তাহাকে ইতস্ততঃ কবিতো দেখে নাই। সকল হৃদয়ের সঙ্গেই সে সমান ভাবেই হৃদয়ে মিশাইতে অভ্যস্ত ছিল, কিন্তু কোথাও এতটুকু অসংযম বর্ববতাব চিহ্ন ছিল না। নিজেদেব ক্রটি যাহারা সংশোধন করিতে জানে না এবং পবের নৈপুণ্য সহ্য করাও যাহাদের ক্ষমতাব অতীত, তাহাদের মত গোেকের চক্ষুশূল ছিল বঙ্গন। কিন্তু উন্মুক্ত উদার প্রাণ বঙ্গনের তাহাতে কিছু আসিয়া যাইত না। সে প্রতিদ্বন্দ্বী আক্রোশেব আক্রমণ কৌতুকের হাসিতে নিষ্ফল করিয়া শত্রুকে অমাযিক বাবহারে অভিভূত করিয়া ফেলিত। তাহাকে যে অপদস্থ কবিতো আসিত— সেই অপস্তুত হইয়া ফিবিত।

অবসরে অবসরে রঞ্জন মেসোমশায়ের অন্তরঙ্গ সহচর হইয়া উঠিল। শ্রীমন্দিরে বিগ্রহ দর্শনের সময় তাঁহাদের নিজ পাণ্ডার ছড়িদার থাকা সত্ত্বেও তিনি রঞ্জনকে টানিয়া আনিতেন। সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে হইবে, তাও রঞ্জন সঙ্গী, রাত্রে বাসায় বসিয়া গল্প-গুজব করিতেন, তাহাতেও প্রায় রঞ্জনই রঙ্গদার থাকিবে। দূরে দেবদর্শনে যাইতে হইবে, সেও রঞ্জনের সঙ্গে থাকিলেই ভালো হয়। না হইলে মেসোমশায়ের একান্ত অস্বস্তি বোধ হয়। সকল বিষয়েই রঞ্জন হইয়াছিল তাঁহার প্রধান নির্ভর।

নিজের প্রভুর কাজ বাজাইয়া এতটুকু অবসর পাইলেই রঞ্জন আসিয়া তাঁহার কাছে জুটিত, তাঁহাদের সহিত ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহাদের সব দেখাইয়া ওনাইয়া কে জানে কেন— রঞ্জন এক অনির্বচনীয় পরিতৃপ্তি পাইত। বিশেষ ছবি, —আহা ছবিটি বেশ মেয়ে, ছবিব কমলীয় ছবিখানি দেখিবার জন্য তাহার প্রাণে সযত্নে লুক্কায়িত একটা অপরিমিত আগ্রহ সঞ্চিত ছিল। তাহার প্রাবল্যে রঞ্জন একটু বেশ বীতিমতই বিব্রত হইয়াছিল। ছবির নিকট হইতে সে ইদানিং সতর্কতাব সহিত তফাতে থাকিতে চাহিত, প্রাণপণে আত্মদমন করিয়া সকলের নিকট চিরপরিচিত আত্মীয়ের মত স্বভাবসিদ্ধ সহজ সুরে দিবা কথাবার্তা বহিত, কিন্তু এতটুকু ছোট মেয়ে— সে সকলের নিত্যন্ত অগ্রাহ্য বস্তু— তাহার কাছে রঞ্জনের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া হঠাৎ সব গোলমাল হইয়া যাইত। হাসিভরা মুখের সুখভবা বাকাওনা অকস্মাৎ নির্মম সঙ্কোচে পরস্পর আত্মঘাতী হইয়া মরিত। সকলের মুখপানে সে অসঙ্কোচে চাহিত, কিন্তু যদি দৈবাৎ অতর্কিতে ছবিব সহিত চোখাচোখি হইত তবে সে আকুল উৎকণ্ঠায় ব্রহ্ম চোখ নামাইয়া, কোনমতে সেখান হইতে সরিয়া যাইতে পারিলে তবে হাঁফ ছাড়িয়া সুস্থ হইত, কিন্তু কে জানে কি একটা তীব্র আকর্ষণ তাহাকে ক্রমাগতই সেই দিকেই টানিত।

পনের বছর বয়স হইতে সে যাত্রী চবাইতেছে কিন্তু কই তাহার তো কাহারও কাছে এক মুহূর্তের জন্য সঙ্কোচ হয় নাই। এখন তবে একি হইতেছে? এতটুকু একজনকে কাছে এত কিসের...। নিজের গতিক বুঝিয়া সে নিজেই ধাঁধায় পড়িয়া গেল। একি হইল।

॥ তিন ॥

বিকালে, বাসার বাবান্দায় পৈঠার উপর বসিয়া ছুঁরি দিবা মেসোমশাই কাঁচা আম ছাড়াইতেছেন ও অদূরবর্তী রোয়াকে উপবিষ্টা, হরিনামের নুনি হস্তে ছবিব জননীর সহিত ছবির বিবাহ সম্বন্ধে কথাবার্তা করিতেছেন। খিড়কির পশ্চাত্তাগে পোড়ো তাম্রায় ছেলেরা সকলে খেলা করিতেছিল সেখান হইতে তাহাদের উচ্চ কলরব বেশ স্পষ্ট শোনা যাইতেছিল। অনা দ্বীলোকেরা তখন রান্নাঘরে ছিলেন।

সদর দ্যুর পার হইয়া প্রাঙ্গণে রঞ্জন মিশ্র দেখা দিল। মুহূর্তে মেসোমশায়ের মুখে কথ্য ঠোঁটের মধ্যে খামিয়া গেল, হাস্যোজ্জ্বল মুখে বলিলেন, “এস এস রঞ্জন, এস, কাল তোমায় দেখতে পাইনি কেন ঠাকুর?”

“বড় কাজের ভিড় পড়েছে বাবু। ওকি করছেন? আম ৬ দিন আমায়, আমি ছাড়াছি”— মেসোমশায়ের হাত হইতে ছুরি লইয়া বঞ্জন তৎক্ষণাৎ আম ছাড়াইতে বসিয়া পড়িল। সম্মুখে দৃষ্টিতে তাহার পানে তাকাইয়া মেসোমশাই আবার ছবির বিবাহের প্রশংসা লইয়া পড়িলেন।

রঞ্জনের শ্রবণেন্দ্রিয়ের উপর শরীরের সমস্ত তড়িৎ আসিয়া কাজ করিতে লাগিল, প্রাণপণে উত্তেজনা চাপিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত সে ছুরি চালাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বঞ্জন সব আমগুলি পরিষ্কাররূপে ছাড়াইয়া ফেলিল, “দেখুন গো বাবু, হয়েছে?”

“বেশ হয়েছে! আচ্ছা রঞ্জন, তুমি এত বাংলা শিখলে কোথা? কখনো বাংলা দেশে গিছলে?”

“না বাবু, এইখানেই যাত্রীদের সঙ্গে মিশে শিখেছি।”

“বাঃ! বাহাদুর ছেলে তুমি, খাসা বুদ্ধিমান।” বঞ্জন উপহৃত কৌতুকে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বালকের মত অস্কেচ আনন্দ-সুন্দর দৃষ্টিতে মেসোমশায়ের পানে তাবাইয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, “আপনারা আমায় বড় ভালোবাসেন, না?”

তাহার সুকুমার সবেল প্রশ্নে ছবির জননীর মনে গভীর নমতার উৎস উথলিয়া উঠিল, তাঁবনের সহস্র শোক বেদনায় সমুদ্র রমণীর চক্ষু হইতে বাৎসল্য স্নেহের তপ্ত অশ্রু অসিয়া পড়িতেই তাড়াতাড়ি আঁচলে চক্ষু মুছিয়া আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, “নাবায়েণ, নারায়ণ, হরিবোল।” মেসোমশাই সঙ্গেহে রঞ্জনেব পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বহুসম্মিতহাস্যে বলিলেন, “ঠিক হয়েছে দিদি, আপনি ছবিব বের জন্যে ভাবছেন কেন? এক ব্যক্তি বসন রূপবদ্বয় সামনে। দুটো ফুল ফেলে ছবিব- এই ছেলেরি হাতে উচুগ্য করে দিন। ভাবনা চিন্তে সব চুকুক, আর রঞ্জনাটিও আমাদের আপনাব লোক হয়ে থাক।”

বঞ্জেব কপালেনব শিবা নাথাইয়া ফুলিয়া উঠিল। আঘাতের ধাক্কাটা অবিচলিত ভাবে গোপন করিতে তাড়াতাড়ি অঞ্জলি পুরিয়া আম লইয়া বঞ্জন বাম্মাখের দিকে চলিয়া গেল। সতল নয়নে চাহিয়া চাহিয়া ছবিব জননী ভাবিলেন, “আহা! এমন আত্মীয় লমাই হওয়া ভাগ্যের কথা!”

রঞ্জন ফিবিয়া আসিয়া বসিল, অন্যপ্রসঙ্গের কথাবার্তা চলিতে লাগিল। কিন্তু রঞ্জন সে সকল কথা আর শুনিতে পাইল না। তাহার উদ্যত আনন্দফুল্ল শ্রবণশক্তি— সহসা কালান্তকের শব্দবদ্ধ মূর্মুর্যব মত প্রাণের মাঝে লুকাইয়া পড়িল। হায়, অন্তর্ভক্ষণে সেই তুচ্ছ বাস উচ্চারিত হইয়াছিল— বঞ্জেব অন্তরে সেটা সাংঘাতিক ব্যক্তিয়াছে, থাকিয়া থাকিয়া রঞ্জন কেবলই অধীর হইয়া উঠিতেছিল। কঠিন পৌরুষের তীব্র ক্রকটী ভঙ্গিমায যতই সেই মোহময় উদ্বেগটাকে সজোরে ধাক্কা মারিয়া তাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ব্যাপাবটা ততই দৃঢ় হইয়া তাহার অন্তরে প্রতিঘাত করিতে লাগিল। কি বিপদ— রঞ্জন আকুল হইয়া উঠিল। কথাটা ব্রহ্মণঃ তাহাব সমস্ত মনটা জুড়িয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিল। কোন রকমে শিষ্টাচার বজায় রাখিয়া বিদায় লইয়া রঞ্জন খিড়কিব দ্যূর দিয়া বাহির হইল। সুবিধা হইত বলিয়া সে এই পথ দিয়াই প্রায় বাটা যাইত।

খিড়কির বাহিবে, খোলা ভূমিতে বালিব গুণ্ডী কাটিয়া মহা উৎসাহ আত্মশালনে ছোকবা সব খেলায় মাতিয়াছে। কেবল ছবি একাকী, ওদিকের বাস্তব ধাবে বেড়ার কাছে দাঁড়াইয়া একজন উড়িয়া স্ত্রীলোকেব সহিত কথা কহিতেছিল। ছবি বড় হইয়াছে, সে কি আব খেলিতে পাবে?— ছিঃ তাহার কাজ এখন সকলকে আটকাইয়া খেলা করান।

রঞ্জনের পা আর সরিল না, চিত্রাঙ্গিতের দ্যূর অবলম্বনে দাঁড়াইয়া আত্মবিস্মৃত বঞ্জন গভীর বিহ্বলপ্রায় ছবির পানে চাহিয়া রহিল— আহা কি চমৎকার ছবিটি! রঞ্জনেব মস্তিষ্কে ঘনীভূত উত্তেজনা ভ্রমট বাধিয়া উঠিল।

ছবি স্ত্রীলোকটিকে আত্ম-পরিচয় দিতেছে, “আমার সবাই আছে, কেবল বাবা নাই।”

কথাটা বঞ্জেব মর্মভেদ করিয়া ধ্যানস্থ হৃদয়ের সমবেদনার তারে সূক্ষ্ম আঘাতে গভীর ক্লগার আকুল ঝঙ্কনা বাজাইয়া তুলিল। আহা, তাহারও যে পিতা নাই।

সহসা তাহাব স্বপ্নপূর্ণ চিত্র আলোড়িত করিয়া তীব্র স্থানির ধিকারে ক্ষণনধো তাহার সহানুভূতিপূর্ণ সূত্রেব আবেশে রচিত চিত্তগ্রস্থি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ক্ষুদ্রতাক্ষিণ প্রাণ নিদ্রার যন্ত্রণায় হাহাকার করিয়া উঠিল, হায় হায়, সে করিতেছে কি?— করিতেছে কি?

ভগবান জগন্নাথদেব, তোমার আশ্রিত অনুগত সেবকের অন্তরে এক প্রলয়ঙ্কর প্রলোভনময় আকাঙ্ক্ষার দাবানল প্রজ্বলিত করিলে ঠাকুর! — রক্ষা কর, রক্ষা কর প্রভু!

মাতালের মত চলিতে চলিতে রঞ্জন পথে নামিয়া পড়িল।

॥ চার ॥

পরদিন শ্রীমন্দিরে মেসোমশায়েব সহিত রঞ্জনের দেখা হইল। সকলকে লইয়া তিনি দেবতা দর্শনে আসিয়াছেন। রঞ্জনকে ডাকিয়া বলিলেন, “ঠাকুব, আজ একবার ভাল করে দর্শন করিয়ে দাও, আজই তো শেষ, আর ত হবে না।”

“হবে না? কেন বাবু?”

“কাল যে আমরা দেশে ফিবব ঠাকুর।”

নিমেষ মধ্যে কে যেন বপ্তনের হৃদপিণ্ডেব শিবাওলি তপ্ত সাঁড়াশীতে সজোবে চিনটাইয়া ধবিল, কাল! কাল! এত শীঘ্র। পাড়িত মর্ম ভেদ করিয়া বুকের মাঝখানে, বাব বাব আত্মপ্রণা ধ্বনিত হইতে লাগিল— কাল, কালই, এত শীঘ্র। হাস দুর্ভাগ্য।

কোমরে কসিয়া চাদব বাধিয়া, সজোরে নিশ্বাস ছাড়িয়া বপ্তন মনে মনে ভাবিল, “আমারই অনায়া।”

“আবাব কবে আসিবেন বাবু।”

“আবার!” বহুসময় হসিয়া মেসোমশাই বলিলেন, “জগন্নাথ আবাব যখন ঘুরি ধবে টানবেন তখন আসব, কি বলেন দিদি?”

নিশ্বাস ফেলিয়া ছবিব জননী মন্দিব পানে চাহিয়া বলিলেন, “আহা, তা আব নয়। জগদ্বন্ধু আবাব যখন মনে কববেন, তখন আসব।” জ্ঞানমুখে ক্রিষ্টহাসি হাসিয়া বপ্তন বলিল, “ওঁনি সবাইকে মনে করেন মা, কিন্তু তাঁকে তো সবাইকাব মনে পড়ে না।”

মেসোমশাই গম্ভীর মুখে বলিলেন, “ঠিক।”

“তা হলে সবাইকে নিয়ে রথের সময়ে আসবেন বাবু।” কথাটা বলিয়াই দুঃসহ কণ্ঠা রঞ্জনের কণ্ঠ যেন চাপিয়া ধবিল, রঞ্জন তাড়াতাড়ি সকলকে লইয়া অগ্রসব হইল। চলিতে চলিতে মেসোমশাই বলিলেন, “বপ্তন, হুমি আজ বিকেলে আমাদের বাসায যাবে?”

“না বাবু, পাণ্ডাব জরুরী কাজ আছে।”

“তাইত, তোমাব সঙ্গে যে তাহলে আব দেখা হবে না, আমরা কাল সকালের ট্রেনেই রওনা হবে।”

বাস্তাবে ছবিব জননী বলিলেন, “তা হলে এইখানেই—”

“হ্যাঁ, তাই হবে।”

সকলে মন্দিবে ঢুকিলেন। নির্দিষ্ট সময়ে বিগ্রহকে প্রণাম করিয়া সকলে মন্দির প্রাঙ্গণে আবাব সমবেত হইলেন। অকস্মাৎ-দৃষ্ট একটি পরিচিত লোকের সহিত মেসোমশাই একটু তফাতে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছেন দেখিয়া রঞ্জনও অন্যাদিকে সরিয়া গেল, কয়েক ছড়া কপূরের মালা হাতে লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে অনামনস্বভাবে অন্যাদিকে মুখ ফিরাইয়া সে ভাবিতেছিল। মর্মান্তিক কাতরতায় তাহার সাবা অস্ত্রকরণটা আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল। হায, কাল হইতে সে আর ইহাদিগকে দেখিতে পাইবে না!

খানিক পবে মেসোমশাই ফিরিলেন। রঞ্জন আসিয়া মেসোমশায়েব গলাফ একছড়া মালা পবাইয়া ছেলেনদের গলাফ এক একছড়া মালা দিল। রমণীদের সকলের হাতে হাতে এক এক ছড়া মালা বিলিইয়া— অবশিষ্ট মালা ছড়াটা হাতে করিয়া মার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, “মা, এ মালাটি আপনাব ছবিকে দিন।”

মমতাভরা মুখে চাহিয়া একটু হাসিয়া মা বলিলেন, “তুমিই দাও না ঠাকুর।”

ঠাকুর চকিত নেত্রে একবার ছবির পানে তাকাইল। তাহার পর মুহূর্তের জন্য একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, “না মা, আপনি দিন।”

ক্রমাল হইতে গুটিকয়েক টাকা খুলিয়া ছবির হাতে দিয়া মেসোমশাই বলিলেন, “ছবি, ঠাকুরকে প্রণাম কর মা।” ঠাকুরের চোখের সামনে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া উঠিল।

মাটিতে টাকা রাখিয়া ছবি প্রণাম করিল। কম্পিত হস্তে টাকা তুলিয়া মার হাতে দিয়া ঠাকুর বলিল, “আমি আপনার ছবিকে আশীর্বাদ করলুম মা।” চিরপ্রচলিত প্রথার অপব্যবহার।

“ওকি ঠাকুর, টাকা নাও, ছবির ওতে অকল্যাণ হবে, তুমি আমাদের কত উপকার করেছ,—”

গভীর দুঃখ ভরা হাসি হাসিয়া বঞ্জন বলিল, “টাকা নিয়ে উপকার বিক্রী করি না মা, এ টাকা আপনার পাণ্ডার ছড়িদারদের পাওয়া।”—চট্ করিয়া রঞ্জন ভিড়ের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। লোকটার আত্মভ্রাণে হাড়ে হাড়ে চটিয়া বিদ্রোহ বিস্ফারিত নয়নে পাণ্ডার চেলারা চাহিয়া রহিল।

॥ পাঁচ ॥

পরদিন মেসোমশাইরা দেশে ফিরিয়া গেলেন। মনে একান্ত আগ্রহ থাকিলেও কর্তব্যপরায়ণ বঞ্জন বিদায়ের শেষ মুহূর্তে, তাঁহাদের কাছে উপস্থিত থাকিতে পারিল না। পরাধীন জীবনের ক্লান্তিশূন্য কর্মস্রোতের প্রবল তোড়ে দুর্দম্য আকাঙ্ক্ষাকে নিঃশব্দে তৃণের মত ভাসাইয়া দিয়া কোলাহলেব মধ্যে ডুবিয়া প্রাণের মহা শূন্যতাকে কোন রকমে পূর্ণ করিতে চাহিল, পারিল কিনা কে জানে।

দিনের পর দিন কাটিয়া চলিল, রঞ্জন মেসোমশায়ের পাণ্ডার কাছে সন্ধান লইতে লাগিল, তাঁহারা আসিবেন কি না, পত্রাদি কিছু আসিয়াছে কি?

কিছুই না!— হতাশার নিদারুণ নিষ্পেষণে রঞ্জনের আবেগ ক্রমশঃ বাড়িয়াই উঠিতে লাগিল। হায়, মেসোমশায়েব আসার গুরুত্ব কি তাহার মনের আকুলতার চেয়ে বেশী? কখনই না। ক্রমে রথের সময় কাছাকাছি হইতে লাগিল। পাণ্ডার কাছারিতে রঞ্জনেব যাওয়া-আসাটা ঘন ঘন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু বিফল প্রয়াস। পাণ্ডা কোন খবরই জানে না। অবশেষে সকল সন্ধ্যাচ দুবে তেলিয়া রঞ্জন নিজে পত্র লিখিতে বসিল। পত্র লিখিল। তাহার পর একবার তাহা পাঠ করিল, হঠাৎ কি ভাবিয়া তাহার কান দুইটি লাল হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ পত্রখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিড়িয়া সমুদ্রের জলে ভাসাইয়া দিল। ছিঃ! তাহাব ছেলেমানুষী দেখিয়া তাঁহারা কি মনে করিবেন?

তবু রঞ্জন নিজেকে আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। রথের দিন যত নিকটবর্তী হইতে লাগিল, তাঁহার অধীরতাও তত বাড়িতে লাগিল; জীবন্ত আশা বৃকে করিয়া সে প্রতাহ স্টেশনে আসিয়া ব্যগ্র উৎকণ্ঠায় চতুর্দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিত, বিদেশ হইতে শত শত যাত্রী আসিতেছে, যাইতেছে, কিন্তু কই, যাহাদের খুঁজিতেছে তাহারা কই?

সুদক্ষ কর্মচারী,— কাজে অমনোযোগী হওয়ায় প্রভু দুই চারিদিন মিঠে কড়া বচনে তাকে সাবধান হইতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু উদ্বিগ্ন রঞ্জনের কাণে সে কথা স্থান পাইল না। রথের দিন আসিয়া পড়িল। জগন্নাথ রথে উঠিলেন, নাবিলেন, শুইলেন, পাশ ফিরিলেন— অবশেষে উঠিয়া বসিলেন পর্যন্ত তথাপি মেসোমশায়ের দেখা নাই। পূজার ছুটি আসিল, ফুরাইল, তথাপি কাহারো খোঁজ নাই।

হায়! পৃথিবীতে কেহ কাহারো অন্তর্ভেদী যাতনা বোঝে না! রঞ্জন গনিয়া গনিয়া প্রতি মুহূর্ত যাপন করিতেছিল। অবশেষে পূজার ছুটির পর যখন দাসত্বজীবী, ধনগর্বী হওয়া-খাইয়েরা দলে দলে পুরী ছাড়িতে লাগিল, তখন রঞ্জন আর ভারাক্রান্ত মনটাকে লইয়া কোনমতে পুরীতে তিষ্ঠাইতে পারিল না। সে যখন কোন দিকে কিছু প্রতিকার খুঁজিয়া পাইল না তখন একদিন পাণ্ডুর কাজে জন্মের মত জবাব দিয়া হঠাৎ স্টেশনে আসিয়া বঙ্গদেশের টিকিট কিনিয়া ট্রেনে চাপিয়া বসিল।

॥ ছয় ॥

গত রাত্রে ছবির বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আজ বরকন্যা বিদায়। মধুর প্রভাতী সূরের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই, সানাইয়ের সেই সুরে, বিদায়ের করুণ রাগিনী বাজিতেছে,— সুর বায়ুর স্তরে স্তরে ঘনায়মান হইয়া উর্ধ্ব হইতে উর্ধ্বে পুঞ্জীকৃত বেদনায় ঠেলিয়া উঠিতেছে।

একটা লোক অত্যন্ত ব্যস্তভাবে বাগ্র ঔৎসুক্যের সহিত বিবাহ-বাড়ীর চারিদিকে ফ্রমাগত দ্রুতবেগে ঘুরিতেছে, তাহার মুখ উজ্জ্বল। আনন্দ ও হ্রাকুল আতঙ্ক — যেন আসন্ন ভীষণতায় গাঢ়ভাবে ঘনাইয়া আসিয়াছে, লোকটার ভাব দেখিয়া বোধ হয় সে যেন বাড়ীর ভিতরকার সমারোহের তত্ত্বনির্ণয়ে উদগ্রীব। কিন্তু না— তাহাও তো হইতে পারে না, উৎসবের কারণ জ্ঞাত হওয়া তো কিছুই দুরূহ ব্যাপার নয়, দলে দলে লোক বাড়ী ঢুকিতেছে, বাহির হইতেছে,— চারিদিকে ঘুরিতেছে।— কতবার কত লোকের সহিত তাহার মাথায় ঠোকাঠুকি হইয়া যাইতেছে, তথাপি কই, সে তো কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছে না, — বরং বন্দকের গুলির মুখ হইতে যেমন শিকার ব্রশ্তে পলায়ন করে, সেও সেইরূপ কুণ্ঠিত ভাবে সরিয়া যাইতেছে। লোকটার রকম কি?

কিছুক্ষণ পরে, বাড়ীর কোলাহলের ঘনঘটা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। শীগ্রি নাও, শীগ্রি নাও, ট্রেনের আর সময় নেই— চারিদিকে এমনি একটা কলরব দ্বিগুণ মুখরতায় উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। সকলের ব্যস্ততার মাত্রা চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল।

প্রাণপণে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া, এইবার অন্তিম সাহসে ভর করিয়া, লোকটা বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। উৎসবের বাড়ীতে কে কাহার পানে চাহিতেছে? লোকটা অবাধে গিয়া বাড়ীর ভিতর উপস্থিত হইল।

প্রাঙ্গণে আলিপনা-আঁকা পাড়ির ওপর বর ও বধূকে দাঁড় কবাইয়া পৌরাঙ্গনারা তখন মাঙ্গলিক ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতেছিল। চারিদিকে শাঁখ ও উলুধ্বনির উচ্চ শব্দ।— লোকটা গিয়া একেবারে আসন্ন আগ্রহে ঝুকিয়া পড়িল। অকস্মাৎ বজ্রাগ্নি-সম্পাতে তাহার চক্ষু যেন ঝলসিয়া গেল! প্রচণ্ড উন্মত্ত হৃদপিণ্ডটাকে সবলে দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া সময়ে শব্দ লুকাইয়া— সূর্যের উজ্জ্বল আলোকের মাঝে সন্তর্পণে আপনাকে গোপন করিয়া নিঃশব্দে সে বাহিরে আসিল। কোলাহলময় জগৎ সহসা বিরাট নিস্তব্ধতায় ডুবিয়া গেল। চারিদিক মৃত্যুমলিন পাংশুবর্ণে রঞ্জিত হইয়া গেল, কোন দিকে একটা ক্ষীণ শব্দ অবশি আর তাহার কানে শুনা গেল না— শুনিতে সাহসও হইল না। একটা নিঃশ্বাসের শব্দ—না না, পবন অচল হোক, রুদ্ধ বায়ুতে সমস্ত জগৎ ধ্বংস হইয়া যাক— সে বরং সহ্য হইবে, তবু এ সুসজ্জিত উৎসব-ক্ষেত্রে মর্মভেদী বার্থতার ঈষৎস্ফুরণ।— না না, সে কিছুতেই হইবে না। কিছুতেই না। যুগ-প্রলয়ের মহাঝটিকা ভয়াবহ কঠিনতার গহুরে ধীরে ধীরে সুস্থিলাভ করিল, কেহ দেখিল না, কেহ জানিল না, কেহ ফিরিয়া তাকাইল না।— ভগবান জগবন্ধু দেব!

এখনো কামনা, এখনো একটি ভিক্ষা ঠাকুর, এক মুহূর্তের জন্য এতটুকু শক্তি ভিক্ষা দাও ঠাকুর— ওগো দয়াময়, এতটুকু বল, এতটুকু শুধু বল দাও।

সুউচ্চ হর্ষনিদারদের মধ্যে একটুখানি ক্রন্দনের অভিনয় সমাপ্ত হইলে প্রকাণ্ড অশ্বযুক্ত ঝকঝকে চক্চকে ফিটনে বহুমূলা বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত বরবধু সমারূঢ় হইল। গুরুগম্ভীর গর্বে মাটির অভ্যস্তুরে কম্পন-হিম্মোল তুলিয়া ফিটন ছুটিল। অগ্রপশ্চাতে আরো কয়েক খানা গাড়ীতে বরযাত্রীর দল চলিয়াছে।

গাড়ী অনেক দূর আসিয়াছে। হঠাৎ বেগগামী গাড়ীর হাতল ধরিয়া ছুটিতে ছুটিতে একটা লোক সেই চলন্ত গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল! লোকটার চক্ষু নিম্পলক, মুখে দৃঢ় কঠোরতা, হস্তপদে মৃত্যুর শীতলতা, শরীরে শোণিত-শূন্যতা স্পষ্ট প্রতীয়মান। সে কোন দিকে না চাহিয়া, বরেব গলায় একছড়া কর্পূরের মালা পরাইয়া দিয়া অচঞ্চল কণ্ঠে বলিল, “ভগবান্থ দেবের সেবাইত ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ, আপনার জীবন সফলতায় চিব-গৌরবময় হোক।” বর নতমস্তকে নমস্কার করিল।

তারপর আরও কঠিন হইয়া, আরো অসঙ্কোচে— অবগুষ্ঠিতা বধুর হাতখানি তুলিয়া ধরিয়া আর একগাছি কর্পূরের মালা জড়াইয়া দিতে দিতে ধীরে ধীরে, পরিষ্কার স্বরে বলিল, “এই ক্ষণধ্বংসী কর্পূরের মত — তোমাদের জীবনের সমস্ত মালিন্য লুপ্ত হয়ে যাক্, ভগবান ভগবান্থ দেবের নামে আশীর্বাদ করি, তোমরা শান্তিময় সুখে সুখী হও।”

বস্ত্রার ললাটে গভীর স্নিগ্ধতার সহিত মহিমাময় বিজয়ত্রীর দীপ্ত জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। মোহেব দাসত্বের মুক্তি লাভে, আত্মজয়ের পূর্ণ সন্তোষে, মহাপূর্ণতায় প্রাণ পূর্ণ হইয়া গেল। প্রসন্ন সার্থকতায় সারা জগৎ ভরিয়া উঠিল। অপার্থিব শান্তির কিরণে সহসা চরাচর পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সে কি তৃপ্তি! কি আনন্দ! কি সুমহান জয়োল্লাস!

কণ্ঠস্বরে চমকিয়া বিশ্বয়-ব্যাকুলা ছবি অশ্রুসিক্ত অবনত দৃষ্টি তুলিয়া যখন কুণ্ঠিতভাবে বস্ত্রার পানে তাকাইল, তখন সে গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছে। ছবি চিনিতে পারিল না, শুধু উদ্দেশে নমস্কার করিল। গাড়ী ছুটিয়া চলিল।

## নিমন্ত্রণ-রক্ষা

### ধৃজটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

এক

সুরেশ ও নরেশ বাল্যবন্ধু। অবস্থার বৈষম্য-সত্ত্বেও তাদের বন্ধুত্ব অটুট ছিল। নরেশ বড়লোকের ছেলে,— কোনো বিষয়েই তার আগ্রহাতিশয্য দেখা যেত না। দৈনন্দিনতার শাস্ত ধারাই ছিল তার সাবা জীবনের ইতিহাস। কিছুতেই তার মছর ভাবের বৈলক্ষণ্য হত না। তার পিতামহ যে রকম ভাবে টাকা জমিয়ে গিয়েছিলেন সেইভাবেই নরেশ তার ইচ্ছাশক্তির অপচয় হতে দিত না। সুরেশ এই সম্বন্ধ-বৃত্তিকে কার্পণ্য বলত। সুরেশের কাছে নরেশ আত্মার উপর দেহের প্রভূত প্রভাবের নিদর্শন মাত্র। নরেশের বইয়ের নেশা ছিল না, কিন্তু বই কিনে সুরেশকে পড়তে দিত — সুরেশ নির্লজ্জভাবে সেগুলো পড়ে শেষ করত।

আর সুরেশ নেশা না হলে থাকতেই পারত না। ছেলেবেলায় নস্য— তারপর সিগারেট, চা—তারপর বই এবং পরে বউ। বাইরে থেকে দেখলে প্রত্যেকটির উপরই তার প্রগাঢ় ভক্তি—কিন্তু বাস্তবিক তা নয়— সে জামাইষষ্ঠীর টাকা নিয়ে বই কিনত। বিবাহের কিছু দিন পরেই একরাতে তার স্ত্রী, সুরেশ পড়ছে এমন সময়, বই কেড়ে নিয়ে আলো নির্ভয়ে দেয়। তখন দেশলাই জ্বেলে সুরেশ একটু গম্ভীর হয়ে বলে, “কি করব বল— ওটা বিদ্যাসাগরের দোষ— কেন উ-কারের আগে ই-কার এল?”

সুরেশ সর্বশেষে পঠিত শক্তিশালী লেখকের কথার উদগাব করত —এই কথা বলে নরেশ তাকে কত ঠাট্টাই করেছে, কিন্তু নরেশ জানত মনে-মনে যে সে মোহ ক্ষণস্থায়ী। দু-এক মাস পরেই সুরেশের গুপ্ত সত্ত্বা খাড়া হয়ে উঠত, তখন তার মত কঠিন হ’তে কঠিনতর হত, অবশ্য নবশক্তি-আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত। কিন্তু প্রত্যেক বন্যা যেমন পলি রেখে যেত সেটা ধীরে ধীরে এক যে অতি উর্বর ক্ষেত্রে পরিণত হচ্ছিল, সে খবর সুরেশ জানত না— কিন্তু নরেশ জানত। লোকে তাকে Inconsistent বললে সে চোঁচিয়ে বলতো— ‘তোদের এমার্সনই বলেছে, ‘Inconsistency is the hobgoblin of little munda’ সত্যি তার কথা এবং কাজের ভিতর এমন একটি আন্তরিক সঙ্গতি ছিল, যেটি বন্ধুর চোখ ব্যতীত আব সকলের চোখ এড়িয়ে যেত। একজন নন কো-অপারেটর তাকে ‘পশ্চিম সভ্যতার কুফল’ বলাতে নরেশ ধীরে ধীরে জবাব দিয়েছিল, “সুরেশ নিজের দামে জিনিষ কেনে, পরের দামে নয়।”

সুরেশ অনর্গল কথা কয়— নরেশ শোনে, আর মাঝে মাঝে সে যে জেগে আছে, এই সত্যের প্রমাণ দেয় ‘হঁ’, ‘হাঁ’ করে, সুরেশ কথা কইতে কইতে ভাবে—সে ভাবায় না আছে শ্রী, না আছে সৌষ্ঠব— তার ক্ষুরধার বুদ্ধি শুধু বিশ্লেষণ করতেই জানত — পরের বোকামির



পায়ে শান দিতেই জানত—খুব কম সময়ই সেটা খাপে পোরা থাকত। গোলদিঘির ধারে বসলে তার মাথা খুলে যেত—সন্ধ্যাবেলায় তার কথায় ফোয়ারা ছুটত— বিশ্বের যাবতীয় ঘটনা এবং ভাবে যার অধিকার সে কিন্তু সব কথা শেষ করত নিজেকে বিশ্লেষণ করে। নরেশ তাকে Egoist বললে সে উত্তর করত— “Hamletism বল। হ্যামলেটের অসামঞ্জস্যই হচ্ছে উন্নতির মূল কারণ। রুশিয়ার প্রত্যেক নায়কই হচ্ছে Egoist Egoism-এব নিন্দা করো না, বেদান্ত তা হ'লে কোথায় দাঁড়ায়?”

॥ দুই ॥

তখন সুরেশ এফ্, এ পড়ে— তার ভগ্নীপতি থাকতেন আসামে। বড় দিনের ছুটিতে তেজপুর থেকে তার দিদি চিঠি লিখলেন যেতে— চিঠির সঙ্গে সঙ্গে একটা কুড়ি টাকার মনিঅর্ডার এল। কলকাতার ধোঁয়া তার বুকে হাঁপ ধরিয়ে দিত, নরেশও পুরী যাচ্ছে— সুরেশও বেরিয়ে পড়ল।

দুদিন পরে যখন সে তেজপুরে পৌঁছল, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আরদালী গাড়িতে লটবহর তুলে তাকে বাসায় নিয়ে গেল। রাত্রে খাবার সময় সুরেশ তার দিদিকে তাঁর মেয়ে বেশ সুন্দরী হয়েছে, এই খবরটি দিলে। দিদি বললেন, ‘ওকে আর সুন্দরী বলিস নে— কাল সকালে ওর চেয়েও সুন্দরী তোকে দেখাব। ওলো অলি, কাল মুখখীকে ডাকিস ত। সে আত্র সন্ধ্যাবেলায় আসেনি, লজ্জা হয়েছে বুঝি?’ মেয়ে বললে, “না মা— সে এসেছিল। তবে মামাবাবুকে দেখে বললেন— ওরে ঠিক দাদার মতন— আর পালিয়ে গেল।”

তেজপুরের শীত একটু ভিন্ন রকমের। বেলা আটটা পর্যন্ত সুবেশ লেপের ভিতব শুয়ে রইল। যখন ঘুম ভাঙ্গল, তখন মনে হল, জানলার ফুটো দিয়ে তার চোখের পাতায় আলো এসে পড়েছে— সব সোনারলি দেখাচ্ছে— খুব তীব্র চাঁপা ফুলের গন্ধ সব ঘবকে ভ্রাসিয়ে দিয়েছে। সে চোখ বুজে পড়ে বইল। অলি এসে তার গায়ে হাত দিয়ে বললে, “মামাবাবু ওঠো, দেখ, কে এসেছে।” চোখ খুলতে না খুলতে এক জোড়া মাটি ছাড়া পা দেখতে পেলো। অলি “ওঃ যাঃ পোডাবমুখী পালিয়ে গেল।”

“কে? মুখখী বুঝি?”

“হ্যাঁ, ভাবি লজ্জা— আমি আর আনতে পারি না” এই বলে অলি বিছানায় বসে মুখখীর জীবন-কাহিনী আবৃত্তি কবে যেতে লাগল। তার সম্পর্কে পিস্তুতো বোন হয়— ওরা সকলে সুন্দর— ওর আব এক বোন পূজার সময় এসেছিল, সেও খুব সুন্দর— তবে অত নয়। ওর পড়াশোনায় মতি নেই— শিবের মাথার চাঁপা ফুল নিজেব খোঁপায় গুঁজেছিল— মার সঙ্গে ঝগড়া করে— তার বাবার সঙ্গে বেশি ভাব অথচ যদি মা হৃদয়বাবুব গিন্নীর সঙ্গে গল্প করে, কি, তাদের বাড়ি বেড়াতে যায় তা হ'লে ভয়ানক চটে যায়— আর ওর বাবা কাছারি থেকে এলেই বলে দেয়— গিন্নী এলেই কুকুর ছেড়ে দেয় আর বলে, ছুঁয়ে ফেল, ছুঁয়ে দে গিন্নীকে— খুব ঘামাচি মাবতে পাবে— আঁচলের খুটে ঝিনুক নিয়ে বেড়ায়— কি শীত কি গ্রীষ্ম।”

খানিক পরে দিদি তাকে ধরে নিয়ে এলেন— যেন কত শান্ত মেয়েটা। পবনে পেঁয়াজ রংয়ের শাড়ি, ভুরু ও চোখের তারা উজ্জ্বল, যেন চীনে কালি দিয়ে আঁকা বা কালবৈশাখী

পর যখন আকাশ সন্ধ্যাবেলায় পরিষ্কার হয়ে যায়, তখন যেমন একটা হলুদে সোনালি আভা, কালো কনেকেও সুন্দরী করে তোলে— বাঙ্গালী মেয়েরা যাকে ঘরোয়া ভাষায় ‘কনে দেখা’ বলে— সেই রকমের রঙ মুখখীর। সুরেশ তার চেহারার সঙ্গে অলির বর্ণনা খাপ খাওয়াতে না পেরে হেসে ফেললে, “কই রে অলি, এত দুষ্টু নয়”— মুখখী হাত ছিনিয়ে পালিয়ে গেল।

সেই দিন থেকে মুখখীর দুষ্টমি শুরু হল। মুখখী বিকালে অলিকে বললে, “তুই পাজী, আমি ভাল— আর তোর মামা খুব পাজী। আর আমি যদি পাজী হই তা হলে দ্যাখ্ আমি কি রকম পাজী হতে পারি।” দুষ্টুমী হচ্ছে অন্তর্ধানবিদ্যার খেলা, জুতো লুকিয়ে রাখা, জানার বোতাম ছেঁড়া, স্টকিং-এব গার্ডার উড়িয়ে দেওয়া— এই সব থেকে আরম্ভ করে শেষকালে চায়ের পেয়ালায় কম চিনি দেওয়া আর লেপের ভিতর মিনি বেড়াল পুরে রাখা। সুবেশ নীরবে সহ্য করে একদিন প্রতিশোধ নেবে ঠিক করলে। যেই কলমের কালি জানলার তলায় ফুলগাছের ঝোপে পড়েচে, অমনি সুরেশ মুখখীর হাত দুটো চেপে ধরে অলিকে ডেকে বললে, “সেই শিশিটা নিয়ে আয়।” অলি শিশিটা নিয়ে এলে সুরেশ তাকে দুহাত দিয়ে জোরে মুখখীর হাতদুটো চেপে ধরতে বললে। তখন ছিপি খুলে একটা আরগুলার গুঁড় ধরে বার করে মুখখীর চোখের সামনে ধরলে— মুখখী তখন চোখ বুজে ঠক ঠক করে কাঁপছে— পালাবার চেষ্টা নেই— মুখ শুকিয়ে গেছে। সুরেশ তার মাথায় তেলাপোকাকে ছাড়তে গিয়ে দেখে যে, মুখখীর মুখ সাদা হয়ে গেছে। সুরেশ বললে, “আর কালি ফেলে দেবে? আচ্ছা, যাও— আব যদি দুষ্টুমি দেখি, তা হ’লে এই তেলাপোকা ছেড়ে দেবো।” এই ঘটনার বিবরণ দিতে দিতে সুরেশ নরেশকে একদিন বলেছিল, “লোকে যাকে cadaverous বলে সেটা ভুল— সত্যি cadaverous দেখতে খুব ভাল। তার ওপর যদি সে চোখ বুজে কাঁপে...!”

তারপর থেকে মুখখী খুব গম্ভীর হয়ে গেল— সুরেশের ছুটির মেয়াদও ফুরিয়ে এল। যেদিন কলকাতায় ফিরবে, সেদিন সকালে সে একটা পরিসা ওপরে ছুড়ে ফেলে দিলে— যদি রাণীর মুখ পড়ে, তা হ’লে মুখখীর সঙ্গে যাবার আগেই দেখা হবে! উলটো পড়ল— মন তার খারাপ হয়ে গেল। যাত্রা করবার পব বাস্তায় এসে দেখলে যে মুখখী তাদের ঝুমরোলতার গাছের তলায় গেটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সুরেশ সেদিকে আর না চেয়ে বরাবর স্টেশনে চলে এল।

তার তিন বছর পরে সুরেশ অলির বিয়েতে তেজপুরে যায়— বাসর ঘরে মুখখীকে দেখতে পেয়ে প্রথমটা চিনতে পারেনি। সে একেবারে বদলে গেছে। সুরেশের দিদি বললেন, “ওর বিয়ে হবে শীগগির, সব ঠিক হয়ে গেছে, খুব ভাল পাত্র।”

সুরেশ এসে নরেশকে মুখখীর বিবাহ হয়ে গেছে বলাতে নরেশ তাকে চন্দ্রশেখরের পাতা উন্টেনিতে উপদেশ দিলে। সুরেশ বললে, “কি জান— ওটা প্রেম নয়, ভালো লাগা মাত্র।”

“না, ওটি প্রেম— বাল্যপ্রেম।”

সেই রাতে বাসায় গিয়ে সুরেশ একবার বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থাবলী ওলটাতে লাগল। হাতে ছোঁওয়া মাত্র সে বুঝতে পারলে যে, তার প্রেম হয়েছে— সব লক্ষণই বর্তমান। বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থাবলীর মলাটে যে দৈনিক বসুমতীর আদালতের খবর ছিল, সেখানে ফরিয়াদী আসানীর

কথা পড়েই তার মন চমকে উঠল— অমনি আসামের কথা, তারপর তেজপুর— তার মাঝে মুখখী বসে রয়েছে। সুরেশ ভাবলে, যে কালে প্রেম হয়েছে, তখন পুরা দমেই সে প্রেম করে যাবে। তার জীবন অভিশপ্ত— ভালই ত, সমস্ত মাসিক সাহিত্য কেবল দুঃখের কথাই কয়! বাথা, বাথা, বাথা— ব্যথায় সব রঙ্গীন হয়ে উঠবে। রবিবাবুও লিখেছেন, “সকল কাঁটা ধন্য করে গোলাপ হয়ে ফুটবে।” Oscar Wilde-ও Profundis-এ তাঁর জীবনের সার্থকতা দিয়েছেন ব্যাখ্যা।

এম. এ. পরীক্ষার ছ'মাস পূর্বে নরেশ সুরেশকে বললে, “প্রেমের ফাঁসে যেন পরীক্ষাটি ফাঁস না হয়। আবার বাড়ি গিয়ে পড়বে চল— তোমাকে চাকরির করে খেতে হবে।”

সুরেশ পাশ হল নরেশের তাড়ায়। পাশের খবর পাবার পব সুরেশের দিদি তাকে চিঠি লিখলেন, “যদি তোমার কৃতজ্ঞতা থাকে, তা হলে তোমার জামাইবাবুর প্রস্তাব অমান্য করো না।”— প্রস্তাব বিবাহের, যদিও ভাষা আদালতের, কন্যাটি জামাইবাবুর এক আত্মীয়ের,— অবক্ষণীয়া সুন্দরী। কন্যার পিতা তেজপুরের স্কুলের শিক্ষক— ভদ্র বংশ ইত্যাদি। নরেশেরও সেই সময় বিবাহের সম্বন্ধ হচ্ছিল। সুরেশ চিঠি নিয়ে তার কাছে গেল। নবশ চিঠি দেখে বললে, “এখনি সম্মতি দাও— সেই বিয়ে কবতেই হবে— লোক হাসিয়ে কাজ নেই। আমিও মত দিয়েছি— মার কথা কখনও শুনিনি, একবার না হয় শুনলাম।” সুবেশ বললে, “তোমার আর আমার অবস্থা এক নয়।”

“হ্যাঁ, তোমার আমার চেয়ে খারাপ।” নবশের মা সুরেশকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, “বাবা, তুই যদি আমাকে ভালবাসিস, তা হলে বিয়েতে মত দে। তুই না বিয়ে করলে নরেশ বিয়ে করবে না বলছে— আমি নাতিব মুখ দেখে কাশীবাসী হব।” সুরেশ “ভেবে দেখি” বলে বাসায় চলে গেল। নরেশ তাকে যাবার সময় বললে, “মত দিয়েছে হে, দয়া করে তা না হলে আমার বিয়ে হবে না। আর এও ত মন্দ নয়, ঘরে স্ত্রী অথচ প্রেমের সাহিত্যে মহত্বের উৎস অনাথ— এই ত আশ্চর্যের ঘটনা! আশ্চর্য কেন, এই প্রতিভার বীতি— আমি পড়িনি! কিন্তু এই রকম একটা সংস্কৃত শ্লোক কেউ না কেউ ধর্মশাস্ত্রে লিখে গেছেন।”

॥ তিন ॥

বিবাহ হয়ে গেল। তাব বাসরে মুখখী এল না। সে সেখানে ছিল না, শ্বশুরবাড়ি ছিল। পরের দিন সকালে একখানা পত্র এল। মুখখী লিখেছে, “দাদা, বাণী আমার সমবয়সী। তাকে বৌদি বলব, না, ছোড়দি বলব, তাই ভাবছি। বড় দুঃখ যে, তোমার বিয়েতে যেতে পারলাম না। ছোড়দি বড় ভাল, সতি ভাল— বড় ভীতু — আরওলা দেখিয়ে না” সুবেশের এই প্রথম চিঠি পাওয়া।

সুরেশ নববধূকে পেয়ে দেখলে যে সে বিছানায় এক পাশে শোয়, কোণে শুতে ভালবাসে— ট্রান্সে এবং দেওয়ালের ফাঁকে যেখানে শুধু একটি বিদ্রী যেতে পারে। সুরেশের দিদি বলেন, “পাখির খাবারে হবে না— একটা ছেলেপুলে হতে না হতেই ইতিয়ে যাবে।” এক টুকরো মেয়ে, তবু পৃথিবীকে ভার বহন করতে নারাজ। গিরিশবাবু মধো মধো তাঁর নাটকে যেমন একটি ছোট্ট মধুর মেয়ে আঁকতেন— এ তেমনি! পারশ্য দেশের ছবিতে যেন

কার্পেটের ধারে একটি ছোট্ট ফুল, তপন-তাপে শুকিয়ে যেতে যারা জন্মেছে! সুরেশ একদিন এসে নরেশকে বলেছিল, “বাণীর বিধবা হওয়া উচিত ছিল!”

নরেশ একটু চোখ কুঁচকে বললে, “অর্থাৎ বোধ হয় একটু সাদৃশ্য প্রকৃতির!”

প্রথমে সুরেশের লজ্জা হল, কি করে একে ভালবাসবে। নরেশ বললে, “কেন জুলিয়েট রোমিওর দ্বিতীয় পক্ষ—”

“ওসব বইয়ের কথা!”

“বটে!”

“ওসব হয় যাদের হৃদয়ে চিরবসন্ত বিরাজমান!”

“কেন? বর্ষাঋতু তো দ্বিতীয় রাগেই জন্মেছিল!”

একমাস পরে পরে সুরেশ হিসেব করে দেখলে যে তার স্ত্রীর প্রতি বর্তমান মনোভাবকে দয়া বলা যেতে পারে সে যে কেমন ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে — চোখের পাতা সহজেই লাল হয় — ঠোট কাঁপে — কাঁপে, — কিন্তু মুখখীর যেমন কেঁপেছিল তেমন ঠকঠক কবে নয় — আরও মৃদু ভাবে। একদিন রাতে হরিবোল দিয়ে যখন একটা মড়া নিয়ে গেল, তখন এই সরমী মেয়েটি তার সরম টুটে ফেলে সুরেশের বুকেব কাছে চলে এল। সুরেশ এত দিন পরে মুখখীর সঙ্গে তার স্ত্রীর একটা নিগূঢ় মিল খুঁজে পেলে। পোলে, “স্ত্রীলোকেরা কি একটি বিশিষ্ট জাতি যারা আরগুলা দেখে মুর্ছা যাওয়া থেকে আবদ্ধ করে হরিধ্বনি পর্যন্ত যখন অজ্ঞান হ’য়ে স্বামীকে বিপদে ফেলতে পারে? ও ভাতই আলাদা। যাই হোক, সুরেশ বিছানা থেকে বোকার মতন লাফিয়ে অভয় প্রদান করতে লাগল, “ভয় কি? ও মড়া — আরগুলা নয়। ভূত নেই, মরে গেলে সব ফুরিয়ে যায়। আমি রয়েছে — ভয় কিসের?”

বাণী তবু ছাড়লে না। সেই রাতের ভোরে সুরেশ — ঠিক করলে যে কালে মরে গেলে কিছু থাকে না তখন বিবাহ হলে পূর্ব-স্মৃতি লোপ পাওয়া উচিত — আর সে অভয়বাণী সে দিয়েছে সেইটেই সত্যি, — আমি রয়েছে ভূত নেই। সুরেশের একটি অদৃশ্য মহাশক্তি ছিল যে তাকে — চাক্ষু্যের পাশাণীর মতন নয় — ভাল দিকেই নিয়ে যেত — সফ্রেটিসের demion-এর মত, রবিবাবুর জীবন-দেবতার মত। সুরেশ তাকে নমস্কার করে ঘুমিয়ে পড়ল।

॥ চার ॥

নতুন জীবন আরম্ভ হল — নরেশেরও হয়েছিল। দুই বন্ধুতে গোলদিঘির ধারে নোট Compare করতে করতে একদিন নরেশ বললে, “স্ত্রীকে damaged goods দিয়ে লাভ আছে?”

সুরেশ বললে, চব্বিশ বছরের বাঙ্গালীর জীবনে আর কি damaged হবে? জীবনের দু’একটি ঘটনা স্ত্রীকে না বলাই ভাল। প্রত্যেক স্ত্রীর অনেক গোপনীয় কথা থাকবে, প্রত্যেক স্বামীরও তাই — অতএব সুখে সংসার করতে হলে প্রত্যেকেরই প্রত্যেকের নীরবতাকে শ্রদ্ধা করে চলা উচিত।”

নরেশ বললে, “এরই মধ্যে সুখ সম্বন্ধে খিওরি বেরিয়েছে। Pessimist হলে কবে? আত্মদান সব উড়ে গেল!”

সুরেশ বললে, “না। এবার সুখী হব ভাবছি। সুখ—বুঝেছ—নিজের হাতে। প্রেম বইয়ের কথা আর যে প্রেম জীবনের কথা, সেটা সোয়াস্তি।”

সুরেশ কিন্তু নরেশকে লেকচার দিয়ে বাড়ি গিয়েই তার স্ত্রীকে বললে যে তাব প্রেম হয়েছিল মুখখীর সঙ্গে। বাণী চূপ করে রইল। সুরেশ অনর্গল বকে যাবার পর রেগেই বললে, “শুনলে গা Leeberg ?”

“হ্যাঁ— তোমার জন্য আমার দুঃখ হয়”— সুরেশ বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে বসল— “তাই না কি? তবু একটা কিছু হয়। আমিই যে তোমাকে একদিন দয়া কবে আসছি, আচ্ছা বুঝি তার প্রতিশোধ নিলে? দেখছি, সবই উন্টে যায়, নয়?”

॥ পাঁচ ॥

পরের বৎসর সুরেশের একটি পুত্র হল। নরেশের স্ত্রী এসে বাণীকে বললে, “ওকে আমায় দিতে হবে— আমি ওর মা, তুমি ওর আসল মা।”

“আচ্ছা— শেষকালে যেন ফিরিয়ে নিয়ে না। দিয়ে ফেরৎ নিলে কি হয় জানো ত?” মন্তীপূজার পরেই নরেশ ছেলেকে নিয়ে গেল— সপ্তাহের মধ্যে তিন দিন সে থাকে ও বাড়িতে আর চারদিন এ বাড়িতে।

ছেলেব ভাতের সময় বাণী সুরেশকে অনুরোধ করলে দিদিকে এই মর্মে লিখতে যেন তিনি আসবার সময় মুখখীকে নিয়ে আসেন—

মুখখী এল— আসা পর্যন্ত সে ছেলেকে কোল থেকে নামালে না— যাবার সময় পর্যন্ত গাড়িতে নিয়ে গেল। সুরেশকে স্টেশন থেকে খোকাকে নিয়ে আসতে হল। ঘোড়ার গাড়িতে ওঠাবার সময় মুখখী বাণীকে বললে, “না, দেবো না। তা হলে তুমি আর আসবে না। না দিলে খোকার টানে আসবে। খোকা হল বলেই ত এলে—”

সুবেশ বলে উঠল, “তবে আসতে পেলো বল—”

মুখখী বললে, “তা না হ’লে আসতে পেতাম না। আচ্ছা, এবার থেকে খোকার জন্য আসব।”

তারপর যখনই মুখখী কলকাতায় আসে, তখনই ছেলেকে দেখে যায়— সে এসে ছেলেকে আদর দিয়ে মাটি করে যায় সুরেশের এই অভিযোগ। বাণী বলে, “আসুক না, ভয় কি? আমি বয়েছি।”

॥ ছয় ॥

সেদিন বেড়িয়ে ফেরবার সময় সুবেশ নরেশকে বললে, “তোমার আব কি বল না। গোল দিখিতে সন্ধ্যাবৃত্ত সেরে বাড়ি ঢুকবে, তারপর খেয়ে দেয়ে আলো জ্বলে একখানি পুরোনো ‘ভারতী’-র পাতা ওলটাতে ওলটাতে ঘুমিয়ে পড়বে। বীণা এসে আলো নিভিয়ে দেবে। শুনেছি, তুমি আবার মাদাম্ বোভারির স্বামীর মতন ভৌঁস-ভৌঁস করে নাক ডাকাও! তোমার স্ত্রীকে অপমান করছি না।”

নরেশ উত্তর না দিয়ে প্রশ্ন করলে, “আর তুমি?” সুরেশ একটু গলাটা তারিয়ে নিয়ে বলে যেতে লাগল, “আর আমি? আমি আলোর গায়ে একখানা খবরের কাগজের টুকরো জড়িয়ে জানলার কোণে রাখব— একখানা বই খুলে আকাশ পাতাল ভাবব। কি যে করি আর কি যে ভাবি, তার ইয়ত্তা নেই। এক এক রাত্রে মনে হয়, আর পারি না, পাগল হয়ে যাই, কাগজ নিয়ে বসি— সাজাতে গিয়ে সব গুলিয়ে যায়। জননী বঙ্গভাষা আমাকে Sav- age সন্তান ঠাণ্ডরান— আবার ইংরিজি লিখতে গেলে বাঁধা বুকনীর দাসত্বে ভাব তার সহজ গতি হারায়— মাথায় তোয়ালে ভিজিয়ে বাঁধি। তার পর হঠাৎ মনে হয়, খোকাকে দুধ খাওয়াতে হবে, খোকার মাকে ডেকে দি। দুধের বাটি হারিকেনের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে যে ঘুমিয়ে পড়ে — সারাদিন তাকে কি গাধার মতন পরিশ্রম করতে হয়, তুমি কি জানবে? আবার ডেকে দি — যেদিন মড়ার মতন ঘুমিয়ে পড়ে, সেদিন আর ডাকতে পারি না। দুধ খাওয়ানোই হয় না। সেই দুধে সকালে চা করে দেয়, ডেকে দিইনি বলে বকেও না ভাই,— এই আমার রাতের রুটিন।”

নরেশ খানিক পরে ধীরে ধীরে বললে, “নিজে না পড়ে ছেলেকে ঘুম পাড়াওগে। common place-কে ফাঁকি দেবে, সাধ্য কি? মাদাম্ বোভারির দুর্দশা সকলেরই হয়। কি স্ত্রী, কি পুরুষের।” নরেশ বাড়ি ফিরল, সুরেশও পাশেব দোকানে দড়ি থেকে চুরুট ধরিয়ে বাড়িমুখো হল।

॥ সাত ॥

বাড়ির সদর দরজায় পৌছেই সে জিজ্ঞাসা করলে, “দোর খুলে রাখলে কে বে?” কে একজন জবাব দিলে, “এই যে দাদা? এতক্ষণে বুঝি বাড়ি ফেরা হল। আমরা যে সব খেয়ে দেয়ে বসে আছি। এত রাত্রে খেলে নিজেরও শরীব খারাপ হয়, আব ছোড়দিরও জেগে বসে থাকতে হয়।”

“এই যে মুখখী। কবে এলে?”

“তুমি বেরিয়ে যাবার পরেই আমার দেওর এখানে দিয়ে চলে গেল।”

“হঠাৎ যে বড়! এবার কিন্তু অনেক দিন পরে!”

“হ্যাঁ দাদা, আসি-আসি করে আর আসা হয়ে ওঠে না। এবার ছোড়দিকে নিয়ে যেতে এসেছি— ছাড়ব না কিন্তু তোমাকেও যেতে হবে, আর খোকাবাবুকেও — খোকস মণিকেও — আমি বুঝি তোর কেউ নই? আমি যে তোর মা।”

“ও সকলের কোলেই যায়, বেশি আর ভাল বাসে না, সেই জন্য তোমার কোলে থাকছে না। নিমন্ত্রণ কিসের?”

“আমার দাদার বিয়ে। কাল সকালে আসাম মেলে যেতে হবে— সে মেয়ে আমি দেখে পছন্দ করে এসেছি।”

“অর্থাৎ সে সুন্দর না হয়ে যায় না— কি বল, মুখখী! তোমার ও থিওরি ভুল। সুন্দর কালোকে ভালবাসে— বাঁশী-নাক খাঁদাকে— পটলচেবা আলুচেরাকে— অতঃপর সে মেয়ে কালোই হবে। যাই হোক, তোমার শোবার জায়গা হয়েছে ত? পাশের ঘরে শুয়ে শুয়ে সব স্বামীদের নিন্দে করগে—”

“না দাদা, আমি আর খোকন একসঙ্গে শোব। খোকন-মণি শোবে ত? কাঁদতে নেইরে, আমি যে তোর মা।” ওর তা হ’লে তিন মা হলো। তিন মাতে ওর মাথাটা চিবিয়ে খেয়ানা।”  
“আর একটি মা কে, দাদা?”

“নরেশের স্ত্রী। তিনি আবার খোকনকে না দেখলে থাকতে পারেন না।— খোকান তার সঙ্গে সব চেয়ে ভাল— সে হচ্ছে না, আর তোমার ছোড়দি হচ্ছে আসল মা। ভাল কথা, কলমে কালি পুরে রাখা হয়েছে?” সুরেশের স্ত্রী সম্মতি-সূচক ঘাড় নাড়তে নাড়তে ওপরে উঠতে লাগল। মুখখী বললে, “কই দাদা— তোমার কাপড়-চোপড় গুছিয়ে রাখি। কাল ৯টায় ট্রেন। ছোড়দি, চাবিটা দেবে, চল।”

“তুমি নেহাৎ ছাড়বে না, কি বল?”

“কিছুতেই না।”

“বেশ, তোমার ছোড়দিই না হয় যাক, আবাব আনায় কেন?”

“সেটি হবে না— তা হলে আমরা কেউ যাব না। একে ছোড়দি কথা কয় না, তার ওপর তুমি না গেলে মুখে ইষ্কুপ পড়ে যাবে। কোথায় মেশে মেশে খেয়ে বেড়াবে।”

“না, মেশে কেন? নরেশের বাড়িতে থাকব’খন, সেই বেশ হবে। তোমরা যাও। অনেক রাত হয়েছে, সকালে উঠতে হবে, দুমুঠো খেয়ে যেতে হবে ত! দুজনে ঘুমিয়ে পড়গে।”

আটঘণ্টার ভিতর যখন মুখখী— তার ছারপোকাকার গন্ধ বড় ভাল লাগে— মশাব সঙ্গে তার ভাব এবং ছোড়দির সঙ্গে তাদের শত্রুতাব খবর দিতে তাব ছোড়দিকে নিয়ে সুরেশের ঘবে এল, তখন আলো কমানো। “দাদা ঘুমোলে— ওঃ ঘুমিয়েছ। তুমি শোওগে ছোড়দি। খোকাকে আমাব কাছে দাও।”

“ও কাঁদবে, আর কাঁদলে ঘুম ভেঙ্গে যাবে, বাগ করবেন।”

“আচ্ছা, আমি যাই— ভোরবেলা উঠতে হবে।”

বাণী বিছানায় শুতেই সুরেশ চুপি চুপি বললে, “শুয়ে পড়, খোকাকে দাও না ওর কাছে।”

“না, খোকাক ওর কাছে ওখানে গিয়ে কাজ নেই। তুমি ঘুমোবে?”

“হ্যাঁ, শরীর বড় ক্লান্ত হয়েছে।” সুরেশের ঘুম আসে শেষে, অনেক সাধ-সাধনার পর—অনেকক্ষণ নিদ্রাদেবীর সঙ্গে লড়াই কবে যখন হেরে যায়, তখনই সে জেতে। হাত-পা কাঠ করে মড়ার মতন সে পড়ে থাকে—নিঃশ্বাস গুণতে থাকে, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের শরণাপন্ন হয়ে বৃষ্টি পড়ার কথা ভাবে—ভেড়ার সার চলেছে, ভাবে—কিছু ছাকড়া গাড়িব ঘড়ঘড়ানি সব সব। ভেড়ার দলকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়! তাই আজ ঘুম যখন এল না, তখন সে সঙ্কল্প করলে যে, আজ আর ঘুমাবে না। রোজই তার মনের একটা অংশ ছাড়া পেয়ে উধাও হয়ে যায় ধোঁয়ার আবরণে, তার সন্ধান মেলে না। আজ রাতে একটি প্রজাপতি গুটি কেটে বেরিয়ে পড়ল, এই প্রজাপতির অভিসারের কথা সুরেশের জানতে ইচ্ছা হল। কোথায় যাচ্ছে? কার উদ্দেশ্যে? সেও ধীরে ধীরে উড়ল— এই যে তার দেহখানি বিছানায় পড়ে রয়েছে,— বাঃ উড়ে যাওয়ায়— কি আনন্দ! ঐ যে প্রজাপতি একটা নীল সাগরের ধারে এল, ঐ যাঃ, সাগরের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে— তার মন আর উড়তে পারে না, তাই ডাক্সার ধারে একটা কাঁটাবনের হলুদে ফুলের ওপর মনটি তার বসে বইল— প্রজাপতি

উড়তে উড়তে এক জায়গায় গিয়ে হাঁফিয়ে পড়েছে। সেখানে একটা ঘূর্ণী— ঘন নীলের মধ্যে সাদা ফেনা গর্জাচ্ছে। হঠাৎ সেই আবর্তের মধ্য হতে সেই পুরাকালের সুন্দরীর মত এক অপরাধ মূর্তি উঠল— ও যে মুখখী, মুখখীরানী— সোনার দেহ, পেঁয়াজ রং-এর শাড়ি পরা, তার কোলে একটি ছেলে। সে ছেলেটি তারই স্ত্রীর, বাণীর। কাঁটাগাছ ছেড়ে মন উড়তে চাইলে,— আর সে পারে না। ওগো ভেসে যেতে দাও— যেথা নিয়ে যাও আমাকে— ওগো প্রজাপতি, আমাকে ডাকো না, আরো জেরে— আরো জোবে— কাঁটাবনে আর বসব না.... খোকা খুঁৎ খুঁৎ করে উঠল, সুরেশ তাকে থাবড়াতে আরম্ভ করলে। হঠাৎ বাণী ধীরে ধীরে সুবেশের গায়ে হাত দিলে— সুরেশ চমকে উঠল।

“ভেগে রয়েছ?”

“হ্যাঁ বাণী— কেন?”

“অমনি।”

খানিক পরে বাণী আবার সুরেশের গায়ে হাত দিয়ে বললে, “যাবে ত? তেজপুবে?”

“গেলে হয়! কি জানো, নিমন্ত্রণ রক্ষা সামাজিকতার প্রধান অঙ্গ। তুমি যাবে?”

“না!”

সুরেশ চূপ করে থেকে আবার জিজ্ঞাসা করলে, “যাবে না কেন?”

“অমনি।” তারপর বাণী হঠাৎ সুরেশের খুব বুকের কাছে সবে এসে বললে, “ওগো যেয়ো না।”

“কেন?”

“না, যেয়ো না।”

“আচ্ছা, না হয় তুমিই যেয়ো।”

আবার সব চূপচাপ। ভোরবাত্রে খোকা “বাবু” “বাবু” বলে কেঁদে উঠল— সুবেশ ধড়মড়িয়ে উঠল। খোকা আবদার ধরলে, তার মার কাছে যাবে অর্থাৎ নরেশের স্ত্রীর কাছে। কেউ তার কান্না থামাতে পারলেন না। মুখখী পাশের ঘর থেকে উঠে এল, “ছোড়দি, ওকে আমাব কাছে দাও, ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি—”

খোকা কিন্তু গেল না। বাণী বললে, “তুমি ঘুমোও গে— ওকে থামাতে পারবে না।”

“দাখো না—”

খোকার কান্না বেড়ে চলল। শেষকালে বাণীর কাছে এল, খানিক পরে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ল। মুখখী ঘর থেকে চলে গেল। সুরেশ ঘুমন্ত খোকার মুখে চুনু খেয়ে বললে, “নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে দিলি নি— সামাজিকতা রাখব কি করে? মুখখী পোড়ারমুখী, বাণী তোর মা— আর বাণী তোর মা— বুঝলি! ভুলিসনি।”

পরদিন সকালে মুখখী বললে, “থাক ছোড়দি, তুমি না হয় যেয়ো না—দাদা মেসে খেলে ডিসপেনসিয়া হবে।”



## মুক্তির মূল্য

### সীতা দেবী

অদূরবর্তী গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া ছ'টা বাজিতেই মা তানের ঘুমটা ভাঙিয়া গেল। সারারাত গরমে তাহার ঘুমই হয় নাই, তবু বেশী বেলা করিবার তাহার উপায় নাই। সকালের ট্রেন আসিয়া পড়িল বলিয়া। এখন ছড়নুড় করিয়া যাত্রীর দল আসিয়া পড়িবে, তখন কাজ সামলান দায় হইবে।

বড় রাস্তার উপর প্রৌঢ়া মা তান্ বাস করে। তাহার একটি হোটেল আছে। ইহাতে তাহার গ্রাসাচ্ছাদন ত চলেই, তাহার উপর বিলক্ষণ বেশ কিছু হাতেও থাকিয়া যায়। বাহির হইতে দেখিলে অবশ্য ঘরটিকে হোটেল বলিয়া মোটেই মনে হইবে না। বারান্দায় দুখানা তরুপোষ, তাহার উপর মোটা মোটা চাটাই বিছানো। ঘরের ভিতরটায়াও আসবাব-পত্র বেশী নাই। গুটি দুই তিন বাস্কা কাঠের বেঞ্চির উপর রক্ষিত, একটা আলমারি, দুটা চেয়ার, একটা ছোট টেবিল। কাঠের পার্টিশন দিয়া ঘরখানি দুই অংশে বিভক্ত। একটা অংশ একেবারে খালি, কেবল কোণে কতকগুলি চাটাই এবং পাটি গুটানো রহিয়াছে। এই ঘরেই যাত্রীরা রাত্রিবাস করিয়া থাকে। অবশ্য ঘরে থাকিতে তাহারা বিশেষ পছন্দ করে না, কারণ এখানে আলো-বাতাসের বিলক্ষণ অভাব, এবং পিছনের ময়লা গলির দুর্গন্ধ ব্রহ্মদেশীয় নাসিকাকেও কাতর করিয়া তোলে। কাজেই বৃষ্টির দিন না হইলে যাত্রীগণ বারান্দায় এবং সামনের ফুটপাথে চাটাই বিছাইয়া মনের আনন্দে নিদ্রা দেয়। হাওয়া পাওয়া যায় খুব এবং দশটার পর ফুটপাথে লোক-চলাচল এতটা কমিয়া যায় যে, পথিকের অসতর্ক পদক্ষেপে আহত হইবারও কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

আশেপাশে সবই দোকান এবং হোটেল। সব নামজাদা জায়গা, দিব্য ফিট্‌ফাট্‌ সাজান। এক পাশে চীনা ভোজনাগার, তাহার প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড, সাদা জমির উপর বড় বড় কালো চীনা অক্ষরে লেখা, এক লাইন ইংরাজী লেখাও আছে, একটা পাউরুটির ছবিও আছে। এখানে ইংরাজ, ফিরঙ্গী, আর সৈনিক সারাক্ষণই আসে, সুতরাং একটু সাহেবীয়া না করিয়া উপায় নাই। জায়গাটি খুব পরিষ্কার, চীনা 'বয়'গুলি দিনে দশবার দরজার সামনে ঝাঁট দেয়, চেয়ার টেবিল মুছিয়া রাখে। যখন খরিদ্দার থাকে, তারা একমনে কাজ করিয়া যায়, যখন হাত খালি থাকে, তখন ফুটপাথের উপর বল খেলে, পরস্পরের পিঠের উপর দিয়া লাফ মারে।

মা তানের দোকানের অপর পার্শ্বে মোটর মেরামত এবং রং করিবার কারখানা। দুই বিপুলদেহ মুসলমান ইহার স্বত্বাধিকারী। তাহাদের চেহারাগত সাদৃশ্যে বেশ বুঝা যায়, ইহারা দুই ভাই হইবে। তাহার নিজেরা কোনো কাজই করে না। দুখানা বড় বড় চেয়ার টানিয়া, একরকম রাস্তার উপরেই আসিয়া বসে, এবং সাহেব-সুবা কাজে আসিলে তাহাদের সঙ্গে গম্ভীর ভারিক্কি চালে কথাবার্তা বলে। ভিতরে দশ বারোজন মুসলমান এবং বর্ম্ম কারিগর অবিশ্রান্ত খাটিয়া যায়, সমস্ত দিন তাহাদের নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় নাই। তাহাদের নিপুণ হাতের সেবায় ভগ্ন, জীর্ণ, বিবর্ণ এক একখানা গাড়ী নবযৌবন লাভ করিয়া ঝক্‌ঝকে,

চক্চকে রূপে পাড়ার বালকবৃন্দকে লুপ্ত, বিস্মিত করিয়া বাহির হইয়া আসে। এক একখানি গাড়ীর কাজ হইয়া যায়, আর সেটাকে সকলে ঠেলিয়া রাস্তায় নামাইয়া দিয়া যায়। তাহার পর যাহার গাড়ী সে আসিয়া, বিল চুকাইয়া দিয়া, গাড়ীখানা হাঁকাইয়া চলিয়া যায়। কারখানাটি যেন এক মোটরকারের একজিবিশান্। এখানে বিপুলাকৃতি 'মোটব-বাস্' হইতে, ক্ষুদ্রাকার 'বেবী আসটিন' পর্যন্ত সর্বজাতীয় গাড়ীই দেখিতে পাওয়া যায়।

এ ছাড়া সামনে পিছনে, এদিকে ওদিকে জমকালো দোকানের অভাব নাই। কাছাকাছি গোটা-দুই বায়োকোপও আছে— সন্ধ্যা হইবামাত্র ব্যাণ্ডের আওয়াজে কানে তাল দধে, সারি সারি বৈদ্যুতিক আলোয় পথিকের চোখ বলসিয়া যায়।

ইহাদের ভীড়ে, মা তানের হোটেল পথিকের চোখে ধরাই পড়ে না। না আছে বৈদ্যুতিক আলো, না আছে শাদা রং-করা বড় বড় দরজা। কোনকালে বাড়ীওয়াল দয়া করিয়া ঘরের সামনে এবং ভিতরে খানিকটা হলদে রং লাগাইয়া দিয়াছিল, তাহার পর আর কিছু করা প্রয়োজন মনে করে নাই। মা তান্ও এ লইয়া কিছু উচ্চবাচ্চা করে না, কারণ ঘর দেখিতে যেমনই হউক, তাহাতে তাহার যাত্রী সমাগমের কোনোই হানি হইবে না। সৌন্দর্যবোধ তাহার কিছু প্রবল ছিল না, সুতরাং চুনবালি-খসা দেওয়াল এবং বিবর্ণ দরজা-জানালা তাহাব চক্ষুকে বিন্দুমাত্রও পীড়া দিত না। অন্যান্য দোকান বা হোটেলের মত লোকের চক্ষে সে ধাঁধা লাগাইতে পারে না বটে, কিন্তু তাহাতে কি-ই বা আসিয়া যায়? তাহাদের অনেকের চেয়ে আয় তাহার বেশী এবং ব্যয় সর্বাপেক্ষা কম। ঘরভাড়া তাহার পঁয়ত্রিশ টাকা মাত্র। বহুকাল হইল, এ বাড়ী যখন প্রথম তৈয়ারী হয়, তখন হইতে, সে এখানে আছে। বাড়ীওয়াল পুরানো ভাড়াটিয়া বলিয়া তাহার ঘরের ভাড়া আর বাড়ায় নাই; যদিও অন্য ঘরগুলির ভাড়া যথেষ্টই বাড়িয়া গিয়াছে। বৈদ্যুতিক আলো সে জ্বালায় না, কাজেই মাসের শেষে কুড়ি-পঁচিশ টাকার বিলও তাহার আসে না। ছ'পয়সার কেরোসিন তেল কিনিলে তাহাব দুদিন কাটিয়া যায়। চাকর-বাকর রাখার উৎসাহ তাহার নাই। খালি দুই বেলা ভাত দিয়া বুড়ী মা পোয়েকে সে রাখিয়াছে, তাহার কাজে একটু সাহায্য করিবার জন্য। মা পোয়ে সকালবেলা ফুল বিক্রী করিতে বাহির হয়, বেলা বারোটা আন্দাজ সব ফুল তাহার বিক্রী হইয়া যায়, তাহার পর সারাদিন তাহার অবসর। শুধু শুধু আলস্যে কাল না কাটাইয়া, মা তানকে সে একটু সাহায্য করে, ইহার বদলে খাইতে পায় এবং থাকিতে পায়, ফুল বিক্রয়ের লাভের টাকা তাহার জমাই থাকিয়া যায়। পাড়াপ্রতিবেশী সকলেই জানে, দুই বুড়ীর অনেক টাকা জমা আছে, বিশেষ করিয়া মা তানের। ইহাদের খরচ কিই বা? এ ত বাড়ী। খাওয়া-দাওয়ারও বাড়াবাড়ি রকম ব্যবস্থা কিছুই নাই। যাত্রীদের জন্য যে রান্না হয়, উহার নিজেরাও তাহাই খায়। এমন কি ব্রহ্মদেশীয়া রমণীমাত্রেরই প্রায় যে খরচটা অবশ্যস্বাবী,— সেই পোষাকের খরচও তাহাদের বেশী নাই। রেশমী লুঙ্গী বা ভাল জামা, কেহ কস্মিনকালেও তাহাদের পরিতে দেখে না। ছিটের লুঙ্গী আর শাদা জামাই তাহাদের সব দিনের পোষাক।

মা তানের বয়স কত ঠিক করিয়া বলা যায় না। বারো বৎসর আগে প্রথম যখন সে এই বাড়ীতে আসিয়া হোটেল খোলে, তখনও তাহার এই রকম চেহারাই ছিল। আন্দাজে বোধ হয় বয়স চল্লিশ হইতে পঞ্চাশের মাঝামাঝি হইবে। শরীর ইদানীং কিছু ভারি হইয়া পড়িয়াছে, কৃশাঙ্গী বৃদ্ধা মা পোয়ের পাশে তাহাকে রীতিমত মোটাই দেখায়; রং কিছু ময়লা, রূপচর্চার একেবারেই অভাব, সুতরাং যতটা কালো সে, পুরাপুরি ততটা কালোই তাহাকে দেখায়। রাগী মেজাজ এবং নিভীকতার জন্য সে রেসুনে বিখ্যাত। এ পর্যন্ত ঝগড়ায় কেহ কোনোদিন তাহার সঙ্গে পারিয়া ওঠে নাই, এক পয়সা কেহ কোনোদিন তাহাকে ঠকাইয়া লইতে পারে নাই। কিন্তু ফাঁকি দেবার চেষ্টাও সে কোনোদিন করে না। এইজন্য তাহার হোটেল যাত্রীর অভাব কোনোদিনই হয় না।

আজও সে ঘুম হইতে উঠিয়া, আর এক মিনিট বসিয়া কুড়ুমী করিল না। মস্ত একটা হাই তুলিয়া, একেবারে দাঁড়াইয়া পড়িল। নিদ্রিত মা পোয়েকে এক ঠেলা দিয়া উঠাইয়া দিল। তাহার পর বালিশ মাদুর উঠাইয়া লইয়া ঘরের ভিতর চলিল।

মুখ ধুইয়া বাহির হইয়া আসিতেই মা পোয়ে বলিল, “আজ আর বেরোব না, শরীরটা ভাল নেই। রাগে ভাল করে ঘুম হয়নি।”

মা তান্ বলিল, “ওমা, একটু ঘুম হয়নি বলে সারাদিন বসে কাটাবি? এইজন্যে তোর পয়সা হয় না।”

মা পোয়ে পাশের পাখাখানা তুলিয়া লইয়া হাওয়া খাইতে খাইতে বলিল, “যাক গে। পয়সা বেশী নিয়ে করবই বা কি? না ছেলে না পিলে। যা আছে তাতে আমার শ্রাদ্ধে খরচা বেশ চলে যাবে। তুই ত ক্রমাগতই জমাচ্ছিস, তোর পয়সা খাবে কে? কোনকালে বিধবা হয়েছিস, আর ত বিয়েও করলি না?”

“বিয়ের মুখে ঝাঁটা”, বলিয়া মা তান্ মুখ ছুটাইয়া দিল। “গায়ের রক্ত জল করে যে পয়সা করলাম, তা কোন লক্ষ্মীছাড়া এসে দুদিনে মদ খেয়ে উড়িয়ে দিক আর কি? আমাকে এখন বিয়ে করলে লোকে টাকার লোভেই ত করবে? আর আমি পিছন ফিরলেই আমার টাকা নিয়ে অন্য কোন মুখপুড়ী ছুঁড়িকে গহনা গড়িয়ে দিয়ে আসবে।”

বেলগায়ে স্টেশন খুব কাছেই। এই সময় ট্রেন আসিয়া পড়ার শব্দ শোনা গেল। মা তান্ বিবাহ সম্বন্ধে বদ্ধতা ছাড়িয়া ছুটিল উনান ধরাইতে, কারণ যাত্রীরা আসিয়াই চায়ের জন্য গোলমাল লাগাইবে। মা পোয়ে নিজের বালিশ ঘরে রাখিয়া আসিল, এবং মা তানের নির্দেশ মত ঝাঁটা লইয়া ঘর বারান্দা ঝাঁট দিতে আরম্ভ করিল।

মিনিট পাঁচ পরেই সামনের রাস্তা দিয়া রেলগাড়ীর আমদানী যাত্রীর দল সহরের চতুর্দিকে যাত্রা শুরু করিল। প্রথমে ঘোড়ার গাড়ীর দল, গাড়ীর মাথায় ট্রান্স, হোল্ড অল, স্যুটকেস প্রভৃতি উচুদরের মাল। তাহার পর রিক্শ, রেক্সনের ভাষায় “লাঞ্চা”, তাহাতেও যাত্রীর পায়ের কাছে বাস্ক, বিছানা—কম্বল বা সতরঞ্চিতে জড়ানো। সর্বশেষে পদাতিকের দল। ইহাদের জিনিষপত্র ও পোষাক-পরিচ্ছদ একেবারে সহরবাসী বর্মার ধার দিয়াও যায় না। বেতের বাস্ক, বিছানার পোঁটলা—সব নিজেরাই বহন করিয়া চলিয়াছে। কাহারও বা বাস্কও নাই, কাপড়ের পুটলি বাঁশের লাঠিতে ঝুলাইয়া তাহারা লাঠি ঘাড়ে করিয়া চলিয়াছে। পুরুষ মানুষগুলিরও মাথায় লম্বা চুল। খোঁপা করিয়া বাঁধা এবং রঙ্গীন রুমাল দিয়া জড়ানো। সকলেরই পরনে পুরু ছিটের বা রং-করা লুঙ্গী। রেশমের ধার ইহারা ধারে না, বেশভূষার পারিপাটাও কিছু নাই। কাহারও পায়ের বর্মা চটি, কাহারও বা পা খালিই। কলিকাতার রাস্তায় পল্লীগাম হইতে আগত কালীখাটের যাত্রীদলকে যেমন চিনিতে একটুও বিলম্ব হয় না, ইহাদেরও দেখিবামাত্র চেনা যায় যে, রেক্সনের অধিবাসী ইহারা মোটেই নয়।

গুটি ত্রিশ মানুষ আসিয়া মা তানের হোটেলের সম্মুখে দাঁড়াইল এবং মাথা হইতে ঘাড় হইতে জিনিষপত্র নামাইয়া রাখিতে প্রবৃত্ত হইল। ইহাদের ভিতর বৃদ্ধ আছে, শ্রৌঢ় আছে, যুবক এবং বালকও আছে। ইহারা নানা কাজে পল্লীগাম হইতে রেক্সনে আসে। দোকানদার আসে জিনিষ কিনিয়া লইতে, চাষী আসে ক্ষেতে উৎপন্ন জিনিষ বিক্রয় করিতে, কেহ বা আসে কাপড়-চোপড় কিনিতে, কেহ বা আসে মহাজনের কাছে টাকা ধার করিতে। বালকবালিকা যাহারা আসে, তাহারা আসে শুধু স্মৃতি করিবার জন্যই। এখানে বায়োস্কোপ আছে, থিয়েটার আছে, বড় প্যাগোডা আছে। রাস্তার ধারে বসিয়া থাকিলেই এখানে হাজার রকম তামাসা দেখা যায়। দেশে এসব কিছুই নাই, আছে কেবল দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ, বন-জঙ্গল, ঝিল। মানুষও পবম্পরের কাছে থাকে না। একজনের বাড়ী হইতে আর একজনের

বাড়ী কতদূরে তাহার ঠিকানা নাই। দিনের পর দিন কাটিয়া যায়, ঘরের লোক ছাড়া অন্য একটা মানুষের মুখ তাহারা দেখে না। এইজন্য সুবিধা পাইলেই তাহারা দল বাঁধিয়া সহরে আসিয়া উপস্থিত হয়। কোন উৎসব বা পর্ব থাকিলে ত আর কথাই নাই। এপ্রিল মাসে বর্মীদের মস্ত উৎসব, কাজেই এ সময়ে পাড়ারগায়ের যাত্রীর ভীড় খুব বেশীই হয়।

যাত্রীর সংখ্যা দেখিয়া, মা তান্ সঙ্গিনীকে বলিল, “যাক্, যাস্ননি ভালই হয়েছে। যা দল এসে পৌছল, একলা পেরে ওঠা দায় হত। ‘জল-খেলার’ সময়, লোক ত বেশী হব্বেই এর পর।”

প্রকাণ্ড ডেকাটীতে চায়ের জল বসাইয়া সে বাহিরে যাত্রীদের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। বেশীর ভাগই তাহার পুরানো মস্কেল, বছরে দশবারো বাব রেস্‌নে আসে। কয়েকজন নূতন মানুষও দেখা গেল। ইহার ভিতর একটি যুবক বিশেষ করিয়া তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। অন্যদের চেয়ে তাহার বেশভূষার পারিপাট্য অধিক, মাথার চুলও ছোট করিয়া ছাঁটা। পায়ে বিলাতী জুতা। তাহার সঙ্গীদের মধ্যে তাহাকে নিতান্তই খাপছাড়া বোমানান দেখাইতেছিল। সকলের সঙ্গে দুচারটা কথা বলিয়া, মা তান্ আবার ভিতরে চলিয়া আসিল। মা পোয়েকে বলিল, “তুই চা-টা একটু দিয়ে দে, আমি বাজারটা ঘুরে আসি। সকাল সকাল গেলে সস্তায় জিনিস পাওয়া যাবে।” প্রকাণ্ড এক বুড়ি লইয়া সে বাহিরে চলিল। যাত্রীদের হাত-মুখ ধুইয়া চা খাইতে উপদেশ দিয়া সে রিক্‌শ ডাকিয়া চড়িয়া বসিল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সে মাছ তরকারি কিনিয়া ফিরিয়া আসিল। যাত্রীর দলের চা-পান শেষ হইয়া গিয়াছে। দুচারজন কাজে এদিক ওদিক বাহির হইয়া গিয়াছে, বেশীর ভাগ চাটাই বিছাইয়া ফুটপাথের উপর বসিয়া গিয়াছে। রাস্তার জনশ্রোত, হাজার রকম গাড়ী ঘোড়া, মোটর দেখিয়াই তাহারা দিব্য আনন্দ লাভ করিতেছে। মা তান্ লক্ষ্য করিয়া দেখিল, নবাগত যুবকটি নাই, কোথাও বাহির হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, তখন তাহার এসব দিকে মন দেবার অবকাশ ছিল না, সমস্ত রান্নাবান্না তাহার সম্মুখে। রিক্‌শওয়ালাকে পয়সা এবং কিঞ্চিৎ গলাগালি দিয়া সে বাজারের বুড়ি লইয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

সকলে যখন খাইতে বসিল, তখনও দেখা গেল, সেই যুবক অনুপস্থিত। মা তান্ এক শ্রোটকে জিজ্ঞাসা করিল, “তোমাদের সঙ্গে ছোকরা কোথায় গেল? সেই যে দিবি ফুলবাবু সঙ্গে এসেছিল?”

শ্রোট বলিল, “কে জানে?” কিসের ধান্দায় ঘোরে তারও ঠিকানা নেই। কি করতে এসেছে তাও জানি না। ওর বাবা মন্দালেতে দোকান রেখে বেশ দুপয়সা উপার্জন করে। ছোঁড়ার খাবার ভাবনা ত নেই, নিজের খেয়ালেই ঘোরে।”

খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া যাত্রীর দল আপন আপন কাজে বাহির হইয়া গেল। ইহার সাধারণতঃ একদিন একরাত মাত্র রেস্‌নে বাস করে। পরের দিন সকালেই ট্রেনে চড়িয়া যে যার ঘরে ফিরিয়া যায়।

মা তান্ ও মা পোয়ে নিজেদেব খাওয়ার ব্যবস্থা করিতে বসিল। মা পোয়ে জিজ্ঞাসা করিল, “ছোঁড়াটা কিছু ত খায়নি। তার জন্যে কিছু রাখবে নাকি?”

মা তানের নিয়ম সকলকে সময়মত খাইতে হইবে। কাহারও জন্য সে ঝুসিয়া থাকে না বরং খাবার তুলিয়া রাখে না। কিন্তু ঐ যুবকটির প্রতি প্রথম দর্শনেই তাহার একটু মায়া জন্মিয়া গিয়াছিল। কেন যে, সে তাহা নিজেই বুঝিতে পারিতেছিল না। যুবক দেখিতে বেশ সুন্দর বটে, তবে রেস্‌নে সুপুরুষের কিছুমাত্র অভাব নাই, অমন চেহারা সে ঢের দেখিয়াছে।

মা পোয়ের কথার উত্তরে মা তান্ বলিল, “রেখে দে কিছু। ছোঁড়া এই প্রথমবার এসেছে, খেতে না পেলে কোনোদিন আর এমুখোও হবে না।”

মা পোয়ে খাবার তুলিয়া রাখিল। তাহার পর আহাৰাদি সারিয়া রাত্রে ঘুমের য়েটুকু ব্যাদ্যত হইয়াছিল, তাহা পুৰাইয়া লইবার চেষ্টায় মাদুর পাতিয়া বারান্দায় গিয়া শুইয়া পড়িল। মা তানের দিবানিদ্রার অভ্যাস মোটেই ছিল না। সে মস্ত বড় একটা বৰ্মা চুৰুট ধরইয়া, মা পোয়ের পাশে বসিয়া রাস্তার লোক-চলাচল দেখিতে লাগিল।

ছোকরার কথা আরো দুই চারিবার তাহার মনে হইল। হোঁড়া কোথায় ঘুরিতেছে ঠিকানা নাই। সকাল হইতে এক পেয়ালা চায়ের বেশী কিছুই তাহার পেটে পড়ে নাই। এক যদি রাস্তায় কিনিয়া খাইয়া থাকে! কিন্তু তাহা কি আর করিবে? হোটেলের খরচ তাহাকে পুরাই যখন দিতে হইবে, তখন আবার গাঁটের পয়সা খবচ করিয়া সে খাইতে যাইবে কেন? মা তান্ মনে করিত, দুনিয়ার সকল মানুষই তাহার মত হিসাবী।

ছোকরা বেলা দুইটার সময় বোদে পুড়িয়া ফিরিয়া আসিল। তাহাকে বড়ই ক্লিষ্ট ও বিষন্ন দেখাইতেছিল। এক হাত লম্বা চুৰুটটা মুখ হইতে নামাইয়া মা তান্ জিজ্ঞাসা করিল, “কোথায় ছিলে এতক্ষণ? ভাত ছুড়িয়ে ত বরফের মত হয়ে গেল।”

ছোকরা বলিল, “কাজে ঘুবছিলাম, তাই দেরি হয়ে গেল।”

মা তান্ বলিল, “কি কাজে সহবে এসেছ? তোমাকে ত এই প্রথম দেখছি এখানে।”

ছোকরা বলিল, “কাজ তেমন কিছু নয়। আমার এক বন্ধু এখানে এসেছে, তার সন্ধানে এসেছি।”

মা তান্ মনে মনে বলিল, “বন্ধু ত কত! কোনো ছুড়ী গুণ করেছে আর কি।” মুখে বলিল, “কোথা থেকে আসছ? তোমার নাম কি?”

যুবক বসিয়া বলিল, “আমার বাড়ী মন্ডালে। নাম মণ্ডলাট।”

মা তান্ বলিল, “চল, ভাত দিচ্ছি, খেয়ে নাও।”

যুবক বলিল, “ভিতরে কল নেই? একটু স্নান করে নিতাম।”

কল ছিল অবশ্যই, তবে মা তানের মক্কেলরা স্নান করিবার ইচ্ছা-প্রকাশ কেহই করিত না। মা তান্ বুঝিল, এ ছোকরা সতাই অন্য পর্যায়ের মানুষ। কল-ঘর দেখাইয়া সংক্ষেপে বলিল, “এখানে যাও।”

যুবক স্নানাহার সারিয়া বাহিরেই আসিয়া বসিল। মা পোয়ে তখনও বিপুল নার্সিকা গর্জন করিয়া ঘুমাইতেছে। মণ্ডলাট একটা ভাঙা কাঠের বাস্ত্রের উপর বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “ইনি তোমাব বোন নাকি?”

মা তান্ বলিল, “না, আমার আপনার জন কেউ নেই। ওকে রেখেছি আমাব কাজের একটু সাহায্য করবার জন্য।”

মণ্ডলাট হঠাৎ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “আপনার কেউ না থাকাই ভাল।”

মা তান্ ভাবিল, “একেবারে আস্ত গিলে খেয়েছে গো। কে ছুঁড়ী কে জানে।” ব্রহ্মদেশীয় মানুষ মাত্রেই তুচ্ছাকৃ, গুণ করা প্রভৃতিতে অগাধ বিশ্বাস। বৌদ্ধ ফুঙ্গী (সন্ন্যাসী), ভারতবর্ষীয় যাদুকার, জ্যোতিষ সকলেরই প্রতি ইহাদের গভীর ভক্তি। কত পয়সা যে জুয়াচোরে ইহাদের নিকট হইতে ঠকাইয়া লয় তাহার ঠিকানা নাই। অত্যাশ্চর্য মন্ত্রশক্তি, বশীকরণ প্রভৃতির গল্প ইহাদের মুখে লাগিয়াই আছে।

মণ্ডলাটের পেট হইতে কথা বাহির করিবার জন্য মা তান্ বলিল, “আপনার জন না থাকা ভাল আর কি? আপদ-বিপদে দেখবার কেউ থাকে না। এখন গতর আছে খাটিছি খাচ্ছি, কিন্তু যদি অসুখে পড়ি, মুখে জল দেবার কেউ নেই।”

যুবক কথটা ফিরাইয়া দিল। নিজের সুখ-দুঃখের কথা সকলের কাছে প্রকাশ করার স্বভাব সব মানুষের থাকে না! বিশেষ করিয়া মা তান্ একেবারে অপরিচিত, এই প্রথম দিন তাহাকে সে দেখিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, “এখানের ওটা বর্মা বায়োস্কোপ না? কখনো যাও দেখতে?”

মা তান্ হাত উল্টাইয়া তচ্ছিল্যের ভঙ্গী করিয়া বলিল, “বায়োস্কোপ দেখবার সময়ও নেই, সখও নেই। ওসব তোমাদের বয়সেই সাজে। সাড়ে তিনটা বাজুক না, দেখবে ছোঁড়া-ছুড়ীর কিরকম ভীড় লেগে যায়।”

মঙ্‌লাট বলিল, “গিয়ে একটু দেখে এলে হয়, কাজ ত হাতে নেই। এক টাকা করে টিকিট বুঝি?”

মা তান্ বলিল, “বেশীও আছে, কমও আছে।”

সাড়ে তিনটা বাজিতে বড় বেশী দেরি ছিল না, অল্প একটু পরেই ব্যাণ্ডের বাজনা সুরু হইয়া গেল। যুবক জুতার ফিতা বাঁধিতেছে দেখিয়া মা তান্ জিজ্ঞাসা করিল, “কোনো কাজে তাহলে এসনি? এমনি বেড়াতেই এসেছ?”

মঙ্‌লাট বলিল, “কাজ অল্প একটু আছে। বাবার দোকানের দুচারটে জিনিষ কিনে নিয়ে যেতে হবে। তা সকাল কিনলেই হবে। আজ মনটা ভাল নেই, একটু বায়োস্কোপ দেখেই আসি।”

মা তান্ একটু উৎসুক ভাবেই যেন জিজ্ঞাসা করিল, “কানও থাকবে নাকি? এখানেই?”

যুবক জুতার ফিতা বাঁধা শেষ করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, “হ্যাঁ, দুচারদিন থাকবই মনে করছি। এখানে যখন উঠেছি, এখানেই থাকব।”

মঙ্‌লাট চলিয়া যাইতেই মা তান্ ঠেলা দিয়া মা পোয়েকে উঠাইয়া দিল। বলিল, “নে ওঠ, নাক ডাকাচ্ছিস যেন রেলের ইঞ্জিন। উনুনটা ধরাগে যা। এখনি সব এল বলে, গলা শুকিয়ে।” দুইজনেই কাজে ডুবিয়া গেল, একেবারে খাওয়া-দাওয়া চুকিলে পর তাদের ছুটি।

রান্নাঘরে গরমে টেকা যায় না, প্রাণ যেন বাহির হইয়া আসে। মা পোয়ে মশলা ইত্যাদি কি সব কিনিতে গেল, মা তান্ ভাত চড়াইয়া বারান্দায় একটু আসিয়া বসিল। সাড়ে পাঁচটা আন্দাজ বাজিয়াছে। বায়োস্কোপের একটা পালা শেষ হইল, ছড়মুড় করিয়া লোক বাহির হইতে লাগিল। মোটরের ভাঁক্ ভাঁক্, গাড়ীর ঘড় ঘড়, মানুষের কলরবে, একেবারে চারিদিক মুখর হইয়া উঠিল।

হঠাৎ মা তান্ উঠিয়া পড়িল। মঙ্‌লাট একটি বাদামী রঙের লুঙ্গী-পরা মেয়ের সঙ্গে কথা বলিতেছে যেন। মা তানের বড় কৌতূহল হইল মেয়েটিকে দেখিবার জন্য। বারান্দা ছাড়িয়া রাস্তায় নামিয়া সে কিছুদূর অগ্রসব হইয়া গেল। মঙ্‌লাটই বটে। এই ছুড়ীর সন্ধানে মা-দালাে হইতে এতদূরে আসিয়াছে? দেখিতে মন্দ নয়, তবে এমন কি রূপসী? মেয়েটাকে কোথায় যেন সে দেখিয়াছে বলিয়া মনে হইল, কিন্তু স্থির করিতে পারিল না। যাহা হোক, তখন আর বেশী সময় ছিল না, ভাত পুড়িয়া যাইবার ভয়ে সে তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়া ঢুকিল।

খাওয়া-দাওয়া সারিতে একটু রাতই হইয়া যাইত। সাড়ে নটা দশটার আগে প্রায়ই হইত না। রাত্রে আর মঙ্‌লাট দেরি করিল না, অন্য সকলের সঙ্গেই বসিয়া খাইল। মা তানের ইচ্ছা ছিল বায়োস্কোপে দৃষ্টা যুবতীর বিষয়ে একটু কথা বলে, কিন্তু অন্য লোকের সামনে বলিতে পারিল না।

রাত দশটা বাজিতে বাজিতেই ফুটপাথ একরকম খালি হইয়া যায়। বর্ষা এখনও আরম্ভ হয় নাই। কাঠের তক্তা, চাটাই, পাটি প্রভৃতি বিছাইয়া যাত্রীর দল রাস্তা জুড়িয়া শুইয়া পড়িল। সারাদিন গরমে ঘোরাঘুরি করার ফলে অধিকাংশই কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িল। মঙ্‌লাট কেবল একটা চুরুট ধরাইয়া তাহার চাটাইয়ের উপর বসিয়া ধূমপান করিতে লাগিল।

মা তান্ এবং মা পোয়েও কাজকর্ম আহারাতি সারিয়া বাহির হইয়া আসিল। দারুণ গরম। ঘরের ভিতর ঘুমানো মানুষের অসাধ্য। যাত্রীরা সকলেই বাহিরে শুইয়াছিল, বারান্দার তন্ত্রপোষগুলি খালিই পড়িয়াছিল। উহারা দুজনে ঐখানেই শুইবে ঠিক করিয়া বালিশ প্রভৃতি বাহির করিয়া আনি। নিদ্রার সঙ্গে বুড়ী মা পোয়ের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। শয়ন করিবামাত্রই সে ঘুমাইয়া পড়িত এবং তাহার প্রবল নাসিকান্ধনি পাড়ার ছেলেমেয়েদের কৌতুকের জিনিষ ছিল।

মা তানের অত্যন্ত শীঘ্র ঘুম আসিত না। অন্তত আধঘণ্টা চুরুট ফুকিয়া তবে সে শুইতে যাইত। আজও নিজের বিপুল বর্মা চুরুটটি ধরাইয়া, তন্ত্রপোষের উপর আসিয়া বসিল। মঙলাট তখনও জাগিয়া বসিয়া আছে, অন্য যাত্রীরা সকলেই নিদ্রিত। মা তান্ কি বলিয়া তাহার সঙ্গে গল্প আরম্ভ করিবে ভাবিতেছে, এমন সময় যুবকই কথা আরম্ভ করিল। মা তানের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “এখান থেকে চিমেগুইনে কত দূর?”

মা তান্ মুখ হইতে চুরুট নামাইয়া বলিল, “তা দূর আছে। কিন্তু দূর হলেই বা কি? হেঁটে ত কেউ যায় না। মোটর-বাসে যায়, না হয় ট্রেনে যায়।”

মঙলাট বলিল, “সব সময় কি গাড়ী পাওয়া যায়? কাল সকালে একবার যেতে হবে।”

মা তান্ বলিল, “সবসময়। সকাল থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত। এই যে বায়োস্কোপ দেখছ, এর ত অর্ধেক লোক আসে ওখান থেকে। রাত বারোটার মোটর-বাসে চড়ে সব ফিরে যায়।”

যুবক বলিল, “আমার সেই বন্ধুটির খোঁজ পেয়েছি। তারা চিমেগুইনেই থাকে, একবার যেতে হবে তাদের বাড়ী।”

মা তান্ আবার চুরুটটা মুখে দিয়া টানিতে লাগিল। ছুঁড়ীকে কোথায় দেখিয়াছে, এতক্ষণে তাহার মনে পড়িল! চিমেগুইনেই বটে। মা তানের এক দূর সম্পর্কের ভাই থাকে সেখানে, পাশেব বাড়ীতেই ঐ ছুকুই থাকে, বাপ নাই, নিজের মাও নাই, এক সৎমা আছে। সৎমার ছেলেপিলে আছে কয়েকটা।

যুবক আর গল্প চলাইবার চেষ্টা করিল না। মা তান্ও শুইয়া পড়িল, তবে অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাহার ঘুম আসিল না।

পরদিন ভোরবেলা যাত্রীর দল পৌঁটলা পুঁটলি বাঁধিয়া, টাকাকড়ি চুকাইয়া দিয়া, রেলওয়ে স্টেশনের পথে বিদায় হইয়া গেল। কেবল বাকি রহিল মঙলাট। মা পোয়েও ভোরেই চলিয়া গেল ফুলের ডালা লইয়া। মা তান্ চা খাইয়া খানিকক্ষণ চুপচাপ বসিয়া রহিল। আজ তাহার হাত একেবারে খালি, কোনো কাজ নাই। মনটা, কেন জানি না, তাহার একটু ভাব হইয়া ছিল। পাশের ঘরের বর্মা যুবকীটির নিশ্বাস ফেলিবার সময় নাই। তিন চারিটি ছেলেমেয়েকে মুখ ধোয়ানো, খাওয়ানো, সামলানো, কম বাপার নয়। ইহাকে মা তান্ কোনো দিন হিংসা করে নাই, বরং উহার দারিদ্রের জন্য কৃপার চক্ষেই দেখিত। কিন্তু আজ ইঠাৎ তাহার মনে হইল, একদিক দিয়া মেয়েটি তাহার অপেক্ষা ভালই আছে। তাহার স্বামী আছে, সন্তানসন্ততি আছে। তাহার নিশ্বাস ফেলিবার সময় নাই সত্য, কিন্তু জগৎসংসার তাহার কাছে পরিপূর্ণ। বাহিরের লোক না আসিলেও সে গ্রাহ্য করে না, বুড়া বয়সে কোথায় গিয়া মরিবে সে ভাবনাও তাহার নাই।

মঙলাট উঠিয়া, চা খাইয়া বাহির হইয়া গেল। মা তান্ আর কিছুক্ষণ শুধু শুধু বসিয়া থাকিয়া বুড়ি লইয়া বাজারে চলিল।

খাওয়া-দাওয়া সারিয়া মঙলাট সকাল সকাল বাহির হইয়া গেল। যাইবার আগে, ঘরে ঢুকিয়া পোষাক-পরিচ্ছদ বদল করিল, জুতাজোড়াও পালিশ করিয়া লইল। মা তান্ বারান্দায়

বসিয়া তাহার রকম দেখিতে লাগিল এবং মনে মনে চটিতে লাগিল। ছোঁড়ার রকম দেখ না। যেন কোন রাজনন্দিনীর সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছে। মেয়েটা দেখিতেই বা কি এমন ভাল? সংমায়ের ঝাঁটা খাইয়া ত দিন কাটে, পরনের লুঙ্গীও দুখানার বেশী চারিখানা আছে কিনা সন্দেহ।

মা পোয়ে ফুল বিক্রী করিয়া আসিয়া দেখিল, মা তান্ আপন মনে বিড় বিড় কবিয়া বকিতেছে। জিজ্ঞাসা করিল, “কার সঙ্গে ঝগড়া হল আবার আজ?”

মা তান্ বলিল, “ঝগড়া হতে যাবে কেন লা? আমার কি ঝগড়া করাই ব্যবসা?”

মা পোয়ে অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, “না, তা কেন। চটে রয়েছিস্কিনা, তাই জিগ্গেস করছি।”

মা তান্ বলিল, “চটি কি সাথে? চটি মানুষের আঙ্কেল দেখে। মরুকগে থাক্। আয় আয় খাবি আয়।”

খাইয়া-দাইয়া মা পোয়ে অভ্যাস-মত নাক ডাকাইয়া নিদ্রা সুরু করিল। মা তান্ খানিকক্ষণ চুকট ফুকিয়া উঠিয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। ঘরের কোণে তাহার বাস্ক-প্যাটারা বছরের পব বছর একই ভাবে সাজানো আছে, কোনদিন সে খুলিয়াও দেখে না। আজ কি মনে করিয়া সে বড় কাঠের বাস্কটা খুলিয়া ফেলিল। তাহার ভিতর মূল্যবান রেশমী লুঙ্গী, মিহি কাপড়ের লেশ দেওয়া জামা, গলায় ভড়াইবার পাতলা রেশমের টুকরা, থরে থবে সাজান। কোণে একটা ছোট কাজ-করা হাতীর দাঁতের বাস্ক। সেটাও খুলিয়া দেখিল। সব ঠিক আছে। নীলা-বসান চূড়, চুনীর বোতাম, হীরার কানফুল, হীরার আংটি, চুনী-বসানো দু'ছড়া সোনাব গলাব হার, সোনার গিল্টি-করা পায়েব মল। এসব মা তানের বিগত বধূজীবনের সম্পত্তি, এখন আব কোনো কাজে লাগে না। মুখে মাখিবার তানাখা, বড় বড় পাখব বসানো চিক্কণী, মখমলের চটিজুতা পৰ্বস্ত সে তুলিয়া রাখিয়া দিয়াছে। কাহার জন্যই বা রাখিয়াছে? একটা মেয়েও জন্মায় নাই পেটে যে, তাহাকে সাজাইয়া দেখিয়া সুখ হইবে। মরিলে পর এসব কোন্ হতভাগীর গর্ভে যাইবে কে জানে?

পোষাক-পরিচ্ছদগুলির দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া, সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাস্কের ডালাটা বন্ধ করিয়া দিল। মনে মনে বলিল, “থাক, এখন আবার এ পরতে গেলে লোকে হাসবে। যখনকার যা, তখনকার তা।”

লিকালে মা তান্ আবার বাজার যাইতেছে দেখিয়া মা পোয়ে বলিল, “তরকারি ত ঢেব রয়েছে, আবার বাজার যাচ্ছিস্ যে?”

মা তান্ বলিল, “একটু মাংস নিয়ে আসি। অনেক দিন মাংস খাই নি।”

মা পোয়ে বলিল, “তা ছোঁড়া চলে গেলে আনলেই ত হয়। এখন রাঁধলে তাকেও ত দিতে হবে?”

মা তান্ বলিল, “তা দেব এখন। ছোঁড়া খায় ত এই কটা। সারাক্ষণ কিসের চিন্তায় মজে আছে ঠিকানা নেই।”

মা পোয়ে অবাধ হইয়া চুপ করিয়া গেল। মা তানের এ ধরনের বদান্যতা কেহ কখনও দেখে নাই।

মঙলাট ফিরিয়া আসিল সন্ধ্যার সময়। চা খাইয়া, রাস্তার ধারে বসিয়া আকাশপাতাল ভাবিতে লাগিল।

মা পোয়ের উপর রন্ধনের ভার দিয়া মা তান্ও বাহিরে আসিয়া আসিল, কিন্তু গল্প মোটেই জমিল না। মঙলাট অন্যমনস্কভাবে দু-একটা উত্তর দেয়, আবার চুপ করিয়া ভাবে। মা তান্ শেষে বিবস্ত হইয়া উঠিয়া গেল; ছোঁড়াকে ধরিয়া তাহার চড়াইতে ইচ্ছা করিতেছে। ঢং দেখ না!



রাত্রি তাহার অত যত্নে প্রস্তুত মাংস তাহাকে এবং বুড়ী মা পোয়েকেই খাইতে হইল। মঙলাট কিছুতেই খাইল না, চাদর মুড়ি দিয়া নিদ্রার ভাগ করিয়া শুইয়া রহিল।

সকাল বেলা মা তান বলিল, “আজ শরীরটা ভাল ঠেকছে না। কাল অতগুলো মাংস খাওয়া ঠিক হয়নি। তুই আজ ফুল বেচতে যাসনে, রান্নাটা একটু দেখ।”

মা তানের শরীর খারাপ হইতে জীবনে কেহ কখনো দেখে নাই। কিন্তু তাহার মেজাজকে মা পোয়ে সমীহ করিয়া চলিত, কাজেই আর উচ্চবাচ্য না করিয়া সে থাকিয়া গেল। মা তানের প্রতি তাহার ভালবাসাও ছিল খানিকটা, কাজেই একটু চিন্তিতও বোধ করিতে লাগিল। কেহ মাগীকে গুণটন করিল নাকি? ঐ ছোঁড়াটার ধরনধারণ ত ভাল ঠেকে না। সব মানুষ চলিয়া গেল, সে কিসের জন্য মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছে? কাজও ত তাহার কিছু দেখা যায় না। সে আসার পব হইতেই মা তানের একটু পরিবর্তন সূর হইয়াছে। কিন্তু মা তানকে কিছু বলাও যায় না এ বিষয়ে। সে হয়ত তখন ঝাঁটা লইয়া তাড়া করিয়া আসিবে।

মঙলাট সকাল হইতেই বাহির হইয়া গিয়াছিল, চায়ের জন্যও অপেক্ষা করে নাই। মা তানের মেজাজ ইহাতে আরো বিগড়াইয়া গিয়াছিল। এককাল এত মানুষের সঙ্গে সে কারবার করিয়াছে, কাহাকেও লইয়া তাহাকে এতটা ভুগিতে হয় নাই। কেন যে সে এত বিচলিত হইতেছিল, তাহা নিজেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছিল না। মঙলাটের দৃষ্টি নিতান্তই অন্য স্থানে, না হইলে মা তানেরও মা পোয়ের মত সন্দেহ হইত যে যুবক তাহাকে গুণ করিয়াছে। কথটা মনে হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু একটা দীর্ঘনিশ্বাস তাহার বুক হইতে বাহির হইয়া আসিল। গুণ করিলেও হয়ত ছিল ভাল। কিন্তু কি দেখিয়া করিবে? একদিকে সুন্দরী যুবতী, আর একদিকে বিগত-যৌবনা রূপহীনা হোটেলওয়ালী। মঙলাটকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু কি এ দৈবের বিড়ম্বনা! এতদিন সে নিরুপদ্রবে কাটাওয়া, এই বুড়া বয়সে মজিল কেন? তাহার কাজে মন লাগে না, সারাক্ষণ প্রাণ ছটফট করে। অপরিচিতা যুবতীর প্রতি হিংসায় জ্বলিতে থাকে। মঙলাটকে সম্মুখে দেখিলে, তাহার সহিত দুইটা কথা বলিতে পারিলে সে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পায়। ছোঁড়া কোথা হইতে মরিতে আসিল? সে কি যাদু জানে? দুই তিন দিনের ভিতর মা তানের এমন অবস্থা হইল কি করিয়া?

মা তান দুপুরে ভাত পর্যন্ত খাইল না, মঙলাটের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল। মা পোয়ের ঠোট অবধি নানা কথা ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু ভয়ে সে কিছু বলিল না। অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল, কি কাণ্ডই মা তান করিতেছে, লোকে বলিবে কি? তাহার পরিচিত এক ফুঙ্গী ছিল, তুক্তাক্, বাড়-ফুঁকে তাহার নাম খুব। মা তানের ভূত ছাড়াইবাব জন্য তাহার শরণ লইবে কি না, মা পোয়ে ভাবিতে লাগিল।

মঙলাট ফিরিয়া আসিতেই মা তান গলা চড়াইয়া ঝগড়া সুরু করিল। খাওয়ার সময় খাওয়া নাই, শোয়ার সময় শোওয়া নাই, এসব কি ঢং? কে তাহার ভাত আগলাইয়া বসিয়া থাকিবে? এখানে তাহার দশটা বিয়ে-করা বৌ বসিয়া আছে না কি?

মঙলাট অবাক হইয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। মা তানের এমন মূর্তি আগে সে কখনও দেখে নাই। যে কদিন সে এখানে আছে, মা তান তাহাকে খুবই যত্ন করিয়াছে, এমন কি সে আছে বলিয়া অন্য যাত্রীদের সঙ্গে গালাগালি বকাবকি করে নাই। সুতরাং এমন ভাবে আক্রান্ত হইয়া সে একেবারে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল।

মা তান নিশ্বাস লইবার জন্য থামিলামাত্র সে বলিল, “আমার জন্য বসতে ত আমি বলিনি। ভাত ফেলে রাখলেই পারতে। আমার অনেক দূর যেতে হয়েছিল, তাই দেরি হয়ে গেল।”

মা তান সুর নরম করিয়া বলিল, “একটা মানুষ সঁকাল থেকে গলা শুকিয়ে বসে আছে জানলে, কে কাঁড়ি গিলতে বসতে পারে? হাজার হোক, আমার ঘরে রয়েছ ত?”

মঙ্‌লাটের চোখ দুটো কেমন যেন করুণ হইয়া আসিল। সে বলিল, “তিন দিন আগে ত আমায় মোটে দেখেছ, অথচ আমার জন্যে এত মায়া তোমার? আর যারা কত বছর ধরে দেখেছে, তারা পারে ত আমার গলায় ছুরি দেয়।”

মা তান্ বলিল, “উপরের গিন্টি দেখে ভুললেই ঐ দশা হয়। সব গিন্টির নীচে সোনা থাকে না।”

মঙ্‌লাট কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, “কার কথা বলছ? আমি গিন্টি দেখে ভুলেছি কে তোমায় বললে?”

মা তান্ বলিল, “তোমার কথাই বলছি। আমায় কেউ কিছু বলেনি, কিন্তু কপালে চোখ ত দুটো আছে? বায়োঙ্কোপে কার দেখা পেয়েছ তাও জানি, আর কার লোভে চিমেগুইন্ ছুটছ দিনে দশবার করে, তাও জানি।”

মঙ্‌লাট জিজ্ঞাসা করিল, “মা শিন্কে তুমি চেন নাকি?”

মা তান্ বলিল, “চিনি না, তবে ওদের বাড়ীর কাছেই আমার ভাইয়েব বাড়ী। অনেকবার ওদের দেখেছি, ওদের হালচাল সবই জানি।”

মঙ্‌লাট কি যেন বলিতে গিয়া চুপ করিয়া গেল। মা পোয়েও সেই সময় নিদ্রা হইতে উঠিয়া পড়ায়, আর কথাবার্তা কিছু হইল না।

ইহার পরের দিনটা কাটিল প্রায় একইভাবে। মঙ্‌লাট সমস্ত দিনটা বাহিরে ঘুরিয়াই কাটাইল। মা তান্ সেদিনও শরীর খারাপের ছুতা করিয়া মা পোয়েকে ধরিয়া রাখিল, এবং খাওয়া-দাওয়া ছাড়িয়া সারাদিন বারান্দায় বসিয়া চুরুটের পর চুরুট ধংস করিতে লাগিল। মা পোয়ে রান্নাঘরে বসিয়া কত কি যে মানত করিতে লাগিল, তাহার ঠিকানা নাই। ফুঙ্গীর কাছে যাওয়া সে একরকম স্থির করিয়া ফেলিল। রাত্রের রান্না হইয়া গেলেই সে ভাইবিকে দেখিবার ছুতা করিয়া বাহির হইবে।

কিন্তু অত কষ্ট আর তাহাকে করিতে হইল না। বিকেল বেলা মঙ্‌লাট অনেকগুলি জিনিসপত্র কিনিয়া ফিরিয়া আসিল। তাহার চেহারা অত্যন্ত স্নান ও বিষন্ন। মা তান্ তাহার অপেক্ষায় বারান্দায় বসিয়াই ছিল। যুবককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কি সব এত সওদা করে নিয়ে এলে?”

মঙ্‌লাট বলিল, “এ সব আমার বাবার ফরমাশী জিনিষ। কাল ভোরের ট্রেনেই আমি বাড়ী চলে যাব।”

মা তানের বুকের ভিতরটা হঠাৎ ঠাণ্ডা হইয়া আসিল। চলিয়া যাইবে, কালই? তাহার মুখ দেখিতে পাইবে না, কথা শুনিতে পাইবে না। উঃ, জগৎটা কি ভয়ানক কালো, কি বিরাট শূন্যতা এখানে।

কিন্তু মুখে বলিল, “ভালই, দেশে গিয়ে কাজকর্মে মন দাও। রাস্তায় রাস্তায় ছুঁড়ীর পিছনে ঘুরলে ত আর ভাত কাপড় মিলবে না?”

মঙ্‌লাট নীরবে জিনিষপত্রগুলো গুছাইয়া বাস্ত্রে ভরিতে লাগিল। মা পোয়ে একটু দূরে সরিয়া যাইতেই মা তান্ নীচু গলায় জিজ্ঞাসা করিল, “মা শিন্ তোমায় বিয়ে করছে না তা হলে?”

মঙ্‌লাট মুখ না তুলিয়াই বলিল, “তার ত আশা কিছু দেখছি না।”

মা তানের মনের পাষাণ ভারটা অনেকখানি যেন লঘু হইয়া গেল। জগতে আশার বিনাশ নাই। মা তান্কে বিবাহ করিতে ইচ্ছা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম, তবু যতক্ষণ মা শিন্কে সে বিবাহ না করিতেছে, ততক্ষণ মা তান্ মনে মনে আকাশ-কুসুমের মালা গাঁথিতে ছাড়িবে না।

মঙলাট যাইবার সময় টাকাকড়ি চুকাইয়া দিতে আসিল। মা তান্ টাকা লইল না। মঙলাটের প্রসারিত হস্ত ঠেলিয়া দিয়া বলিল, “তোমার কাছে টাকা নেব না।”

মঙলাট বিস্মিত হইয়া বলিল, “কেন?” মা তান্ বলিল, “আমাব মান্তি আছে, মাসে একজন লোককে বিনা খরচায় খাওয়াই। আবার রেস্তুনে এলে এখানেই উঠো কিন্তু।”

“নিশ্চয়ই,” বলিয়া মঙলাট রিক্শ ডাকিয়া চাড়িয়া বসিল, এবং দেখিতে দেখিতে চোখের অদৃশ্য হইয়া গেল।

মা তানের কাছে বিশ্বসংসার যেন বিশ্বাদ নিরর্থক হইয়া গেল। পাঁচ দিন আগেকার তাহার যে জীবন, আব আভকাব জীবন, কি বিপুল বাবধান! পূর্বের জীবনের নিশ্চিন্ততা, স্বাধীনতার ভিতর আর তাহার ফিরিবার উপায় নাই। কোথা হইতে, কেমন কবিয়া, এ কঠিন মাথার কঁাস তাহাব গলায় আসিয়া জড়াইল? কোথায় তাহার মুক্তি? যাহা পাইবার নয়, তাহারই জন্য মাথা কুটিয়া কি তাহাব চিরটা দিন কাটিয়া যাইবে? জগতে কাহাবও অনিষ্ট সে কোনদিন করে নাই পাবশ্রম করিয়াছে, খাইয়াছে, তবে কেন দেবতা তাহাকে এমন দুঃখ দিলেন? এত শুধু দুঃখ নয়, ও লজ্জাও যে সুগভীর। কাহারও সহানুভূতি সে পাইবে না, অন্যের হাস্যব খোরাকই ইহাতে জুটিবে। ঘরের কোণে রক্ষিত বুদ্ধমূর্তির সম্মুখে সে মাথা কুটিতে লাগিল। সে মুক্তি চায়, যেমন কবিয়া হোক। ভালবাসাহীন জীবনও তাহার স্বর্গ ছিল, কিন্তু এই বেড়া-আগুনের ভিতর সে কেমন কবিয়া বাঁচিবে? দেবমূর্তির প্রশান্ত মুখে কোথাও কবণার রেখা দেখা দিল না।

মা তান্ সব দিক দিয়াই কেমন একরকম হইয়া গেল। সে খায় না, ঘুমায় না, কাজকম দেখে না। হঠাৎ সাজ পোষাকের ঘটা তাহাব লাগিয়া গেল। এখন সে রেশমেব লুঙ্গী পরে, লেশ-বসানো জামা পরে, চুলের যত্ন করে। মন্ডালঘের দিকের ট্রেন আসিবার সময় হইলেই সে একেবারে অস্থিরভাবে ঘর আর বাহির কবে। মঙলাট আবার নিশ্চয়ই আসিবে, অস্তিত্ব হারো একবার ত আসিবে? মা তানের জন্য নাই আসিল, কিন্তু তাহার প্রেয়সী মা শিনও ত এই সহরেই বাস কবে।

একদিন চিমেগুহিনে ভাইয়ের বাড়ীতে সে গিয়া হাতির হইল। তাহার নূতন সাজসজ্জা লইয়া ভাই, ভাইয়ের বউ অনেক রসিকতা করিল, বর কবে আসিতেছে তাহারও খোঁজ কবিল।

মা তান্ সে সব কথা উড়ইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “পাশের বাড়ীর ওরা কোথায় গেল?”

ভাজ বলিল, “একটু দূরে ঘর নিয়েছে কম ভাড়াতে। মেয়েটাও ত বিয়ে শুন্ছি।”

মা তানের মাথা ঘুরিতে লাগিল। কোনমতে জিজ্ঞাসা করিল, “কোথায়? কার সঙ্গে?”

তাহার ভাজ বলিল, “কে এক ছোঁড়া আসে রোজ, তার মাকে জিগ্গেস করলে বলে এখানে কোন দোকানে কেরানীর কাজ করে! ঠিক কিনা জানি না।”

মা তান্ আর বসিল না। বাড়ী ফিরিবার পথে মানং করল। মা শিনের বিবাহ যদি মঙলাট রেস্তুনে আসিবার পূর্বে হইয়া যায় তাহা হইলে সে প্যাগোডায় সোনা দিবে। ট্রেন আসিবার সময় তাহার ব্যাকুলতা আরো যেন বাড়িয়া উঠিত। সে ঘরের ভিতর টিকিতে পারিত না। সাজ-গোজ করিয়া ফুটপাথের উপর পায়চারি করিত। বড়ী মা-পোয়ে বুদ্ধমূর্তির সম্মুখে মাথা কুটিয়া কুটিয়া কপাল ফুলাইয়া ফেলিল, ফুঙ্গীকে চুপি চুপি কত পয়সা দিল তাহার ঠিকানা নাই, কিন্তু মা তান্কে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিল না। পাড়ার ছেলে-মেয়েরা মা তান্কে লইয়া রঙ্গ করিয়া ছড়া বাঁধিতে লাগিল।

আবার একদিন ছড়মুড় করিয়া একপাল যাত্রী আসিয়া জুটিল। যতক্ষণ দূর হইতে তাহাদের দেখা যাইতেছিল, ততক্ষণ মা তান্ একেবারে আগ্রহে ঔৎসুক্যে অধীর হইয়া ফুটপাতে

যোরাঘুরি করিতেছিল। বুড়ী মা-পোয়ে মনে মনে দেবতাকে ধন্যবাদ দিতেছিল, কাজে কর্মে ডুবিয়া থাকিলে, মা তানের ঘাড়ের ভূত নামিয়া যাইবে।

কিন্তু কার্যতঃ যাহা ঘটিল, তাহাতে বুড়ী মা পোয়ে একেবারে সকল আশা ছাড়িয়া দিল। যাত্রীর দল কাছে আসিয়া পৌটলা-পুটলি নামাইবার জোগাড় করিতেছে, এমন সময় মা তান্ বলিল, “এখানে না হে, আরো একটু এগিয়ে মঙ চিটির হোটেলের ঘাও। আমি হোটেলের ব্যবসা তুলে দিয়েছি।”

যাত্রীর দল অবাক হইয়া মা তানের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহারা পৌটলা-পুটলি তুলিয়া লইয়া আবার অন্য হোটেলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল।

মা পোয়ে মাথায় চড় মারিয়া বসিয়া পড়িল। শয়তানে মাগীকে একেবারে গিলিয়া খাইয়াছে। মা তানের ভয় ভুলিয়া গিয়া সে চিৎকার করিয়া উঠিল, “তুই কি ক্ষেপলি মা তান্? এ ছোঁড়ার জন্যে নিজের গলায় ছুরি দিবি? সে ত শুনলে হাসবে। তোর কি আর বিয়ের বয়স আছে?”

মা তান্ হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল। মা পোয়ের কথার উত্তর না দিয়া ঘরের ভিতরে চলিয়া গেল। মা পোয়ে ঠিকই বলিয়াছে। মঙলাট হাসিবে। মা তান্ মরিতেছে বটে, কিন্তু ইহাতে সে ছাড়া আর কেহ দুঃখের কারণ দেখিবে না। বুড়ী মরিতেছে যুবককে ভালবাসিয়া, এ ত হাসিরই জিনিষ।

তাহার মাথায় যেন রক্ত চড়িতে লাগিল। এত অধঃপতন তাহার হইয়াছে। এখন তাহার সামনেই তাহাকে লইয়া লোকে হাসিহাসি করে! ছোট ছেলেমেয়েও লো ছড়া বলে, চৈচায়, হাততালি দেয়। একমাস আগে, এ পাড়ায় কেহ তাহার মুখের উপর একটা কথা বলিতে সাহস করিত না। দু পয়সা ধার পাইবার আশায় কত লোক আসিয়া হাতজোড় করিত।

কাহার জন্যে সে এমন করিয়া মরিতেছে? মঙলাট কখনও তাহার হইবে না। দেবমূর্তির সামনে সে পড়িয়া রহিল, প্রাণপণে প্রার্থনা করিতে লাগিল, তাহার মন হইতে এই অসম্ভবের প্রলোভন কাটিয়া যাক্, সে আবার মানুষের মত হইয়া উঠুক।

পরদিন সকালে ট্রেনেব সন্মুখ সে জোর করিয়া নিজেকে সংযত করিল। ঘরের ভিতরেই বসিয়া রহিল। ফুলফুল লইয়া দেবতার পূজার জোগাড় করিতে লাগিল।

হঠাৎ শুনিল বাহিরে কে জিজ্ঞাসা করিতেছে, “মা তান্ ঘরে নাই?”

এ যে মঙলাটের গলা! দেবতা, সংকল্প, সব ভুলিয়া সে ছুটিয়া বাস্তির হইয়া আসিল। সতাই ত মঙলাট।

তাহাকে দেখিয়া মঙলাট বলিল, “ওখানে থাকতে শুনেছিলাম, তুমি হোটেল তুলে দিয়েছ, তবু একবার দেখে যেতে এলাম।”

মা তান্ ব্যগ্র হইয়া বলিল, “কিসের হোটেল তুলে দিয়েছি? জিনিষপত্র নামিয়ে রাখ। মাঝে শরীর ভাল ছিল না বলে যাত্রী ফিরিয়ে দিয়েছিলাম।”

মঙলাট জিনিষ নামাইয়া রিক্‌শওয়ালাকে বিদায় করিয়া দিল। মা তান্ ছুটিয়া গিয়া তাহার জন্য চা লইয়া আসিল। মা পোয়ে রাগে বিড়বিড় করিতে করিতে ফুলের ঝুড়ি লইয়া চলিয়া গেল।

মা তান্ তাড়াতাড়ি বাজার করিয়া আনি, বেশ ভাল দেখিয়া। রান্নার জোগাড় করিতে করিতে বলিল, “এবার খাওয়া-দাওয়া করবে ত ঠিক মত? না সেবারের মত খালি টো টো করবে?”

মঙলাট বলিল, “কাল ঠিক করে বলতে পারব।”

মা তান্ জিজ্ঞাসা করিল, “তার মানে কি? আজ বলতে পার না কেন?”

মঙ্‌লাট হান হাসি হাসিয়া বলিল, “আজ ত গিয়ে দেখি। শুনছি মা শিনের অনা কোথায় সম্বন্ধ হচ্ছে। তা যদি হয়, তাহলে এরপর জেলের ভাত খাব, না হয় ফাঁসি যাব।”

মা তান্‌ রান্না ফেলিয়া কাঠের পুতুলের মত বসিয়া রহিল। মা শিনের জন্য মঙ্‌লাট ফাঁসি যাইতেও প্রস্তুত। এততেও কি মা তানের আক্কেল হইবে না? খানিক পরে তাকাইয়া দেখিল মঙ্‌লাট চলিয়া গিয়াছে।

রান্নার জোগাড় তেমন পড়িয়া রহিল। মা তান্‌ দরজায় তালা লাগাইয়া বাহির হইয়া পড়িল। মোটর-বাসে চড়িয়া একেবারে চিমেগুইনে উপস্থিত হইল।

ভাজের কাছে খোঁজ লইয়া সে মা শিনের বাড়ি শীঘ্রই বাহির করিয়া ফেলিল। মা শিন বাহিরে বসিয়া উল বুনিতেছিল, মা তান্‌কে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কাকে চাও? মাকে ডেকে দেব?”

মা তান্‌ তাহার পাশে উবু হইয়া বসিয়া বলিল, “না, মাকে দরকার নাই, আমি তোমার কাছেই এসেছি।”

যুবতী অবাক হইয়া বলিল, “কিন্তু তোমাকে ত আগে কখনও দেখিনি।”

মা তান্‌ বলিল, “তা নাই বা দেখলে? আমি তোমায় অনেকবার দেখেছি। মঙ্‌লাটকে জান ত? আমি তার আপনার লোক।”

যুবতীর মুখের ভাব বদলাইয়া গেল। একটু কঠিন সুরে বলিল, “তা কি মনে করে এসেছ? মঙ্‌লাট আবার এখানে এসেছে না কি? তাকে এমুখো হতে বারণ করো, অনর্থক একটা খুনোখুনি হবে।”

মা তান্‌ বলিল, “তুমি তাকে বিয়ে করতে চাও না কেন? তোমার কেরানী কি তার চেয়ে দেখতে সুন্দর?”

মা শিন্‌ হাত তুলিয়া একটা সোনার চুড়ী দেখাইল। বলিল, “দেখেছ? সে দিয়েছে। তোমার মঙ্‌লাটকে নিঙড়লেও এক ফোঁটা সোনা বেরোবে না।”

মা তান্‌ হি-হি করিয়া হাসিতে লাগিল। বলিল, “এব জন্যে? আচ্ছা, তুমি মঙ্‌লাটকে বিয়ে যদি কর, যত সোনা-দানা চাও সব পাবে।”

যুবতী বিবক্ত হইয়া বলিল, “কথায় টিড়ে ভেজেনা গো। চোখে দেখলে বিশ্বাস হবে।”

মা তান্‌ বলিল, “তা আমার সঙ্গে যাও যদি ত দেখাতে পারি।”

যুবতী কি মনে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, “আচ্ছা, একটু দাঁড়াও, মাকে যা হোক একটা কিছু বলে আসি। না হলে চোঁচিয়ে মরবে।”

মা তান্‌ বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে চটি পায়ে দিয়া মা শিন বাহির হইয়া আসিল, বলিল, “চল। কোথায় যাবে? রেস্‌নে ত?”

মা তান্‌ বলিল, “হ্যাঁ।” আধ ঘণ্টার মধ্যে তাহারা মা তানের বাড়ি আসিয়া পৌঁছিল। তখনও মা পোয়ে বা মঙ্‌লাট কেহই ফেরে নাই। তালা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া মা তান্‌ বলিল, “এই দেখ।”

নিজের কাপড়ের বাস্‌, গহনার বাস্‌ সে খুলিয়া ফেলিল, বলিল, “এর ভিতর যা কিছু আছে সব। তোমার কেরানী এত দিতে পারবে? এখনই দেব। কিন্তু এখানে দেবতা বসে, তাঁর সামনে শপথ কর যে মঙ্‌লাটকে বিয়ে করবে।”

লোভে, আনন্দে যুবতীর দুই চোখ জ্বল্‌ জ্বল্‌ করিতে লাগিল। সে দামী রেশমী লুঙ্গীগুলির উপর হাত বুলাইয়া দেখিতে লাগিল। আংটি হাতে পরিয়া দেখিল, গলায় হার বুলাইয়া দেখিতে লাগিল, নীলার চূড় দুইটা উন্টাইয়া পাণ্টাইয়া দেখিতে লাগিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, “সব দেবে আমায়?”

মা তান্ বলিল, “সব দেব, যদি ওকে বিয়ে করে মান্দালে চলে যাও এখন।”

যুবতী মিনিট দুই ভাবিয়া লইল, তাহার পর বলিল, “আচ্ছা।” মা তান্ তাহাকে বুদ্ধমূর্তির সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইল।

গাভী ডাকিয়া তাহাকে গহনা ও কাপড়ের বাস্তু সমেত যুবতীকে উঠাইয়া দিল। ঘরে আর প্রবেশ করিল না। মা পোয়ের অপেক্ষায় বাহিরে বসিয়া রহিল।

মা পোয়ে বেলা বারোটায় আসিল। মা তান্কে বাহিরে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কি, এমন করে বসে আছিচ্ যে? রান্না চড়াসনি?”

মা তান্ বলিল, “না, ওসব থাক এখন। তুই যা পারিস দুটো রোঁধে খাস্। মঙ্‌লাট এলে তাকে চিমেণ্ডাইন চলে যেতে বলিস্, আমি তার সব ব্যবস্থা করে দিয়েছি।”

মা পোয়ে বিস্থিত হইয়া বলিল, “তুই আবার কি ব্যবস্থা করলি? তুই কোথায় যাচ্ছিচ্?”

মা তান্ ঘরের ভিতরের শূন্য কোনটা দেখাইয়া বলিল, “ঐ দেখ। তাহলেই বুঝবি।”

মা পোয়ে একেবারে বসিয়া পড়িল। চীৎকার করিয়া বলিল, “সব দিয়ে দিয়েছিচ্ পোড়াকপাল! বুড়ো বয়সে তোর গতি হবে কি?”

মা তান্ বলিল, “গতি যাতে হয়, সেই জনোই দিলাম। ওর লোভ মন থেকে না গেলে আমার আর রক্ষে ছিল না। কুকুরের মরণ হত। এখন আবার মানুষের মত হলাম। জানি, তাকে আর কোনদিন চোখে দেখব না। কতদিনের জন্যে পিণ্ড যাচ্ছি, তুই ঘর-দোর দেখিস, যাত্রী এলে রাখিস্।”

মা পোয়ে তবু বিলাপ করিয়াই চলিল, “অত টাকাব জিনিষ দিয়ে দিলি?”

মা তান্ বলিল, “যাক গে। কোন্ কাজে আমার লাগত? মেয়েও নাই, ছেলেও নাই। টাকা এখনও কিছু আছে, আরো যতদিন বাঁচি, রোজগারই কবব। মল্লবাব সময় ভাইকে বলে যাবো, আমার নামে যেন প্যাগোডার দু হাত জায়গা সোনা দিখে বাঁধিয়ে দেয়।”

মা তান্ খালি হাতেই বাহির হইয়া গেল। বুড়ী মা পোয়ে বিলাপ করিয়াই চলিল। শয়তানের উদ্দেশ্যে গালাগালি করিতে লাগিল।

## যীহুদী খগেন্দ্রনাথ মিত্র

॥ ১ ॥

নিস্তরক মকভূমি পাবে সূর্য ডুবে গেল। প্রাচীন ও অপরিচ্ছন্ন শহরটার মাথায় ধূলি ও সন্ধ্যার সোনালি আলোয় আজি দেওয়া একখানা ওড়না ধীরে বিছিয়ে যাচ্ছে।

“সন্ধ্যা হ’য়ে আসছে, আজকের মতন যাই।”

“রোজই এমনি কোরে চলে যাবে?” বোলে জুবোদা তার তপ্ত কোমল হাত দুখানি আমার কাঁধের ওপর রেখে বুকের কাছে আরও সরে এল।

“কিন্তু না গিয়ে উপায় কি?”

“রাতটাও যাতে থাকতে পার তার কি উপায় হল?”

“চেষ্টা কোরছি— এমনি কোরে আর বিদায় নিতে হবে না বেশী দিন।”

এ কথায় তার ভরাট দীর্ঘ দেহটা আনন্দে ঢেউ খেলে উঠল। সে পশ্চিমের মতন তার সজীব মুখখানাকে আমার ঠোঁটের দিকে তুলে ধরলে।

কিছুক্ষণ পরে যখন জুবোদাকে ছেড়ে বোগদাদের ধুলোভরা পথ দিয়ে আমাদের ছাউনির দিকে চলেছি, ততক্ষণে সন্ধ্যা একটু ঘোরালো হয়ে এসেছে। মনটা আমার তখন আনন্দে এমন ভরে উঠেছিল যে ইচ্ছে কোরছিল এই গোটা পৃথিবীটাকেই বুকের ভেতর খুব জোরে চেপে ধরি। আর আমার যা কিছু আছে, যদি কেউ এসে চায় ত সব বিলিয়ে দিই। ঠিক সেই সময় একটা ভিখারী আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। পকেটে আমার টাকা পাঁচেকের ওপর ছিল। সে হাত পাততেই একটা আধূলি দিয়ে দিলুম।

॥ ২ ॥

টাইগ্রিস নদী একে-বেকে মরুপথে পারস্য উপসাগরের দিকে ছুটে চলেছে। তারি সবস তটের একটা খেজুর কুঞ্জে আমাদের ছাউনি। চারিপাশে দিগন্তের কোলে কোলে বিছানো শুষ্ক তপ্ত বিজন মরুভূমি। আমাদের ছাউনি থেকে প্রায় এক মাইল দূরে ছেলেবেলায় গল্পে শোনা এই বোগদাদ নগরী।

প্রায় আট মাস হয়ে গেছে আমরা এখানে এসেছি। এখানকার মতন জীবন্ত সৌন্দর্যের এমন প্রাচুর্য ও নিদারুণ অপচয় আর কোথাও দেখিনি। হয় ত মরুভূমি বোলেই এটা সম্ভব। এই আট মাসে এদের ভাষাটাকে এক রকম দূরন্ত কোরে নিয়ে, সৈনিকের নিয়ম ও নিষেধকে লঙ্ঘন কোরে, জুবোদার সঙ্গে গোপনে মিশে গেলাম। প্রতি সন্ধ্যায়ই তাকে এমনি কোরে ছেড়ে চলে আসতে হয়। তার কারণ এরা আমাদের শত্রু। এদের সঙ্গে, বিশেষত এই গোলাপগুলির সঙ্গে আমাদের মিলন একেবারে নিষিদ্ধ। বিকেল ছটার পর সারা শহরে একটি আলো জ্বলতে পাবে না, বা কারুর পথ দিয়ে চলবার হুকুম নেই। অন্ধকার রাতের মতন একটা দুর্ভেদ্য রহস্য নিয়েই অপরিচ্ছন্ন শহরটা পড়ে থাকে।

সেদিন গভীর রাত্রে হঠাৎ ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। তাম্বুর পর্দার ফাঁকে তারাভরা আকাশখানা ঝিকমিকিয়ে উঠল। তার তলে ঘুমন্ত অসাড় শহরটার অস্পষ্ট ছায়া দেখতে পেলুম। মনে হ'ল, যেমন কোরেই হোক, এই সৈনিকের পোষাক খসিয়ে ফেলে, কেরানীগিরিতে ঢুকতেই হবে। না হলে জুবদাকে কিছুতেই একেবারে আপনার কোরে পেতে পাবি না। কোন দিন রক্তে লাল, কানানের নির্যোষ ও ধূমাচ্ছন্ন রণক্ষেত্রের মৃত্যুকোলাহলে আমার কণ্ঠটি চিরদিনের মতন ডুবে যাবে, কে জানে।

পর দিন ঘুম ভাঙ্গতেই মতলব ঠাউরাতে লাগলুম কি কোরে আমার কাজটা শেষ করা যায়। যারা সৈনিকপদ ছেড়ে কেরানীগিরিতে গিয়ে যোগ দিয়েছিল, তাদের কাছে পরামর্শ চাইলুম। কিন্তু তেমন কোন আশা কোথাও পেলুম না। তবু নিরাশ না হয়ে চেষ্টা কোরতে লাগলুম।

সেদিনও জুবদা আমায় জিজ্ঞাসা কোরলে— “কতদূর?”

“বাস্তু কি?” কথাটা হয় ত নিজেকেই সান্ত্বনা দেবার জন্যেই বল্লুম।

“না, এরকম কোরে চলবে না!” হঠাৎ তার গোলাপরাসা নরম গাল দুখানির ওপর দিয়ে চোখের জল নেমে এল। তার জলে-ভরা সরল চোখ দুটোতে চুমো দিয়ে, জল মুছিয়ে শান্ত করবার ছলে বল্লুম— “এ বাড়ীটা কিন্তু আমাদের ছাড়তেই হবে—”

“কেন, কোথায় যাবে?”

“ঐ যে রাস্তার শেষে নদীর দিকের বাড়ীটা—ঐটে আমরা নেব—কি বল?”

“বেশ ত, কিন্তু দেরী কোরছ কেন?”

“তবে এস আমাদের বিয়েটা হয়ে যাক—”

“এখন নয়; কাজটা তোমার আগে শেষ হোক—” কথাটা শেষ না কোরেই সে আমায় দুহাতে জড়িয়ে ধরে মুখের দিকে চাইলে। আমার একটা জায়গায় কেমন ব্যথা দিত—ঐই জন্যে যে, জুবদার কাছে আমি অকপট হতে পারিনি। অর্থাৎ আমি ক্রীশ্চান না হয়েও নিজেকে তাই বোলে পরিচয় দিতে বর্তমানে খুবই বাধত।

সেদিন আসবার সময় আমারও তাকে ছেড়ে আসতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, যেন তার সঙ্গে সেই শেষ দেখা। তাই তাকে বুকের ভেতর নিবিড় কোরে ধরেও সোয়াস্তি পাচ্ছিলাম না! আর এ ভাবটা দিন কয়েক সারা মন জুড়ে লেগে রইল।

কিন্তু যখন এ মিথ্যা উদ্বেগের কোন কারণই আর আমাদের চোখে পড়ল না, আনবা দুজনে বেশ শান্ত হয়ে উঠলুম। দিনগুলি বেশ ভরপুর সুখে কেটে যেতে লাগল।

॥ ৩ ॥

হঠাৎ একদিন তাম্বুতে ফিরে গিয়ে শুনলুম, পর দিন ভোরে আমাদের সেখান থেকে যাত্রা কোরতে হবে। কোথায়, এক ছাড়া— তা আব কেউ বলতে পারে না। তবে খুব সম্ভব যেখানে লড়াই হচ্ছে সেইদিকে।

বিছানাটার ওপর চুপ কোরে বসে পড়লুম! বোগদাদকে, জুবদাকে ছেড়ে যেতে হবে?

কারুর সঙ্গে ভাল কোরে কথা না বলে রাতখানাকে একরকম জেগেই কাটিয়ে দিলুম।

পর দিন ভোর হতে না হতে চারিদিকে সাজ সাজ। এতদিনকার এতবড় একটা ছাউনি এক নিমেষে কোথায় মিলিয়ে গেল। মরুভূমির ওপার থেকে সূর্য উঠতে না উঠতে আমরা সবাই প্রস্তুত। তার পর পথের লাল ধুলো উড়িয়ে আধঘুমন্ত শহরটার বুকের ভেতর দিয়ে সারে সারে আমরা চলতে লাগলুম।

“জুবদাদের বাড়ীর নীচে দিয়ে চলেছি। হঠাৎ তাদের দোতলায় একটা জানালা খুলে গেল। চেয়ে দেখলুম— জুবদার ঘুম-জড়ান মুখখানা তার ভেতর থেকে ভেসে উঠেছে।



চোখাচোখি হতেই আমি ইসারায় জানিয়ে দিলুম—বিদায়! সে যেন কেমন বিস্মিত হয়ে উঠল। তার পর স্নানমুখে বিদায়ের বাণী নিয়ে আমার দিকে কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

॥ ৪ ॥

একটা মাস চলে গেছে। বোগদাদ থেকে বহু দূরে চলে এসেছি। কিন্তু কোথায় এসেছি, জুবোদা তা জানে না, তাকে জানানাবও কোন উপায়ই তখন পাইনি।

একদিন সন্ধ্যা-বেলা বসে বসে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে হ'ল— যদি পালিয়ে যাই, দূরে—টাইগ্রিস পার হয়ে মরুভূমিকে পেছনে ফেলে রেখে পাহাড় পথে পথে জুবোদাকে সঙ্গে নিয়ে? ধরা পড়লে আমাব শাস্তি হবে, কিন্তু না পালিয়ে এখানে থেকে শাস্তির কন্মতি ত কিছু হচ্ছে না। কার জন্যে আমি মরতে চলেছি? আমার প্রাণ দিলে কার গৌরব বাড়বে? আমার দেশের? আমার দেশ ত ঐ বোগদাদ, যেখানে জুবোদা থাকে। কিন্তু আমার মন কিছুতেই পালিয়ে যেতে সায় দিলে না; আবার শান্তও হল না। সেইদিন থেকেই আমি পথঘাটের সব সন্ধান নিতে লাগলুম।

একজন রুঘের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। পর দিন তার সঙ্গে দেখা হতেই কথার ছলে পথঘাটের খবর নিতে লাগলুম। সে তাব দেশের এমন বর্ণনা কোরলে— বিশেষত গাঢ় নীল আকাশ-ছেঁয়া তুষারে ঢাকা ফুটফুটে সাদা ককেসাস পাহাড়মালা, ও তারি গায়ে শালের মতন জড়ান, পায়ের তলে কার্পেটের মতন বিছানো সবুজ ও গভীর বনের এমনি ছবি একে আমার চোখের সামনে ধরলে যে, আমি সেখানে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলুম। সে আরও বললে যে, পাহাড়ের কোল-ঘেঁষা অতবড় নীল সমুদ্রটা রয়েছে— তার কূলেও ত অনেকে আমার মতন এখান থেকে গিয়ে ছোট ছোট কুঁড়ে বেঁধে বাস কবে। বনের হরিণ ও পাখী শিকার কোরে, সমুদ্রের নানান রকম ঝিনুক ও শামুক বিক্রী করে, সুখে স্বাধীন ভাবে দিন কাটায়।

“কিন্তু আমি যে সেখানে গিয়ে বাস কোরতে চাচ্ছি— এ কথা তুমি বলছ যে?”

“নাও হতে পাবে—” বোলে সে ঠোঁটের কোলে একটা দুষ্কৃমি হাসি নিয়ে চলে গেল। একটু বিস্মিত হয়ে পড়লুম! আমার মনের কথাটা লোকটা কি কোরে জানতে পাবলে? মনে হ'ল, হয় ত সে নিজেও এমনি ধরনের কাজ অনেকবার কোরেছে বা অন্য লোককে কোরতে দেখেছে। কাজেই ওর কাছ থেকে আমার ভয়ের কোন কারণ নেই।

তার পাঁচ দিন পরে দিনের আলো ফুটতে না ফুটতে, রাইফেলটাকে ঘাড়ে ফেলে, টাক-কড়ি যা ছিল সব সঙ্গে নিয়ে, বোগদাদের দিকে যাত্রা কোরলুম। ধরা পড়বাব ভয়ে সৈনিকের পোষাকটা খসিয়ে আরবীয় বেশে চলেছি।

আমাদের নৌকাখানা টাইগ্রিসের খরস্রোতে দুর্দিন ছুটে চলেছে। নদীর দুটি তীরে, খুব দূরে দূরে ছোট ছোট খেজুর-কুঞ্জ, লম্বা লম্বা মন্দিরের মতন “টুঁত” ফলের গাছ। তারি ছায়ায় কোথাও কোথাও সুস্থ কুসুম-কলির মতন দু'একটি আরবী কিশোরী একলাটি মেঘ চরাচ্ছে। রবি কর তপ্ত মরুস্থলীর শুষ্ক বালি উড়িয়ে সারাদিন ধরে বাতাস হাহা কোবে ছুটে চলছে। আমি খুব সাবধানে চলেছি। কেন না এই নদীটির তীরে তীরে পাহারা।

আমি ভাবছিলাম— সেই দূর তুষারে-সাদা ককেসাসের পায়ের তলায় কুঙ্গসাগরের তটে বন প্রান্তে জুবোদা আর আমি কত সুখে দিন কাটাচ্ছি। সে সুখের আর সীমা নেই! দুখটাও তার পায়ে এসে ঠেকে হাঙ্গির ঢেউ হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। সেটা যেন আমাদের প্রেমটাকে আরও গাঢ় কোরে তুলছে। হঠাৎ আমার অজ্ঞানতে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল— জুবোদা। নৌকাওয়ালারা একটু চমকে উঠল; আমিও অপ্রস্তুত হয়ে নদীর ওপব দিয়ে পাল

তুলে একখানা বিপরীতগামী নৌকার দিকে চোখ ফেরালুম। দেখলুম, একটা যীহুদী পুরুষের পাশে বসে একটি তরুণী যীহুদী আমাদের নৌকার দিকে, বিশেষ কোরে আমায় দেখে, মুখটা একটু ঢেকে, নৌকার আচ্ছাদনীর আড়ালে গিয়ে বসল। মেয়েটার লজ্জা দেখে আমার একটু হাসি এল; আমিও মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বসলুম। কিছুক্ষণ পরে ফিরে দেখলুম—নদীর বাকের আড়ালে তারা অদৃশ্য হয়ে গেছে। ঠিক সেই সময়ে একজন সৈনিক হাত তুলে আমাদের থামতে বললে। আমি নৌকোওয়ালাকে চালাতে বলে রাইফেলটা হাতে তুলে নিলুম। প্রাণ দেব তবু ধরা কিছুতেই দেব না। সে লোকটাও তাব রাইফেলটা বাগিয়ে ধরলে, কিন্তু খুব কাতর সুরে বললে— “বড় বিপন্ন।” অবশেষে নৌকো ভিড়িয়ে, সন্দেহ সত্ত্বেও তাকে তুলে নিলুম। কিছুদূর গিয়ে দুজনের বেশ ভাব হয়ে গেল। শুনলুম, সেও আমারই মতন পলাতক। বোগদাদের আগেই নেমে যাবে— তার বেশী আর কিছু বললে না।

পর দিন—প্রায় বেলা শেষাশেষি—বোগদাদের সেই খেজুর-কুঞ্জ চোখে পড়ল! আমরা দুজনেই সেখানে নৌকো থেকে নেমে পড়লুম। সে একটা আরব পল্লীর দিকে চলে গেল— আমি ভয় ও আশা-আনন্দ বৃকে নিয়ে বোগদাদের দিকে ছুটতে লাগলাম।

শহরে ঢুকে কোন কিছুর দিকে না চেয়ে একেবারে সোজা এসে তাদের বাড়ীভেতর দাঁড়িয়ে ডাকলুম—

“জুবোদা—”

তার ভাই বেরিয়ে এল। আমায় দেখে খুবই একটু বিস্মিত হয়ে একটু পরে বললে—

“জুবোদা তার স্বামীর সঙ্গে তিন দিন আগে টাইগ্রিস দিয়ে ইউরোপ যাত্রা করেছে।”

“স্বামী—? ইউরোপ—?” আমি অবসন্ন দেহে দেওয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়ালুম। তাবা দুটিতে আজ অফুরন্ত সুখের আশায় পথে কেবলই চলেছে— আর আমাব মাথার ওপব শান্তির কঠিন উদ্যত দণ্ড।

## পুটুরানী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ভুবন মুখুজে বোড়োটা তুলিয়াছিলেন, সেটা হাতে করিয়াই ব্যস্তভাবে উঠিয়া পড়িলেন, গোলক চাটুজে প্রশ্ন করিলেন,— ওকি, ওঠ যে?

ছেলেগুলো পড়লো হুড়মুড়িয়ে, অন্ধকার, একবার দেখি..

গোলক চাটুজে হাতে টান দিয়া বলিলেন,— বস তুমি, এমন জনাট-খেলা ছেড়ে ওঠে না, পেন্নাদের নাম শুনেছ তো?

প্রশ্নের উদ্দেশ্যটা বুঝিতে না পারিয়া ভুবন মুখুজে বসিতে বসিতে একটু বিমুঢ়ভাবে বলিলেন,— কোন পেন্নাদের কথা বলছো দাদা? হিরণ্যকর্শপুর ছেলে, না, আমাদের জটে তেলীর ভাগনে!

হিরণ্যকর্শপুর সেই 'পুণি'র কথাই বলছি,— একটি মরে এই ছ'টিতে দাঁড়িয়েছে,— ইঞ্জিনের মুখে ফেলে দাও, আঁচড়টি পর্যন্ত...

এমন সময় পুটুরানী ভিতরের দয়ার তেলিয়া হৃদয় হইয়া বাহির হইতে হইতে বলিল— ও দাদু, বোধহয় তোংলা গণেশের দল বাগান টপকে...

অপবিচিত লোক দেখিয়াই একটু অপ্রতিভ হইয়া থামিয়া গেল; গোলক চাটুজে তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন— এইটি বুঝি তোমার নাতনী ভুবন? এস তো মা... বাঃ দিবিা মেয়ে, তোংলা গণেশের দল বড় উপদ্রব লাগিয়েছে, না?

মেয়েটি লজ্জিতভাবে ঘাড় বাঁকাইয়া নিরুত্তর রহিল।

কি ব্যবস্থা করা যায় বল দিকি তোংলা গণেশের?

পুটুরানী অর্ধশ্ফুটস্বরে বলিল,— যাঃ, বলতে নেই তোংলা, কষ্ট হয়।

ভুবন মুখুজে হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন,—এই যে, এদিক থেকেও টান আছে তাহলে!

পুটুরানী কিছু বুঝিল না, তবু আর একটু লজ্জিত হইয়া পড়িল। গোলক চাটুজে স্নেহভরে তাহার কাঁধটা একটু চাপিয়া বলিলেন,—যাও মা তুমি, ভেতবে যাও।

আবার খেলা চলিতে লাগিল।

॥ ২ ॥

গণেশদের খবর এইরূপ,—

পুটুরানী দর্শনের শোচনীয় অভিযানের পর দলটা একটু বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ত্রিলোচন শালার বিবাহের বউ লইয়া শ্বশুরবাড়ি গিয়াছে, তোংলার বৌদিদির বোন কলকাতা দেখিতে আসিয়াছে, সে তাহাকে দেখিতে একটু ব্যস্ত থাকে; গোরাচাঁদের মাসতুত বোনের বিবাহ ছিল, এই শিবপুরেই, তাও খুব কাছাকাছি, পাঁচদিন ধরিয়া দুই বাড়িতে পাকা দেখা, আইবুড়ো ভাত, গায়ে হলুদ, বিয়ে, বৌভাত প্রভৃতি অত্যন্তরকম ভোজ, সবগুলো পুরা দমে চালাইয়াছে, এক একদিন আবার দু'দুটো করিয়া পড়িয়া গিয়াছিল। এর উপরন্তু আবাব বৌকে আনিতে শ্বশুরবাড়ি গিয়াছিল।.... তাল সামলাইতে পারে নাই।

এখনও বাড়ি ফেরা হয় নাই, মাসির বাড়িতে থাকিয়াই ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করিতেছে।  
 মেসো কবিরাজ, খানিকটা সুবিধা আছে। গণশা কে. গুপ্ত আর রাজেন মনমরা হইয়া সমস্ত দিন ঘুরিয়া বেড়ায়। একটা সমস্যা সমাধান হইতেছে না, গোলক চাটুজ্জে কি পুটুদের বাড়ি দাবা খেলিতে যায় মাঝে মাঝে, না, বিশেষ করিয়া ঐ দিনটিতেই গিয়াছিল তাদের মেয়ে দেখা পণ্ড করিবার জন্য? যদি যায় মাঝে মাঝে তো ব্যাপারটা খুবই নৈরাশ্যজনক, আর যদি ইহার মেয়ে দেখিতে যাইতেছে বলিয়া বিশেষ করিয়া সেই দিনটিতেই গিয়া থাকে তো ব্যাপারটা শুধু নৈরাশ্যজনক নয়, গুরুতরও। কেননা এর মানে হয় গোলক চাটুজ্জে ভেতরে ভেতরে সন্ধান লইতেছে এবং যেখানেই এরা তোড়জোড় করিয়া মেয়ে দেখা, কি পাত্রী পক্ষের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতার ব্যবস্থা করিবে, ও ঐরকম নিঃশব্দে গিয়া ভণ্ডুল করিয়া দিবে।

সিঁমার ঘাটের জেটিতে তিনজনে আলোচনা হইতেছিল—

রাজেন বলিল,— তোর মামা, মনে আঘাত পাবি তই বলতে পারি না, কিন্তু অন্য কেউ হলে বলতাম এটা নিছক শযতানী।

গণশা বলিল,— আজ এ মা-ম্মামা কিছু না বললি, কিন্তু আজ এ মান্ ছাড়বি কেন?

রাজেন বলিল,— না, শয়তান বলব কেন? উনি গুরুজন, মাথায় কবে রাখবার জিনিস, তবে ওর এটা মনে রাখা উচিত যে, এটা ডেমোক্র্যাসির যুগ— যার যেরকম খুশি পাত্রী বেছে নিতে পারে। ওর চোদ্দ পুরুষের ভাগি যে, আজ তুই পুটুরানীকে পেলেই সম্ভব, কুমারী, স্বঘব:— ধর যদি তুই বিদ্রোহ করে বলিস যে, আমি বিধবা-বিবাহ দবব, কি আমার ক্ষেত্র ওইয়ের নাতনীরা সঙ্গে ভালোবাসা হয়ে গেছে, তাকেই চাই,— বলে বিদ্রোহ করে বলিস...

গণশা অলসভাবে রেলিঙে একটু হেলিয়া পড়িয়া বলিল,— বি-বিদ্রোহ করতে আব কদিন বা লাগে।—কতদূর দৌড় সেইটে শুধু দে-দেখে যাচ্ছি। তুই কোন্ মেয়েটার কথা বলছিস!— আমাদের সঙ্গে সেদিন যে চ্যা-চ্যারিটি শোতে ভলান্টিয়ারি করছিল?

নামটা নেহাৎ মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল। কিন্তু রাজেন সেদিন ভলান্টিয়ারি লইয়াই একটু ঘনিষ্ঠতা করিতে গিয়া মেয়েটির কাছে একটু দাবডানি খাইয়াছিল বলিয়া বিশেষ সম্ভব ছিল না, অবহেলার সহিত গঙ্গার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল,— হ্যাঁ, সেই ঋদ্ধিপনা মেয়েটা। অমন ভলন্টিয়ারি ঢেব দেখেছি, নে, রাজেনকে আর কোন মেয়াকে ভলন্টিয়ারি শেখাতে হবে না, ক্ষেত্র ওইয়ের নাতনীই হক, কি নবাব খাজ্ঞাখার নাতীই হক, কি বলিভোছল ভুলিয়া খানিকটা চুপ করিয়া রহিল।

গণশা প্রশ্ন করিল, —যৌৎনার খবর এদিকে আর পেয়েছিস?

রাজেন নিজের খোয়ালেই ডুবিয়াছিল, কথাটা তাহার কানে গেল না। একটু পরে ‘‘স্মাব দিক থেকে মুখ ফিরাইয়া বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলিল,— এ যুগের আমরা সবাই বিদ্রোহী গণশা, আমরা সমাজের কোন শাসনই— কোন শাসনই মানব না। আমরা এক একটা.. ?

গণশা হাত বাড়াইয়া বলিল,— বি-বিড়িটা যেন ফেলে দিস নি।

রাজেন অর্ধদৃষ্টি বিড়িটা তাহার হাতে দিয়া বলিল,— কি বলছিলাম? — হ্যাঁ, আমরা এক একটা ঝঞ্ঝা, এক একটা ঘূর্ণি, এক একটা— এক একটা...

গণশা যেন চাক্কোর পার্ট শুনিতেছে এইভাবে বিড়িতে একটা টান দিয়া বলিল,— ম-ম্মহামারী।

রাজেন বলিয়া চলিল,— আমবা মানব না। গোকুল চাটুজ্জে আর ভুবন মুখুজ্জের সমাজ-ব্যবস্থা— সে আমাদের জন্যে নয়,— আমবা তাকে টেনে উপড়ে, চুরমার কবে প্রলয়ের বাত্যার মুখে ফেলে দোব, সে এই পচা, গলা, মরচে-ধবা উইটিপকে— যা সমাজেব

মুখোশ পরে আমাদের মনুষ্যত্বকে আড়ষ্ট করে রেখেছে—তাকে মহাকাালের অপর তীরে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। তারপর আমরা নতুন করে গড়ব— আমরা একালের নব-যৌবনের নবীন আলোক-দূতের দল— যার মধ্যে একদিকে আছে বাংলার যত গণেশ, কে. গুপ্ত, য়োতন, গোরাচাঁদ আর অন্যদিকে আছে যত পুঁটুরানী, সাধনা গুই— বাংলার এই সম্মিলিত যুব-মন নিয়ে আমরা এই পচা-ধরা গলিত শবকে নতুন করে গড়ব— আমাদের নতুন আশা, নতুন উদ্যমের সাদৃশ্য কবে .. একবার সামনে চেয়ে দেখুন, কী দেখছেন?

শেষের প্রশ্নটা করিল কে. গুপ্তের পানে চাহিয়া। সামনে গঙ্গার উপর কত নৌকা, ডাইনে গাদা-বোট, স্টিমার, জাহাজ, ওপারে অসংখ্য বিদ্যুতের ব্যতি জ্বলিতেছে, ফোর্টের খানিকটা, তার পিছনে হাইকোর্ট, মনুমেন্ট প্রভৃতিরও ছায়াকূর্ত একটু একটু দেখা যায়,— কোনটা সে বলিবে বুঝিতে না পারিয়া কে. গুপ্ত একটু যেন ধাঁধায় পড়িয়া গেল। রাজেন একটু সময় দিয়া উত্তর না পাইয়া বিরক্তভাবে কি বলতে যাইতেছিল, গণশা বলিল,—প-স্পষ্ট তো নতুন সূর্য দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মশাই। .. চল রাজেন, অনেকটা রা-ররাত হয়ে গেল।

রাজেন রেলিং ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া বিরক্তভাবেই টীকা করিল,—নবযুগের নবীন সূর্য পাচ্ছেন না দেখতে? আপনি ঠিক সেই একরকমই থেকে গেলেন মশাই,—‘তালকানা’।

|| ৩ ||

তিনদিন পরের কথা। ত্রিলোচন হঠাৎ চলিয়া আসিয়াছে। কে. গুপ্তের নিকট শুনিল গোরাচাঁদেব ছোটখাট কলারার মত হইয়া গিয়াছিল, কোনরকমে এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছে। পথে বাজেনকে সঙ্গে করিয়া দুইজনে গণশার বাড়ি গেল এবং সেখান হইতে চারজনে গোরাচাঁদেব মাসির বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। খবর পাইয়া গোরাচাঁদ বাহিব হইয়া আসিল। এখনও একটু একটু দুর্বল আছে, তবে যতটা না দুর্বল তাহার চেয়েও বেশি যেন দমিয়া গেছে, গণশা প্রশ্ন করিল,—আজ আছিস কেমন?

গোরাচাঁদ ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর করিল,—আর থাকা ...

ত্রিলোচন বলিল,—তুই মরবি কোনদিন, শুনলাম এক হস্তার মধ্যে শিবপুরে দু'বেলা যত নেমস্তম্ন হয়েছিল...

গোরাচাঁদ মুখ বিকৃত করিয়া সেইরূপ ক্ষীণ কণ্ঠেই খিঁচাইয়া বলিল,—গা-জ্বালানো কথা বলিস নি তিনে, আর এই এক হস্তা ধরে শুধু বার্লি আর লেবুর রস সার হয়েছে সেদিকে কারুর নজর যায় না। রোগ কাটিয়ে পঁথাতে মারা যেতে বসেছি—তোদের যেন তামাসা লেগে গেছে।

রাজেন বলিল,—পরশু সকালে বললি ভাত দেবে।

গোরাচাঁদ বলিল,—পোরের ভাত, কাঁচকলা আর ডুমুরের ঝোল—শুধু দিনেরবেলা, তাও ওষুধের মত দাগে দাগে মাপা—মাসি আদর করে খাওয়াবার ছতো করে পাখা হাতে সামনে বসে, যাতে এক মুঠোও ফালতু না তুলতে পারি—তার ওপর মেসো মাসিকে মিনিটে মিনিটে সাবধান করছে—‘ওগো, প্রাণটা আগে।’ ... প্রাণ আছে কি না আছে সেদিকে কারুর হঁস নেই।

গণশার একটা গুণ দলের মধ্যে কেহ নিজের দুর্বলতা লইয়া সত্যিকারের বাথা অনুভব করিতেছে দেখিলে, ভুল হক, ঠিক হক তাহারই পক্ষ লইয়া দাঁড়ায়। হাসিয়া বলে,—খাওয়ার আগে প্রাণ—এতো না-নতুন কথা শুনছি, তাহলে তো রো-রোগের আগে ওষুধ দিয়ে বসবেন কোনদিন দেখছি।

তুলনাটি যেমনই হোক মেসোমশাই কবিরাজ বলিয়া গোরাচাঁদের মনের গ্লানিটা একেবারে কাটিয়া গেল, হাসিয়া বলিল,—তুই এইসা লাগসই উপমা ঝাড়তে পারিস গণশা—রোগের ওষুধই বটে! বাজে কথা থাক, একবার ওদিকে চল সবাই। মস্ত বড় একটা দরকারি কথা আছে, এখানে সুবিধা হবে না।

বাড়ির লাগোয়া একটা পুকুর, তাহার দুইদিকে বাঁধান ঘাট; সুবিধার জন্য সকলে ওদিককার ঘাটের দিকে চলিল। ত্রিলোচন আবার প্রশ্ন করিল, গোরাচাঁদ ঔৎসুক্যটা জমাট করিয়া তুলিবার জন্য বলিল,—চল না, বলবার জন্যেই তো যাচ্ছি।

রাজেন বার দুয়েক ডান হাতটা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া খুব অস্বুটস্ববে বলিল,—আমরা বিদ্রোহী—আমরা ঝঞ্ঝা—

পদার ঝোক চাপিলে মাঝে মাঝে ওরকম করে; সবাই অভ্যস্ত, বড় একটা গা করিল না। কে. ওপ্ত শুধু একবার প্রশ্ন করিল,—কমপ্লিট করেছেন?

ঘাটে বসিয়াও গোরাচাঁদ একটু চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল,—এই অসুখ আব উপোসের ঝোঁকে মস্ত বড় একটা কায়দা হয়ে গেল। সকলে আরও উন্মুখ হইয়া বসিল। গোরাচাঁদ বলিল,—খুব একটা কাজ গুছিয়েছি,—কেয়া ফতে।

গণশাব পর্যন্ত ধৈর্যচ্যুতি,—ভে-ভেঙে বলবি, না, হেঁয়ালি নিয়ে থাকবি?—তাহলে উঠি। গোরাচাঁদ বলিল—তোরা মামাকে বলগে যত বাগড়া দিতে পারে দিক—পুঁটুরানী এখন এদিকে।

ত্রিলোচন প্রশ্ন করিল,—এদিকে মানে?

এদিকে মানে আমাদের দলে। আমার মাসতুতো বোনের সই হয় কি না, এ বাড়িতে খুব আনাগোনা আছে। একটু একটু করে এসা ভাব জমিয়ে ফেলেছি যে গোরাচাঁদ বলতে এখন অসম্মান। অষ্টগ্রহর তো আমার ঘরেই বসে থাকে—কোনদিন ইস্কুল গেল, কোনদিন বা গেলই না, ঠাকুরদাদার কাছে একটা বাজে ছুতো করে এসে বসে রইল।

ত্রিলোচন প্রশ্ন করিল,—খুব ধূর্ত বুঝি?

গোরাচাঁদ বলিল,—এক নম্বর, গণশাকে যা নাকানি-চোবানি খাওয়াবে।

গণশা হুটচিন্তে একটু বাঙ্গ সহকারে বলিল,—লে লে, ওর দাদামশাইকে পাঠিয়ে দিতে বলিস। ... রাজেন, একটা বিড়ি ছাড় দিকিন।

রাজেন একটা বিড়ি বাহির করিয়া দিয়া গোরাচাঁদকে প্রশ্ন করিল,—এতক্ষণ ধবে কি কথা হয় তোদের?

গোরাচাঁদ বলিল,—আমাদের খেলাব। ভলন্টিয়ারির বাইরে গিয়ে আমবা কোথায় কি করেছি না করেছি সেইসব গল্প। ভয়ানক ভালবাসে শুনতে, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জিগোস করে।

ভলন্টিয়ারি করা, বাহিরে যাওয়া প্রভৃতির শেষ পর্যন্ত কি মর্যাদিক পরিণাম হয় স্বরণ করিয়া কে. ওপ্ত বলিল,—গল্পগুলো আগাগোড়া বলেন না তো মশাই?

গোরাচাঁদ বলিল,—আমায় সেইরকম কাঁচা ছেলে পেয়েছেন? গল্পগুলো বলবার আমার ভেতরের মতলবটা কি বলুন দিকিন?—আমি শ্রেফ ভাবছি গল্প বলে বলে কি করে ওব মনটা গণশার ওপর বসাৰ। কি করে ...

ত্রিলোচন প্রশ্ন করিল,—বসেছে বলে মনে হয়?

গোরাচাঁদ একটু রহস্যপ্রবণ হইয়া উঠিল, বলিল,—ভাইরে, নারীর মন। তিন বছর বিয়ে করেছি গিল্লীর মনেরই এখনও পান্ডা পেলাম না, পুঁটুরানী তো দূরের কথা। তবে হ্যাঁ, এইটুকু দেখেছি—গণশার গল্প হলে আর কিছু চায় না, আহাৰ নিজে ভুলে যায় বললেও বড় একটা বেশি বলা হয় না। আমি গল্প বলে যাই—ও মুখের দিকে চেয়ে থাকে, কতরকম ভাব

খেলে যায় মুখে—কখন হাসছে, কখনও গণশার বীরত্ব দেখে শিউরে উঠছে, কখন ‘আহা’ বলছে—এক রকমারি কাণ্ড ... কি রকম মনে হয় রে রাজেন?

রাজেন বলিল,—পৃথীরাজ সংযুক্ত। আমি চ্যালেঞ্জ করছি ভুবন মুখুজে স্বয়ম্বর সভা করুক, পুঁটুরানী যদি লাট বেলাটকে ছেড়ে গণশার গলায় মালা না দেয় তো রাজেনের নামে একটা কুকুর পুষিস্।

গোরাচাঁদ বলিল,—আমারও তো ঐরকমই মনে হয়। অবিশ্যি স্বয়ম্বর আর আজকাল কে কবাছে— সে যুগই নয় ...

রাজেন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, বলিল,— সে যুগকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। আমরা সইব না গোকুল চাটুজে আর ভুবন মুখুজের অত্যাচার। যুগ যুগ ধরে কত সংযুক্ত জয়সিংহদের অত্যাচারে অস্ত্রপুরের ভ্যাপসা ঘরের মধ্যে কুকড়ে গুটিয়ে অকালে ঝরে পড়েছে। আমরা আর সইব না, আমরা তাদের কানে বিদ্রোহের অগ্নিমন্ত্র দোব, আমরা বিদ্রোহী আমরা ...

ত্রিলোচন বলিল,—ভাল কথা মনে পড়ে গেল,—যুগ তো ফিরেই এসেছে। ... শালার বিয়ের সব ঠিকঠাক, কলকাতা থেকে আমার স্বশ্বাব আব খুড়শ্বর,—মানে জগুদা আর কি—দুজনে কনে পছন্দ করে আশীর্বাদ করে এল, পরশু বিয়ে, বাড়িতে আত্মীয় কুটুমে থৈ থৈ কবাছে। এই প্রায় এমনি সময় হঠাৎ এক মোটর এসে উপস্থিত। একজন আগে একজন পেছনে করে দুজন মেয়ে এসে নামল। পায়ে হিলতোলা জুতো, হাতে ড্যানিটি ব্যাগ—গট গট কবে এগিয়ে এসে আগেরটা বললে,—আমি অমিতার বড়দিদি আর ইনি অমিতার বন্ধু, যখন আপনাবা ছেলে দেখতে যান তখন আমি ছিলাম না, এলাহাবাদে প্রফেসারি করি, কাল এসে পৌঁছেছি। ছেলে দেখতে এলাম।

এলাহাবাদের মতই চেহারা, দেখতে দেখতে ভিড় জমে গেল। স্বশ্বরের গলা শুকিয়ে গেছে, বললেন,—এতো পরম সৌভাগ্য, কর্তা একবার দেখেই গেছেন, আপনিও যদি দেখতে চান সেতো ভালই।

হাতটা উলটে ঘড়ি দেখে নিয়ে বললে,— কর্তা তো ছেলে বুঝবেন না, তাই একবার আসতে হল। অমিতা নিজেই আসত, কিন্তু একটু লাজুক, তাই তার বন্ধুকে নিয়ে এলাম। ঐব নাম মিস লতিকা লাহিড়ী, বেথুনে এবারে নাম লিখিয়েছেন।

স্বশ্বর মশাই ভয়ে ভয়ে লতিকা লাহিড়ীকে একটা নমস্কার করলে। জগুদা দোকানে গিয়েছিল, একজনকে ডেকে আনতে ইসারা কবে দিয়েছিল, জগুদা এসে একপাশে গুটিসুটি মেবে দাঁড়াল— এতো মুগুর ভাঁজাও নয়, বস্ত্রিং নয়, এ বাবা অমিতার দিদি আর বন্ধু।

দিদি জগুদার দিকে একবারটি আড়ে দেখে নিলে, তারপর স্বশ্বর মশাইকে বললে,— বড় বোন আর বন্ধু— দুজনে দেখে যাচ্ছি— যদি আমাদের পছন্দ হয় তো অমিতারও পছন্দ হবে বলে আশা করা যেতে পারে, তবে আমাদের দু’পক্ষেরই কর্তব্য হচ্ছে ওদের পরস্পরকে একবার মোকাবিলা করিয়ে দেওয়া, বিয়ে তো ওদেরই কিনা।

হঠাৎ জগুদার দিকে চেয়ে বললে,— আপনি কি বলেন?

জগুদার তাক লেগে গেছিল, হাঁ করে অনামনস্ক হয়ে চেয়ে ছিল, চমকে উঠল— এতো মুগুর ভাঁজাও নয়, বস্ত্রিংও নয়—আমতা আমতা করে বললে,—আমিও সেই কথাই বলছিলাম।

পাত্রীর দিদি হাতটা ঘুরিয়ে আবার ঘড়িটা দেখে বললেন,—তাহলে আর আমাদের সময় নেই। ...এত ভিড় কিসের?

জগুদা দাবড়ানি দিতে ছেলেমেয়ের দল পালিয়ে গেল, ওদের দুজনকে বৈঠকখানায় এনে বসান হল।

রাজেন কতকটা আক্রোশের স্বরে বলিল,— নবযুগ! নবযুগ!— ছেলেকে এসেও জড়সড় হয়ে বলতে হল তো— কি নাম? —কতদূর পড়েছ? —একবার নামটি লেখ তো, লেখার হাঁদটা দেখি... উঃ, তাঁদের পায়ের ধুলো নেবার ইচ্ছে করছে আমার।

ত্রিলোচন এদিকে কান দিল না, যেমন বলিতেছিল, বলিয়াই চলিল,— আগে স্বপ্তর উঠে গেল, জগুদা বললে, তুমি বস, আমি গজুকে নিয়ে আসি। দেরি হচ্ছে কেন দেখি বলে জগুদাও সটকে পড়ল। জল খাবার নাম করে আমি উঠে গিয়ে দেখি বিচুলিগাদার পেছনে দুজনে চাপা গলায় জোর বচসা লাগিয়ে দিয়েছে— ছেলে দেখাবে কি সম্বন্ধ ভেঙে দেবে;— স্বপ্তর ফর, জগুদা এগেন্স্ট। শেষকালে স্বপ্তরের কথাই রইল,— অনেকদূর এতনো গেছে, স্বপ্তর শাশুড়িও এরকম ধরনের লোক নয়, ছেলেকে দেখিয়ে দেওয়াই হক, জগুদা বললে,— তুমি বড় ভাই, তোমার কথা ঠেলা যায় না, তবে আমার মতে এর চেয়ে ছেলেকে হাত পা বেঁধে জলে ভাসিয়ে দেওয়া ভাল।

রাজেনের পিষ্টদস্তপংক্তির ফাঁক দিয়া শোনা গেল— এসেছে; যুগ আগত এ..

ত্রিলোচন বলিয়া চলিল,— কিন্তু গজেনদাকে পাওয়া গেল না। গণশা আর গোরাক্ষাদ বলিয়া উঠিল,— তার মানে?

ত্রিলোচন বলিল,— সেই ছোঁড়াটাকে মনে আছে? স্ত্রী-আচার দেখবার নাম করে তাদের যে মার খাওয়াবার ব্যবস্থা করেছিল?— তার নাম ফকরে। গজেনদা নিজের বরে, ডায়েল একসারসাইজ করছিল— স্বপ্তরবাড়িতে জগুদা ওটা কম্পানসারি করেছে কিনা, — ফকরে গিয়ে তাকে সব কথা বললে। গজেনদা ফকরেকে চর মোতায়ন করে, একসারসাইজ ভুলে জানলায় দাঁড়িয়ে এদের দুজনের গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগল। প্রথমটা আশা করেছিল জগুদা নিশ্চয় ভাগিয়ে দেবে; এগুতে দেখে খিড়কির দোর খুলে সেই যে ডুব মারলে।

গোরাক্ষাদ বলিল,— মেয়ের দল এসে ছেলে দেখাও হয়েছে কোন কোনখানে, মেয়ে দেখার পাল্টা জবাব আর কি।

কে. গুপ্তেরও এক আধটা সম্বন্ধ আসে মাঝে মাঝে, বিবাহ ব্যাপারটা যে এতটা উগ্ররকম জটিল হইয়া উঠিতেছে এ-সংবাদটা পাইয়া শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিল, গোবর্ষাদের কথায় কতকটা আশ্বাসের স্বরে বলিল,— তবে ছেলেদের একটা সুবিধে এই যে তারা এইরকম পালিয়ে যেতে পারে।

আবার পূর্ব প্রসঙ্গটা ফিরিয়া আসিল।

গোরাক্ষাদ বলিল,— তা পুঁটু, নতুন যুগের মেয়ে, তাতে একটুও সন্দেহ নেই। এখন নেহাৎ একটু বয়স কম, আর দাদামশাইয়ের আওতায় রয়েছে; তবুও এক একটা যা চোখা চোখা বুলি ঝাড়ে। ... এখন কথা হচ্ছে যা করতে বসেছি আমরা তা কি করে করা যায়? আমি তো অনেকটা এগিয়ে এনেছি— গল্প-সল্পর মধ্য দিয়ে। আগে ‘তোৎলা গণেশ’ বলত, এখন বলে ‘গণেশদা’। কিন্তু কথা হচ্ছে মনের মধ্যে প্রেম সম্বন্ধ না করে দিলে তো কাজ হবে না। এখন ব্যাপারটি দাঁড় করাতে হবে যাতে অন্য জায়গায় বিয়ের নামেই মুখ গৌজ করে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু তা কি শুধু গল্পের মধ্যে দিয়েই সম্ভব?— লাজেন কি বলিস?

রাজেন ডানদিকের রগটা তক্তনী দিয়া টিপিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। আর সকলেও বিড়ি টানার মধ্য দিয়া, কি আকাশের পানে চাহিয়া উত্তর হাতড়াইতে লাগিল। একটু পরে রাজেন বলিল,— গল্প শুনেও প্রেম যে না হয় এমন নয়,— নদী কিসের আবেগে সমুদ্রেব পানে ছুটে চলেছে? তবে দেখা সাক্ষাৎ আদান-প্রদান হলে পেম যেমন দানা বাঁধতে পারে— শুধু গল্প শুনে...



গোরাচাঁদ বলিল,— সেই কথা ভেবে আমিও মতলব ঠাউরেছি, তোমাদের পছন্দ হয় কিনা দেখ। মাসিমা বলছিল, — গোরা, নেড়ির জন্যে একটা মাস্টার ষোঁগাড় করে দিতে পারিস বাবা? তোর তো অনেক জানাশোনা আছে; মেয়েটা কিছু পড়ে না বাড়িতে। আমি উত্তর দিই নি— ‘দেখব’ বলে চুপ করে আছি, মনে মনে কিন্তু গণশাকে এঁচে বসে আছি।

ত্রিলোচন বলিল,— নেড়ি তো পুঁটুরানী নয়?

গোরাচাঁদ বলিল,— পুঁটুর সই, হরিহর আত্মা দুজনে। দেখা সাক্ষাৎ হতে থাক রোজ গণশার সঙ্গে। তারপর ক্রমে— ‘কি গো খুকু, কি পড়? কোন ইস্কুলে পড়?’ ... তারপর ক্রমে পুঁটুও এসে আরম্ভ করে দিক, গণশা ঠিক ম্যানেজ করে নেবে...

কে. গুপ্ত বলিল, —কিন্তু ওর দাদামশাই কি টাকা দেবে?

গণশা উন্টাদিকে মুখ করিয়া দাঁতে বিড়ি চাপিয়া মনোযোগের সহিত শুনিতেছিল, মুখ ঘুরাইয়া বিরক্ত না হইবার চেষ্টা করিয়া বলিল,— টা-টাকাটাই সব নাকি মশাই দুনিয়ায়?— একটা-বু-বুড়ো লোকের উপকার...

সে থাকিতে গোরাচাঁদের প্লানে গণশা উপকৃত হইবে ভক্ত ত্রিলোচনের এটা বোধহয় খুব মনঃপূত নয়; বলিল,— টাকার কথা নাই হল, কিন্তু বুড়ো কি কোনমতে চাইবে তার নাতনী গণশার কাছে আসে, বসে, পড়াশোনা করে?

গোরাচাঁদ ভ্রু কঁচকইয়া হাত নাড়িয়া বলিল,— আমি পেটের দায়ে টিউশন করছি মশাই, একটা মেয়ে আসে, একটু আধটু জিগ্যেস করে বলে দিই, আপনার নাতনী কি হারাধনের ভাইজি, কি গুপীকেষ্টর ভাগনী তা আমি কি করে টের পাব?— জান তো নয়? ... আপনার নাতনী হয় আপনি সরিয়ে নিন।

গণশা একবারটি দেখিয়া লইয়া, আবার সেইভাবে কাঁধ ফিরাইয়া বলিল,— আমি জানি বি-ব্রিড্যো দান করা একটা পুণ্য, তাই সাদা মনে দা-দান করে যাই।

গোরাচাঁদ বলিল,— কিন্তু সে সব কিছু হতে পারে না। ভয়ঙ্কর চটা দাদামশাইয়ের ওপর, বড্ড কেপ্লন কিনা—পুঁটু নিজে একটু দরাজ—প্রায়ই তো ফলটা-আশটা নিয়ে আসে আর দাদামশাইয়ের কিপটেপনার গল্প করে। আমি আবার একটু একটু করে ওস্কানিও দিতে থাকি কিনা। ওকে যদি মানা করে দিই পড়ার কথা বলতে তো কখনও বলবে না। আর যদি দাদামশাই কোনরকমে টের পেয়ে করেরি মানা তো ও শুনবে নাকি?—সে মেয়েই নয়।

রাজেন বলিল,—একটা কথা যে তোরা ভুলেই যাচ্ছিস, বুড়ো কেপ্লন হক, কিন্তু একদিন নিজেও সংসার করেছে, হৃদয় বলে একটা জিনিস তো আছেই; যখন বুঝতে পারবে নাতনীর জীবন-মরণ সমিস্যো, তখন কি আর পুরনো কথাই ধরে বসে থাকতে পারবে? সকলে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, শেষে গোরাচাঁদ বলিল,—এই আমার প্লান, এখন তোমরা সবাই ভেবে দেখ, গণশাও বলুক, রাজি কিনা। ... কি রে গণেশ, হয়েছে মতলবটা?— গোরাচাঁদ তো শুধু, পেটটাই চেনে বলে একটা বদনাম আছে।

নেহাৎ অশোভন হয় বলিয়া গণশা একটা লোক-দেখানি গোছের আপত্তি করিল,—তা বলে আমি সন্দের পর টিউশানি করতে পারব না।

॥ ৪ ॥

মাসখানেক পরের কথা।

অনেকটা প্লান মতই কাজ হইতেছে। গণেশ সকালবেলা নেড়িকে পড়াইতে আসে। পুঁটুরানী রোজ না হক প্রায়ই উপস্থিত থাকে। নাম শুনিয়াই গণেশ বোধহয় একদিন নাক

সিঁটকাইয়াছিল, কিন্তু নিতান্ত ‘আহামরি’ না হইলেও মেয়েটি যে নিম্নের এমন নয়। একটু খাট-গড়ন, তাই তের বছরটাকে হয়তো বারো দেখায়; কিন্তু গণেশের এ-লইয়া আপত্তি তো নাই-ই বরং একটু ভালই লাগে। মেয়েটি একটু চঞ্চল প্রকৃতির, একটু বেশি হাসে—অন্য অনেকে বোধহয় বিরক্ত হয়—কিন্তু হাসি ভালবাসে এমন লোকেরও তো অভাব নাই?—সব মিলিয়া বেশ ভাল লাগিতেছে পুটুরানীকে। অবসর পাইলে এবং না পাইলে, অবসর করিয়া লইয়া—নেড়িকে উপলক্ষ করিয়া নানারকম হাতের খেলা শেখায়, পড়িয়া আসিয়া এবং নিজের অভিজ্ঞতা হইতে নানারকম গল্প বলে, কাছে পিঠে কোথায় কবে তাহাদের ছবি খেলা কি জিম্ন্যাস্টিক হইতেছে তাহার সন্ধান দেয়, পুটুরানী উপস্থিত আছে টের পাইলে এমন খেলা খুলিয়া যায় যে হাততালি যেন একচেটিয়া করিয়া ফেলে।

পড়াইতে আসিয়া পুটুর মুখে শুনিয়া বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করে,—সত্যি? তু-তুমিও ছিলে নাকি খুকুমগি?

খুকুমগি বলিয়া আশ মেটে না, তবু ঐ ডাকটাই চালাইতেছে, কেননা ওর আড়ালে আত্মগোপনটা বেশ চলিতেছে। গোবার্চাদ প্রায়ই আসে, নিজে লক্ষ্য করে, জিজ্ঞাসাও করে, রাজেন খুবই উদগ্রীব, পদ্য লিখিয়া শোনাইবার অবস্থা আসিয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করে, অন্য সকলেও খুব উৎসুক,—খোঁতনা সলাপরামর্শ দেয়,—গণশা বলে, তোদের মাথা খারাপ হয়েছে? একটা দু-দুস্কপোষা কচি মেয়ে . .

গণশার এই অবস্থা, তা এটাকে যে নামেই অভিহিত করা হক।

পুটুরানী মেয়ে, তাহাকে এত স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া লওয়া সহজ নয়। যেন মনে হয় সে গণেশের প্রতি একটু আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু সেটা তার পৌরুষের জন্য কি তোৎলামির জন্য বলা কঠিন। চোখ খুব বড় বড় করিয়া গল্প শোনে, যেখানে উৎসাহের বশে গণশাব কথা বেশি আটকাইয়া যায় ‘খুক খুক’ করিয়া হাসিয়া ফেলে, বলে,—দেখন গণেশদা, নেড়ি হাসাচ্ছে, এখনও দেখন। গণেশ বলে—তবে গ-গল্প রইল, তোমরা অসভ্য হয়ে উঠছ।

পুটুরানী ঝাঁকড়া মাথায় একটা দোল দিয়া মুখ ফিরাইয়া বসে, বলে,—যান, আপনি বড় একচোখো, কে দোষ করলে, আর কার ওপর রাগ।

গণশা ঠিক রাগেনি, আশ্চর্যবোধ হইলেও কথাটা খুব সত্যি। ঐ-যে পুটু চুলের গোছা নাড়িয়া মাথায় একটা দোল দিলে, ঐ যে মুখটা ভার করিল, ঐ যে অভিমান ভরে একচোখো বলিল, তাহাব পর সে তাহার দিকে দু’একবার আড়ে চাহিবে, নেড়িব দিকেও দু’একবার আড়ে চাহিয়া আবার ভিতরের দুষ্টমি বশে ‘খুকখুক’ করিয়া হাসিয়া উঠিবে—সামান্য একটু তোৎলামির বিনিময়ে এতটা সম্ভব হয় বলিয়া গণশা রাগ তো করেছে না বরং তোৎলামিটুকু দিবার জন্য বিধাতার উপর সন্দেহই হয়। যখন দৈবক্রমে তোৎলামিটি একটু বন্ধ থাকে, পুটুর হাসি দুর্লভ হইয়া পড়ে, গণশা ইচ্ছা করিয়া কথাটা আটকাইয়া দেয়। এটাও খুব আশ্চর্য, কিন্তু প্রজাপতির কোন রহস্যটাই বা আশ্চর্য কম?

ক্রমে ব্যাপার আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল। একদিন নেড়ির শ্লেট অপরিষ্কার দেখিয়া গণশা তাহাকে পুকুর থেকে কাঠ-কয়লা দিয়া ঘষিয়া ভাল করিয়া পরিষ্কার করিয়া আনিতে বলিল। নেড়ি চলিয়া গেলে পুটুরানীকে বলিল,—এসো তোমায় আঙুলের একটা খেলা শিখিয়ে দিই ততক্ষণ।

একটু সুতার দুইটা মুখ বাঁধিয়া কয়েকটি আঙুলের মধ্যে জড়াইয়া দুইটা হাত জোড় করিয়া ধরিয়া বলিল,—নাও, এবার সুতাটা খোল দিকিন।

পুটুরানী তাহার ছোট ছোট দশটা আঙুল দিয়া অনেক চেষ্টা করিল, তাহার পর হার মানিয়া একটু হাসিয়া বলিল,—নাঃ পারলাম না। ... শিখিয়ে দিন গণেশদা—হ্যাঁ শিখিয়ে দিন।

গণশা প্রথমটা নিজের হাত দিয়াই শিখাইবার চেষ্টা করিল—কিন্তু এমন গোলমাল করিয়া চেষ্টা করিল যে পুটুর ধরা অসম্ভব হইল, তখন সে নিজের হাত দুইটা বাড়াইয়া দিয়া বলিল,—না, এই আমার হাতে শিখিয়ে দিন। কিছু বুঝতে পারছি না, গণেশদা।

গণেশ হাতটা ধরিয়া দুই তিনটা আঙুলে সুতাটা পরাইল, তাড়ার পর হঠাৎ থামিয়া বলিল,—তুমি তো আমায় আগে তো—‘তোৎলা গণেশ’ বলতে।

হঠাৎ এ ভাব পরিবর্তনে পুটুবানী যেন একটু ভয় পাইয়া গেল, মুখের পানে বিস্মিত ভাবে চাহিয়া বলিল,—ওমা কবে?—কে বললে!

গণেশ বলিল,—তাই বলেই ডেকে।

ওমা কেন!—আমি পারব না।

গণেশের মুঠা দুইটা বোধহয় একটু সঙ্কুচিতও হইল, বলিল,—সবাইকে কি দা-দাদা বলা চলে?

একদিনেই এর বেশি বলা গণেশের নিশ্চয় অভিপ্রেত ছিল না, সেটা সম্ভবও হইল না, কেন না স্নেহে ধূইয়া কাপড়ের আঁচলে মুছিতে মুছিতে নেড়ি আসিয়া হাজির হইল।

কিন্তু আগেই বলাই পুটুবানীর ভাবটা বোঝা শক্ত। আঙুলের খেলার অন্য কিছু ভাষা আছে কিনা, অথবা যাহাদের দাদা বলা যায় গণেশ তাহাদের মধ্যে কেন পড়িতে পাবে না, অথবা গোরাদা এখানকাব কোন কথা বাড়িতে তুলিতে মানা কবেই বা কেন—এ সমস্ত লইয়া পুটুবানী যে কখনও মাথা থামায় এমন তো কিছুই বোধ হয় না। বাহিরে দেখিয়া গণেশ বুঝিয়াছে মেয়েটি চঞ্চল হোক কিন্তু খুব সরল, তা ভিন্ন বাধ্যও,—একটা কিছু বলিলে সেটা তামিল করে, মানা করিলেও বেশ নিশ্চিত থাকায় যায়, অন্যথা হইবে না। একদিন পড়িতে আসিয়া বাহিব হইতে শুনি—কে যেন ঘরের ভিতর খুব তোৎলামি করিয়া একপাল ছেলেনেয়েদের উপর ওরুমশাইগিরি করিতেছে। সে প্রবেশ করিতে পড়ুয়ার দল পলাইল, পুটু নেড়ি এ ওর ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া খানিকটা ঝগড়া করিল, নেড়িকে একটু মৃদু ধমক দিলেও গণশা বুঝিল কার কীর্তি, কিন্তু অত ছোট কথা গ্রাহ্য করিল না, সরল—বাধ্য, এসব অনেক গুণ আছে যে। আর ছেলেনানুষ এখন একটু নকল করে বলিয়া চিরকালটাই কি বসিয়া বসিয়া ভাংচাইতে থাকিবে?

একদিন স্টিমার খাটে একজনা পাইয়া রাজেন ধরয়া বসিল। বলিল, একটা পদা শেষ করিয়া দ্বিতীয়তে হাত দিয়াছে, ভালোবাসা বৃদ্ধির এক একটা অবস্থা এক একটা পদা, সময় উৎরাইয়া গেলে শোনাইয়া ফল হইবে না। বিস্তর পীড়াপীড়ি করিল গণশাকে, অভিমানও করিল, বলিল,—আর যাকেই নুকো, রাজেনকে নুকোন সহজ নয় গণশা, টের পেতে বাকি নেই, তবে মুখ ফুটে না বলিস সে আলাদা কথা।

গণশাকে একটু ভাঙিতেই হইল, বলিল,—ওর বোধহয় একটু টান হয়েছে-য-যাতটা বুঝি,—আমার কথা একটা দ-দশ বছরের কচি মেয়ে ...

রাজেন নিটিমিটি হাসিয়া মাথা দোলাইয়া বলিল,—এতেই হবে,—এক হাতে তালি বাজে না হে কজা। ...

॥ ৫ ॥

গণশা রাজেনের প্রথম পদাটা মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছে; মনে হইতেছে শোনাইবার সময় হইয়াছে, এমন কি এক একবার এও মনে হইতেছে যে প্রথম পদের সময়টা যেন উৎরাইয়া যাইতেছে, এমন সময় খুব একটা ঝোঁকে বর্ষা নামিল।

চারদিন ধরিয়া বৃষ্টি চলিয়াছে, আকাশ মেঘে সমাচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে অল্প একটু বিরাম, আবার দ্বিগুণ বেগে ধারাপাত। ... রাজেন বলিতেছে—গণশা, এই ভাল,—এমন জমাটি সময় চলে গেলে আপসে মরবি।

গণেশ প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। এ অবস্থায় পাশ দেওয়ার ছেলেকেও কেহ পড়াইতে যায় না, কিন্তু গণেশ নিয়মিতভাবে বাহির হইতেছে। গোরানাদের মাসি পর্যন্ত বলিলেন,—বাবা, এ দুটো দিন না হয় না-ই এলে, কত দুঃখাগ!

গণশা বলিল,—ক-কর্তবাটা একটা মন্ত বড় জিনিস মাসিমা—ঝড়-বৃষ্টিকে ভয় করলে চলবে কেন?

চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু ফল কিছুই হইতেছে না। পুটুরানী এ কটা দিন বাড়ি ছাড়িয়া বাহিরই হইল না। কর্তব্যপরায়ণ শিক্ষকের কাছে নেড়ি শুধু কারণে-অকারণে খিঁচুনি খাইয়া সারা হইতেছে।

অবশেষে সুযোগ আসিল। আব আসিল সেও একেবারে অপ্রত্যাশিত পথে, আর দাক্ষিণ্যে ভরপুর হইয়া। সুযোগ এমনভাবে অল্প লোকের কাছেই আসে।

সকালবেলা। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি নামিয়াছে। গণশা ছপ্ ছপ্ করিয়া জনবিরল পথ দিয়া টুইশানি করিতে চলিয়াছে, গায়ে একটা রেনকোট, মাথায় ছাতা। দুইটিই বেশ সৌখিন এবং দামি; টুইশনিটা চাকরির পূর্বলক্ষণ বলিয়া মাসিমার মধ্যস্থতায় এ-দুটা মামার নিকট হইতে পাওয়া গেছে। গণশা আজকাল সবদিকেই একটু সৌখিন হইয়াছেও।

হাঠাৎ ডাক শুনিল—গণেশদা, ও গণেশদা।

ফিরিয়া দেখে বাগ্গার মুড়ির দোকানে পুটুরানী; যেন নিজের দৃষ্টিকে বিশ্বাস করিতে না পারিয়া একটু থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর অগ্রসর হইয়া গিয়া দোকানের ঝাঁপের নিচে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল,—খুকমণি তুমি এখানে!

পুটুরানী বলিল,—ভাগিস আপনি যাচ্ছিলেন এদিক দিয়ে। .. আমি বাগ্গার দোকানে মুড়িকি আর দানাদার নিতে এসেছিলাম ...

এই বৃষ্টিতে?

বৃষ্টি তখন কোথায়? তাই ভাবলাম—খিদে পেয়েছে, যাই চট করে নিয়ে আসি। নিয়ে বেরুতে যাব, কি বৃষ্টি! কি বৃষ্টি! ... আমায় নিয়ে চলুন আপনার ছাতার মধ্যে, আসি?

সাবলো গণশার আর যেন কথা জোগাইতেছিল না। কম কবিয়া ধরিলেও মিনিট পাঁচেকের পথ হইবে এখান থেকে পুটুদের বাড়ি—বর্ষার পথ, সেটাকে টানিয়া সাত-আট মিনিট করা মোটেই অসম্ভব নয়। এতটা সময় পুটুরানী, আর সে এক ছাতার মধ্যে! জনহীন পথ, অঝোর ধারায় বর্ষা! ... গণশা আজকাল বেশ একটু রাজেনের ছোঁয়াচও পাইয়াছে ... কি যে করিবে যেন ভাবিয়া পাইতেছে না।

দোকানে এক বুড়ো বাগ্গা ভিন্ন আর কেহ নাই, গণশা বলিল,—থামো, শুধু ছা-ছাছাতায় ঠিক হবে না তো, আমার রেনকোটটা একটু মুড়েমাড়ে তোমায় পরিয়ে দিই, নইলে—কাপড়টাতে ঝাপটা লেগে ভিজ়ে যাবে।

ভিতরে গিয়া কোটটা খুলিল।

পুটুরানীর প্রথমটা ভয়, তাহার পর বেশ একটা মজার কৌতূহল হইল। একটু আপত্তি করিল,—মেয়ে কখন ওসব পরে, আর অত বড়।

তাহার পর রাজি হইল। গণশা উপরের ভাগটা আর হাত দুইটা মুড়িয়া দিয়া ফিটফাট করিয়া পরাইয়া দিয়া কোমরে বেন্‌টো জড়াইয়া দিল।

পুটুরানী ঝাঁপের নিচে আসিয়া বলিল,—আর আপনার?—বা-রে।

বাঞ্ছারাম কি করিতে ওদিকে ফিরিয়াছিল, গণশা বলিল,—আমার কথা তো-তোমায় ভাবতে হবে না ...

সাহস করিয়া আর একটু জুড়িয়া দিল,—এখন।

ছ্প ছ্প করিয়া দুজনে চলিয়াছে। পুটুরানী কৌতুকে এক একবার শিহরিয়া উঠিতেছে। একবার বলিল,—ভাগ্যিস আপনি যাচ্ছিলেন এই পথ দিয়ে।

ভাগ্যটা যে কার আর কত বড় গণশা সেটাই ভাবিতেছিল, কোন উত্তর দিল না।

পুটুরানী একবার আত্মদে শিহরিয়া উঠিয়া বলিল,—আর বেশ গরমও হয় এগুলো, না গণেশদা?

সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া উঠিল,—না গণেশ দা, আপনার সঙ্গে আড়ি।

সোজা 'কেন?' না বলিয়া গণেশ একটু রসিকতা করিয়া প্রশ্ন করিল—'গণেশদা'র অপবাধ?"

একটু মুখ ঝামটার স্ববেই পুটুরানী বলিল,—আপনি কেন ও বুড়োর সামনে আমায় খুকুমণি বলবেন? আমার যেন নাম নেই।

আজ গণেশ কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছে? ... কিন্তু পথ তো প্রায় অর্ধেক হইয়া গেল। গণেশ একটা অছিলা হিসাবে একটা পায়ের জুতা খুলিয়া ফেলিল, তাহার পর সেটার জল ফেলিয়া পায়ে দিতে দিতে বলিল,—কি নাম তোমার?

বর্ষাটা যেন আরও জোর হইয়া ওদের দুজনকে চারদিক হইতে আলাদা করিয়া ফেলিয়াছে।

পুটুরানী বলিল,— কেন?—মৃণালিনী, আপনি জানেন না? নিশ্চয় জানেন।

যা জপোমন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা আব জানে না? গণশার কুষ্ঠা আসিতেছিল, কিন্তু হাতে পাওয়া সুযোগকে আর হাতছাড়া করিল না। আর একটা পায়ের জুতা খুলিয়া আর একটু সময় লইল, বলিল মি-মৃণালিনী—মৃণালিনী? বাঃ বেশ মিষ্টি নাম তো!

মেয়েদেব মন,—হঠাৎ কি হইল, পুটুরানী যেন একটু লজ্জিত হইয়া পড়িল, অপেক্ষাকৃত নিম্নকণ্ঠে বলিল,—যাঃ, মিষ্টি না আরও কিছু।

গণেশ হয় লক্ষ্য করিল না, না হয় গ্রাহ্যই করিল না, বলিল,—রোসো, তোমার নামের একটা পদ্য যেন কবে কো-কোথায় পড়েছিলাম, শুনবে?

পুটুরানী সেইরকম একটু কুণ্ঠিত স্ববেই বলিল,—বলুন না, শুনি, সব পদ্যই আমার বেশ লাগে।

বৃষ্টিটা হঠাৎ ধরিয়া আসিল, আর গৌরচন্দ্রিকা চলে না।

গণেশ রাজেনের পদাটো গুরু করিয়া দিল।

পু-ধুকুরে ফুটেছে মৃণালিনী

তার রাঙা রাপে আলো করে,

গন্ধে ভ্রমর ঘোরে ফেরে

বুঝি প-প্লাগল করেছে তারে

ত-ওবে নধর শ্যামল মৃণালে

ঢেউ দুলে দুলে দেয় দোল

তা-জ্ঞার আলোক চুমিত রাঙা দল

ঘিরে বায়ু হোল উত্তরোল।

শো-শো, শো-শোন, অচিন দেশের অতিথি গো ...

পুটুরানী আচমকা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া, বলিল,— আমার বাড়ি এসে গেছে যে—

বাগানের বাঁশের ফটকের সামনে আসিয়া পড়িয়াছে, গণশা দাঁড়াইয়া পড়িল। পুটুরানী ফটকটা খুলিয়া দিয়া দুই পা ভিতরে গিয়া বলিল,—আসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন যে?

মাঝ-পদা থেকে মাঝ-সমস্যায় গণশা একটু হক-চকিয়ে গিয়াছে।

বলিল,—না।

ওমা, কেন? বাঃ।

তাহার পর কি যেন হঠাৎ মনে পড়িয়া গিয়া বাড়ির দিকে যাইয়া অতিকষ্টে একটা হাসি চাপিয়া রেন-কোটের বেষ্টটা খুলিতে খুলিতে বলিল,—তা হলে এটা নিন, আমি যাই।

বাগানের ভিতর দিয়া বেশ খানিকটা গিয়া তবে বাড়িটা। বৃষ্টি ধরিয়া আসিয়াছে তবে সম্পূর্ণ যায় নাই, তাহা ভিন্ন গাছের ডালপালা হইতে মোটা মোটা ফোঁটা বাবিত্তেছে, গণশা একটু কি ভাবিল, তাহার পব বলিল,—না তুমি যাও, এই ছা-ছছাতাও নাও, ঝিকে দিয়ে পাঠিয়ে দাওগে।

বাঃ আর আপনি?

আমাব কথা ভাবতে হবে না, আমি ত-ততক্ষণ এই ছাতিম গাছটার তলায় দাঁড়াচ্ছি, বেশ ঘন আছে।

একবার পিছু ডাকিয়া বলিল,—শোন।

পুটুরানী ঘুরিয়া প্রশ্ন করিল,—কি?

মুখে যেন একটু হাসি লাগিয়া আছে। গণশা বলিল,—দাদামশাইকে বলে কাজ নেই, বাড়ির কাউকেই নয়।

আর একটু স্পষ্টতর হাসিতে ঠোঁটটি যেন একটু গুটাইয়া গেল। প্রশ্ন হইল, “কেন?”

এই ম-ম্মনে করবে ভারি একটু ছাতা দিয়ে উবগাব করেছে, আবাব জা জ্ঞানাত্তে এসেছে, তুমি বাইরের ঘর থেকেই পাঠিয়ে দিও।

॥ ৬ ॥

দুই মিনিট গেল, চার মিনিট গেল, দশ মিনিট গেল, না ঝি, না ছাতা, না বেন কোট। বর্ষা আর একটু বাড়িল, একবার মনে হইল ভিতবে চলিয়া যায়, একবার মনে হইল ডাকে—কিন্তু কি ভাষিয়া কোনটাই সমীচীন মনে হইল না। এতক্ষণ ধরিয়া যে অনুভূতিটা মনে আধিপত্য করিতেছিল সেটাকে ঠেলিয়া একটু করিয়া রাগ জন্মিয়া উঠিতে লাগিল। টুকরো টুকরো হাসিওলা বেশ অর্থবান হইয়া উঠিল—ঠাট্টা করিয়াছে, জঙ্গ করিয়াছে, উপকারের বদলে ... উঃ, কী ধড়িবাত্র মেয়ে!

বৃষ্টি নামিল, ছাতিমের ছাতায় আর কাজ হয় না। কী কিচলেমি বুদ্ধি। দাদামশাইকে বলে নাই এটা ঠিক, বড় মানুষ, তায়—গোকুল চাটুজ্জের পরিচিত, এ-ধরনের উগ্র রসিকতা সে নিশ্চয় করিত না।—রসিকতা! একেবারে সীমা ছাড়াইয়া—এ এক ফোঁটা মেয়ে? ...

ভিজিয়া চুপসিয়া এমন অবস্থা হইয়াছে যে রাস্তায় বাহির হওয়া দায়—যে দেখিবে সেই বা কি বলিবে? গোরাচাঁদের মামার বাড়ি তো সম্ভব ... তবু আর একটু দেখিল,—ছাতিমের তলায় আশ্রয়গোপন করিয়া,—তীব্র আশায় বাড়িটার দিকে চাহিয়া চাহিয়া চোখ যেন ঠিকরহিয়া যাইতেছে! নাঃ, ডাহা শয়তানি—কোন আশাই নাই। উঃ, ঐ একরসি মেয়ে!—দেখিতে অত সরল, অত নিরীহ।

যাহাতে ভুবন মুখুজ্জের বাড়ির কেহ দেখিতে না পায়, গোরাচাঁদের মাসির বাড়িরও কেহ না ডাকে, বাঞ্ছারামও দেখিয়া না প্রশ্ন করিয়া বসে, আবার ওদিকে রাজেনেরও না

নজরে পড়িয়া যাইতে হয়—এইভাবে চতুর্দিক বাঁচাইয়া সেই দারুণ বৃষ্টি মাথায করিয়া গণশা ছপ্ ছপ্ করিতে করিতে বাড়ি লক্ষ্য করিয়া হালকা দৌড়ের চালে ছুটিল।

পরদিনের কথা। সন্ধ্যা বেশ খানিকক্ষণ হইল উৎবাহিয়া গিয়াছে। বিকাল হইতে বৃষ্টি কমিয়া এখন বেশ পরিষ্কার। নিজের বাড়িতে বাহিরের দিকে একটা ঘরে গণেশরা বসিয়া আছে—সকলেই। গণশার শরীরটা ভালো নয়, মনটা একেবারেই ভালো নয়। ছাতা, রেন-কোটের কথা সবাই জানে, উদ্ধার করা একটা সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে।

ঘরটা একটেরেয়; গোকুল চাটুজ্জের ঘর থেকে অনেকটা দূরে। চাপা গলায় নানা রকম আলোচনা হইতেছে।

রাজেন আর গোবাচাঁদকে সকলে গল্পনা দিতেছে, ত্রিলোচন বলিতেছে,—পাড়ায় থাকিস আর জানিস না সে মেয়েটা এবকম ফিচেল?—মেয়ে দেখলেই যে তোদের আর জ্ঞান থাকে না ... লেখ কাব্য। রাজেনের কাছে দাম আদায় কর গণশা—একটার দাম রাজেনের কাছে, একটার দাম গোরাচাঁদের কাছে—

রাজেন গোরাচাঁদ অপরাধীর মত বসিয়া আছে, কোন উত্তর দিল না। রাজেনের বিদ্রোহের বনবনানি পর্যন্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছে,—শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—উঃ—নারী! চিবরহসাময়ী!

গণশা নিরুদাম কণ্ঠে বলিল,—ওদেব আর কি দোষ? চি-চিরকেলে অবোশ—উপকার করতে গেছলাম—শিক্ষা হোল—ওসব বাই এবার থেকে ছা-ছছাড়লাম।

হকের জিনিস দুটো—প-প্লচন্দ করে কিনেছিলাম।

কে. গুপ্ত বলিল,—কালীঘাটে দুটো টাকা মানসিক করুন না মশাই, অনেক সময় তাতে এসে যায় হকের জিনিস হলে।

ওঁদিক দিয়া কে যেন আসিয়া গোকুল চাটুজ্জের ঘরে গেল। দলটা অল্প একটু অনুসন্ধিৎসু হইয়া উঠিল, খোঁতনা বলিল,—বোধহয় ভুবন মুখুজ্জে—মাঝে মাঝে সে আসে দাবা খেলতে।

গোরাচাঁদ বলিল,—উঃ, কী মতলববাজ—নাতনীটি কি ঠিক সেইরকম গজিয়ে উঠেছে?

গণশা কি ভাবিতেছিল, কে. গুপ্তব কথার উত্তর দিয়া বলিল,—দু টাকা, কি বলছেন মশাই? আমি ও দুটোব জন্যে পঁ-পঁচিশ টাকা মানসিক করতেও পেছপাও নাই; কত বে-বেছে বেছে সে।

এমন সময় ঘরে একটা ছায়া পড়িল, ভিতরের দবোজা খুলিয়া গোকুল চাটুজ্জে প্রবেশ করিয়া প্রশ্ন করিলেন,—গণশা আছে এখানে? ... এই যে রয়েছি, তোর ছাতা আব রেন-কোট।

সামনের টেবিলের উপর রাখিয়া আবার আস্তে আস্তে চলিয়া গেলেন। কে দিল, কোথা হইতে আসিল, কি ভালো-মন্দ একটা মন্তবাই করা,—কিছু না।

মিনিট দশেক পর্যন্ত ঘরটাতে আর কোন সাড়াই রহিল না। ... আর এটাও জানা কথা যে গণশা কালীঘাটে দুটো টাকাই হোক বা পঁচিশ টাকাই হোক—কোন মানসিকই দেয় নাই আজ পর্যন্ত।

## গাঁয়ের ডাক্তার প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

১

ডাক্তার বেচারাম চক্রবর্তী।

ডাক্তারী বিদ্যাটা তাঁহার কতখানি জানা ছিল তাহা বলিতে গেলে অনেক কথা আসিয়া পড়ে, সেসব কথা বলিয়া বিশেষ আবশ্যকও নাই।

অনেক দিন পূর্ব হইতে তিনি এই গ্রামে বাস করিয়া আসিতেছেন। মাসিক বেতন দশ টাকা মাত্র। আজকালকার দিনে দশ টাকায় দিন চালানো বড় কঠিন, তবে কোনক্রমে তাঁহার চলিয়া যাইত, কারণ সংসারে তাঁহার আর কেহ ছিল না।

লোকটী ছিলেন অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির, কোনও জটিল ব্যাপারে কিছুতেই জড়াইয়া পড়িতেন না। এখানে বাস করিয়া গ্রামের একজন ইইয়াও তিনি সকলের নিকট হইতে অনেক দূরে সরিয়া ছিলেন।

রায়েদের প্রকাণ্ড বড় বাগান, মাঝখানে বড় একটা পুষ্করিণী, জলটি তাহার কাচের মত স্বচ্ছ। বাঁধানো ঘাটের দুইপার্শ্বে সারি সারি কয়টা বকুল গাছ। বর্ষার সময়ে বকুল ফুটিয়া উঠিত, ঝরিয়া তলা বিছাইয়া পড়িত। এ পাশেব কেয়াগাছগুলিতে ফুল ফুটিত, কেয়া বকুলের গন্ধ লইয়া মাতাল ভ্রমর ছুটাছুটি করিত। আম গাছের শাখায় বসিয়া দোয়েল শিস দিত, পাতায় পাতায় খঞ্জন নাচিয়া বেড়াইত। বকুলতলা শূন্য হইতে না হইতে এদিককার শিউলি গাছগুলি সাদা সাদা ফুলে ভরিয়া উঠিত, সমস্ত রাত্রে গন্ধ বিলাইয়া সকালে ঝরিয়া পড়িত। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের ফুল কুড়ানোর বিরাম ছিল না, সমস্ত বাগানটা তাহাদের অশান্ত পদবিক্ষেপে, চপল চীৎকারে তরল হাসিতে মুখরিত হইয়া উঠিত।

এই বাগানের একটা পার্শ্বে পথের ধারে ছিল চক্রবর্তী ডাক্তারের ছোট্ট খড়ের ঘরখানা। চারচালা বারান্দা, মাঝখানে দুখানা মাত্র ঘর। একদিককার বারান্দা খানিকটা ঝাঁপ দিয়া ঘিরিয়া লইয়া তাহাই রন্ধনশালারূপে ব্যবহৃত হয়। ঘর হইতে কুড়ি পঁচিশ হাত দূরে দাতব্য চিকিৎসালয়। এ ঘরটার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। খুঁটিগুলিতে উই ধরিয়া খাইয়া ফেলিয়াছে, চাল অনেক জায়গায় নাই, দেয়ালটি কোনক্রমে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে মাত্র। এই ঘরখানির মধ্যে গুটি দুই ছোট আলমারী আছে, একখানা অতি জীর্ণ কোন অতীতের সাক্ষী চেয়ার আছে,— তাহারই সমসাময়িক একখানা টেবিলও সেখানে আছে।

যিনি এই দাতব্য চিকিৎসালয়টি স্থাপন করিয়াছিলেন সেই দয়ার্দ্রহৃদয় উদারস্বভাব জমীদার রজনীনাথ এখন পরলোকে। দেশের দরিদ্র সম্প্রদায়ের দুঃখে তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়াছিল; ইহার ব্যারামে পড়ে, একশিশি ঔষধ পায় না, ভুগিয়া ভুগিয়া অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দরিদ্রের কষ্ট তিনি অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া নিজ ব্যয়ে এই চিকিৎসালয় নির্মাণ করাইয়া দেন। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন ততদিন লোকে খাঁটি ঔষধ পাইয়াছে, সকল রকম ঔষধই তখন মজুত থাকিত। তাঁহার অস্তে চিকিৎসালয় গৃহটির সংস্কার পর্য্যন্ত



হয় নাই। তাঁহার কথানুসারে তরুণ জমিদার অবনীনাথকে বাধা হইয়া এই চিকিৎসালয়ে বৎসরান্তর কিছু করিয়া ঔষধ আনাইয়া দিতে হইত, অপদার্থ ডাক্তারকে মাস মাস দশটা করিয়া টাকা যোগাইতে হইত।

ঔষধ আগে আসিত প্রচুর, লোকে খাঁটি ঔষধ পাইত, এখন ডাক্তারখানায় আছে শুধু ব্যাণ্টর অয়েল ও কুইনাইন মিক্শচার। সেই ডাক্তার মহাশয়ই এখনও মিক্শচার তৈয়ারী করেন, কিন্তু এখন তাঁহার হাত কাঁপে, জলের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী হইয়া যায়। ঔষধের শিশি দিয়া তিনি যখন বলিয়া দেন— কেমন থাকে বলে যাস, — বলিতেই মনে পড়িয়া যায় তিনি যে ঔষধ দিয়াছেন তাহা নিছক জল মাত্র। যে ঔষধে তিনি আগে একটি দাগ করিতেন এখন তাহাতে আট মাত্রা হয়।

কিন্তু এ মিথ্যাকে ঢাকার সকল চেষ্টাই তাঁহার বার্থ হইয়া যাইত। কেন না লোকেব অসুখ না করিয়া বরং বাড়িয়াই চলিতেছিল, তথাপি অজ্ঞ লোকেরা এই ঔষধই গ্রহণ করিত।

তাঁহার দেশ পূর্ববাংলার কোন পল্লীগামে। কদাচিৎ তিনি দেশে যাইতেন, কারণ তাঁহার কেহই ছিল না। যৌবনের প্রারম্ভে পত্নী পরলোকে যাত্রা করিয়াছেন, তখন তাঁহার মাতা বর্জমান ছিলেন। তিনি অনেক জিদ করিয়াও পুত্রের আর বিবাহ দিতে পারেন নাই।

দেশ হইতে ভ্রাতা ভ্রাতুষ্পুত্র প্রায়ই পত্র দিতেন, মাঝে মাঝে দেশে আসা দরকার। তদুত্তরে তিনি জানাইতেন তাঁহার কি যাইবার যো আছে, একদণ্ড কোথাও সরিবার যো নাই, কারণ এত বড় গ্রামটার সব লোকগুলি তাঁহারই মুখ চাহিয়া বাঁচিয়া আছে, তিনি একটা দিন কোথাও গেলে ইহাদের দেখার লোক নাই— ইত্যাদি ইত্যাদি।

সন্ধ্যার সময় যখন গ্রামের পাঁচ মণ্ডল, ছকু মিঞা, রামচন্দ্রের সাক প্রভৃতি লোকগুলি তাঁহার বারাণ্ডায় বসিয়া পাঁচটা সুখ দুঃখের কথা পাড়িত, তাহারই মধ্যে এক ফাঁকে তিনি জানাইয়া দিতেন— “এই দেখ, আমার ভাই ভাইপো দেশে ফিরে যাওয়ার জন্যে চিঠির ওপর চিঠি দিচ্ছে, কিন্তু যাই বা কি করে? তাদের লিখে দিলুম,— এখন তো আমার কোন বকমেই যাওয়া হতে পারে না। এইসব অসুখ বিস্ময় নিত্য এ গাঁয়ে লেগে রয়েছে, চোলে গেলে যদি কিছু হয়— আমারই পাপ,— তোমাদের আর কি।”

গ্রামের বুদ্ধিমান মণ্ডলগুলি চমকাইয়া উঠিত, আরও ভাল করিয়া ডাক্তার মহাশয়কে আঁকড়াইয়া ধরিত, “তা কি হয় ডাক্তার মশাই, আপনি গেলে আমরা দাঁড়িয়ে মরব। যাও বা এক আধ শিশি ওষুধ পাচ্ছি তাও আর পাব না।”

গদগদকণ্ঠে ডাক্তার বলিলেন, “সেটা কি আমি বুঝিবে মণ্ডল,— এই জনোই তো যাইনে, নইলে সেখানে আমার অভাব কিসের? দিন দিন বুড়ো হয়ে পড়ছি, তারা এখন আমায় বসিয়ে খাওয়াতে চায়; কিন্তু শুই যে বদ্বুম,— কেবল তোমাদেরই জন্যে,— নইলে এখানে থাকায় আমার কি লাভ হয় বল?”

এমনই করিয়া দিন বেশ কাটিয়া যাইত।

২

বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি। আমবাগান আমে ভরিয়া উঠিয়াছে, বালক-বালিকাদের দৌরাডাও অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। ইহারই মধ্যে কয়টি দল কাগজে লবণ ও হাতে ছুরি,— অভাবে শামুকের খোলা লইয়া ঘুরিয়া গিয়াছে। সমস্ত দুপুরটা ইহাদের শ্রান্তি নাই।

ডাক্তার মশাই নিজের গৃহটার মধ্যে একখানা তক্তার উপরে মাদুরটা বিছাইয়া তাহার উপর শুইয়া পড়িয়া ছিলেন। আহালাদি শেষ হইয়া গিয়াছে, পাঁচ মণ্ডলের বিধবা মেয়ে নারায়ণী বাসনওলা মাজিতে লইয়া গিয়াছিল; সে সেওলা মাল্য শেষ কবিয়া বারাণ্ডায়

উপড় করিয়া সাজিয়া রাখিতে রাখিতে শ্রান্তভাবে বলিল, “বাবা— কি রোদ, চারিদিক যেন ঝলছে উঠছে।”

গৃহমধ্য হইতে নিক্শকণ্ঠে ডাক্তার মশাই বলিলেন, “তোকে তো তখনি বারণ করলুম নারাগী— এত রোদে ওগুলো মাজতে নিয়ে যাসনে— শুনলিনে তো আমার কথা।”

নারায়ণী শ্রান্তভাবে বারাণ্ডায় বসিয়া পড়িয়া বলিল, “আপনার যেমন কথা ডাক্তার মশাই, বিকেল বেলা কি ঘাটে যাবার যো আছে? গাঁয়ের ভদ্র লোকের ছেলেবা এমন বদ, ঘাটে পথে দেখলে যা না তাই বলে বসে। আমরা গরীব মানুষ, তাদের কথা বলতে পারিনে যে, তাই সব সয়ে যেতে হয়।”

আর একদিনকার কথা ডাক্তারের মনে জাগিয়া উঠিল। নারায়ণীর পিতা একদিন বড় দুঃখ করিয়াই বলিয়াছিল, “ভদ্রলোকের ছেলেদের জ্বালায় আমাদের মত গরীব লোকদের পরিবার নিয়ে গাঁয়ে বাস করা দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠল দেখছি।”

কেন যে সে একথা বলিয়াছিল তাহা বুঝিতে ডাক্তারের বিশেষ বিলম্ব হয় নাই, একদিন ঘাটের পথে এ প্রমাণ তিনি পাইয়াছিলেন।

তিনি একটু থামিয়া বলিলেন, “কথা শোনার চেয়ে দুপুরে কাজ করে বাথিস সে ভাল, কিন্তু এখন এই দুপুর রোদে কি করে বাড়ী ফির্বে নারাগী? খানিকটা বস, রোদটা একটু কমে আসুক, তারপরে যাস।”

এই মেয়েটার বিবাহ হইয়াছিল খুব কম বয়সে, সে নাকি তখন চার পাঁচ বছরের ছিল মাত্র, সাত আট বৎসর বয়সেই সে বিধবা হয়। মা এতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, বছর খানেক হইল তিনি মারা গিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে পিতা আবার বিবাহ করিয়াছেন। এই নূতন বধূটার সহিত নারায়ণীর মোটেই সম্ভাব জন্মে নাই। বধূটা প্রায় তাহার সমবয়স্কা, ঝগড়া বিবাদে সুদক্ষা, নারায়ণীকে সে আদতেই দেখিতে পারিত না, প্রায়ই তাহাকে খাইতে দিত না। নারায়ণীও নূতন বধূকে জন্ম করিবার চেষ্টায় অহোরাত্র ফিরিত, ইহার জন্য তাহাকে শাস্তিও পাইতে হইত বড় কম নয়, কিন্তু তাহাতে সে ভ্রূক্ষেপও করিত না। দৈহিক উৎপীড়নে সে বড় একটা কাবু হইত না, আহাব বন্ধ করিলেই একটু মুক্তিলাভিত। ডাক্তার মশাইয়ের কাছে দুই একবার ভাত খাইতে পাইয়া সে ভয়শূন্য হইয়াছিল, বাড়ীতে নিত্য অত্যাচার উপদ্রব করিয়া বধূটিকে মারিয়া ধরিয়া পলাইয়া সে এখানে আসিয়া জুটিত। স্বস্ত্যার সময় তাহার পিতা আসিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইত।

তাহার বয়স চৌদ্দ পনের বৎসর; যৌবনসীমায় পা দিয়াও মেয়েটা সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। অধুনা কেমন করিয়া সে যে বুঝিল ছেলেরা তাহাকে বিদ্রূপ করে, এবং তাহাতে কেমন করিয়া তাহার লজ্জা অনুভব হয়, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়।—

ডাক্তার একবেলাই কোন রকমে ভাতে ভাত রাঁধিতেন। কিছুদিন হইতে এই মেয়েটা তাহাব রাত্রের আহাৰ্য্যে ভাগ বসাইতেছিল। বেচারী বৃদ্ধকে একবেলা আহাৰ করিয়া থাকিতে হইত।

মেয়েটা যে দিন এখানে আসিয়া জুটিত সে দিন সে আর কিছুতেই নড়িতে চাহিত না। ডাক্তার ডাক্তারী বইগুলো নাড়াচাড়া করিতেন, পাতা উন্টাইতেন, আর সে অবাক হইয়া বসিয়া দেখিত। বোধ হয় ভাবিত ডাক্তার অত মোটা বইগুলো কি করিয়া পড়ে। ডাক্তার যখন বইগুলো রাখিয়া শ্রান্তভাবে তামাক টানিতেন ও নানা দেশ বিদেশের গল্প করিতেন, তখন সে হাঁ করিয়া সেইসব গল্প যেন গিলিয়া খাইত। ডাক্তার নিজেদের দেশের গল্প করিতেন, কত নদীর গল্প করিতেন, কলিকাতার একটা বাগানে কত রকম জন্তু জানোয়ার আছে সে সব গল্প সবিস্তারে শুনাইতেন, শুনিতে শুনিতে বালিকা শ্রোত্রীর চক্ষু দুইটা

অস্বাভাবিক রকম দীপ্ত হইয়া উঠিত। ডাক্তার গল্প সমাপ্তে যখন নিয়মিত দিবানিদ্ৰাটুকু উপভোগ করিতেন তখন সে বসিয়া বসিয়া সেইসব কথাই মনের মধ্যে তোলপাড় করিত, এবং এই ভ্রমণকারী ডাক্তারটিকে অসাধারণ মানুষ বলিয়া ধারণা করিত।

সে একদিন বারাণ্ডায় আঁচলটা বেশ ভাল করিয়া বিছাইয়া শুইয়া পড়িল, তাহার পরই বলিল, “কাল গল্প বলবেন বলেছিলেন, আজ বলুন না।”

ডাক্তার অবাক হইয়া গিয়া বলিলেন, “কিসের গল্প বলব বলেছিলেন?”

নারায়ণী বলিল, “আপনার দেশের গল্প। অন্য দেশের অনেক গল্প শুনেছি, আপনার দেশের গল্প ভাল করে বলুন।”

“আমার দেশের গল্প?” ডাক্তার হাসিয়াই আকুল, “আমার দেশের গল্প শুনিবি,— তবেই হয়েছে। আচ্ছা, শোন তবে।”

সে এক আশ্চর্য্য গল্প। ডাক্তারের দেশ,— সে মেঘনা নদীর ধারে, সেখানে নীচে ধু ধু করে সবুজ জল, উপরে ধু ধু করে সুনীল আকাশ। এপার হইতে ওপারটা দেখায় শাড়ীব পাড়ের মত। ডাক্তারের বাড়ী সেই নদীর ধারে— শাড়ীর পাড়ের মত জায়গা তাহারই উপরে। আজও মনে পড়ে নৌকায় করিয়া মেঘনার বক্ষে ভ্রমণ, মাছ ধরা, আনন্দের সেই সব গান। হায় রে, আজ সে সবই অতীতে মিশিয়া গিয়াছে, অতীতের সেই সুখময় দিনগুলার পানে তাকাইয়া তিনি আজ কিছুতেই সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস দমন করিতে পারেন না।

গল্প শুনিতে শুনিতে নারায়ণীর চোখে কেবল সেই বিগত দিনগুলি ফুটিয়া উঠিত, সে বাস্তব চোখে নৌকায় উঠা, মাছ ধরা দেখিত, কারে গান শুনিত।

এই একদিন কি তাহা গল্প শোনা? সে প্রায়ই আসিষা জুটিত, ডাক্তারের দেশের গল্প তাহা বর্ণনায় বড়ই ভাল লাগিত। সেখানকার লোকেরা কি ভাবে জীবন যাপন করে, তাহাদেব মতই তাহাদেব দিন যায় কিনা ইত্যাদি কথাগুলো সে বিশেষ করিয়া জানিয়া লইত। বারাণ্ডায় পা ছড়াইয়া বসিয়া একটু একটু দুলিতে দুলিতে হঠাৎ সে কখন হির হইয়া যাইত, তাহা ব মনটা এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইত, উত্তালতরঙ্গময়ী মেঘনার ওপারে সেই গ্রামখানির মধ্যে।

হঠাৎ কোন দিন সে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিত, “আপনার বিয়ে হয় নি ডাক্তার মশাই?”

ডাক্তার হাসিতেন, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাহার প্রফুল্ল মুখখানা গাভীরোর অন্ধকাবে ছইয়া উঠিত; তিনি বলিতেন, “বিয়ে?— না, বিয়ে আমার হয় নি।”

বালিকার কৌতূহল বাড়িয়া উঠিত, “বিয়ে হয়নি? আচ্ছা বিয়ে হয়নি কেন— বলুন না। আপনি বুড়া হয়েছেন, এখনও কেন বিয়ে করেন নি?”

সে সব কথার উত্তর এই ক্ষুদ্র বালিকার কাছে দেওয়া যায় না, কাজেই ডাক্তার একেবারে নীরব হইয়া যাইতেন। বালিকা বুকিত না বৃদ্ধ এখানে সকলের মধ্যে থাকিয়া নিজের অতীত দিনের স্মৃতিকে ডুবাইয়া দিবার চেষ্টায় আছেন। বালিকা জানিত না, বিবাহের কথায় বৃদ্ধের মনে সেই অতীতের স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়া তাঁহাকে মরণাধিক যন্ত্রণা দেয়, কাজেই সে বার-বার সেই গোপন কারণটী জানিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করে।

ডাক্তার ইহার কথাকে চাপা দিবার মতলবে আবার এক আজওবি গল্প ফাঁদিয়া বসিতেন, নারায়ণী তাহার প্রশ্ন ভুলিয়া যাইত, আবার হাঁ করিয়া গল্প গলিত।

এই চিকিৎসালয়টী ছিল ডাক্তারের প্রাণ। আজ, এই ভগ্ন গৃহখানার পানে তাকাইয়া তাঁহার মনে পড়ে ইহার প্রতিষ্ঠান-দিনটার কথা। আজ সেই গৃহ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে, ইহাতে কাহারও দৃষ্টি নাই।

একদিনকার বৈশাখী ঝড়ের একটা দমকায় চালের মটকটা সশরীরে কোথায় উধাও হইয়া গেল, চালের যে খড়গুলি অবশিষ্ট ছিল তাহাও নিপর্য্যন্ত হইয়া পড়িল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ডাক্তার নমঃশূদ্রদের মণ্ডল, পাঁচ মণ্ডলের বাড়ীতে এসে দেখা দিলেন; সকলকে ডাকইয়া আনিয়া সে ঘরের শোচনীয় অবস্থার কথা বিবৃত করিয়া অবশেষে বলিলেন, “তোমরা তো দেখতে পাচ্ছ ঘরটা ভেসে পড়ছে, এখন উপায় কি?”

পাঁচ মণ্ডল মাথা নাড়িয়া বলিল, “দেখুন ডাক্তার মশাই, ঘরটা একেবারে নতুন করেই করতে হবে, নইলে মোটেই থাকবে না। ওর খুঁটিগুলো সব পচে গিয়েছে, দেয়ালটারও অনেক জায়গায় খরাপ হয়ে গেছে। এতে খরচ ত বড় কম হবে না ডাক্তার মশাই, আমরা কি এ খরচ করতে পারব? কোনরকমে ছেলেপুলেগুলোকে মানুষ করি, ক্ষেত খামারের কাজ করি, বছরে খাজনা দিতে ব্রাহ্মি ব্রাহ্মি করতে হয়।”

মণ্ডলের সঙ্গে সঙ্গে সকলেই এই কথায় সায় দিল।

নিরুপায় ডাক্তার বলিলেন, “তবে উপায়?”

নিতাই দাস বলিল, “এককাজ করলে হয় ডাক্তার মশাই, বাবুর কাছে গেলে হয় না? ওরোঁছ বাবু এসেছেন, এখন দিনকতক থাকবেনও বটে। তিনি অবিশ্যি ঘরটা নতুন করে তুলে দেবেন,— দেওয়ারই কথা, কারণ তাঁর বাপেরই জিনিস তো।”

পঞ্চানন বলিয়া উঠিল, “ঠিক, ঠিক, বাবুর কাছে যাওয়াই উচিত।”

যুবক জমিদারের রুদ্রমূর্তি ও অশিষ্ট আচরণের কথা মনে করিয়া ডাক্তার দমিয়া গেলেন। ইব্রাহিম মিঞা বলিল, “আপনি এখনই যান ডাক্তার মশাই, বাবু এখন বাইরেই আছেন, এই আমি দেখে আসছি।”

অবশেষে তাহাই করিতে হইল।

\* \* \* \*

অবনীনাথের বৈঠকখানা তখন গুলজার, বন্ধুবান্ধবে পূর্ণ। সম্প্রতি এখানে একটা থিয়েটার ঘর তৈয়ারী করিবার কথা চলিতেছে। একটা বাঁধা স্টেজ না থাকিলে থিয়েটার করা চলে না, অভাবটা সকলেরই ভীষণ বলিয়া বোধ হইতেছে। বন্ধুবান্ধবেরা যথাসাধ্য দু এক টাকা চাঁদা দিবেন, বাকি সব অবনীনাথ দিবেন।

ডাক্তার গিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইলেন। নায়েব মহাশয় জমিদার বাবুর নিকটে অগ্রসর হইয়া জনান্তিকে বলিয়া দিলেন— “ডাক্তার মশাই,—”

“আঃ, ডাক্তার মশাই,—”

বিকট একটা হো হো হাসির ধমকে ঘরটা যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে। এইসব বর্করদের কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতে ডাক্তারের মাথাটা নুইয়া পড়িতেছিল, তিনি ইহাদের কাছে তাঁহার প্রার্থনা জানাইবেন কিরূপে?

অবনীনাথ ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিলেন, “বসুন মশাই, ওই টুলটাতেই না হয় বসে পড়ুন।”

ডাক্তার ভগ্নপ্রায় টুলটার পানে একবার চাহিলেন। এই গৃহটার মধ্যে টুলে বসিলে তাঁহাকে কিরূপ দেখাইবে তাহা কল্পনা করিয়া তিনি বসিতে পারিলেন না, দাঁড়াইয়া রহিলেন। বলিলেন, “আমার দরকার খুব সামান্য, শেষ করে এখনি চলে যাচ্ছি।”

রাখালচন্দ্র হাতে একটা তুড়ি দিয়া কি একটা কথা বলিতে যাইবামাত্র অবনীনাথ একটা ধমক দিয়া উঠিলেন, “চুপ কর রাখাল। হ্যাঁ, আপনার যা কথা একটু তাড়াআড়ি করে বলে ফেললেই ভাল হয় ডাক্তার বাবু, আমার এখনও ঢের কাজ পড়ে আছে।”

ডাক্তার বলিলেন, “না, আপনার কাজে বাধা দেব না, দুই একটা কথাটোই শেষ হবে। আপনার পিতা রায়মহাশয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্যে যে ঘরটা তৈরী করে দিয়েছিলেন সে ঘরটার অবস্থা ভারী খরাপ হয়ে পড়েছে। আপনি বাৎসরিক ওষুধ দেব কিম্বা ঘরটার দিকে কোনদিন চান নি। আপনার পিতার কীর্তি এ, খুব আশা করছি ঘরটাকে আবার ঠিক করে দেবেন দয়া করে।”

অবনীনাথ খানিক চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর গম্ভীরভাবে বলিলেন, “এখন ওইতেই চালিয়ে নিন ডাক্তার বাবু, ওদিকে বিশেষ আর কিছু করা হবে না। আমি মনে করছি আমাদের বাড়ীতেই আশ্টি মালেরিয়া সোসাইটীর একটা শাখা খুলে দেব। এতে আমার একটা পয়সা লাগবে না, বরং গাঁয়ের লোকেরা ভাল ডাক্তার পাবে, ভাল ওষুধটাও পাবে।”

ডাক্তারের মাথাটা ঘুরিতেছিল, খানিক তিনি কথা বলিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ পরে একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “সে ভাল কথা, কিন্তু এখনও তার দেৱী আছে, ততদিনে গোটাকত টাকা দিয়ে এ ঘরের চালটা—”

রুদ্রগর্জনে তরুণ জমিদার বলিয়া উঠিলেন, “যান যান, আর বেশী কথা বলবেন না। জমিদারের এক কথা, এর বেশী আর বলা হবে না। আর দেখুন, আপনার সম্বন্ধে কিছু কিছু কথা আমার কানে এসেছে। শুনলুম আপনি নাকি একটা নৈশ পাঠশালা করেন চাষার ছেলেদের পড়াবার জন্যে? এটা ভয়ানক খারাপ কাজ হচ্ছে, জমিদারের বিপক্ষে একটা ষড়যন্ত্র বাধিয়ে তোলারই ইচ্ছে আপনার। ওইসব ছেলেরা লেখাপড়া শিখে আর কি জমিদার বলে তেমনই খাতির করবে? লেখাপড়া শিক্ষা মানে— ছোটলোকগুলোর মাথা খাওয়া,— সেটা জানেন?”

দৃঢ় অথচ ধীরভাবে ডাক্তার বলিলেন, “না, আগে জানি নি, এখন জানলুম। আপনি যা বললেন, এ সত্য কথা, বুঝলুম আপনি তরুণ হ'লেও ভবিষ্যৎ ভাবতে পারেন। এই সব ছোটলোকেরা— আপনার লাখী বুক পেতে নিচ্ছে, অসহ্য বাথায় লুটিয়ে পড়ছে, তবু জানতে সাহস নেই তাদের, কেন লাখী খেলে। লেখাপড়া শেখালে, আত্মবোধ শক্তি জন্মালে তারা এমন ভাবে লাখী বুক পেতে নেবে না। কিন্তু জমিদারবাবু, আপনি জানেন না আপনার বাপ যে ছিলেন,— এই ছোটলোকেরাই তাঁর কতখানি প্রিয় ছিল, তিনি এদের মূল্য বুঝতেন, তাই এদের মানুষ করবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন, এদের শিক্ষা দেওয়ার জন্যে তিনি নিজের নৈশ পাঠশালা করে শিক্ষা দিতেন, আপনার সে কথা আজ মনে না থাকতে পারে, যারা তাঁর দ্বারা উপকৃত হয়েছে তারা ভুলে যায় নি। আপনি সব রকমে গ্রামটাকে উন্নত কবতে চান, করুন, কিন্তু এই সব ছোটলোকদের বাদ দেবেন না, কারণ এরাই হবে আপনার উন্নতির প্রধান সহায়,— এ কথা মনে রাখবেন।”

ধীরে ধীরে তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

পথে পাঁচু মণ্ডল দাঁড়াইয়া ছিল, সোৎসুকে সে জিজ্ঞাসা করিল, “কি হল ডাক্তার মশাই?” হায়রে অভাগা দরিদ্রগুলি, তাদের বেদনা বুঝিবে কে? ব্যথিত না হইলে পরের বাথা কেহ বুঝে না, নিজের চোখে অশ্রু না ঝরিলে কেহ অন্যের অশ্রুজলের মূল্য বুঝে না।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ডাক্তার বলিলেন, “ও ঘরে আর ডাক্তারখানা চলবে না পাঁচু। কিছুদিন পরে বাবুর বাড়ীতেই একটা ঘরে ডাক্তারখানা হবে, একজন বড় ডাক্তার আসবে, সেই তাদের দেখাশোনা করবে। যাই হোক ওষুধ খেয়ে বাঁচবি তখন পাঁচু, শুধু জল খেয়ে আর সর্দিকশিতে ভুগে মরবি নে।”

পাঁচু মণ্ডল ভারী খুসি হইয়া উঠিল, — “সত্যি ডাক্তার মশাই, তা হলে আমরা বাঁচব বটে। সেবাবে আনন্দবাবুর ছেলের ব্যারামে সেই যে কোথেকে একজন বড় ডাক্তার মশাই এসেছিলেন তাঁর কি-ই বা চেহারা, কি-ই বা নলচালা। কানে লাগিয়ে সেই যে নল চাললেন, ছেলে একেবারে দুদিনে খাড়া হয়ে উঠল। আচ্ছা ডাক্তার মশাই, আপনি কেন নলচালাটা শিখলেন না?”

কপালে হাতখানা ঠেকাইয়া মলিন হাসিয়া ডাক্তার কেবলমাত্র বলিলেন, “অদৃষ্ট।”

পাঁচু জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি থাকবেন তো ডাক্তার মশাই? দুজন ডাক্তার মশাই থাকলে—”

বাধা দিয়া ডাক্তার বলিলেন, “আমার আর থাকা কই হয় পাঁচু, দুচার দিনের মধ্যেই চলে যাব ভাবছি।”

বিস্মিত হইয়া গিয়া পাঁচু বলিল, “চলে যাবেন,— কেন?”

ডাক্তার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চাপা সুরে বলিলেন, “এখানে থেকে কি করব পাঁচু, আমার মত লোককে দিয়ে কোন কাজই হবে না। নতুন ডাক্তার আসবেন, ওষুধ তিনিই দেবেন, লোককে দেখাশোনা তিনিই করবেন। বাবু গাঁয়ে একটা বড় স্কুল করবেন, তোমাদের ছেলেপুলেদের নৈশ পাঠশালায় পড়তে হবে না, সেখানে ভাল পড়া হবে। বাবু তোমাদের কর্মশ্রান্ত জীবনে আনন্দধারা ঢালবার জন্যে থিয়েটার ঘর করবেন, বিনা পয়সায় সে আনন্দ তোমরা উপভোগ করতে পারবে। দুর্দিনে আমি তোমাদের কাছে ভিলুম, সুখেব দিনে তোমরা তো আমায় ডাকবে না পাঁচু, তাই আগেই আমি সরে যেতে চাই। আমার যোগাতা সীমার মধ্যে আবদ্ধ, অসীমে নিজেকে বিস্তার করবার যোগাতা আমার নেই। একদিন এমনি কাজ খুঁজতে খুঁজতে তরুণ বয়সে তোমাদের কাছে এসেছিলাম, এখন এখানকার কাজ সঙ্গ হয়ে গেছে। আবার খুঁজে দেখি গিয়ে কোথায় একটা কাজ পেতে পাবি।”

৪

সমস্ত বাগ্মিটা সে দিন ডাক্তার ঘুমাইতে পারিলেন না। কি একটা অসহ্য বেদনায় সারা বুকখানা ভরিয়া উঠিয়াছিল, তাহার উচ্ছ্বাস ঠেলিয়া আসিতেছিল, বাহির হইয়া পড়িতে চাহিতেছিল।

তিনি হিসাব করিয়া দেখিলেন, এই গ্রামে এই সব দরিদ্রদের মাঝে তাঁহার জীবনের পঁয়ত্রিশটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। তিনি আজ বাহিরের লোক নহেন, এই গ্রামের একটা অধিবাসিরূপে পরিণত হইয়াছেন।

তাঁহার নৈশস্কুলে অনেকগুলি নীচবংশীয় ছাত্র ছিল। এই সব অন্তর্ভুক্তদের গ্রামের ভদ্রলোকেরা আন্তরিক ঘৃণা করিতেন, ইহাদের স্পর্শ করা দূরে থাক, ছায়া মাড়াইতেও সঙ্কুচিত হইতেন। অবনীনাথ স্কুল করিতেছেন, কিন্তু এই সব ছেলে কি সেই স্কুলে পড়িতে পাইবে? কয়েকটা ছেলে অন্ধশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছে, ইহারা কালে একটা মানুষ হইতে পারিত। চালনা না করিলে— এত পড়াশুনা— ডাক্তারের একটা পরিশ্রম সবই বার্থ হইয়া যাইবে।

সকালে উঠিয়াই তিনি একখানা দীর্ঘ পত্র লিখিয়া অবনীনাথের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এই পত্রে তিনি স্পষ্টই জানাইলেন অবনীনাথ যে সব কার্য্য করবেন বলিয়া ইচ্ছা করিয়াছেন তাহা অতীব প্রশংসনীয়, কিন্তু ইহাতে তাঁহার কয়েকটা কথা বলিবার মত আছে। প্রথম— যে ডাক্তার আসিবেন তাঁহার শুধু ভদ্রলোকদের দেখিলেই চলিবে না, দরিদ্রদেরও দেখিতে হইবে এবং ভদ্রলোকদের মত দরিদ্রদেরও যত্ন করিয়া ওষুধ দিতে হইবে। গ্রামে যে স্কুল হইবে ইহাতে শুধু ভদ্রলোকের ছেলেরাই প্রবেশাধিকার পাইবে না, অস্পৃশ্য চণ্ডাল, মালী জেলে প্রভৃতিরও পড়িতে পাইবে একরূপ ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতে করা বিশেষ আবশ্যক। অবনীনাথের একটা কথা তিনি জানিতে চাহেন; যদি অবনীনাথ এ সকল প্রস্তাবে সম্মত না হন তিনি স্বর্গীয় কর্তার স্বহস্তলিখিত দলিলের বলে নিজে যেমন আছেন তেঁরনি থাকিয়া এই সব ব্যবস্থা করিয়া যাইবেন।

স্বর্গীয় জমিদার পুত্রের খেয়ালের উপর প্রজাদের শিক্ষা ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে মরিতে পারেন নাই। বিস্তৃত জমিদার নিজের উইলে ইহা লিখিয়া গিয়াছিলেন এবং জমিদারীর আয়ের তিনভাগের একভাগ এই সকল কার্য্যে ব্যয় হইবে এ

সম্বন্ধে একটা লেখাপড়া করিয়া ডাক্তারের হাতে দিয়াছিলেন। তিনি মানুষ চিনিতেন, ডাক্তারকে চিনতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই।

এতদিন অবনীনাথ নিতান্ত দয়া করিয়া প্রজাদের হিতার্থে যাহা কিছু দিতেছিল ডাক্তার তাহাই লইতেছিলেন, একটা আপত্তি তিনি করেন নাই। কিন্তু দরিদ্রদের এবার বিশেষরূপে নির্যাতিত হইতে হইবে দেখিয়া তাঁহার অন্তরে স্পৃহা সিংহ গর্জিয়া উঠিল, তিনি দরিদ্রদের দাবী লইয়া জমিদারের বিপক্ষে দৃঢ়পদে দাঁড়াইলেন।

এই পত্রখানা অবনীনাথের ফ্রেণ্ডশিপে যুঁট ঢালিয়া দিল। তিনি বরাবরই এই অকর্মণ্য বৃদ্ধকে দেখিতে পারিতেন না, তিনি ঠিক জানিতেন এই বৃদ্ধ ভিতরে ভিতরে প্রজাদের উত্তেজিত করে, সেই জন্য প্রজারা নিয়মিত খাজনা ভিন্ন জমিদারের সেলামি একপয়সাও দেয় না। এই পত্রখানা তাঁহার জিহ্বাসাকে বর্দ্ধিত করিয়া তুলিল, কি করিয়া এই বাঙ্গাল বৃদ্ধটাকে বিশেষরূপ জপ করিয়া, লোকের কাছে যুগিত নির্দিত করিয়া চিরবিদায় দেওয়া যাইতে পারে তিনি তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

অবিলম্বে গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গেল অবনীনাথের বহুমূল্য হীরার আংটিটা হারাইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও প্রচারিত হইল সেদিন রাত্রে যখন ডাক্তার দেখা করিতে গিয়াছিলেন তখন আংটিটা টুলেব পাশটায় পড়িয়া ছিল— হঠাৎ মনে পড়ায় অবনীনাথ খোঁজ করিয়া আর পান নাই।

গ্রামের ছোটবড় সকলেই পরস্পর পরস্পরের পানে তাকাইল, বিস্ময়ে সকলেই বলিল, “আঁ, ডাক্তার মশাইয়ের এই কাজ?”

পাঁচু মণ্ডল গুনিয়া মাথা নাড়িল, বন্ধননিরতা পত্নীর পানে চাহিয়া বলিল, “দুনিয়ায় সাধু সবাই। বাবু আজ সকালে আমায় ডেকে বললেন, খবরদার পাঁচু, চোরের দিকে যেন চাস নে। গবীর মানুষ,— থানা পুলিশ জড়িয়ে শেষটায় কেন মববিৎ বাবু হারও বললেন, দেখ পাঁচু, আমি একটা ডাক্তারখানা কবুছি, সহবের খুব বড় ডাক্তার আসবে,— সেই তোদের দেখবে শুনবে ওষুধ পস্তব দেবে? আর পাঠশালায় ছেলে পড়াবিই বা কেন? আমি মস্ত বড় স্কুল কবব— যেখানে ডাক্তারখানা রয়েছে ওইখানে, সেইখানে ছেলেপুলেদের পড়াবি। বাবুব ইঁটের পাঁজা তৈরী হচ্ছে, মাসখানেকের মধ্যে আওন পড়বে, তারপর ইটগুলো হয়ে গেলে ইস্কুল হতে আর কতক্ষণ?”

ডাক্তার মশাই চোর— কথাটা গুনিয়াই নারায়ণী তাঁহার গৃহে ছুটিল।

বেলা তখন প্রায় পড়িয়া আসিয়াছে, অস্তগামী রবির সোণাব মত কিরণটুকু গাছের পাতায় পাতায় পড়িয়া ঝিকমিক করিয়া জ্বলিতেছে। ডাক্তার নিজের জরাজীর্ণ বেতের বাস্কাটা বরাণ্ডায় টানিয়া আনিয়া তাহার ভিতরের কাপড়জামাগুলো ফেলিয়া কি খুঁজিতেছিলেন।

নারায়ণী একেবাবে কাছে গিয়া বসিয়া পড়িল, “কি খুঁজছেন ডাক্তার মশাই?”

“একটা জিনিস নারায়ণী।”

তাঁর কণ্ঠস্বর বড় ভার।

নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিল, “আংটি ডাক্তার মশাই?”

ডাক্তার দুইটা চোখ তুলিয়া তাহার মুখের উপর রাখিলেন, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “আংটি নয়; আংটির চেয়ে বেশীই দাম তার, সেইটাই খুঁজছি।”

বাগ্র চোখে নারায়ণী দেখিল, হিজিবিজি কি সব লেখা বহুপুরাতন একটুকরা কাগজ পাইয়া ডাক্তার মশাইয়ের চোখ দুইটা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, তিনি অতি যত্নে সেখানা হাতের মধ্যে রাখিয়া বাস্ত্রে কাপড়জামা তুলিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। নারায়ণীর পানে চাহিয়া মলিন মুখে একটু হাসির বেখা ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াসে বিকৃত করিয়া ফেলিয়া আত্মকণ্ঠে বলিলেন, “আমি কাল সকালে এ দেশ ছেড়ে চলে যাব নারায়ণী।”

“চলে যাবেন,— কোথায় যাবেন, আবার কবে আসবেন?”

তাহার ব্যাকুল কণ্ঠস্বর ডাক্তারের হৃদয় স্পর্শ করিল, তাঁহার দীপ্ত চোখ দুইটা অজ্ঞাতে কেমন করিয়া জলে ভরিয়া উঠিল; তিনি রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, “কোথায় যে যাব তা এখনও ঠিক করতে পারিনি; তবে এ গ্রাম হতে জন্মের মতই যাচ্ছি, আর যে ফিরে আসব না, এ কথা ঠিক।”

নারায়ণী অন্যদিকে চাহিয়া আড়ষ্টভাবে বসিয়া রহিল, খানিক পরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “আংটা চুরি করার কথাতেই আপনি—”

অকস্মাৎ দীপ্ত হইয়া উঠিয়া ডাক্তার বলিলেন, “তুইও কি ভাবিস নারায়ণী আংটা আমি নিয়েছি?”

ছেট্ট একটা “না” বলিয়াই নারায়ণী ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় আবার একখানা পত্র লিখিয়া জমীদার মহাশয়ের লেখা দলিলখানি দিয়া একটা বালককে তিনি অবনীনাথের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

\* \* \* \*

ঘাটে নৌকা বাঁধা, নৌকায় খানিক দূর গিয়া তবে রেলওয়ে স্টেশনে যাওয়া যাইবে। স্থলপথ দিয়াও যাওয়া চলে, কিন্তু জ্যেষ্ঠের দারুণ রৌদ্র স্থলপথ অপেক্ষা জলপথে গমন প্রশস্ত ভাবিয়া ডাক্তার নৌকা ঠিক করিয়াছেন।

নিস্কল ঘাটে আসিয়া ডাক্তার একবার পিছন ফিরিয়া চাহিলেন। ওই— অদূরে দেখা যাইতেছে আমবাগান, উহারই মধ্যে তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় চিকিৎসালয়, চিরপরিচিত ছোট ঘরখানি। আজ তাঁহার সব হারাইয়া চোর বদনাম লইয়া কেবলমাত্র একটি বাস্তব সম্বল করিয়া চিরবিদায় লইতে ইহতেছে, এ দুঃখ কি কিছুতেই যায়? এত শীঘ্র তিনি পরাজয় মানিতেন না, যদি বদনামটা তাঁহার বিস্তৃতি লাভ না করিত। আজ তিনি ছোটবড় সকলের কাছে ঘৃণিত, কাহারও নিকটে মুখ দেখাইবার যো আজ তাঁহার নাই। কাল রাত্রে তিনি পাঁচুব বাটাতে গিয়াছিলেন, সে গৃহমধ্য ইহতে তাঁহাকে শুনাইয়া কন্যাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিল,— “বল গিয়ে বাড়ী নেই। জমীদারের বিষচোখে ওঁর জন্যে পড়তে পারব না।”

আরও কি শুনিবার জন্য তিনি এখানে পড়িয়া থাকিতে চান?

দেশটা ছাড়িয়া যাইতে তাঁহার বুক বড় ব্যথা বাজিতেছিল, চোখ ফাটিয়া জল আসিতে ছিল। ইহার পথ, ঘাট, মাঠ সবই যেন তাঁহার আজন্মকালের পরিচিত ছিল, অনেক সময় তিনি নিজেই ভুলিয়া যাইতেন, তিনি এখানকার কেহ নহেন, বিদেশী মাত্র। ইহার অধিবাসীরা তাঁহার কেহই ছিল না, আপনার স্বভাবগুণে তিনি ইহাদের বড় আপনার ইহতে পারিয়াছিলেন। এর উদার সুনীল আকাশ, বহমান মৃদুল বাতাস, পাখীর কলগীতি, সবই তাঁহার বড় আপনার ছিল। আজ এ সব ছাড়িয়া যাইতে হৃদয় চাহিতেছিল না, তাই দুই পা চলিয়া চমকিয়া দাঁড়াইয়া তিনি পিছন দিকে চাহিতেছিলেন।

নারায়ণী আসিয়া প্রশ্ন করিতেই তিনি চমকাইয়া উঠিলেন, উর্দ্বনেত্র নত করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, “তুই এসেছিস নারায়ণী—?”

নারায়ণী কাদিয়া বলিল, “হ্যাঁ ডাক্তার মশাই, বাবা আসতে দিচ্ছিল না, আমি পালিয়ে এসেছি।”

একটা বুকভাঙ্গা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ডাক্তার বলিলেন, “আমি যাচ্ছি নারায়ণী, কিন্তু যতদিন আর বেঁচে থাকবো তাদের কথা ভুলব না। তাদের গরীব ডাক্তার মশাই কিছু দিয়ে যেতে পারলে না রে, কিন্তু অনেকখানি নিয়ে চললো।”

মাঝি ডাকিল, “বাবু আসুন, ট্রেন ধরতে হবে।”



চমকাইয়া ডাক্তার বলিলেন, “হ্যাঁ, এই আসি। আজকের দিনে, এই অবস্থায় সবাই আমায় পর বলে ডাবলে, সবাই আমায় দূরে রেখে দাঁড়ালে, কেবলমাত্র তুই নারায়ণী,— তুই মাত্র আমায় আপনার ভেবে কাছে এসে দাঁড়ালি। আজ শেষ বিদায়ের পূর্বক্ষণে নিজেকে একেবারে একলা ভেবে একলা চোখের জল মুছছিলুম, তুই এমনি সময় এসে তোর চোখের জল আমায় উপহার দিলি, যাতে জানতে পারলুম— সবাই আমায় ভুলে গেলেও তুই ভুলবি নে। আশীর্ব্বাদ করে যাচ্ছি — যেন সুখী হতে পারিস।”

গোপনে চোখের জল মুছিতে মুছিতে তিনি নৌকায় উঠিলেন।

নদীর কালো জল চিরিয়া নৌকা সোজা অগ্রসর হইল। অতৃপ্ত নয়নে ডাক্তার দেখিতে দেখিতে চলিলেন, সবই চিরপরিচিত। তাঁহার এই শেষ বিদায়ের ক্ষণেও গ্রাম পূর্বে যেমন ছিল তেমনই রহিয়াছে।

ফরিয়া দেখিলেন শূন্যঘাটে নারায়ণী একা দাঁড়াইয়া উচ্ছলিত অশ্রুজল মুছিতেছে।

## মায়ের দিন মণীন্দ্রলাল বসু

রাতের অন্ধকার যখন পাংলা হয়ে আসে, শুকতারাটা দপদপ করে তেল-ফুরিয়ে-যাওয়া প্রদীপের শিখার মত, ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস বয়, আর মিউনিসিপ্যালিটির ময়লা-ফেলা গাড়ীগুলোর চাকাব বনবাননি শব্দে ঘুমন্ত নগরের জনহীন পথ আকুল হয়ে ওঠে, তখন কমলাব ঘুম ভেঙে যায়। সেই সময়ে তার স্নেহঘেরা কোলে ছোটখুকীর চোখ থেকেও ঘুম চলে যায়, গাছের পাতা-ঢাকা নীড়গুলিতে পাখীদের গান গেয়ে ওঠার সময় স্নিগ্ধ ভোরবেলায় ছড়ানো বিছানাতে মা ও মেয়ের খেলায় মায়ের দিনের আরম্ভ হয়। তরল অন্ধকারে মায়ের বড় মুখখানি বদিকে চেয়ে সদ্য-জাগা পাখী ব ছানাব মত ‘আঁ’ ‘আঁ’ শব্দ করে খুকী আপন মনে হাত-পা ছোঁড়ে, কমলা তার নবীনকোমল অধরে চুম্বন দিয়ে এলানো গাড়ীটা কোনমতে জড়িয়ে বিছানা থেকে ওঠে, ছেলেমেয়েদের গায়ে বিছানার চাদবটা টেনে দেয়। সন্ধ্যাবেলায় যে চাদরটা বিছানাতে পাতা হয়েছিল, ভোরবেলায় সে চাদরটা যে কি করে কুণ্ডলী পাকিয়ে মোঝেতে গিয়ে পড়ে, ছেলেমেয়েদের নিদ্রা-পঙ্কতির সে এক রহস্য। স্বামীর খাটেব পাষেব দিকের জানলাটা বন্ধ করে দেয়, ভোবের আলো ও ঠাণ্ডা বাতাস যেন স্বামী ব ঘুমেব ব্যাঘাত না করে। তার পর, সে আবার বিছানাতে শুয়ে ছোটখুকী চাপুকে বুকে টেনে নেয়, তার তুলতুলে পায়ে হাত বুলিয়ে চাপার কলির মত আঙুলগুলি নিয়ে খেলা কবে। সারাদিনেব কাজে খুকীকে যে একটু আদর করবে তারও সময় হয় না,— এই ভোরবেলা হচ্ছে কমলাব মাতৃ-স্নেহলীলার সময়। খুকী মায়ের মুখের দিকে চেয়ে হাসে আর দুখ খায়,— মাঝে মাঝে সুর করে বলে’ ওঠে— আঁ, আঁ, আঁ।

—দুটু চাপু, চাপু, এফুনি বাবার ঘুম ভেঙে যাবে। চাপু তার ফুলের কুঁড়ির মত চোখ দুটি নাচায়।

খাটের ওপর স্বামী শোন, তলায় মেঝেতে লম্বা বিছানা,—এক দিকে খুকী আর খুকীর মা, তার পব লাখী, তার পর রাণু, তার পর মনা, তার পব শোভা,— বয়সেব বাড়তি অনুসারে শোয়, মাঝে একটি করে পাশ-বালিশ ব্যবধান। এই পাশ-বালিশ হচ্ছে প্রত্যেকেব বিছানা বাসেব সীমানা। লাখীর কিন্তু দু’দিকে দুই পাশ-বালিশ ও পায়ের দিকেও একটা বালিশ চাই,— তার বয়স চার কি না,— সেজন্যে চারটে বালিশ না হলে তার চোখে ঘুম আসে না। রাণু কিন্তু ভাবি লক্ষ্মী। সে বলে, তার একটা পাশ-বালিশও চাই না। কি হবে মা, বাক্তে বালিশ নিয়ে, আমি ত আর লাখীর মত ছোট নেই যে গড়িয়ে মেঝেতে পড়ে যাবো। ছ’বছর তার বয়স, এরি মধ্যে গিন্গি। সবচেয়ে দুটু হচ্ছে মনা। তার ওপর রাতে ঘুমের ঘোরে সে ঘরপাক খায়,— শোভা বেচারাকে লাথি মেরে তার ওপর দিবা পা তুলে মহানন্দে ঘুমোয়। শোভা যে সবাব বড়দিদি এই গর্বটুকু বজায় রাখবার জন্যে সে আর নালিশ করে না,— ছোট ভাই ঘুমের ঘোরে হাত-পা ছোঁড়ে, তা কি করা যায়! সে মাঝে মাঝে বলে বটে, মা, ও চরকির পাশে আমি শোব না, কিন্তু সন্ধ্যা-বেলায় আর আলাদা বিছানা করতে দেয় না, সে মনার পাশেই শোয়।

দু’টো মোটা পাশ-বালিশের দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলে শোভা ভাবে আজ নিরাপদে ঘুমানো যাবে, কিন্তু রাতে যখন চরকি ঘোরে,— কোথায় থাকে পাশ-বালিশ, কোথায় বা থাকে

মাথার বালিশ,— মনার এক পা চলে যায় শোভার বিছানাতে, আর এক পা চলে যায় মেঝেতে,— চাদরটা তালগোল পাকিয়ে থাকে,— কিন্তু কারুর ঘুমের কোন কমতি বা ব্যাঘাত হয় না।

খুকীর দুধ খাওয়া শেষ হলে খুকীর চোখ ধীরে ধীরে বন্ধে আসে, আবার সে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু খুকীর মায়ের আর ঘুমানো চলে না। কমলা ধীরে উঠে আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে, চুলগুলো মাথায় কুণ্ডলী করে বঁধে, ঘুমন্ত ছেলেমেয়েগুলির দিকে সম্মেহ নয়নে চেয়ে দেখে। ইচ্ছে করে প্রত্যেককে বুকে জড়িয়ে চুমো খায়, কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে না। লাখীকে সোজা করে শুইয়ে দিয়ে তার চার-পাশে চারটি বালিশ ঠিক করে রাখে। রাণু কি শান্ত ভাবে ঘুমোচ্ছে,— তার কোলের পুতুলটিরও নড়চড় হয়নি। মনাটাকে মেজে থেকে তুলে বিছানাতে শুইয়ে দেয়,— মনা কি বিড়বিড় করে বকে ওঠে— ‘গোল’ ‘গোল’, আর সঙ্গে সঙ্গে পা হেঁড়ে —সারা বিকেল ফুটবল খেলে তার আশ মেটে নি।

চারিদিক নিব্বন, সবাই ঘুমোয়,— ভোরের আলো পূর্বের পাঁচিল দিয়ে আসে— ময়নাটা খাঁচায় উসখুস করে। কমলা ময়নাটাকে বলে, গোলমাল করিস না। তার পর ঝি-চাকরদের জাগাতে নীচে চলে যায়। মধুটা কোন দিন যদি সকালে ওঠে,— দালান বারান্দা সিঁড়ি সব ধুতে হবে,— ধুয়ে শুকিয়ে যাবার আগে যদি সবাই উঠে পড়ে, পায়ে পায়ে কাদা হয়ে যায়। এই ধোওয়া নিষে স্বামীর সঙ্গে কত গোলমাল না হয়েছে। স্বামী বলেন, ‘আচ্ছা, কলকাতা সহনৈব সব বাড়ীর দালান বাবান্দা সিঁড়ি উঠান সব জল দিয়ে যদি ধুতে হয়, কত জল লাগে বল ত! অত জল মিউনিসিপ্যালিটি দেবে কি কবে?’

কমলা বলে, ‘তা হিদুর বাড়ী আমি স্নেহপনা করতে দেবো না।’

মধুব ঘবেব শিকলি বন্বন শব্দে বেজে ওঠে।— ‘হতভাগা ওঠ না, কলে জল এসেছে কতক্ষণ।’

—‘উঠি মা।’

কমলা নিজেই বালুতি ও কাঁটা নিয়ে সিঁড়ি ধুতে আরম্ভ করে,— জানে, কাঁটার শব্দ না শুনে মধু উঠবে না। আব মা ধুচ্ছেন জনলে সে আর শুয়ে থাকতে পারবে না। চোখ বগড়াতে বগড়াতে মধু ছুটে আসে— ‘মা আমায় দিন, আমায় দিন।’

কমলা দরজা খুলে রান্নাঘরে ঢোকে,— সব ঠিক আছে,— রাতে তাহলে বেড়াল ঢোকে নি। উনানের ছাই নিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে বাহিব হয়ে আসে— ওসব ক্রীম, পাউডারে নত মাঙ্গ তাব পোষায় না।

মুখ ধুয়ে কমলা ওপরে উঠে আসে,— সব দরজার গোড়ায় জল-ছড়া দেয়,— শাওড়ী ঠাকরুণের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে,— ‘মা, রাতে কেমন ঘুম হল?’ উত্তর আসে, ‘ভাল না মা।’ কয়েক দিন হল শাওড়ীর হাঁপানিটা বেড়েছে। শোবার ঘরের দরজায় দাঁড়ায়, খুকী ব সুখস্বপ্নহাস্যভরা মুখখানি দেখে, তার পর মনাকে ডাকে, ‘খোকা খোকা’। মনা রোজ মাকে বলে, মা ভোরে উঠিয়ে দিও, পড়া মুখস্থ করবো, কিন্তু কোন দিন সে ভোরে উঠতে পারল না। কমলা দু’তিনবার ডাকে, হাত ধরে ঝাঁকুনি দায়। মনা গাঁইগুই করে বসে, আবার শুয়ে পড়ে। ঘুম-ভরা ছেলেকে টেনে তুলতে কমলার মনে বাস্তব,— বলে, ঘুমোক, কত পড়বে!

স্বামীর, ছেলেমেয়েদের দাঁত-মাজার সরঞ্জাম ঠিক করে বেখে, ওপরের ঠাকুর-ঘর মুছে, উনানে আগুন দিয়ে, স্নান করে কমলা যখন রান্নাঘরে ঢোকে, তখন সূর্য উঠে গেছে— অরুণ-রথচূড়া পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি চায়ের জল বসিয়ে দিয়ে গয়লার কাছ থেকে দুধ মেপে নেয়। মধুর সিঁড়ি বারান্দা ধোওয়া হয়ে গেছে,— সে এসে দাঁড়ায়— ‘মা, চা, বাবু যে হাঁকছেন।’ ‘হাঁকতে দে, জল বসিয়েছি। চায়ের বাটি না হলে

বিছানা থেকে উঠতে পারেন না, কিন্তু ছেলেমেয়েগুলির যে মাথা খাচ্ছেন। হ্যাঁ রে, ছেলেমেয়েগুলোর সব মুখ ধোওয়া হয়েছে?’

‘মুখ ধোওয়া কোথায় মা, সব এখন যুদ্ধ হচ্ছে।’

‘যুদ্ধ কি রে?’

‘বালিশ ছোঁড়াছুঁড়ি।’

‘আবার আজ হচ্ছে, রোস দেখাচ্ছি।’

বিছানা খামসানো বা বালিশ ছোঁড়া কমলা মোটেই পছন্দ করে না,— তার বুকে যেন বাজে, — হনহন করে সে ওপরে চলে যায়।

শোবার ঘরে দু’পক্ষে যুদ্ধ চলে,— এক দিকে মনা আর লাখী, অপর দিকে শোভা আর রাণু,— তাদের বাবাও মাঝে মাঝে যোগ দান। মনা সবচেয়ে ওস্তাদ,— তার তাগটা ঠিক হয়। লাখী বেচারার ছোট বালিশগুলিই সবাই টেনে টেনে ছোঁড়ে। সে মাঝে মাঝে চৈচিয়ে ওঠে, ‘আমার বালিশ, আমার বালিশ।’ তার পর নিজের পক্ষের জয় হচ্ছে দেখে হেসে ওঠে। এই যুদ্ধক্ষেত্রে চাঁপু কিন্তু সুখে নিদ্রা যায়।

মাকে দেখে যুদ্ধটা হঠাৎ থেমে যায়,— মনা কিন্তু হাতের বালিশটা শোভাকে ছুঁড়ে মারতে ছাড়েন না।

—‘হতভাগা ছেলেরা, সকালে উঠে কাণ্ড দেখ না, মেরে’—

সবাই সমস্বরে চৈচিয়ে ওঠে— ‘মা, মনাই ত আরম্ভ করলে’—

‘আমি। বাঃ, বাবা ত প্রথমে’—

‘মা দেখো না, আমার বালিশ, এই তুলো বেরিয়ে গেল।’

‘মনা শীগগীর ওঠ, হতছাড়া ছেলে— আর হ্যাঁ গা, তুমি বুড়ো মিনসে, তুমি কি শিং ভেঙে বাছুরের দলে’—

ক্ট্রীকে দেখেই স্বামী শুয়ে পড়েন,— তিনি নীববে চোখ বোজেন। মনা দৃপ্ত ভাবে উঠে চলে যায়,— জানে মা এখন স্নান করে কাচা কাপড় পরে, সুতরাং তার ওপর কোন চড় বা চাপড় পড়ার আশঙ্কা নেই।

স্বামীর চা ও ছেলেমেয়েদের সিদ্ধ ওটমিল-মিশ্রিত দুধভরা বাটিগুলি সাজিয়ে মধুর হাতে দিয়ে কমলা উঁড়ার ঘরে তরকারি কুটতে বসে, — ঠাকুর এখন এসে পড়বে। মধু এসে দাঁড়ায়,— ‘বাজার কি আঁনতে হবে মা।’ ঝি ঝামা দিয়ে কড়া মাজতে-মাজতে কলতলা মুখর করে তোলে। লাখী এসে দাঁড়ায়, সঙ্গে শোভা।

‘দেখ মা, লাখী দুধ খাচ্ছে না।’

‘মা, আমার বাবা একটু চা দিচ্ছে না কেন।’

কমলার সামনে বাঁটি, —চারি দিকে তরকারির পাহাড়,— আলু চেরা, পটল কাটা চলছে। তার সঙ্গে ঝকুঁম করা,— ছেলেমেয়েদের অভিযোগের শীমাংসা করা,— বামুনঠাকুরের ফরমাজ শোনা, সব চলছে।

‘লক্ষ্মী লাখু দুধ খাও গে, আমার সঙ্গে চা খেও। ওই রে চাঁপু জেগেছে,— রাণু, নিয়ে আয় ত মা দুধটা খাইয়ে দে’না।’

শোভা হচ্ছে পড়ুয়ে মেয়ে— সে সংসারের কাজে খেঁসে না। রাণুর প্রথম ভাগ শেষ হয়েছে,— ‘এঁকা বাকা’ আর তার পোষাচ্ছে না,—মুখতার অখ্যাতি সে বহন করতে রাজী আছে,— বিদুষী বলে সে বিখ্যাত হতে চায় না। সেজন্যে সংসারের একটু কাজ করতে পারলে সে খুসি,—ততক্ষণ ত মাস্টার মহাশয়ের কাছে পড়াটা ফাঁকি দেওয়া যায়। সে সর্বদাই মাকে সাহায্য করতে বাস্তু,—চাঁপু কাদলেই সে পড়ার ঘর থেকেও ছোটে।

ঠাকুরের চাল ডাল বের কবে, তরকারি বুঝিয়ে কমলাকে একবার ওপরে যেতে হয়। বাড়ীখানা এতক্ষণে সরগরম হয়ে উঠেছে। পড়ার ঘরে মনার সঙ্গে পান্না দিয়ে রাণু টেঁচাচ্ছে,—

কলতলায় ক্ষেত্রের মা বাসন মাজার সঙ্গে বকবক করছে,—রান্নাঘরে তেলের কল্কল শব্দ হচ্ছে,—আর শোবার ঘরে কেণ্টো খাটের বিছানা তুলছে,—তলায় বিছানাতে লাখীতে চাঁপুতে স্বামীতে মিলে হাসাহাসি চাঁচামেচি চলছে,—বারান্দাতে ময়নাটাও তার সঙ্গে ডেকে উঠছে। কমলা শোবার ঘরের দিকে এখন যায় না,—চাঁপু ‘মা’ বলে চাঁচালে, তাকে কোলে না নেওয়া দু’পক্ষের পক্ষেই কষ্টকর ব্যাপার হবে, শেষে ব্রহ্মনের জয়ই হবে। সে সিঁড়ির পাশে ঠাকুর ঘরে চলে যায়,—সকাল থেকে ঠাকুর-দেবতার একটু নাম করবার সময় পায় নি। সাদা শাড়ীটা ছেড়ে একটা তসরের কাপড় পরে; কিন্তু আত্মিক করতে বসে নীচের কলরব কানে আসে,—মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। নীচে মধুর গলা শোনা যায়। কি মাছ পেল, কত পয়সা ফিরলো,—এ সব জানতে মন উসখুস করে,—আত্মিক তাড়াতাড়ি সেরে চলে আসতে হয়।

মাছ কত ভাগ করে কুটতে হবে বলে, রান্নাঘরটা পরিদর্শন করে’ ভাঁড়ার-ঘরে ঢুকে কমলা দেখে, শাশুড়ী ঠাকুরপুত্র নীচে নেমে এসে ভাঁড়ার-ঘরের এক কোণ দখল করে বসেছেন,—ভাঁড়ার-ঘর-আত্মিকও হয়ে গেছে। শাশুড়ী বলেন, ‘দাও বৌমা, পানগুলো আমিই সাজছি, না বাপু, তোমার এ মেয়ের জ্বালায় পারা গেল না।’ চাঁপু ঠাকুরমার কোলে চড়ে নেমে এসেছে, এখন কোল থেকে নামতে চায় না, আলুর খোসা দিয়ে তাকে ভুলোতে হয়।

সকালের ঘড়ির কাঁটাগুলো ছুটে চলে,— ঠাকুরের ঝোল সাত্তালানো হতে না হতেই কলের ঘরে ছেলেমেয়েদের ভিড় লেগে যায়।

লাখী দিগম্বর হয়ে এসে বলে, ‘মা, আমায় কেউ ছান করিয়ে দিচ্ছে না।’

মনা বলে, ‘আমার খদ্দেরের সার্ট কোথায় মা?’

শোভা বলে, ‘আমি কোন্ শাড়ী পরব?’

রাগু মুখ লাল করে বলে, ‘মা, আজ এক মেম আমাদের স্কুল দেখতে আসবেন, আমি সেই সোনালী ফ্রকটা পরব?’

শোভা মনে মনে বলে ওঠে, ‘সিন্ধের শাড়ী পরে গেলে আবার হেড মিস্ট্রেস্ চটেন,—নিজেরা ত বিকেলে কত সাজগোজ করে বেরুন হয়।’

‘হ্যাঁ রে, স্কুলে যাবি, আবার সাজগোজ করে যাওয়া কি রে।’

বাণুর ইচ্ছা আজ ফ্রক না পরে শাড়ী পরে যায়, কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারে না।

দিদিদের দয়া হলে তারা লাখীকে স্নান করিয়ে দেয়। কিন্তু স্নানের সময় লাখী এত জল ছোঁড়ে, দুষ্টনি করে,— একবার গা মুছিয়ে দিয়ে আবার গা মোছাতে হয়,— দেবী হয়ে যায়,— সেজন্যে সহজে তারা কেউ লাখীকে স্নান করতে রাজী হয় না। কমলাকে স্নান কবাতো হয়। এই নবনী-কোমল দেহে তেল রগড়ানো, সাবান মাখানো, ধোয়ানো, জল মোছানোতে আনন্দ আছে, কিন্তু রোজ সে সুখ উপভোগ করবার সময় কোথায়, মধুকে ডাকতে হয়— ‘দে বাবা লাখীকে চান করিয়ে।’ কমলা চাঁপুকে স্নান করায়।

তার পর দালানে আসন-পাঁড়ে সশব্দে পড়ে যায়। ‘ঠাকুর ভাত দাও।’ ‘শীগগীর!’ ছেলেমেয়েরা গোগ্রাসে গিলতে থাকে।

‘হ্যাঁ রে মনা, এই ত সাড়ে নটা, আস্তে খা’—

‘মা, আমার আজ পরীক্ষা।’ ওজর একটা আছেই কিন্তু পরীক্ষা আছে বলে আধ ঘণ্টা আগে স্কুলে যাবার কারণ সম্বন্ধে কেহ প্রশ্ন করিল না। মনার মনে শুধু জাগে, কাল দুটো লাটু হারিয়েছি, আজ সেগুলির উদ্ধার করতে হবে।

ছেলেমেয়েরা খেতে বসে, একটু দেখবারও সময় নেই,— কমলা তোলা-উনানে তাড়াতাড়ি পটল ও লুচি ভেজে এ্যালোমিনিয়ামের বই-এর মতন টিফিনের বাস্‌ সাজায়। বামুন-ঠাকুরের আলুর দম এখনও হয়ে ওঠেনি। ভাঁড়ার ঘরের দরজার চৌকাটে বসে ঠাকুমা কিছু তদারক করেন।

‘গাড়ী আয়া বাবা!’ শোভা আর রাণুঝড়ের মত ছোটো,— পিঠের ওপর বেণী দোলে,— জুতোর হিলগুলো সিঁড়িতে খটখট করে,— বুঝি হিল-ওয়ালা জুতো শুদ্ধ ঠিকরে পড়ে। ওরে খাবারের বাস্কেল? সেদিকে তাদের হাঁস থাকে না,— খাতা-বইগুলো বুঝি হাত থেকে পড়ে যায়। মধু টিফিনের বাস্কেল নিয়ে পেছনে ছোটো, কমলাও উঠে এসে ভাঁড়ার-ঘরের জালতি-দেওয়া জানলা দিয়ে দ্যাখে,— মেয়ে দুটো উঠল, দরজা বন্ধ হল, বাস্কেল চলে।

‘মা, স্কুলে যাচ্ছি।’ বইডরা চামড়ার ব্যাগটা দুলিয়ে মনা সামনে এসে দাঁড়ায়। ‘আজ পরীক্ষা বুঝি?’ ‘হ্যাঁ মা,’ বলে সে তাড়াতাড়ি একটা প্রণাম সেরে নেয়।

পরীক্ষার দিন মাকে প্রণাম করে গেলে ফলটা ভাল হবেই, এ বিশ্বাস তার দৃঢ়। কমলা তার সার্টের কলারটা ঠিক করে দেয়, গলার বোতামটা আঁটতে চায়। ‘থাক মা, ওটা খুলে রাখা ফাসান, আর যা গরম!’ নিমেষের মধ্যে খোকা অন্তর্হিত হয়ে যায়। এ দিকে স্বামী খেতে বসেন, তাঁর পাশে লাখী ও চাঁপু।

চাকরদের জলখাবার দিয়ে, এক হাতে এক বড় পেতলের বাটিতে চা ও আব এক হাতে পাখা নিয়ে কমলা স্বামীর কাছে এসে বসে। চা নয়, চায়ের সরবৎ— তাতে চায়ের চেয়ে দুধ ও চিনির ভাগই বেশী,— এতেই বেলা একটা পর্যন্ত চলবে।

মায়ের সঙ্গে চা খাবে, না, বাবার সঙ্গে গরম মাছ-ভাজা খাবে,— এ সমস্যা সমাধান করে উঠতে পাবে না। ‘চা ছাই না’ বলে গরম মাছ-ভাজাই খেতে আরম্ভ করে। তাবপব মায়ের গলা জড়িয়ে চায়ের বাটির দিকে এমন ভাবে চায় যে চা একটু দিতেই হয়। চাঁপু কিন্তু একটু আলু খেয়েই সমস্ত,— লক্ষ্মী মেয়ে।

পান নিয়ে যখন কমলা উপবে আসে, স্বামীর অর্ধেক সাজগোজ হয়ে গেছে,— মধু পাখার বাতাস করছে। সে মাকে দেখেই পাখাটা রেখে অকারণে চলে যায়। কমলা পাখা করতে করতে দু’একটা সংসারের কথা বলে। সকালের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর এই মিলন,— আফিসের পোষাক পরাব অবসরে পাখার বাতাসে সাংসারিক প্রেমালাপ হয়। কমলা কোটটি ধরে, স্বামী দু’টো হাত তাতে ভরে বলেন,— ‘থ্যাক ইউ ডিয়ার।’ তারপর এক হাতে কমলার ঠাণ্ডা নরম গালে আদর করেন। কমলার গাল-দুটিতে রক্ত ফেটে পড়ে, বলে, ‘যাও, ঢং কবতে হবে না।’

স্বামী বলেন, ‘সংসার-সংগ্রামে রণক্ষেত্রে যোদ্ধাব বেশ পরিচয় পাঠাচ্ছে,— বিভ্রম-তিলক দাও।’ কমলা একটু ঘাড় বঁকিয়ে দরজাব কাছে যেন পথ রোধ কবে দাঁড়ায়। এই ভঙ্গীতে তাকে বড় সুন্দর দেখায়। কোন দিন বা উচ্ছ্বাসের আবেগে স্বামী একটি চুমো খেয়ে ফেলেন। কমলার সমস্ত দেহে পুলকের শিহরণ লাগে।

‘তবে আঁসি প্রিয়ে।’

স্বামীর জুতোর শব্দ মিলিয়ে যায়,— সদর দরজা বন্ধ হবার শব্দ কানে আসে,— ঘরের মাঝে কমলা উদাসভাবে যেন স্বপ্নের ঘোরে দাঁড়িয়ে থাকে,— সব কাজ ভুলে যায়। বাড়ীখানা স্তব্ধ, নিবুম, মনটা ভারী হয়ে আসে। আঁচল দিয়ে খাটের পায়গুলো ঝাড়ে,— অকারণে কুলুঙ্গি থেকে তেলের ঔষধের শিশিগুলো নামিয়ে ঝাড়তে আরম্ভ করে, কিন্তু কাজে মন থাকে না। সকালের সেই কর্মময়ী কমলা যেন বদলে গেছে কয়েক মূহূর্তের জন্যে।

দালানের কোণ থেকে একটা ডাক আসে— ‘মা, মা, দেখো না—’

কমলা চমকে ওঠে, মনের কুয়াসা কেটে যায়, বলে— ‘যাই, বাবা, ঠাকুরকে জিজ্ঞেস কর ত— মাগুর মাছের ঝোল হয়েছে কি?’

‘হয়েছে মা।’

সাবান দিয়ে ধোবার জন্যে রুমাল, গেঞ্জি, মোজা, খুকীর জামা সব জড় করে মধুকে দিয়ে কমলা লাখীকে মাগুর মাছের ঝোলভাত খাওয়াতে বসে। লাখী একটু পেটরোগা,—

বাবা মা দাদা দিদিদের সঙ্গে বার বার খাওয়াই তার কারণ। মুখ তার সারা দিন টুকটাক্ চলছে। স্বামী তার জন্যে বকেন, আবার নিজেই দিতে ছাড়েন না,— খাবার সময় সামনে এসে বসলে কিছু মুখে না দিয়ে থাকা যায় না।

লাখীকে খাওয়াতে বসলেই চাপু কোথা থেকে টলতে টলতে চলতে চলতে এসে থানার কাছে থপ্ করে বসে পড়ে বলে,— ‘মা মা, ভত্ ভত্’, তা-এর ওপর এমন একটা জোর দেয় যে না হেসে থাকা যায় না।

সকালে কাজ হচ্ছিল দ্রুতগতিতে, যেন মেলগাড়ী বইছিল ছুটে চলছে। এখন কাজ চলে ডিম্বোত্তেতালে। ভাঁড়াব-ঘবেব খুঁটিনাটি, বসার ঘরের টেবিল সাজানো, শোবার ঘরের খাড়পোছ চলে অনস ভাবে। এই ধুলোঝাড়া, গোছানো, সাজানো, মোছা যেন পরম উপভোগের সুখকর কাজ।

গির্জের ঘড়িতে বারোটা বাজে,— দুপুরের বোদ ঝাঁ ঝাঁ করে,— গলির জনস্রোত, গাড়ি চলা মন্দ হয়ে আসে। খাঁচাব ময়নাটা ছাতু ছোলা খেয়ে ঝিমোষ, শাশুড়ী ঠাক্কণ মাঝে মাঝে হাঁক দেন, ‘বৌমা, আর কত বেলা করবে!’

‘এই যে মা, ছাদের কাপড়গুলো তুলে যাচ্ছি।’

ছাদের সিঁড়ির মাঝে জানলার কোণে কিন্তু দাঁড়াতে হয়,— পাশের বাড়ীর একটি মেয়ের অসুখ,— খববটা নেওয়া দবকার। জানলায় দাঁড়াতেই পাশের বাড়ীর বৌ ডাকে, ‘দিদি, এখনও খাওয়া হয় নি?’

‘দেখ না ভাই, কাজেব কি আর শেষ আছে!’

‘আর তোমার আবার যে রকম ঝরঝরে কাজ ভাই!’

তার পর জানলায় দাঁড়িয়ে সংসারের সুখ-দুঃখের কথা আবস্ত হয়। পাশের বাড়ীর বৌ বলে, মেয়েটার জ্বর আর ছাড়ছে না,— বাঙ্গালীর ঘরে অসুখ কি লেগেই থাকবে? বউয়ের মেজাজ আত্ৰ ভাল ছিল না,— সংসারের টানাটানি। তার পর কমলার কাছ থেকে দশ টাকা বাব চেয়ে বসে। কমলা জানায়, পাঁচ টাকা সে কোন মতে দিতে পারে,— সঙ্কে-বেলায় যেন বৌ আসে। কিছু টাকা পাওয়া যাবে শুনে বৌ-এর মলিন মুখ একটু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে,— মেয়েটার ঔষধ-পথা টাকার অভাবে হচ্ছে না। তার পর পাড়ার গল্প ওঠে,— কার ছেলে পিকিটিং করে জেলে গেছে,— কার মেয়ে রোজ পিকিটিং করতে যায়, এত সাহসও আত্ৰকাল মেয়েদের। এবার পুজোয় খন্দের ছাড়া কিছু বিনবে না ঠিক করেছে, কিন্তু খন্দেরের যা দাম!— তারপর কমলার নতুন চূড়ির পাটানটা দেখতে চায়।

একটা ছেলেব কান্নার শব্দ আসে,— দুপুরের জানলায় নিভৃত আলাপ ভেঙে যায়।

শাশুড়ী ঠাক্কণকে খাওয়াতে বসিয়ে নিজে খেতে বসতে দেড়টার আগে হয় না,— বাহিরে দালানে ঝি-চাকররাও একসঙ্গে খেতে বসে।

খাওয়ার পরও কি কাজের বিরাম আছে!— একগাদা। সেলাই পড়ে,— ছেলেমেয়েগুলো কাপড় ছিঁড়তে ওস্তাদ। তার পর এ সব খন্দেরের কাপড় সেলাই করাও হাস্যাম। মনা কিন্তু খন্দের ছাড়া কিছু পরবে না, আর সেই বেশী ছেঁড়ে। তবু হাফ-প্যান্ট কবে ছেঁড়া কিছু কমেছে।

নিব্বাম অপরাহু, চাপু মেজেতে একটা কাঁথার ওপর ছোট বালিশ মাথায় দিয়ে ঘুমোয়। লাখী পাশে বসে অসম্ভব সব কথা বলে, ‘মা, আচ্ছা, তুমি বড় না বাবা বড়? আচ্ছা, তোমার ত বাবার মত গৌফ নেই, মেয়েদের থাকে না বুঝি—’ লাখীকে বুকে টেনে চুমো খেয়ে কমলা বলে, ‘চূপ কর লাখী, একটু ঘুমো না বাছা।’ লাখী তার জন্ত-জানোয়ারের রঙীন ছবিভরা এ, বি, সি, ডির বইখানি নিয়ে পাতা ওন্টাতে ওন্টাতে নিজের মনে মনে কথা

কয়। কখন তার চোখ চুলে পড়ে, কমলা তাকে কোলে টেনে সরু সুরে গান গেয়ে ঘুম পাড়ায়। ছাদে দু'একটা পায়রা বক্‌বক্‌ করে।

চারিদিক নীরব। জনহীন পথে একটা ফিরিওয়ালার ডাক বক্কণ সুরের মত ঘুরে ঘুরে ফেরে। একটা চিল ছাদ দিয়ে উড়ে যায়। নীচে চাকরেরা ও ওপরে ছেলেমেয়েরা ঘুমোয়। বাড়ীখানা স্তব্ধ, যেন রৌদ্রময়ী রাত্রি, একটা মাছি ভনভন করে ঘোরে।

লাখীকে শুইয়ে দিয়ে কমলার আর সেলাই করতে ভাল লাগে না। আলমারীটা যেন টানে, যাদুমন্ত্রে ভুলোয়। আলমারী খুলে সে সাজানো কাপড়গুলি আবার সাজাতে আরম্ভ করে। কিন্তু আলমারী সাজানো আসল ব্যাপার নয়,— আলমারীর ওপরের তাকের পেছনে নীল সিঁকের রুমাল-মোড়া দুটি ছোট্ট জামা বাহিব করে,— সে দুটির দিকে চেয়ে মেজেতে বসে পড়ে,— তার মন কোন্ অজানা দেশে উড়ে যায়— এই সময়টা তার দিন-রাতের সুখ-দুঃখের কর্মের বাহিরে। জামা দুটি তার প্রথমা কন্যার,— এক বছর হতে না হতে নিউমোনিয়াতে সে মারা গেছিল,— সে কতদিন,— পনেরো বোল বছর হবে। সেই প্রথম-জাতাকে হারানোর সুপ্তলোক অপরাহ্নের নিস্তব্ধ প্রহরে মনের অতল থেকে জেগে ওঠে,— এখন সে লোকের দুঃখজ্বালা নেই,— বেদনা গভীর নয়,— রহস্যময়,— মন কোন্ স্বপ্নলোকে চলে যায়। কমলা ভাবে, সে যদি আজ বেঁচে থাকতো, পাড়ায় নীলিমার মত হয় ত সুন্দরী হত, হয় ত তার এতদিনে বিয়ে হয়ে যেত,— ফুটফুটে খোকার মা হত। হয় ত সে কিন্তু তাকে বড় করে ভাবতে যেন সে পারে না,— সেই এক-বচ্ছরের নবীন পুতুলটিই চোখে ভেসে ওঠে,— চোখ ছিলছিল করে।

জামা দুটি ভাল করে পাট করে তুলে রেখে আলমারী বন্ধ করে মেজেতে আঁচল পেতে সে বসে। এই অলস মধুর অপরাহ্নটুকু তার স্বপ্ন দেখার, স্বপ্ন বোনার, মন নিয়ে খেলা করার সময়— কত কথা কত সাধ মনে হয়— ঘুমন্ত লাখীর দিকে চাঁপুর দিকে চেয়ে— সাদা মার্বেলের ওপর কালো চুল এলিয়ে সবুজ পাড় ছড়িয়ে শোয়, কখন ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ে। বারান্দার ঘড়িটা টিক্‌টিক করে,— সময় কেটে যায়,— বাড়ী নীরব,— যেন রূপকথার ঘুমন্ত রাজকন্যার স্বপ্নপুরী।

বনবন শব্দে কডার শব্দ হয়, সদর দরজা নড়ে ওঠে। মধু ছুটে গিয়ে দরজা খোলে। দুড়াদুড় করে ছুটে, দালান পেরিয়ে, সিঁড়িতে খটমট শব্দ করতে করতে মনা স্থল থেকে আসে,— সমস্ত বাড়ী জেগে ওঠে। কমলার ঘুম ভেঙে যায়, চাঁপু চিৎকার করে কেঁদে ওঠে,—ঘুম থেকে জেগে একটু কান্দা তার স্বভাব। বইয়ের ব্যাগটা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে মনা তাকে ভুলোতে বসে। চাঁপু চুপ করলে মনা লাখীর চুল ধরে টানে, কমলা বকে উঠলে, মনা পকেট থেকে দুটো পেয়ারা বের করে বলে, 'তোমার জন্যে এনেছি মা।' কমলার আর বকুনি দেওয়া হয় না। শুধু বলে, 'জুতো খোল, সার্ট ছেড়ে হাতমুখ ধুতে যা, ভূত কোথাকার।' 'মা, বড্ড স্কিদ্দে।'

'হাতমুখ ভাল করে সাবান দিয়ে ধুগে, পথের যত ময়লা গায়।'

একটু পরেই মেয়েরাও স্থল থেকে এসে পড়ে। কাপড়জামা না ছেড়েই ঝগু চাঁপুকে আদর করতে বসে,— স্থল থেকে একটি ফুল এনেছে, সেটি তার হাতে দেয়।

কমলার সংসারের কাজ আবার আরম্ভ হয়। ছেলেমেয়েদের কাপড়-ছাড়া, হাতমুখ-ধোওয়া তদারক করতে হয়। তারপর সবাইকে জলখাবার দিয়ে চাঁপু ও লাখীকে দুখ খাওয়াতে বসে।

বেলা গড়িয়ে যায়, রান্নাঘরে আগুন পড়ে, বাড়ী ধোঁওয়াতে ভরে ওঠে। কমলা বিকে বকে, 'এত দেরীতে আগুন দিস্, এখন যদি বাবু এসে পড়েন।' স্বামী আসার আগে চুল বেঁধে গা ধুয়ে নিতে হয়। শাওড়ী ঠাকরুণ বলেন, 'এসো বৌমা, চুলটা বেঁধে দি।' 'নিজেই বেঁধে



নিচ্ছি মা।' আয়না নিয়ে চুল বাঁধতে বসে। চাঁপু এসে আয়নার উঁকি মারে, আপন মনে হাসে, মাথার ফিতোটো টানে— চুল বাঁধতে দেবী হয়ে যায়।

'বড় জ্বালাতন করিস্ চাঁপি।' চাঁপুর কিন্তু বকুনিতে গ্রাহ্য নেই, নিজের মুখখানা আয়নায় দেখতে সে ব্যস্ত, চিরন্তনী নারী!

কোন দিন শাশুড়ী ছাড়েন না,— চুল বাঁধতে বসেন। চুল বাঁধা হলে সীমন্তে সিন্দুররেখা টেনে বলেন, 'জন্ম এয়াস্ত্রী থাকো, আশীর্বাদ করি।' মুখ রাজ্য করে শাশুড়ীর পায়ের ধুলো সীমন্তে মুছে কমলা গা ধুতে যায়, বুক দূরদূর করে।

স্বামী আসার আগেই কমলা ফলের রেকাব, জল-খাবারের রেকাব সাজিয়ে ধোওয়া কাপড় গুছিয়ে ঘরে বসে থাকে,— টুকটাক কাজ করে, যেন প্রতীক্ষা করছে না, কাজ করছে।

ঘরে ঢুকেই খাবারের রেকাব দেখে স্বামী খুসি হন, কমলার সদা সাবান-ধোওয়া গালে আদর করে বলেন, 'সাদ হয়েছ রণ। তুমি এস এস নারী, আন তব হেমধারি!'

'যাও! হাঁগা, এ প্যাকেটটাতে কি?'

'তোমার জন্যে নতুন শাড়ী।'

'হ্যাঁ! খালি ঠাট্টা! খোকার বিস্কুট এনেছ?'

'ওই ভুল হয়ে গেল।'

'দশটা টাকা দিতে হবে আজ।'

'কাউকে দিতে হবে বুঝি!'

'না, আমার হাতে কিছু টাকা নেই।'

'দেখ, কি সময় পড়েছে, এ টানটানি ব বাজার, কিছু টেনে খরচ করতে হয়।'

এই রকম সাংসারিক প্রেমালাপ কিছুক্ষণ চলে। বেশীক্ষণ চলতে পারে না। সাজগোজ ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে খাবার খেয়ে স্বামী যান বেড়াতে অর্থাৎ মিস্ত্রিদের বাড়ীর তাসের আড্ডায় অথবা ইউনিয়ান ক্লাবে।

'ওগো, আজ সকাল সকাল এসো।'

'হ্যাঁ, বেশী রাত হবে না।'

কিন্তু সাড়ে ন'টা দশটার আগে আর বাড়ী ফেরা হয় না।

তার পব ভাঁড়ার-ঘবে রান্নাঘরে কাজের অবধি থাকে না। ঠাকুরকে সব রান্না-জিনিষ দিতে, রান্না বুঝিয়ে দিতে সঙ্কে হয়ে আসে। সন্ধ্যার শাঁখ বাজিয়ে ছাদে তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে প্রণাম করে। তারপব তার আর কাজের বেগে নিশ্বাস ফেলার সময় থাকে না— মধু জ্বাল, রুটি লুচি বেলা, কত কাজ! কাজের মাঝে মন উসখুস করে. রাগ, লাখী ও চাঁপুকে নিয়ে মধু পাড়ার পার্কে কখন বেড়াতে গেছে, এখনও ফিরল না কেন, মনাও এখনও হকি খেলে আসে নি, শোভাটা পাড়ার কোন্ বাড়ীর ছাদে আড্ডা দিচ্ছে। হাতের লেচিগুলো কমলা তাড়াতাড়ি পাকায়।

কলরব করতে করতে ছেলেমেয়েব দল বাড়ীতে ঢোকে, সব মুখ রাজ্য, ঘর্মান্ত। নানা অভিনয়, অভিযোগ, আবদারে রান্নাঘরের সামনে দালানটা মুখর হয়ে ওঠে। কমলার সে সব শোনার অবসর থাকে না, সে রুটি বালে। ঠাকুমা সিঁড়ির ওপব মালা জপতে জপতে মাঝে মাঝে বলে ওঠেন, 'ওবে গোলমাল করিস না।' মধু লাখীকে টানতে টানতে এসে বলে, 'মা, লাখুর ঘুম পেয়েছে।'

'দু'খানা গরম লুচি খাইয়ে দে না বাবা।'

চোখ রগড়াতে রগড়াতে লাখী বলে, 'আমাল পটল ভাজা কৈ?'

খেতে বসে কিন্তু লাখীর সব ঘুম চলে যায়, সে আর রান্না-ঘর ছেড়ে উঠতে চায় না। দাদা-দিদিরা যখন মাস্টারমশাই-এর কাছে পড়াশুনা সেরে দালানে খেতে বসে, এখন তার

মুখ চলছে। সবার খাওয়া শেষ না হলে সে উঠতে চায় না। খাওয়া শেষে শোভা নিজের মুখ ধুয়ে লাখীর হাতমুখ ধুয়ে দেয়, বলে, 'চ, শুতে।'

দল বেঁধে হুন্না করে সবাই শুতে যায়; চাঁপুর দুধের বাটি নিয়ে কমলা ওপরে আসে,— সবাই কোথায় কি রকম শুল তদারক করে। চারটে বালিশ চার ধারে ঠিক আছে কি না তা দেখে লাখী নিশ্চিন্ত মনে শোয়। মনা স্কুলের গল্প করে; রাণু বলে ওঠে, 'বেশী বক্বক্ব কবিস নে, ঘুমোতে দে।' হঠাৎ লাখী উঠে বসে, বলে, 'বিছানা বড় ঠাণ্ডা।' অয়েল-কুথের ওপর কাথা দিয়ে সে শোবে না, সে কি চাঁপুর মত ছোট।

মনা অগ্নি বলে ওঠে, 'কিন্তু রাত্তিরে বিছানা ভেজাতে'—

রাণু বলে,— 'তুমিও ত বাপু সেদিন'—

'যাঃ! সে বুঝি আমি'— কথাটা তোলা যে ভুল হয়েছে. তা মনা বুঝতে পেরে চুপ করে।

চাঁপু মায়ের কোলে শুয়ে দুধ খায়, ছেলেমেয়েদের চোখে ঘুম ভরে আসে, ঘরের আলো নিভে যায়, দালানের আলোটা মিটিমিটি জ্বলে, আবার বাড়ী নিঝুন নিদ্রিত হয়।

ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়িয়ে কমলা সিঁড়ির পাশে দালানের কোণে একটা সেলাই বা একখানা বাংলা মাসিক পত্রিকা নিয়ে বসে। আজ সন্ধ্যাতে অজিত, কি নির্মল, কি সারদা, কেউ আসে নি, সেই কথা মনে পড়ে। এরা হচ্ছে পাড়াব ছেলে, তাকে দিদি বলে ডাকে। সন্ধ্যাবেলায় দালানে প্রায়ই তাদের বৈঠক বসে। কেউ ফার্স্ট ইয়ার, কেউ থার্ড ইয়ারে পড়ে। কচি বয়স, তরুণ মন। সবাই এসে দিদির কাছে কত সংবাদ দেয়, কত অভিযোগ কত আবদার জানায়— সঙ্গে সঙ্গে চা, খাবার, মাঝে মাঝে মাছের কচুরি বেওনি লাভ হয়। কি তর্ক করতে পারে ছেলেগুলো! এখন দেশের কাজে বড় বাস্তব।

বাংলা মাসিকের একটা গল্প কমলা পড়তে আরম্ভ করে— স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা হচ্ছে না, স্ত্রী স্বামীকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে— এই বকম প্রটের একটা গল্প। কি করে স্বামীকে সংসারকে ছেড়ে মেয়েমানুষ চলে যেতে পারে, কমলা তা কল্পনা করতে পারে না। সেই দুঃখিনী হতভাগিনীর জন্যে তার চোখে জল আসে, গল্প পড়তে ভাল লাগে না, পত্রিকা মুড়ে রাখে। সিঁড়িতে মস্‌মস্‌ জুতোর শব্দ হয়, কমলা চমকে ওঠে, তার চোখের তন্ত্রা চলে যায়, স্বামী আসছেন।

স্বামীকে খাইয়ে নিজে যখন খেতে বসে রাত এগারোটা বেজে যায়। তার পর ঝি-চাকব খেলে রান্নাঘর ধোওয়া হয়। সদব দরজা বন্ধ আছে কি না দেখে, তাঁড়ার-ঘবে কুলুপ দিয়ে পান চিবোতে চিবোতে কমলা যখন ওপরে ওঠে, দেখে, স্বামী দিবা খাটে শুয়ে, নাসিকা গর্জন হচ্ছে।

দালানে একটু চুপ করে বসে, আকাশে তারাগুলো ঝিলমিল করে, গাছের পাতা কাঁপিয়ে মৃদু বাতাস বয়। সুখনিদ্রা-শান্ত শিশুগুলির দিকে সম্মেহ নয়নে চেয়ে সে ভগবানের চরণে প্রার্থনা করে, 'প্রভু, এদের তুমি সুখে শান্তিতে রেখো।'

'ওগো শুতে এসো, রাত যে একটা হবে।' বলে স্বামী পাশ ফেরেন।

ধীরে ঘরে ঢুকে কমলা চাঁপুর পাশে শুয়ে নিমেষের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে।

এমি কবে মায়ের দিনের পর রাত, রাতের পর দিন কেটে যায়।

কিন্তু সেদিন যে কি অথটন ঘটল কমলা তা নিজেই প্রথমে বুঝতে পারে নি। মেথরের দল মিউনিসিপালিটির ময়লা-ফেলা গাড়ী হাঁকিয়ে অনেকক্ষণ চলে গেছে। মধু নিজেই উঠে সিঁড়ির বারান্দা ধুয়েছে। বাইরে রোদ উঠে গেছে, কমলার তখনও ঘুম ভাঙে নি। যখন সে জাগল, লজ্জিত ভাবে দেখল, স্বামী উঠে খাটে বসে,— ছেলেমেয়েরাও জেগেছে, তবে মায়ের ঘুম ভেঙে যেতে পারে ভেবে গোলমাল করছে না,— ফিস্‌ফাস কথা হচ্ছে।

স্বামী বলেন, 'কি গো, এত দেবী আজ, শরীরটা খারাপ?'

‘কেন, একদিন দেবী হতে পারে না! আমি কি কল না কি যে রোজ এক সময়ে উঠতেই হবে, না আমি কালের কুলি যে ভোরের ভৌ বাজলেই কাজে ছুটতে হবে!’

‘না, তা বলছি না।’

কারুর দিকে জাক্‌সেপ না করে কমলা নীচে নেমে গেল। মায়ের মেজাজ আজ সুবিধের নয় দেখে ছেলেমেয়েরা সেদিন হল্পা বা বালিশ ছোড়াছুড়ি করতে সাহস কবলে না।

সারা সকাল কোন কাজে কমলার মন লাগল না,— দেহ শ্রান্ত, মনটা কেমন ভার,— গত রাতে ভাল ঘুম হয় নি।

দেবীতে উঠে সব বিশৃঙ্খল হয়ে গেল সেদিন, দশটা প্রায় বাজে, সব বাল্লা হল না, ছেলেমেয়েবা শুধু ডাল ভাত ও ভাজা খেয়ে স্কুলে গেল। কমলা আপন মনে বসে উঠল, ‘আমি কি মাইনে—করা চাকরানী, আমার যেমন খুসি আমি কাজ করবো।’ স্বামী মান করে এসে দাঁড়িয়ে রইলেন, ‘ঠাকুব, যা হয়েছে দাও।’

সেদিন কমলা বিশেষ কিছু খেলে না, খেতে অরুচি। মধু ও বামুনঠাকুর খাওয়াতে কত পাঁড়ানীড়ি করলে, তাদেরও ভাল করে খাওয়া হল না। শাশুড়ী ঠাকুরগণ বলেন, ‘আজ শরীরটা ভাল নেই বোমা, শুয়ে থাকগে।’ কমলা মনে মনে বলেন, ‘আঁা, শুয়ে থাকবো, সংসারের কাজ কে করবে!’

অপরাত্নে সে নিজের ঘরে এলিয়ে শুয়ে পড়ল, কোন সেলাই বা বই হাতে নিলে না। লাক্ষী একটা আবদার করতে গিয়ে থাপ্পড় খেয়ে কেঁদে ঘুমিয়ে গেল।

কমলার মন বড় চঞ্চল মনে হল, তার সেই প্রথম-জাতা কন্যাব কথা বার বার মনে পড়তে লাগলো। তাব ছোট ঙমা দুটি বাহির করে বুকে জুড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদতে আরম্ভ করলে। কেন যে কাঁদছে, তা সে নিজেও বুঝতে পারলে না, কোন অজানা বেদনা শান্ত হল। কাঁদতে কাঁদতে মন হাল্কা হয়ে আসতে লাগলো, বিদ্যুতের ঝিলকির মত তার মন চমকে উঠল, ততক্ষণে সে বুঝতে পারল তার কি হয়েছে আজ, মুখ প্রথমে গম্ভীর হল, তার পর রহস্যময় মধুর সুন্দর হয়ে উঠল।

সারা দিনের কাজ সেরে রাতে যখন কমলা শুতে গেল, সে শোবার ঘরে ঢুকল না, সামনের বারান্দায় লালপাড়-ওয়ালা আঁচল পেতে শুয়ে পড়ল,— তারা-ভরা আকাশের দিকে চেয়ে রইল, একটা তারা খসে পড়ল।

স্বামী কখন পাশে এসে বসেছেন জানতেই পারে নি। স্বামী তার মাথায় হাত বুলাতে সে স্বামীর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলে, নিশ্চয় স্বরে বলেন— ‘ওগো।’

—‘কি।’

স্বামীর মুখ তার মুখের ওপর নত হয়ে পড়তে সে স্বামীর কানে কানে কি কথা কয়ে রহস্যময় হেসে উঠল, তারা-ভরা আকাশ ঝিকঝিক করতে লাগলো।

স্বামী হেসে বলেন— ‘এই ব্যাপার, আবার আর একটি।’ যেন কমলাই একমাত্র দায়ী!

অধরে আদর করে বলেন, ‘তা বেশ, কাল দিদিকে চিঠি লিখে দেব।’

‘না গো না, অত তাড়াতাড়ি নেই, এখনও অত অকর্মণ্য হই নি।’

স্বামী তার তাম্বুল-রঞ্জিত আবেগ-কম্পিত ওষ্ঠে চুম্বন করলেন।

প্রথম রাতে কমলার চোখে ঘুম হল না। একবার ছাদে ঘূবে এল, দালানে-ঝোলানো বিদ্যাসাগর, গান্ধী, চিত্তরঞ্জনর বাঁধানো ফটোগুলি সামনে দাঁড়িয়ে তাঁদের প্রশ্নাম করলে। অমন কোন মহাপুরুষ তার গর্ভে জন্মাবে, অত পূণ্যবতী নয় সে,— তবু গর্ভবতী মাতার মানস-স্বপ্ন কে বলতে পারে!

তারাগুলির দিকে চেয়ে কত কথা ভাবতে ভাবতে গভীর রাতে কমলা ঘুমিয়ে পড়ল।

## শেষের হিসাব পরিমল গোস্বামী

নতুন ফ্ল্যাটে উঠে এসে পূর্বতন বাসিন্দার একখানা হিসাবের খাতা হঠাৎ হাতে এল। দেয়ালের গায়ের আলমারির মধ্যে খাতাখানা পড়ে ছিল। চুনকাম করার সময়ও কেউ এটা লক্ষ্য করেনি, আশ্চর্য! আলমারিটা তারা কেউ খোলেনি বোধহয়। কিন্তু আগের সেই ভাড়াটিয়াই বা কেমন লোক, হিসাবের খাতাখানাই নিতে ভুলে গেছে?

খাতাখানা সরিয়ে রেখে দিলাম, খোঁজ পড়বে একদিন হয়তো, তখন দেওয়া যাবে।

এদিকে আমার সংসারের যা দুর্গতি, তাতে এই সামান্য পরোপকারের প্রবৃত্তিও এখন আমার কাছে অস্বাভাবিক বোধ হয়। জীবনরক্ষার মূল জিনিসেরই অভাব, অথচ বাঁধা আয়ে সংসার চালাতে হবে। এ অবস্থায় কার কি রইল, কার কি গেল, ভাববার প্রবৃত্তিও হয় না। চোখের সামনে সব ভেঙে পড়েছে। ঘুণ ধরে গেছে বাংলাদেশের জীবনে।

মাসে যা উপার্জন করি তাতে নিতাপ্রয়োজনীয় জিনিস কিছুই কেনা হয় না। জানুয়ারি মাসের বেতন দিয়ে শুধু বিছানার চাদর কিনেছি। পরিবারের লোকসংখ্যা পাঁচ, একসঙ্গে অনেক জিনিস কিনতে হয়। ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন দিয়ে কিনলাম পাঁচজোড়া জুতো। এমন ভাবে এক এক মাসে এক একজাতীয় জিনিস।

গ্রীক পৌরাণিক গল্পে আছে, পারসিউস, গর্গন-হত্যার অভিযানে যাবার পথে এক সময় তিনটি বৃদ্ধা ভাগিনীর দেখা পায়। তাদের তিনজনের চোখ ছিল মাত্র একটি, যখন যার দেখার দরকার হ'ত সে তখন ঐ চোখটি আর একজনের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে ব্যবহার করত। তার কথাই আজ মনে পড়ছে। বর্তমানে আমাদের দেশের এক পরিবারের পাকস্থলী থেকে গুরু করে ছাতাটি পর্যন্ত যদি ঐ রকম একটিতে কাজ চলত!

একদিন একা বিছানায় পড়ে এই সব নানা অসম্ভব কল্পনায় মেতেছি, এমন সময় খেয়াল হ'ল আমার এই ফ্ল্যাটের পূর্বপুরুষটি কি ভাবে সংসার চালাতেন দেখা যাক। তাঁব এই ফেলে-যাওয়া হিসাবের খাতাখানা খুলে শুয়ে শুয়েই পড়তে আরম্ভ করলাম। পাঁচ বছরের হিসাব। পড়তে পড়তে উঠে বসলাম। এক নিশ্বাসে সবটা পড়ে ফেলতে হ'ল। শেষ করে স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে যখন উদ্বেজনা কমে এল, বুঝলাম এর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। কিছু বুঝেও নিষ্ফুটি পেলাম না।

আমার নিজের হিসাবের খাতাখানাও খুলে দেখি, এই হিসাবের সঙ্গে আশ্চর্য মিল। এব শেষ হিসাব লেখা হ'য়ে গেছে, কিন্তু আমার শেষ হিসাব এখনও লেখা হয়নি—এখানেই যা তফাৎ।

প্রতি মাসে আশী টাকা কর সবদুই হিসাব। ভদ্রলোক মাসে আশী টাকা বেতন পেতেন, বেশ বোঝা যায় তিনি কখনও ধার করেননি। তাঁর এই হিসাব থেকে আমি পাঁচ বছরে ছটি মাস বেছে নিয়েছি। এরই মধ্যে পাওয়া যাবে তাঁর ইতিহাস।

কিন্তু কোন এক অদৃশ্য শক্তি এই হিসাবের সঙ্গে আমার নিজের হিসাব এক সুরে বেঁধে দিয়েছে, ভাবতে গেলে আমি অস্থির হয়ে উঠি। তাই নিজের মনকে শাস্ত করার উদ্দেশ্যে

আমার আবিষ্কার-করা হিসাবের খাতা থেকে আমার বাছাই-করা ছ'টি হিসাব সামনে এনে হাজির করলাম, হয়তো আরও পাঁচজনের হিসাবের সঙ্গে এর কিছু সাদৃশ্য থাকতে পারে। এটা কল্পনা করেও অনেক আরাম বোধ করছি। আমার একান্ত অনুরোধ নীচেব পাঁচ বছরের ছ'টি হিসাব আপনারা ভাল করে পড়ুন।

(১)	১৯৩৯ জুলাই		
	বাড়িভাড়া	..	১৫
	চাল দু'মণ	.	১০
	কাপড় ৪ জোড়া	..	১০
	বাজার খরচ	....	৩০
	কয়লা ৩ মণ	..	১১০
	থিয়েটার ও সিনেমা	..	৭
	অন্যান্য	...	৬১০
			<hr/>
			৮০
(২)	১৯৪০ জুলাই		
	বাড়িভাড়া	...	১৫
	চাল দু'মণ	....	১২
	কাপড় ৪ জোড়া	.....	১৮
	কয়লা ৩ মণ	..	২১০
	বাজার	..	৩০
	অন্যান্য	..	২১০
			<hr/>
			৮০
(৩)	১৯৪১ জুলাই		
	বাড়িভাড়া	....	১৫
	চাল একমণ	..	১০
	বাজার	.....	৩৫
	কাপড় ২ জোড়া	..	১৪
	কয়লা ২ মণ	..	২
	অন্যান্য	..	৪
			<hr/>
			৮০
(৪)	১৯৪২ জুলাই		
	বাড়িভাড়া		
	(গত জানুয়ারি থেকে সাময়িক ভাবে কম)	...	১২
	চাল আধমণ	..	১২
	বাজার	....	৩৬
	কয়লা ২ মণ	.....	৩
	লটারিব টিকিট	...	৬
	কাপড় ১ জোড়া	.....	১০
	অন্যান্য	...	১
			<hr/>
			৮০

(৫)	১৯৪৩ জুলাই		
	বাড়িভাড়া (পুনরায় বৃদ্ধি)	.....	১৫
	চাল দশ সের	.....	৭।।০
	বাজার	.....	৩০
	কাপড় ১ জোড়া	.....	১০
	লটারির টিকিট	.....	৫
	সর্বসিদ্ধি কবচ	.....	৫
	ভাগ্যলক্ষ্মী মাদুলি	.....	৫
	কয়লা আধমণ	.....	১।।০
	অন্যান্য	.....	২
			<hr/>
			৮২
(৬)	১৯৪৩ আগস্ট		
	বাড়িভাড়া	.....	১৫
	পরিবার দেশে পাঠানোর খরচ	...	১২
	স্ত্রীর হাতে দেওয়া গেল	...	৫১।।০
	দড়ি ও কলসি	.....	১।০
			<hr/>
			৮২

## বিমাতা অপর্ণা দেবী

জানি না, কোন্ পাপে তাহাকে হারাইলাম। না হইলে তিনি ত ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তবে আবার চলিয়া গেলেন কেন? হয়! মা হারাইয়াও মা ত পাইয়াছিলাম, কিন্তু রাখিতে পারিলাম কে?

সে অনেক দিনের কথা! আজিও যখন তাহা মনে পড়ে গা কেমন ছম্ছম করিয়া উঠে। আমার যখন আট বছর বয়স, আমার ভাই শঙ্কর তখন ছয় বছরের। মা আমাদের দুটিকে রাখিয়া চলিয়া গেলেন। আমরা তখন ছেলেমানুষ কিছুই বুঝিলাম না, সকলের কান্না দেখিয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। শুধু বাড়ির বুড়ো ঝি আমাদের বুঝাইল যে, আর মা আসিবেন না, আর আমরা দুষ্টামী করিলে বকিবেন না, আমরা কাঁদিলে বুকে করিয়া আদর করিবেন না, আর আমরা মাকে দেখিতে পাইব না। বুকের ভিতর কেমন করিয়া উঠিল, শঙ্করের গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া আকুল হইলাম। ভাবিলাম, কোথায় গেলেন, কেমন করিয়া গেলেন। আব যে ফিবিবেন না, তা বিশ্বাস হইল না।

কিন্তু হয়, মা আর ফিরিলেন না।

দিনে অনেক বদল হয়, সবারি যা হয়, আমাদেরও তাহাই হইল। বাবার ভালবাসায়, ঠাকুরমার আদরে ও পিসীমার যত্নে, আমরা যেন সব ভুলিতে লাগিলাম, মার অভাব বড় মনে পড়িত না, কেবল শঙ্কর যখন এক একদিন সন্ধ্যায় আমাদের জড়াইয়া ধরিয়া বলিত—“দিদি! মা কোথায়?” তখন কোন উত্তর দিতে পারিতাম না, কাঁদিয়া ফেলিতাম।

তারপর ঠাকুরমা জোর করিয়া বাবার বিবাহ দিলেন।

সে দিন আমার বেশ মনে আছে। সেই সন্ধ্যাবেলা ঢাক-ঢোল বাজিতেছে, সানাইয়ের সুর আকাশে ছড়াইয়া যাইতেছে, সন্ধ্যার আলো ও শাঁকের আওয়াজের সঙ্গে আমার নতুন মা আমাদের ঘবে আসিলেন। এমন শান্ত চেহারা— দেখিলেই যেন তাঁহার কাছে থাকিতে ইচ্ছা করে। আগে কেন তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না? বুঝিলে বুঝি বা এত বছর পরেও আমরা এমন করিয়া প্রাণে প্রাণে এ স্মৃতি, এ কাহিনীকে বাধিয়া রাখিতে হইত না।

কপালে যাহার যা না থাকে, তা তাহাদের সহিবে কেন? নতুন মার সঙ্গে আমাদের খুব ভাব হইয়াছিল। আমবা তাঁহার আঁচোল ধরিয়া মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া বেড়াইতাম। তিনি আমাদের কত আদর করিতেন, কত গল্প বলিতেন, কত পুতুল দিতেন, কিন্তু আমাদের কপালে তাহা সহিল না। বুড়ো ঝি ও পড়সীবা ঠাকুরমাকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিল, মার কাছে আমাদের যেন যাইতে না দেওয়া হয়।—“বাবা! সংমা কি কখন আপনার হয়, ও মিট্‌মিটে ডান্, ছেলে খাবার রান্‌স—ওই প্যারীদিদির বোনপোকে তার সংমা বিষ দিয়ে মারলে, সেও অমনি কত যত্ন আদর দেখাত।” পাড়ার রাজা পিসী বলিল, ‘ও দিদি, তুমি জান না, ওই আমাদের তরীকে ভাতের ভেতর কিসের শেকড় দিয়েছিল’—এই রকম কত দুষ্টান্তই তাঁরা দেখাইয়া দিলেন—মা আমাদের আদর-যত্ন করিলে হইবে কি, তাঁর মন ত

বিষে ভরা। শেষে কি জানি যদি বিষ দেয়! ঠাকুরমা এইসব শুনিয়া আমাদের মার কাছে যাওয়া একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন।

প্রথম প্রথম আমাদের বড় মন কেমন করিত, মার কাছে যাইবাব জন্য কান্নাকাটি করিতাম। তখন পিসীমা আমাদের বুঝাইলেন—“পর কি কখন আপনার হয়; ও ত আমাদের মা নয়, এখন নতুন নতুন ব'লে তাই অমন আদর করছে, এর পর কোন দিন শেষে কি কাণ্ড করবে তখন!”—এমনি করিয়া কত রকম ভয় দেখাইলেন। যখন পিসীমা, ঠাকুরমা, বুড়ো ঝি এই সব ভয় দেখাইত, তখন প্রাণের ভিতর কেমন করিয়া উঠিত, সত্যি না মনে করিয়া থাকিতে পারিতাম না। কিন্তু তবু কেমন তাঁহার কাছে কাছে থাকিতে ইচ্ছা হইত।

এমনি করিয়া আস্তে আস্তে আমরা তাঁর কাছ হইতে দূরে সরিয়া গেলাম। দিনে দিনে আমাদের এমন হইল যে, ভয়ে আমরা তাঁর ক্রিসীমানায় মাড়ইতাম না, কি জানি যদি মারে, যদি সত্যিই ঠাকুরমা যা বলে—তা যদি সত্যি হয়—যদি বিষ খাওয়ায়।

হায়! তাঁর সেই ছলছল দৃষ্টি আমি কখন ভুলিব না। যেন চোরের মত বেড়াইতেন, সর্বদাই যেন কি চুরি করিয়া মহা অপরাধী হইয়াছেন, সদাই যেন ধরা পড়িবার ভয়। আমাদের সঙ্গে লুকাইয়া কথা বলিতে কত চেষ্টা করিতেন, কত আদর করিতেন, দুর্ভাগা আমরা তখন তাহা বুঝি নাই। তিনি যখনই আমাদের কাছে আসিতেন, অমনি আমরা ঠাকুরমাকে বলিয়া দিতাম। ঠাকুরমা ঝঙ্কার করিয়া উঠিতেন, ‘রাক্ষুসী ডাইনী’—মা ঘরের কোণে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেন। একদিন শঙ্কর ও আমি সিঁড়ির ধারে খেলা করিতেছিলাম, হঠাৎ শঙ্কর আমাদের দৌড়িয়া ধরিতে গিয়া পড়িয়া গেল। মা তখন বারান্দায় বসিয়া পান সাজিতেছিলেন, শঙ্কর পড়িয়া যাইতেই, তিনি “ষাট ষাট” বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া কোলে করিয়া লইলেন। শঙ্কর তাঁহার কোলে গিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। শঙ্করকে কান্না শুনিয়া ঠাকুরমা দৌড়িয়া আসিয়া মার কোল হইতে ছিনাইয়া লইলেন, মাকে মুখঝামটা দিয়া উঠিলেন, বলিলেন, “বৌ, না হয় আছই সংমা, তাই ব'লে কি দুধের ছেলের উপর একটু মায়্যা হয় না! ইচ্ছে ক'রে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে, আবার এখন লোক-দেখান সোহাগ করা হচ্ছে!— ফের যদি তুমি ওদের সামনে এস, তবে ভাল হবে না বলছি।—আহা!—দাদুর আমার কপালটা একেবারে গেছে, ও মা! এমন ডাইনী ঘরে এনেছিলাম গো!”—মা চুপ করিয়া রহিলেন, তাঁহার চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল, মা কাঁদিতে কাঁদিতে নিজের ঘবে গেলেন। রাঙা পিসী সেইখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, মার এই কান্না দেখিয়া বলিলেন, “ওমা! আবার কান্না হচ্ছে—সতীন-পুতের জন্য দরদ ত’ কত, ওরে আমার দরদী রে, বলে—

‘বেয়ানের মার আদরে,

সেজে পাটিতে না ধরে’—

“কালে কালে কতই দেখব।” রাঙা পিসী মুখ ঘুরাইয়া ঠাকুরমার পিছনে পিছনে চলিলেন।

আব একদিন মার বাপের বাড়ি হইতে মিষ্টি আসিয়াছিল, মা লুকাইয়া আমাদের তাহা দিতে গেলেন। মিষ্টির লোভে আর তাঁর কাছে যাইতে একটুও দেবী করিলাম না। তিনি আমাদের হাতে দুটি সন্দেশ সবে তুলিয়া দিয়াছেন, আমরাও যেমনি তা মুখে দিতে যাইব, অমনি কোথা হইতে বামাদাসী আসিয়া বলিলেন, “বৌ-ঠাকুরমা, বড় যে সন্দেশ দিচ্ছে। আমি এখন ঠাকুরমাগকে ব'লে দিচ্ছি।” আর কোথা যায়, ঠাকুরমা সেই সন্দেশের কথা শুনিয়া, বাঘিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া আমাদের হাত হইতে সন্দেশ কাড়িয়া লইয়া ফেলিয়া দিলেন। মাকে বলিলেন, “হু—সন্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ওরে আমার সন্দেশ-দিয়েমি রে!” বামাকে বলিলেন,—“ভাগগিস্ বামা তুই দেখতে পেয়েছিলি, নইলে আজ কি সর্বনাশই হ'ত।” মাকে বলিলেন, “ফের যদি তুমি বউ আবার এইসব কর ত ভাল হবে না বলছি।” মা মুখে



কাপড় দিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। আমাদেরও কিন্তু সন্দেশ না পাইয়া ঠাকুরমার উপর বড় রাগ হইয়াছিল।

এখন কত কথাই মনে আসিতেছে। তিনি বাড়ির বউ হইয়াও কেউ না হইয়াই থাকিতেন। কখন কাহার সঙ্গে এ সব লইয়া একটা কথাও কন নাই, মুখ বুজিয়া শুধু কাজ করিয়া যাইতেন। বাবার কাছেও কোন দিন এ সব কথা বলেন নাই; চুপ করিয়া থাকিতে আসিয়াছিলেন, চুপ করিয়াই গেলেন।

সময় কাহার জন্য বসিয়া থাকে না, সুখে দুঃখে যেমন করিয়াই হউক দিন কাটিয়া যায়, আমাদেরও কাটিল। আমি বার বছরে পড়িলাম। আমার বিবাহের জন্য সকলেই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। অনেক কথা কাটাকাটি ও ইঁটাহাটি গোলমালের পর একজন ডাক্তারের সহিত আমার বিবাহ স্থির হইল।

পাকা দেখার দিন আমার এক সই আসিয়া আমাকে সাজাইয়া দিল, মা একবারও কাছে আসিলেন না। রাঙাপিসী তাহা দেখিয়া, ইচ্ছা করিয়াই মাকে শুনাইয়া একজনকে বলিলেন, “কে গো, কনের মা কোথায়? তাঁর যে আজ দেখাই নেই। ও মা, মেয়ের বিয়ে!” আব একজন মুখভঙ্গি করিয়া বলিলেন, “ওমা, জান না, সতীন-ঝি চ’লে যাচ্ছে, সেই দুঃখে সে শুয়ে শুয়ে কাঁদছে।” কথা শুনিয়া সবাই হাসিয়া উঠিল। পাকা দেখা হইয়া গেল, বিবাহের দিন স্থির হইল।

সেই দিন রাত্রে মা আমাকে ডাকিয়া বকের ভিতর টানিয়া লইলেন। কত ভাল কথা বলিলেন, কত উপদেশ দিলেন। অমন মিষ্টি কথা আর কার মুখে কখন শুনি নাই। কিন্তু বেশিক্ষণ তাঁর কাছে থাকিতে হইল না। কোথা হইতে ঠাকুরমা আসিয়া মাকে খামকা বকিয়া উঠিলেন,—“আব তিনটে দিন ত ও আমাদের কাছে আছে, এইটুকুর জন্যে আর ওকে অমন কবা কেন? একরত্তি মেয়ে, তাকে আর ও সব কুমত্বলব শেখান কেন? পরের ঘরে গিয়ে বাঁচবে, তাও প্রাণে সইছে না?” এই কথায় আমি আর সেখানে থাকিলাম না, ঠাকুরমাব সঙ্গে চলিয়া আসিলাম।

তারপর যথাসময়ে গায়ে হলুদ হইয়া গেল। সে সময়ও মা আমার কাছে আসিলেন না। কিন্তু দেখলাম যে, তিনি খিড়কির জানালার ভিতর দিয়া চুপি চুপি আমাকে দেখিতেছেন।

তাঁর পরদিন আমার বিবাহ। সানাইয়ের মিষ্টআলাপ, কর্মবাড়ির সোরগোল, ছেলেমেয়েদের কলকল, পাড়ার লোকের হাঁকডাক, সব মিলিয়া সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! সম্ভার পর যখন আমাকে সাজাইয়া তুলিল, লগ্নের তখন অনেক দেবী। রাঙাপিসী, পাড়ার মেয়েরা আর সবাই গহনা দেখিবার জন্য আমাকে ঘেরিয়া বসিলেন। কে কোনটা দিয়াছে, এই সব জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ঠাকুরমা সব দেখাইয়া বলিয়া দিতেছিলেন। হঠাৎ একজন বলিল,—“কনের মা কি দিল গো?” ঠাকুরমা মুখখানা বাঁকাইয়া বলিলেন,—“সে আবার কি দেবে?” রাঙাপিসী বলিলেন, “সত্যিই ত, আহা! আজ যদি ওদেব মা বেঁচে থাকত, মা নেই ব’লে তো—বাহারা আমার বেঁচে আছে, এই ঢের, ‘ষাট ষাট’ ওরা আমার বেঁচেবর্তে থাকুক, শ্বশুরঘর আলো করুক।” স্ত্রী-আচারের সময় মা আসিলেন, দেখিলাম, কাঁদিয়া তাঁহার চোখ লাল হইয়াছে, তিনি কান্না চাপিতে পারিতেছেন না।

পরদিন সকালে আমি শ্বশুরবাড়ি চলিলাম, আমাকে দেখিবার জন্য যে যেখানে ছিল, সকলেই আসিল। যাইবার সময় মা আসিয়া আমাকে বকের মধ্যে টানিয়া লইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। রাঙাপিসী বলিয়া উঠিলেন, “শুভযাত্রার সময় আর চোখের জল ফেলে অমঙ্গল কর কেন?” মা উঠিলেন। গাড়িতে উঠিবার সময় তিনি আমার হাতে একটি ছোট টিনের বাক্স দিলেন। ঠাকুরমা বারান্দা হইতে তাহা দেখিলেন! তখনই বামাদাসী দৌড়িয়া

আসিয়া আমার কানে কানে বলিল, “দিদিমণি, ও পান খেয়ো না, ঠাকুরমা মানা করেছেন।” তার পরই আমাদের গাড়ি ছাড়িয়া দিল। যতক্ষণ দেখা যায়, দেখিলাম যে, মা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার চোখে জল ধরে না, তবু যেন তাহাকে চাপিয়া রাখিয়াছেন। দেখিয়া আমার বুকের ভিতরটা কি রকম করিয়া উঠিল, মনে হইতে লাগিল, ছুটিয়া গিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরি। বাবা স্টেশনে আমার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। গাড়ি ছাড়িলে তিনি চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেলেন।

খানিক পরে সেই টিনের বাস্ক খুলিলাম, দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম, তাহার ভিতর এক ছড়া মুক্তাব মালা। মালাছড়াটা বাবা মাকে কিনিয়া দিয়াছিলেন। সকলের সামনে না দিয়া কেন যে তিনি চূপিচূপি দিলেন, তা তখন বুঝি নাই, এখন বুঝিতে পারিয়াছি।

তারপর অনেক দিন বাপের বাড়ি যাওয়া হইয়া উঠে নাই। বাবা আসিয়া মাঝে মাঝে দেখিয়া যাইতেন।

একদিন সকালে উঠিয়া শাওড়ীর সঙ্গে তরকারী কুটিতেছিলাম। উনি সেখানে আসিলেন, তাঁহার হাতে একখানা টেলিগ্রাম—আমি তাড়াতাড়ি মাথায ঘোমটা টানিয়া দিলাম। উনি মাকে বারান্দায় ডাকিয়া লইয়া কি বলিলেন, আমার বুকটা যেন কেমন ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল, কার ত’ কিছু হয়নি! মা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, “বৌমা, বেয়াই তাব কবেছেন, তোমার ভায়ের বড্ড বাড়াবাড়ি ব্যাম, তোমায় যেতে হবে।”

সে দিন রাত্রেই ওঁর সঙ্গে আসিলাম। শঙ্করকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। তাকে যেন চেনা যায় না। বিছানার সঙ্গে লাগিয়া গিয়াছে। বিছানার কাছে বসিয়া তাহার কপালে হাত দিয়া দেখিলাম, তাহার গা যেন পুড়িয়া যাইতেছে। তাহাকে ডাকিলাম, “শঙ্কর!” শঙ্কর একবার ধীরে ধীরে চোখ মেলিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া, আবার তখন চোখ বুজিল। রাঙাপিসী কাছে বসিয়া বাতাস করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, “তুমি ত খুব রক্ষা পেয়েছ, এখন ওই রাক্ষুসীর চোখ পড়েছে এর ওপর, কি যে হবে, জানিনে মা—মা কাণী করুন, এখন ভাল হয়ে ওঠে, তবে ত’।

রাক্ষসীটি যে কে, তার আর বুঝিতে বাকি রইল না। শুনিয়া আমারও যত রাগ পড়িল সেই রাক্ষুসীর উপর। মনে হইল, ভাল করিয়া গোটাকতক কড়া কথা শুনাইয়া দিয়া আসি। মাঘ ঘরের দিকে চলিলাম। যাইবার সময় আঁচলটা পায়ে বাধিয়া পড়িয়া গেলাম। ঘরে গিয়া দেখিলাম, সেখানে নাই, সকল জায়গায় খুঁজিলাম। বাকি রইল ঠাকুরবাড়ি। বাড়ির ভিতরে পুকুরের সামনে নারিকেল গাছ-ঘেরা মন্দির। সেইখানে খুঁজিতে চলিলাম। মন্দিরের কাছে আসিয়া দেখি, দরজা ভেজান। একবার মনে হইল, রাক্ষুসী আমাব ভায়ের মন্দ করিতে আসে নাই ত? শুনিতে পাইলাম, কি যেন বিড় বিড় করিয়া বলিতেছে। তখন আর কোন সন্দেহই রহিল না। রাক্ষুসী নিশ্চয়ই আমার ভায়ের মন্দ করিতে আসিয়াছে। কথাগুলো একবার ভাল করিয়া শুনিবার জন্য দরজায় কান পাতিয়া দম বন্ধ করিয়া শুনিতে লাগিলাম। দরজার ফাঁক দিয়া দেখিলাম যে, মা হাঁটু গাড়িয়া গলায় কাপড় দিয়া, হাত জোড় করিয়া বলিতেছেন—“মা, আমার খোকাকে ভাল ক’রে দাও মা, আমি বুক চিরে রক্ত দেব।” আর দাঁড়াইতে পারিলাম না, দেওয়াল ধরিয়া বসিয়া পড়িলাম। মাথার ভিতর কেমন করিতে লাগিল! এই কি না রাক্ষুসী! আমার কান্না আসিতে লাগিল। এত দিন পরে যে মাকে চিনিতে পারিলাম বলিয়া কি জানি কার উদ্দেশো মাথা সেই দরজার টোকাঠে আপনি নুইয়া পড়িল।

ধীরে ধীরে সেখান হইতে উঠিয়া শঙ্করের কাছে আসিয়া পড়িলাম। প্রাণের ভিতর হইতে কে যেন বলিল—‘হবে হবে, ভাল হবে।’ কানে কেবলই বাজিতে লাগিল—‘ভাল ক’রে দাও মা, বুক চিরে রক্ত দেব।’

আশ্চর্য! তার পর হইতেই শঙ্কর ভাল হইয়া উঠিতে লাগিল। মা তাহাকে দেখিতে একবারও ঘরের মধ্যে আসিতেন না, বাহির হইতে দেখিয়া আবার আস্তে আস্তে চলিয়া যাইতেন।

ব্রহ্মে শঙ্কর সারিয়া উঠিল। ঠাকুরমা আড় এর পূজা, কাল তার পূজা দিতে লাগিলেন, আমি বুঝলাম যে, এ পূজা সত্যিই কার!

ব্রহ্মে ছ'মাস পরে শঙ্কর একেবারে ভাল হইয়া উঠিল। ঠাকুরমা সে দিন তাহার আবেগ্য উপলক্ষ্যে কাঙ্গালী খাওয়াইতেছিলেন। আমরা তখন খুব বাস্ত ছিলাম। হঠাৎ আমার কানে সেই কথা বাজিয়া উঠিল—“ভাল ক'রে দাও না, বুক চিবে রক্ত দেব”—তাইত! কি করিয়াছি! এতক্ষণ মনে হয় নাই কেন? ছুটিয়া মন্দিবে গেলাম—গিঘা দেখলাম, ছিন্ন লতিকার ন্যায় মা আমার সিংহবাহিনীর পদতলে চিরনিদ্রায় নিদ্রিতা—পার্শ্বের ছোট একটি বাটিতে ভরা রক্ত!!

## ডইনী

### তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

কে কবে নামকরণ করিয়াছিল সে ইতিহাস বিস্মৃতির গর্ভে সমাহিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু নামটি আজও পূর্ণগৌরবে বর্তমান—ছাতি-ফাটার মাঠে জলহীন, ছায়াশূন্য দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরটির এ প্রান্তে দাড়ইয়া অপর প্রান্তের দিকে চাহিলে ওপারের গ্রামচিহ্নের গাছপালাওলিকে কালো প্রলেপের মতো মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন যেন কেমন উদাস হইয়া উঠে। এপার হইতে ওপার পর্যন্ত অতিক্রম করিতে গেলে তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া মানুষের মৃত্যু হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়, বিশেষ করিয়া গ্রীষ্মকালে। তখন যেন ছাতি-ফাটার মাঠ নামগৌরব মহামারীর সমকক্ষতা লাভ করিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠে। যন ঘুমাচ্ছন্নতার মতো ধূলার একটা আন্তরণে মাটি হইতে আকাশের কোল পর্যন্ত আচ্ছন্ন হইয়া থাকে, অপর প্রান্তের সুদূর গ্রামচিহ্নের মসীরেখা প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। তখন ছাতি ফাটার মাঠের সে রূপ অদ্ভুত, ভয়ঙ্কর! শুনালোকে ভাসে একটি ধূমধূসরতা, নিম্নলোকে তৃণচিহ্নহীন মাঠে সদা নির্বাপিত চিত্তভ্রমের রূপ ও উত্তপ্ত স্পর্শ। ফ্যাকাশে রঙের নরম ধূলাব রাশি প্রায় এক-হাত পুরু হইয়া জমিয়া থাকে। গাছের মধ্যে এত বড় প্রান্তরটার এখানে ওখানে কতকগুলি খৈরী ও সেয়াকুল জাতীয় কণ্টকগুল্ম। কোন বড় গাছ নাই—বড় গাছ এখানে ভস্মায না, কোথাও জল নাই,—গোটাকয়েক শুষ্কগর্ভ জলাশয় আছে, কিন্তু জল তাহাতে থাকে না।

মাঠখানির চারিদিকেই ছোট ছোট পল্লী—সবই নিরক্ষর চাষীদের গ্রাম, সত্য কথ্য তাহারা গোপন করিতে জানে না—তাহার বলে, কেন্ অতীতকালে এক মহানাগ এখানে আসিয়া বসতি করিয়াছিল, তাহারই বিঘের জ্বালায় মাঠখানির রসময়ী কপ, বীজপ্রসবিনী শক্তি পুড়িয়া স্ফার হইয়া গিয়াছে। তখন নাকি আকাশলোকে সঞ্চবমান পতঙ্গ-পক্ষীও পঙ্গু হইয়া ঝরাপাতাব মত ঘুরিতে ঘুরিতে আসিয়া পড়িত সেই মহানাগের গ্রাসের মধ্যে।

সে নাগ আর নাই, কিন্তু বিষজর্জরতা এখনও কমে নাই। অভিশপ্ত ছাতি-ফাটার মাঠ। ভাগ্যদোমে ঐ বিষজর্জরতাব উপরে আর এক ফুর দৃষ্টি তাহার উপর প্রসারিত হইয়া আছে। মাঠখানার পূর্বপ্রান্তে দলদলির জলা, অর্থাৎ গভীর পঙ্কিল ঝরনা-জাতীয় জলাটার উপরেই বাননগরের সাহাদের যে আমবাগান আছে, সেই আমবাগানে আজ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া বাস করিতেছে এক ডাকিনী, ভীষণ শক্তিশালিনী, নিষ্ঠুর, ফুর এক বৃদ্ধা ডাকিনী। লোকে তাহাকে পরিহার করিয়াই চলে, তবে চল্লিশ বৎসর ধরিয়া দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া তাহার প্রতিটি অঙ্গের বর্ণনা তাহারা দিতে পারে, তাহার দৃষ্টি নাকি অপলক স্থির, আর সে দৃষ্টি নাকি আজ চল্লিশ বৎসর ধরিয়াই নিস্তব্ধ হইয়া আছে এই মাঠখানার উপর। ;

দলদলির উপরেই আমবাগানের ছায়ার মধ্যে নিঃসঙ্গ একখানি মেটে ঘরখানার মুখ ঐ ছাতি-ফাটার মাঠের দিকে। দুয়ারের সম্মুখেই লম্বা একখানি খড়ে-ছাওয়া বান্দা। সেই বান্দায় স্তব্ধ হইয়া বসিয়া নিমেষহীন দৃষ্টিতে বৃদ্ধা চাহিয়া থাকে ঐ ছাতি-ফাটার মাঠের দিকে। তাহার কাজের মধ্যে সে আপন ঘরদুয়ারটি পরিষ্কার করিয়া গোবরমাটি দিয়া নিকাইয়া

লয়, তাহার পর বাহির হয় ভিক্ষায়। দুই-তিনটা বাড়িতে গিয়া দাঁড়াইলেই তাহার কাজ হইয়া যায়, লোকে ভয়ে ভিক্ষা বেশি পরিমাণেই দিয়া থাকে; সেরখানেক চাল হইলেই সে আর ভিক্ষা করে না, বাড়ি ফিরিয়া আসে। ফিরিবার পথে অর্ধেক বিক্রি করিয়া দোকান হইতে একটু নুন, একটু সরিষার তৈল, আর খানিকটা কেরোসিন তেল কিনিয়া আনে। বাড়ি ফিরিয়া আর একবার বাহির হয় শুকনো গোবর আর দুই চারিটা শুকনো ডালপালার সন্ধানে। ইহার পর সমস্ত দিন দাওয়ার উপর নিস্তর হইয়া থাকে। এমন করিয়া চল্লিশ বৎসর সে একই ধারায় ঐ মাঠের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। বৃদ্ধার বাড়ি এখানে নয়, কোথায় যে বাড়ি সে কথাও কেহ সঠিক জানে না। তবে একথা নাকি নিঃসন্দেহ যে তিন-চারখানা গ্রাম একরূপ ধ্বংস করিয়া অবশেষে একদা আকাশপথে একটা গাছকে চালাইয়া লইয়া যাইতে যাইতে এই ছাতি-ফটার মাঠের নির্জন রূপে মুগ্ধ হইয়া নামিয়া আসিয়া এইখানে ঘব বাঁধিয়াছে। নির্জনতাই উহার ভালোবাসে, মানুষের সাক্ষাৎ উহা চায় না।

মানুষ দেখিলেই যে অনিষ্টস্পৃহা জাগিয়ে উঠে। ঐ সর্বনাশী লোণুপ শব্দিটা সাপের মত লকলকে ভিভ বাহির করিয়া ফণা তুলিয়া নাচিয়া ওঠে। না হইলে সেও তো মানুষ।

আপনার দৃষ্টি দেখিয়া সে আপনাই শিহরিয়া উঠে। বহুকালের পুরানো একখানি আয়না। সেই আয়নার আপনার চোখের প্রতিবিম্ব দেখিয়া তাহাব নিজের ভয় হয়— ক্ষুদ্রায়তন চোখেব মধো পিঙ্গল দুইটি তারা, দৃষ্টিতে ছুঁবির মতো একটা ঝকমকে ধার। জরা-বুদ্ধিত মুখ, শনের মত সাদা চুল, দস্তহীন মুখ। আপন প্রতিবিম্ব দেখিতে দেখিতে ঠোট দুইটি তাহার খবথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে আয়নাখানি নামাইয়া রাখিয়া দিল। আয়নাখানির চারিদিকে কাঠের ঘেরটা একেবাবে কালো হইয়া গিয়াছে, অথচ নূতন অবস্থায় কি সুন্দর লালচে রং, আর কি পাঁশশই না ছিল। আর আয়নাব কাচখানা ছিল রোদ-চকচকে পুকুরের জলের মত। কাচখানার ভিতর একখানা মুখ কি পরিষ্কারই না দেখা যাইত। ছোট কপালখানিকে ঘিরিয়া একরাশ চুল— ঘন কালো নয়,— একটু লালচে আভা ছিল চুলে; কপালের নিচেই টিকোল নাক, চোখ দুইটি ছোটই ছিল— চোখের তারা দুইটিও খয়েরা রঙেরই ছিল— লোকেও সে চোখ দেখিয়া ভয় কবিত, কিন্তু তাহার বড় ভাল লাগিত। ছোট চোখ দুইটি আবও একটু ছোট কবিয়া তাকাইলে মনে হইত, আকাশেব কোল পর্যন্ত এ চোখ দিয়া দেখা যায়। অকস্মাৎ সে শিহরিয়া উঠিল— নরুন দিয়া চেরা, ছুঁবির মত চোখে বিড়ালীর মত এই দৃষ্টিতে যাহাকে তাহার ভাল লাগে তাহার আব রক্ষা থাকে না। কোথা দিয়া যে কি হইয়া যায়, কেমন করিয়া যে হইয়া যায়, সে বুঝিতে পারে না, তবে হইয়া যায়।

প্রথম দিনেব কথা তাহার মনে পড়িয়া যায়।

বুড়োশিবতলার সম্মুখেই দুর্গা সায়রের বাঁধাঘাটের ভাঙা রানার উপর সে দাঁড়াইয়া ছিল— জলের তলে তাহার ছবি উলটা দিকে মাথা করিয়া দাঁড়াইয়া জলের চেউয়ে আঁকিয়া-বাঁকিয়া লম্বা হইয়া যাইতেছিল— জল স্থির হইলে লম্বা ছবিটি অবিকল তাহার মতো দশ-এগার বৎসরের মেয়েটি হইয়া তাহারই দিকে চাহিয়াই হাসিতেছিল। ইঠাং বামুনবাড়ির হারু চৌধুরী আসিয়া তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া টানিয়া সান-বাঁধানো সিঁড়ির উপর হইতে আছাড় দিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। তাহার রূঢ় কণ্ঠস্বর সে এখনও শুনিতে পায়— হারামজাদী ডাইনী, তুমি আমার ছেলেকে নজর দিয়েছ? তোমার এত বড় বাড়ি? খুন করে ফেলব হারামজাদীকে।

হারু চৌধুরীর সে ভয়ঙ্কর মূর্তি যেন স্পষ্ট চোখের উপর ভাসিতেছে।

সে ভয়ে বিহ্বল হইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়াছিল— ওগো বাবু গো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি গো!

আম দিয়ে মুড়ি খেতে যদি তোর লোভও হয়েছিল, তবে সে কথা বললি নে কেন হারামজাদী ?  
হাঁ, লোভ তো তাহার হইয়াছিল, সতাই হইয়াছিল, মুখের ভিতরটা তো জলে ভরিয়া  
পরিপূর্ণ হইয়াছিল!

হারামজাদী, আমার ছেলে যে পেট-বেদনায় ছটফট করছে!

সে আজও অবাক হইয়া যায়, কেমন করিয়া এমন হইয়াছিল— কেমন করিয়া এমন  
হয়। কিন্তু এ যে সত্য তাহাতে তো আর সন্দেহ নাই? তাহার স্পষ্ট মনে পড়িতেছে, সে হার  
সরকারের বাড়ি গিয়া অঝোরঝরে কাঁদিতেছিল আর বার বার মনে মনে বলিয়াছিল— হে  
ঠাকুর, ভাল করে দাও, ওকে ভাল করে দাও। কতবার সে মনে মনে বলিয়াছিল— দৃষ্টি  
আমার ফিরাইয়া নইতেছি, এই নইলাম। আশ্চর্যের কথা, কিছুক্ষণ পরেই বার দুই বমি  
করিয়া ছেলেটি সুস্থ হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

চৌধুরী বলিয়াছিল, ওকে একটা আম আর দুটি মুড়ি দাও দেখ।

চৌধুরী-গিন্নী একটা ঝাঁটা তুলিয়াছিল, বলিয়াছিল, ছাই দেব হাবামজাদীর মুখে। মা  
বাপ-মরা অনাথা মেয়ে বলে দয়া কবি— যেদিন হারামজাদী আসে সেই দিনই আমি ওকে  
খেতে দি। আর ও কিনা আমার ছেলেকে নজর দেয়। আবাব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গুনাছে দেখ।  
ওব ওই চোখের দৃষ্টি দেখে বরাবর আমার সন্দেহ ছিল, কখনও আমি ওব সাক্ষাতে  
ছেলেপুলেকে খেতে দিইনি। আজ আমি খোকাকে খেতে দিয়ে যাটে গিয়েছি। আর ও কখন  
এসে একেবারে সামনে দাঁড়িয়েছে! সে কি দৃষ্টি ওব!

লজ্জায় ভয়ে সে পলাইয়া গিয়াছিল। সেদিন ব্যত্রে সে গ্রামের মধ্যে কাহাবও বাড়িব  
দাওয়ায় শুইতে পারে নাই; শুইয়াছিল গ্রামের প্রান্তে ঐ বুড়েশিবতলায়। অঝোরঝরে সে  
সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়াছিল আব বলিয়াছিল, হে ঠাকুর, আমাব দৃষ্টিকে ভাল করে দাও, না হয়  
আমাকে কানা করে দাও।

গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস মাটির মূর্তির মত নিষ্পন্দ বৃদ্ধার অবয়বের মধ্যে এতক্ষণে  
ক্ষীণ একটি চাকুলোর সঞ্চার করিল। ঠোট দুইটি থরথর করিয়া কাঁপতে লাগিল।

পূর্বজন্মের পাপের যে খণ্ডন নাই— দেবতার দোষই বা কী, আর সাধাই বা কী? বেশ  
মনে আছে, গৃহস্থের বাড়িতে সে আর ঢুকিবে না ঠিক করিয়াছিল। বাহিব দুয়ার হইতেই সে  
ভিক্ষা চাহিত— গলা দিয়া কথা যেন বাহির হইতে চাহিত না, কোনও মতে বহুদৃষ্টে বলিত,  
দুটি ভিক্ষে পাই মা? হরিবোল!

কে বে? তুই বুঝি? খবরদার ঘরে ঢুকবি নে। খবরদার!

না মা, ঘরে ঢুকবো না মা।

কিন্তু পরক্ষণেই মনের মধ্যে কি যেন একটি কিলবিল করিয়া উঠিত, এখনও উঠে? কি  
সুন্দর মাছভাজার গন্ধ, আহা-হা! বেশ খুব পাকা মাছখানা বোধহয়।

এই—এই! হারামজাদী বেহায়া! উঁকি মারছে দেখ! সাপের মতো!

ছি ছি ছি! সত্যিই তো উঁকি মারিতেছে— রান্নাশালার সমস্ত আয়োজন তাহার নরুন-  
চেরা ক্ষুদ্র চোখের এক দৃষ্টিতে দেখা হইয়া গিয়াছে। মুখের ভিতর জিভের তলা হইতে  
ঝরণার মত জল উঠিতেছে।

বহুকালের গড়া জীর্ণ বিবর্ণ মাটির মূর্তি যেন কোথায় একটা নাড়া পাইয়া দুনিয়া উঠিল,  
ফটল-খরা শিখিলগ্রস্থি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি শৃঙ্খলাহীন অসমগতিতে চঞ্চল হইয়া পড়িল;  
অস্থিরভাবে বৃদ্ধা এবার নড়িয়া চড়িয়া বসিল— বাঁ হাতের শীর্ণ দীর্ঘ আঙুলগুলির নখাগ্র  
দাওয়ার মাটির উপর বিদ্ধ হইয়া গেল। কেন এমন হয়, কেমন করিয়া এমন হয়, সে কথা  
সারাজীবন ধরিয়াও যে বুঝিতে পারা গেল না। অস্থির চিন্তায় দিশাহারা চিন্তের নিকট সমস্ত  
পৃথিবীই যেন হারাইয়া যায়।

কিন্তু সে তার কী করিবে? কেহ কি বলিয়া দিতে পারে; তার কী করিবে, কী করিতে পারে? প্রহৃত পশু যেমন মরিয়া হইয়া অকস্মাৎ আঁ-আঁ গর্জন করিয়া উঠে, ঠিক তেমনই হঁ-হঁ শব্দ করিয়া অকস্মাৎ বৃদ্ধা মাথা নাড়িয়া শণের মতো চুলগুলোকে বিশৃঙ্খল করিয়া তুলিয়া খাড়া সোজা হইয়া বসিল। ফোকলা মাড়ির উপর মাড়ি চাপিয়া, ছাতি-ফাটার মাঠের দিকে নরুন-চেরা চোখের চিলের মত দৃষ্টি হানিয়া হাঁপাইতে আবস্ত করিল।

ছাতি-ফাটার মাঠটা ধোঁয়ায় ভরিয়া ঝাপসা হইয়া উঠিয়াছে। চৈত্র মাস, বেলা প্রথম প্রহর শেষ হইয়া গিয়াছে। মাঠ ভরা ধোঁয়ার মধ্যে ঝিকঝিকি ঝিলিঝিলির মতো কী যেন একটা ছুটিয়া চলিয়াছে। একটা ফুৎকার যদি সে দেয়, তবে মাঠের ধুলার রাশি উড়িয়া আকাশময় হইয়া যাইবে।

ঐ ধোঁয়ার মধ্যে ক্রমাৎ সাদার মতো ওটা কী নড়িতেছে যেন! মানুষ? হাঁ মানুষই তো। মনের ভিতরটা তাহার কেমন করিয়া উঠে। ফুঁ দিয়া ধূলা উড়াইয়া দিবে মানুষটাকে উড়াইয়া? হি-হি-হি করিয়া পাগলের মতো হাসিয়া একটা অবোধ নিষ্ঠুর কৌতুক তাহাব মনে জাগিয়া উঠিতেছিল।

দু'হাতের মুঠি প্রাণপণ শক্তিতে শক্ত করিয়া সে আপনার উচ্ছৃঙ্খল মনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিল— না নানা। ছাতি-ফাটার মাঠে মানুষটা ধুলার গরমে শ্বাসবোধী যন্ত্রে মরিয়া যাইবে।

নাঃ ওদিকে আব সে চাহিবেই না। তাহার চেয়ে বরং উঠানটায় আরও এতবার ঝাঁটা বুলাইয়া ছড়াইয়া-পড়া পাতা ও কাঠকুটাগুলোকে সাজাইয়া রাখিলে কেমন হয়? বসিয়া বসিয়াই সে ভাঙ্গিয়া-পড়া দেহখানাকে টানিয়া উঠানে ঝাঁটা বুলাইতে শুরু করিল।

জড়ো-কবা পাতাগুলো ফরফর করিয়া অকস্মাৎ সর্পিল ভঙ্গিতে ঘুরপাক খাইয়া উড়িতে আরম্ভ করিল। ঝাঁটার মুখে টানিয়া-আনা ধুলির রাশি তাহার সহিত মিশিয়া বুড়িকেই যেন জড়াইয়া ধবিত্তেছিল, মুখে চোখে ধূলা মাখাইয়া তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিয়া দ্রুত আবর্তিত পাতাগুলো তাহাকে যেন সর্বাগ্রে প্রহাব করিতেছে। জবাগ্রস্ত রোমন্থন আহত মার্জারীর মতো ব্রুদ্ধ মুখভঙ্গী করিয়া বৃদ্ধা আপনার হাতের ঝাঁটাগাছটা আশ্ফালন করিয়া বলিয়া উঠিল— বেরো বেরো বেরো!

বার বার সে ঝাঁটা দিয়া বাতাসের ঐ আবর্তটাকে আঘাত করিতে চেষ্টা করিল, আবর্তটা মাঠের উপর দিয়া ঘুরপাক দিতে দিতে ছুটিয়া গেল। মাঠের ধূলা হু-হু করিয়া উড়িয়া ধূলাব একটা ঘূবস্ত স্তম্ভ হইয়া উঠিতেছে। শুধু কি একটা? এখানে ওখানে ছোট বড় কত ঘুরপাক উঠিয়া পড়িয়াছে— মাঠটা যেন নাচিতেছে! একটা যেন হাজারটা হইয়া উঠিতেছে! একটা অদ্ভুত আনন্দে বৃদ্ধার মন শিশুর মত অধীর হইয়া উঠিল। সহসা সে ন্যুত দেহে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঝাঁটাসুদ্ধ হাতটা প্রসারিত করিয়া সাধামত গতিতে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে টলিতে টলিতে বসিয়া পড়িল। পৃথিবীর এক মাথা উঁচু হইয়া তাহাকে যেন গড়াইয়া কোন অতলের দিকে ফেলিয়া দিতে চাহিতেছে। উঠিয়া দাঁড়াইবার শক্তি ও তাহার ছিল না। ছোট শিশুর মত হামাগুড়ি দিয়া সে দাওয়ার দিকে অগ্রসর হইল। দারুণ তৃষ্ণায় গলা পর্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছে।

কে রইছ গো ঘরে? ওগো!

জলে-পচা নরম মরা-ডালের মত বাঁকিয়া-চুরিয়া দাওয়ার একধারে পড়িয়াছিল। মানুষের কণ্ঠস্বর শুনিয়া কোনমতে মাথা তুলিয়া সে বলিল, কে?

ধূলিধূসর দেহে শুষ্ক পাণ্ডুর মুখ একটি যুবতী মেয়ে বকের ভিতর কোন একটা বস্ত্র কাপড়ের আবরণে ঢাকিয়া বহু কষ্টে ঝাঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। মেয়েটি বোধ হয় ছাতি-

ঘাটার মাঠ পার হইয়া আসিল। কণ্ঠস্বর অনুসরণ করিয়া বৃদ্ধাকে দেখিয়া মেয়েটি সভয়ে শিহরিয়া উঠিল, এক পা করিয়া পিছু হাঁটিতে হাঁটিতে বলিল, একটুকুন জল।

মাটির উপর হাতের ভর দিয়া বৃদ্ধা এবার অতিকষ্টে উঠিয়া বসিল। মেয়েটির পাখুর শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, আহা-হা, বাছারে, আয়, আয়, আয়, বোস।

সভয়ে সন্তর্পণে দাওয়ার এক পাশে বসিয়া মেয়েটি বলিল, একটুকুন জল দাও গো! মমতায় বৃদ্ধার মন গলিয়া গেল, সে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর ঢুকিয়া বড় একটা ঘটি পূর্ণ করিয়া জল ঢালিয়া এক টুকরো পাটালির সন্ধানে হাঁড়িতে হাত পুরিয়া বলিল, আহা-মা, এই রৌদ্রে ঐ রান্ধুসী মাঠে কী বলে বের হলি তুই?

বাহিরে আসিয়া মেয়েটি তখনও হাঁপাইতেছিল, কম্পিত শুষ্ক কণ্ঠ সে বলিল, আমার মাঘের বড় অসুখ মা। বেরিয়েছিলাম রাত থাকতে। মাঠের মাথায এসে আমার পথ ভুল হয়ে গেল, মাঠের ধারে ধারে আমার পথ, কিন্তু এসে পড়লাম একেবারে মধিখানে।

জলের ঘটি ও পাটালির টুকরাটি নামাইয়া দিয়া বৃদ্ধা শিহরিয়া উঠিল— মেয়েটির পাশে একটি শিশু। গরম জলে সিদ্ধ শাকের মতো শিশুটি ঘর্মাক্ত দেহে ন্যাতাইয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধা ব্যস্ত হইয়া বলিল, দে, দে বাছা, ছেলেটার চোখে মুখে জল দে। মেয়েটি ছেলের মুখে জল দিয়া আঁচল ভিজাইয়া সর্বাস মুছিয়া দিল।

বৃদ্ধা দূরে বসিয়া ছেলের দিকে তাকাইয়া রহিল, স্বাস্থ্যবতী যুবতী মাঘের প্রথম সন্তান বোধ হয়, হস্তুপুষ্টি নধর দেহ— কচি লাউডগার মতো নরম সরস। দন্তহীন মুখে কম্পিত জীহ্বার তলে ফোয়ারাটা যেন খুলিয়া গেল, নরম গরম লালায় মুখটা ভরিয়া উঠিতেছে।

এঃ, ছেলেটা কি ভীষণ ঘামিতেছে! দেহের সমস্ত জলই কি বাহির হইয়া আসিতেছে! চোখ দুইটা লাল হইয়া উঠিয়াছে! তবে কি?— কিন্তু সে তাহাব কি করিবে? কে তাহাব সামনে আসিল? কেন আসিল! ঐ কোমল নধর দেহ শিশু ময়দাব মতো ঠাসিয়া চটকাইয়া তাহার শুষ্ক কঙ্কালবুকে চাপিয়া নিঙড়াইয়া—। জীর্ণ জরজর ত্বকের উপর একটা রোমাঙ্কিত শিহরণ ক্ষণে ক্ষণে বহিয়া যাইতেছে, সর্বাস তাহার থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। এঃ, ঘামে ছেলেটার দেহের সমস্ত রস নিঙড়াইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, মুখের লালার মধ্যে স্পষ্ট তার বসান্বাদ! যাঃ! নিতান্ত অসহায়ের মত আর্তস্বরে সে বলিয়া উঠিল, খেয়ে ফেললাম— ছেলেটাকে খেয়ে ফেললাম রে! পালা পালা, তুই ছেলে নিয়ে পালা বলাছি।

শিশুটির মা ঐ যুবতী মেয়েটি দুই হাতে ঘটি তুলিয়া ঢকঢক কবিয়া ভল খাইতেছিল— তাহার হাত হইতে ঘটিটা খসিয়া পড়িয়া গেল, সে আতঙ্কিত বিবর্ণ মুখে বৃদ্ধার বিস্ময়কর-দৃষ্টি ক্ষুদ্র চোখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, এটা তবে রামনগর? তুমিই সেই—? সে ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া ছেলেটাকে ছোঁ মারিয়া কুড়াইয়া লইয়া যেন পক্ষিণীর মত ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

কিন্তু সে কী করিবে? আপনার বুকখানাকে তাহার নিজের জীর্ণ আঙুলের নখ দিয়া চিরিয়া ঐ লোভটাকে বাহির করিয়া দিতে ইচ্ছা করে। জীভটাকে কাটিয়া ফেলিতে পারিলে সে পরিত্রাণ পায়। ছি ছি ছি! কাল সে গ্রামের পথে বাহির হইবে কোন মুখে? স্রোকে কেহ কিছু বলিতে সাহস করিবে না; সে তাহা জানে; কিন্তু তাহাদের মুখে-চোখে যে-কথা ফুটিয়া উঠিবে তাহা সে দেখিবে কি করিয়া? ছেলেমেয়েরা এমনই তাহাকে দেখিলে পলাইয়া যায়, কেহ কেহ কাঁদিয়াও ওঠে, আজিকার ঘটনার পর তাহারা বোধহয় আতঙ্কে জ্ঞান হারাইয়া পড়িয়া যাইবে। ছি ছি ছি!

এই লজ্জায় একদা সে গভীর রাত্রে আপনার গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়াছিল, সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে, তখন সে তো অনেকটা ডাগর হইয়াছে। তাহারই বয়সী তাহাদেরই স্বজাতীয়া



সাবিত্রীর পূর্বদিন রাত্রে খোকা হইয়াছে। সকালেই সে দেখিতে গিয়াছিল। সাবিত্রী তখন ছেলেটিকে লইয়া বাহিরে রৌদ্রে আসিয়া বসিয়া গায়ে রোদ লইতেছিল। ছেলেটি ওইয়া ছিল কাঁথার উপর। কালো চকচকে কি সুন্দর ছেলেটি!

ঠিক এমনি ভাবে ঠিক আজিকার মতই সেদিনও তাহার মনে হইয়াছিল ছেলেটিকে লইয়া আপনার বুকে চাপিয়া নরম ময়দার তালের মত ঠাসিয়া ঠোটে ঠোট দিয়া চুমায় চুমায় চুষিয়া তাহাকে খাইয়া ফেলে। তখন সে বুঝিতে পারিত না, মনে হইত, এ বুঝি কোলে লইয়া আদর করিবার সাধ।

সাবিত্রীর শাশুড়ী হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া সাবিত্রীকে তিরস্কার করিয়াছিল, বলি ওলো, আক্কেলখাগী হারামজাদী, খুব যে, ভাবীবাসীর সঙ্গে মস্করা জুড়েছিস। আমার বাছার যদি কিছু হয়, তবে তাকে বুঝব আমি— হ্যাঁ।

তারপর বাহিরের দিকে আঙুল বাড়াইয়া তাহাকে বলিয়াছিল, বেরো বলছি, বেরো। হারামজাদীর চোখ দেখ দেখি!

সাবিত্রী ছেলেটিকে তাড়াতাড়ি বুকে ঢাকিয়া দুর্বল শরীরে থরথর করিয়া কাপিতে কাপিতে যবেব মধ্যে পলাইয়া গিয়াছিল। মর্মান্তিক দুঃখে আহত হইয়া সে চলিয়া আসিয়াছিল। বার বার সে মনে মনে বলিয়াছিল— ছি ছি, তাই নাকি সে পারে? হইলই বা ডাইনী, কিন্তু তাই বলিয়া কি সে সাবিত্রীর ছেলের অনিষ্ট করিতে পারে? ছি ছি! ভগবানকে ডাকিয়া সে বলিয়াছিল— তুমি ইহার বিচার করবে। একশ বৎসর পরমায়ু দিও তুমি সাবিত্রীর খোকাকে, দয়া করিয়া প্রমাণ করিয়া দিও, সাবিত্রীর খোকাকে আমি কত ভালবাসি!

কিন্তু অপবাহু বেলা হইতে না-হইতেই তাহার অত্যাগ্র বিষময়ী দৃষ্টি-ক্ষুধার কলঙ্ক অতি নিষ্ঠুরভাবে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়া গিয়াছিল।

সাবিত্রীর ছেলেটি নাকি ধনুকের মতো বাঁকিয়া গিয়াছে আর এমনভাবে কাতরাইতেছে যে ঠিক যেন কেহ তাহার রক্ত চুষিয়া লইতেছে।

লজ্জায় সে পলাইয়া গিয়া গ্রামের শ্মশানের জঙ্গলের মধ্যে সমুপর্ণে আত্মগোপন করিয়া বসিয়াছিল। বাব বাব মুখেব থু থু মাটিতে ফেলিয়া দেখিতে চাহিয়াছিল,— কোথায় রক্ত! গলায় আঙুল দিয়া দিয়া বমি করিয়াও দেখিতে চাহিয়াছিল, বুঝিতে চাহিয়াছিল, প্রথম বাব দুয়েক বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু তাহার পরই কুটি কুটি রক্তের ছিটা, শেষকালে একেবারে খানিকটা তাজা রক্ত উঠিয়া আসিয়াছিল। সেইদিন সে নিঃশব্দে বুঝিতে পারিয়াছে আপনার অপার নিষ্ঠুর শক্তির কথা।

গভীর রাত্রি— সেদিন বোধহয় চতুর্দশীই ছিল, হাঁ চতুর্দশীই তো— বাকুলেব তারাদেবী তলায় পূজার ঢাক বাজিতেছিল। জাগ্রত মা তারাদেবী; পূর্ণিমার আগের প্রাতি চতুর্দশীতে মায়ের পূজা হয়, বলিদান হয়। কিন্তু মা তারাও তাহাকে দয়া করেন নাই। কতবার সে মানত করিয়াছে— মা, আমাকে ডাইনী হইতে মানুষ করিয়া দাও, আমি তোমাকে বুক চিরিয়া রক্ত দিব, কিন্তু মা মুখ তুলিয়া চাহেন নাই।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বৃদ্ধার মন দুঃখে হতাশায় উদাস হইয়া গেল। মনের সকল কথা ছিন্নসূত্র ঘুড়িব মতো শিথিলভাবে দোল খাইতে খাইতে ভাসিয়া কোন নিকটদেশলোকে হারাইয়া যাইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চোখের পিসল তারার অর্থহীন দৃষ্টি জাগিয়া উঠিল। সে সেই দৃষ্টি মেলিয়া ছাত-ফাটার মাঠের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। ছাতি-ফাটার মাঠ ধূলায় ধূসর, বাতাস স্তব্ধ; ধূসর ধূলায় গাঢ় নিস্তরঙ্গ আন্তরণের মধ্যে সমস্ত যেন বিনুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ঐ অপরিচিতা পথচারিণী মেয়েটির ছেলে এ গ্রাম হইতে খান দই গ্রাম পাব হইয়া পথেই মরিয়া গিয়াছে। যে ঘাম সে ঘামিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সে ঘাম আর থামে নাই। দেহের সমস্ত

রস নিঙড়াইয়া কে যেন বাহির করিয়া দিল। কে আবার? ঐ সর্বনাশী। মেয়েটি বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিয়াছে, কেন গেলাম গো— আমি ঐ ডাইনীর কাছে কেন গেলাম গো।

লোকে শিহরিয়া উঠিল, তাহার মৃত্যু-কামনা করিল। এবার জনকয়েক জোয়ান ছেলে তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য ঝগড়াটার কাছে আসিয়াও ছুটিল। বৃদ্ধা ডাইনী ক্রোধে সাপিনীর মত ফুঁসিয়া উঠিল— সে তাহার কী করিবে? সে আসিল কেন? তাহার চোখের সম্মুখে এমন সরল লাভণ্য-কোমল দেহ ধরিল কেন? অকস্মাৎ অত্যন্ত ক্রোধে সে একসময় চিলের মতো চীংকার করিয়া উঠিল তীব্র তীক্ষ্ণ স্বরে। সে চীংকার শুনিয়া তাহারা পলাইয়া গেল। কিন্তু সে এখনও ক্রুদ্ধ অজগরীর মত ফুঁসিতেছে, তাহার অন্তরের বিষ সে যেন উদ্ধার করিতেছে আবার নিজেই গিলিতেছে। কখনও তাহার হি-হি করিয়া হাসিতে ইচ্ছা হইতেছে, কখনও বা ক্রুদ্ধ চীংকারে ঐ ছাতি-ফাটার মাঠটা কাঁপাইয়া তুলিবার ইচ্ছা জাগিয়া উঠিতেছে, কখনও বা ইচ্ছা হইতেছে— বুক চাপড়াইয়া মাথার চুল ছিড়িয়া পৃথিবী ফাটাইয়া হা হা করিয়া সে কাঁদে। ক্ষুধাবোধ আজ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, রান্নাবান্নারও আজ দরকার নাই। এঃ, সে আজ একটা গোটা শিশুদেহের রস অদৃশ্য-শোষণে পান করিয়াছে।

ঝিরঝির করিয়া বাতাস বহিতেছিল। গুহ্লা নবমীর চাঁদের জ্যোৎস্নায় ছাতি-ফাটার মাঠ একখানা সাদা ফরাসের মত পড়িয়া আছে। কোথায় একটা পাখী অশ্রান্তভাবে ডাকিয়া চলিয়াছে— চোখ গে-ল। চোখ গে-ল। আমগাছগুলির মধ্যে ঝিঝিপোকা ডাকিতেছে। ঘরব পিছনে ঝগড়ার ধারে দুইটা লোক যেন মৃদুগুঞ্জে কথা কহিতেছে। আবাব সেই ছেলেগুলো তাহার কোন অনিষ্ট করিতে আসিয়াছে নাকি? অতি সম্ভবিত মৃদু পদক্ষেপে বৃদ্ধা ঘরব কোণে আসিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল। না, তাহারা নয়। এ বাড়ীবীদের সেই স্বামী-পরিত্যক্তা উচ্ছ্বলা মেয়েটা, আর তাহারই প্রণয়মুগ্ধ বাড়রী ছেলেটা।

মেয়েটা বলিতেছে, না, কে আবার আসবে এখনি, আমি ঘর যাব! ছেলেটা বলিল, হেঁ। এখানে আসছে নাকে, দিনেই কেউ আসে না, তা রাতে!

তা হোক। তোর বাবা যখন আমার সাথে তোর সাঙা দেবে না, তখন তোর সাথে এখানে কেন থাকব আমি?

ছি ছি ছি! কি লজ্জা গো! কোথায় যাইবে সে! যদি তাই গোপনে দুইজনে দেখা করিতে আসিয়াছে, তবে মরিতে ওখানে কেন? তাহার এই বাড়িতে আসিল না কেন? তাহার মত বৃদ্ধাকে আবার লজ্জা কী? কী বলিতেছে ছেলেটা!— বাবা-মা বিয়ে না দেয়, চল তোতে আনাতে ভিনগাঁয়ে গিয়ে বিয়ে করে সংসার পাতব। তোকে নইলে আমি বাঁচব না।

আ মরণ ছেলেটির পছন্দর। ঐ কুপোর মত মেয়েটাকে উহার এত ভালো লাগিল। তাহার মনে পড়িয়া গেল, তাহাদের গ্রাম হইতে দশ ক্রোশ দূরের বোলপুরে শহরের পানওয়ালার দোকানের সেই বড় আয়নাটা। আয়নাটার মধ্যে ছিপছিপে চৌদ্দ-পনের বছরের একটি মেয়ের ছবি। একমাথা রক্ষ চুল, কপাল, টিকালো নাক, পাতলা ঠোঁট, চোখ দুইটি ছোট, তারা দুটি খয়ের রঙের, কিন্তু সে চোখের বাহার ছিল বহুক! আয়নার দিকে তাকাইয়া সে নিজের ছবিই দেখিতেছিল। তখন আয়না তো তাহার ছিল না, আয়নাতে আপনার ছবি সে কখনও কোনদিন দেখে নাই। আরে, তুই আবার কে রে? কোথা থেকে এলি?— লম্বা-চওড়া এক জোয়ান পুরুষ তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল। আগের দিন সন্ধ্যায় সে সবাঁ বোলপুরে আসিয়াছিল। সাবিত্রীর ছেলেটাকে খাইয়া ফেলিয়া সেই চতুর্দশীর রাগেই গ্রাম ছাড়িয়া বোলপুরে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। লোকটাকে দেখিবা তাহার খাবাপ লাগে নাই, কিন্তু তাহার কথাব চণ্ডটা বড় খারাপ লাগিয়াছিল। সে নিম্পলক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিয়াছিল, কেনে, যেথা থেকে আসি না কেনে, তোমার কি?

আমার কী? এক কিলে তোকে মাটির ভেতর বসিয়ে দেব। দেখেছিস, কিল? ফুঙ্ক হইয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া সে ঐ লোকটির দেহের রক্ত শোষণ করিবার কামনা করিয়াছিল। কালো পাথরের মতো নিটোল শরীর। জিভের নীচে ফোয়ারা হইতে জল ছুটিয়াছিল। কোন উত্তর না দিয়া তির্যক ভঙ্গিতে লোকটার দিকে চাহিতে চাহিতে সে চলিয়া আসিয়াছিল।

সেদিন সূর্য ডুবিবার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্বদিকে চুনে-হলুদে রঙের প্রকাণ্ড থালার মতো নিটোল গোল চাঁদ উঠিয়াছিল; বোলপুরের একেবারে শেষে রেল লাইনের ধাৰে বড় পুকুরটার বাঁধা ঘাটে বসিয়া আঁচল হইতে মুড়ি খাইতে খাইতে সে চাঁদের দিকে চাহিয়া ছিল। চাঁদের আলো তখনও দুধবরণ হইয়া উঠে নাই। ঘোলাটে আবছা আলোয় চারিদিক ঝাপসা দেখাইতেছিল। সতসা কে আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলো। সেই লোকটা! সে হি হি করিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল— আজও বেশ মনে আছে— হাসির সঙ্গে সঙ্গে তাহার গালে দুইটা টোল খাইয়াছিল— হাসিলে তাহার গালে টোল খাইত— সে বলিয়াছিল, কথার জবাব না দিয়ে পালিয়ে এলি যে?

সে বলিয়াছিল, এই দেখ, তুমি যাও বলছি, নইলে আমি চেষ্টাব।

চেষ্টাব? দেখছিস পুকুরের পাক, টুটি টিপে তোকে পুতে দোব ঐ পাকে।

তাহার ভয় হইয়াছিল, সে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল, লোকটা অকস্মাৎ মাটির উপর ভীষণ জোরে পা ঠুকিয়া চীৎকার করিয়া একটা ধমক দিয়া উঠিয়াছিল, ধো-ৎ!

সে আঁতকাইয়া উঠিল— আঁচল-ধরা হাতের মুঠিটা খসিয়া গিয়া মুড়িগুলি বরবার করিয়া পড়িয়া গিয়াছিল। লোকটার হি-হি করিয়া সে কি হাসি! সে একেবারে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। লোকটা অপ্রস্তুত হইয়া বলিয়াছিল, দূর-রো, ফ্যাচকাঁদুনে মেয়ে কোথাকার। ভাগ্!

তাহার কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট স্নেহের আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

সে কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিয়াছিল, তুমি মারবা নাকি?

না না, মারব কেন? তোকে শুধালাম কোথায় বাড়ি তোরা, তু একেবারে খাঁক কবে উঠিল। তাতেই বলি—

বলিয়া আবাব হি-হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

আমার বাড়ি আনেক দূর, পাথবঘাটা।

কী নাম বটে তোব? কী জাত?

নাম বটে আমার 'সোরধনি', লোকে ডাকে 'সরা' বলে। আমরা ডোম বটে।

লোকটা খুশি হইয়া বলিয়াছিল, আমরাও ডোম। তা ঘর থেকে পালিয়ে এলি কেন?

তাহার চোখে আবাব জল আসিয়াছিল, সে চুপ করিয়া ভাবিতেছিল, কী বলিবে?

রাগ করে পালিয়ে এসেছিস বুঝি?

না।

তবে?

আমার মা-বাবা কেউ নাইকো কিনা? কে খেতে পরতে দেবে? তাই খেটে খেতে এসেছি হেথাকে।

বিয়ে করিস না কেনে— বিয়ে?

সে অবাক হইয়া লোকটার মুখের দিকে চাহিয়াছিল। তাহাকে— তাহার মতো ডাইনীকে— কে বিবাহ করিবে? সে শিহরিয়া উঠিয়াছিল। তারপর হঠাৎ সে কেমন লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল।

বৃদ্ধা আজও অকারণে নতশিরে মাটির উপর হাত বুলাইয়া ধূলা কাকর জড়ো করিতে আরম্ভ করিল। সকল কথার সূত্র যেন হারাইয়া গিয়াছে— মালা গাঁথিতে গাঁথিতে হঠাৎ সূতা হইতে সূচটা পড়িয়া গেল।

আঃ, কি মশা! মৌমাছির চাক ভাঙ্গিলে যেমন মাছিগুলো মানুষকে ছাঁকিয়া ধরে, তেমনই করিয়া সর্বাসে ছাঁকিয়া ধরিয়াছে। কই? মেয়েটা আর ছেলোটোর কথাবার্তা তো শোনা যায় না। চলিয়া গিয়াছে। সম্ভবপণে ঘরের দেওয়াল ধরিয়া বৃদ্ধা আসিয়া দাওয়ার উপর বসিল। কাল আবার উহারা নিশ্চয় আসিবে। তাহার ঘরের পাশাপাশি জায়গার মতো আর নিরিবিলি জায়গা কোথায়! এ চাকলায় কেহ আসিতে সাহস করবে না। তবে না। তবে উহা বা ঠিক আসিবে। ভালবাসার কি ভয় আছে।

অকস্মাৎ তাহার মনটা কিলবিল করিয়া উঠিল। আচ্ছা, এ ছোড়াটাকে সে খাইবে? শত সমর্থ জোয়ান শরীর।

সঙ্গে সঙ্গে শিহরিয়া উঠিয়া বার বার সে ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া উঠিল, না না।

কয়েক মুহূর্ত পরে সে আপন মনে দুর্লিতে আরম্ভ করিল, তাহার পর উঠিয়া উঠানে ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইতে শুরু করিয়া দিল। সে বাট বহিতেছে। আজ যে সে একটা শিশুকে খাইয়া ফেলিয়াছে, আজ তো যুমাইবার তাহাব উপায় নাই। ইচ্ছা হয়, এই ছাত্র-ফাটার মাঠটা পার হইয়া অনেক দূর চলিয়া যায়। লোকে বলে, সে গাছ চালাইতে জানে। জানিলে কিন্তু ভালো হইত। গাছের উপর বসিয়া আকাশের মেঘ চিরিয়া ছ-ছ করিয়া যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইত। কিন্তু এ মেয়েটা আর ছেলোটোর কথাগুলো শোনা হইত না। উহারা ঠিক কাল আবার আসিবে।

হি হি হি। ঠিক আসিয়াছে। ছোড়াটা চুপ করিয়া বসিয়া আছে, ঘন ঘন ঘাড় ফিরাইয়া পথের দিকে চাহিতেছে। আসিবে রে, সে আসিবে।

তাহাব নিজের কথাই তো বেশ মনে আছে। সারাদিন ঘুরিয়া ফিরিয়া সন্ধ্যাবেলায় সে জোয়ানটি ঠিক পুকুরের ঘাটে আসিয়াছিল। তাহাব আগেই আসিয়া বসিয়াছিল, পথের দিকে চাহিয়া বসিয়া আপন মনে পা দোলাইতেছিল। সে নিজে আসিয়া দাঁড়াইয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়াছিল।

এসেছিস? আমি সেই কখন থেকে বসে আছি।

বৃদ্ধা চমকিয়া উঠিল। ঠিক সেই কথা, সে তাহাকে সেই কথাটিই বলিয়াছিল। ও?, এ ছোড়াটাও ঠিক সেই কথাটিই বলিতেছে। মেয়েটি সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে, নিশ্চয় সে মুখ টিপিয়া হাসিতেছে।

সেদিন সে একটা ঠোঙাতে করিয়া খাবার আনিয়াছিল। তাহার সম্মুখে বাড়িইয়া ধবিয়া বলিয়াছিল, কাল তোর মুড়ি পড়ে গিয়েছিল। লে।

সে কিন্তু হাত বাড়াইতে পারে নাই। তাহার বকের দুর্দান্ত লোভ— সাপের মত তাহার ডাইনি মনটা বেদের বাঁশী শুনিয়া যেন কেবল দুলিয়া দুলিয়া নাচিয়াছিল, ছোবল মারিতে ভুলিয়া গিয়াছিল।

তারপর সে কি করিয়াছিল? হাঁ মনে আছে। সে কি আর ইহারা জাফা, না, পারে? ও মাগো! ঠিকই তাই। এ ছেলোটো যে মেয়েটার মুখে নিজে হাতে কী তুলিয়া দিতেছে। বুড়ী দুই হাতে মাটির উপর মৃদু করাঘাত করিয়া নিঃশব্দে হাসি হাসিয়া যেন ঝাঙ্গিয়া পড়িল।

কিন্তু নিতান্ত আকস্মিকভাবেই হাসি তাহার থামিয়া গেল। সহসা একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে স্তব্ধভাবে গাছে হেলান দিয়া বসিল। তাহার মনে পড়িল, ইহার পরই সে তাহাকে বলিয়াছিল— আমাকে বিয়ে করবি সরা?

সে কেমন হইয়া গিয়াছিল। কিছু বলিতে পারে নাই, কিছু ভাবিতে পারে নাই। শুধু কানের পাশ দুইটা গরম হইয়া উঠিয়াছিল, হাত-পা ঘামিয়া টসটস করিয়া জল ঝরিয়াছিল।

সে বলিয়াছিল, এই দেখ, আমি কলে কাজ করি, রোজকার করি আনেক। তা জাতে পতিত বলে আমাকে মেয়ে দেয় না কেউ। তু আমাকে বিয়ে করবি?

ঝরনার ধারে প্রশংসী যুবকটিকে বলিল, এই গাঁয়েই সবাই হাঁ হাঁ করবে— আমার জাতগুণ্ডিতেও করবে, তোর জাতগুণ্ডিতেও করবে! তার চেয়ে চল আমরা পালিয়ে যাই। সেইখানে দুজনায় সাঙা করে বেশ থাকব।

মৃদুস্বরে কথা, কিন্তু এই নিস্তরঙ্গ স্থানটির মধ্যে কথাগুলি যেন স্পষ্ট হইয়া ভাসিয়া আসিতেছে। বুড়ী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, তাহারও পৃথিবীর লোকের সঙ্গে সম্বন্ধ ছাড়িয়া বিবাহ করিয়া সংসার পাতিয়াছিল— মাড়োয়াড়ীবাবুর কলের কাছেই একখানা ঘর তৈয়ারী করিয়া তাহারা বাসা বাঁধিয়াছিল। 'বয়লার' না কি কলে— সেই প্রকাণ্ড পিপের মত কলটা— সেই কলটায় সে কয়লা ঠেলিত; তাহার মজুরি ছিল সকলের চেয়ে বেশি।

ঝরনার ধারে অভিসারিকা মেয়েটির কথা ভাসিয়া আসিল— উ হবে না। আগে আমার খুঁটে দশটি টাকা তু বেঁধে দে, তবে আমি যাব। নইলে বিদেশে পয়সার অভাবে খেতে পাব না, তা হবে না।

ছি ছি, মেয়েটার মুখে ঝাঁটা মারিতে হয়। এত বড় একটা জোয়ান মরদ যাহার আঁচল ধরিয়া থাকে, তাহাব নাকি খাওয়া-পরার অভাব হয় কোনদিন। মরণ তোমার! রূপার চুড়ি কি, সোনার শাখা-বাঁধা উঠিবে তোমার হাতে। ছি!

ছেলেটি কথার জবাব দিল না, মেয়েটিই আবার বলিল, কি, রা কাড়িস না যি? কী বলছিস্ বল? আমি আর দাঁড়াতে পারব কিন্তুক।

ছেলেটি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, কী বলব বল? টাকা থাকলে আমি তো দিতাম, রূপোর চুড়িও দিতাম, বলতে হ'ত না তোকে।

মেয়েটা বেশ হেলিয়া দুলিয়া রঙ্গ করিয়াই বলিল, তবে আমি চললাম।

যা।

আর যেন ডাকিস না।

বেশ।

অল্প একটু দূরে যাইতেই সাদা-কাপড়-পরা মেয়েটি ফুটফুটে চাঁদনীর মধ্যে যেন মিশিয়া মিলাইয়া গেল। ছেলেটা চুপ করিয়া ঝরনার ধারে বসিয়া রহিল। আহা! ছেলেটার যেমন কপাল! শেষ পর্যন্ত ছেলেটা যে কি করিবে— কে জানে। হয়তো বৈরাগী হইয়াই চলিয়া যাইবে, নয়তো গলায় দড়ি দিয়াই বসিবে। বৃদ্ধা শিহরিয়া উঠিল। ইহার চেয়ে তাহার রূপার চুড়ি কয় গাছা দিলে হয় না? আর টাকা? দশ টাকা সে দিতে পারিবে না। মোটে তো তাহার এক কুড়ি টাকা আছে, তাহার মধ্য হইতে দুইটা টাকা, না হয় পাঁচটা সে দিতে পারে। তাহাতে কী হইবে? মেয়েটা আর বোধ হয় আপত্তি করিবে না; আহা! জোয়ান বয়স, সুখের সময়, শখের সময়, আহা! ছেলেটিকে ডাকিয়া রূপার চুড়ি ও টাকা সে দিবে, আর উহার সঙ্গে নাতি-ঠাকুরমার সম্বন্ধ পাতাইবে। গোটাকতক চোখা চোখা ঠাট্টা সে যা করিবে!

মাটিতে হাতে ভর দিয়া ঝুঁজির মতো সে ছেলেটার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ছেলেটা যেন ধ্যানে বসিয়াছে, লোকজন আসিলেও খেয়াল নাই। হাসিয়া সে ডাকিল, বলি, ওহে লাগর শুনহ?

দস্তহীন মুখের অস্পষ্ট কথার সাড়ায় ছেলেটি চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া আতঙ্কে চীৎকার করিয়া উঠিল, পর-মুহূর্তেই লাফ দিয়া উঠিয়া সে প্রাণপণে ছুটিতে আরম্ভ করিল।

মুহূর্তে বৃদ্ধারও একটা পরিবর্তন হইয়া গেল; ক্রুদ্ধ মার্জারীর মত ফুলিয়া উঠিয়া সে বলিয়া উঠিল, মর মর— তুই মর। সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছা হইল, ক্রুদ্ধ শোষণে উহার রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা সব নিঃশেষে শুষিয়া খাইয়া ফেলে।

ছেলেটা আত্নাদ করিয়া বসিয়া পড়িল। পর মুহূর্তেই আবার উঠিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে পলাইয়া গেল।

পরদিন দ্বিপ্রহরের পূর্বেই গ্রামখানা বিস্ময়ে শঙ্কায় স্তম্ভিত হইয়া গেল। সর্বনাশী ডাইনী বাউরীদের একটা ছেলেকে বাণ মারিয়াছে। ছেলেটা সন্ধ্যায় গিয়াছিল ঐ ধাবে, মানুষের দেহরসলোলুপা রাক্ষসী গন্ধে আকৃষ্ট বাঘিনীর মত জানিতে পারিয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। ভয়ে ছেলেটি ছুটিয়া পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু রাক্ষসী তাহাকে বাণ মারিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। অতি তীক্ষ্ণ একখানা হাড়ের টুকরা মস্তপুত করিয়া নিক্ষেপ করিতেই সেটা আসিয়া তাহার পায়ে গভীর হইয়া বসিয়া গিয়াছে। টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিতেই সে কি রক্তপাত। তাহার দেহখানি ধনুকের মত বাঁকাইয়া দিয়া দেহের রস নিঙড়াইয়া লইতেছে।

কিন্তু সে তাহার কী করিবে?

কেন সে পলাইতে গেল? পলাইয়া যাইবে? তাহার সম্মুখ হইতে পলাইয়া যাইবে? সেই তাহার মতো শক্তিমান পুরুষ— যে আগুনের সঙ্গে যুদ্ধ করিত— শেষ পর্যন্ত তাহারই অবস্থা হইয়া গিয়াছিল মাংসশূন্য একখানি মাছের কাঁটার মত।

কে এক গুণীন নাকি আসিয়াছে। বলিয়াছে এই ছেলেটাকে ভালো করিয়া দিবে। তিলে তিলে শুকাইয়া ফ্যাকাসে হইয়া সে মরিয়াছিল! রোগ— ঘুসঘুসে জ্বর কাশি। তবে রক্তবর্মি করিয়াছিল কেন সে?

স্তব্ধ দ্বিপ্রহরের উন্মত্ত অস্থিরতায় অধীর হইয়া বৃদ্ধা আপনার উঠানময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সম্মুখে ছাতি-ফাটার মাঠ আগুনে পুড়িতেছে নিষ্পন্দ শব্দেহের মত। সমস্ত মাঠটাব মধ্যে আজ আর কোথাও এতটুকু চঞ্চলতা নাই। বাতাস পর্যন্ত স্থির হইয়া আছে।

যাহাকে সে প্রাণের চেয়েও ভালোবাসিত, কোনদিন যাহার উপর এতটুকু রাগ করে নাই, সেও তাহার দৃষ্টিতে শুকাইয়া নিঃশেষে দেহের রক্ত তুলিয়া মরিয়া গিয়াছে। আর তাহার ক্রুদ্ধ দৃষ্টির আক্রোশে, নিষ্ঠুর শোষণ হইতে বাঁচাইবে ঐ গুণীনটা।

হি-হি করিয়া অতি নিষ্ঠুরভাবে হাসিয়া উঠিল। উঃ, কী ভীষণ হাঁপ ধরিতেছে তাহার। দম যেন বন্ধ হইয়া গেল। কি যন্ত্রণা, উঃ— যন্ত্রণায় বুক ফাটাইয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইতেছে। ঐ গুণীনটা বোধহয় তাহাকে মস্তপ্রহারে জর্জর করিবার চেষ্টা করিতেছে। কর, তোর যথাসাধ্য তুই কর।

এখান হইতে কিন্তু পলাইতে হইবে। তাহার মৃত্যুর পর বোলপুরের লোকে যখন তাহার গোপন কথাটা জানিতে পারিয়াছিল, তখন কি দুর্দশাই না তাহার করিয়াছিল। সে নিজেই কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছিল। কলের সেই হাড়ীদের শঙ্করীর সহিত তাহার ভাব ছিল, তাহার কাছেই সে একদিন মনের আক্ষেপে কথাটা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিল।

তাহার পর সে গ্রামের বাহিরে একধারে লোকের সহিত সম্বন্ধ না রাখিয়া বাস করিতেছে। কত জায়গাই যে সে ফিরিল! আবার সে কোথায় যাইবে!

ও কি! অকস্মাৎ উত্তপ্ত দ্বিপ্রহরের তন্দ্রাতুর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া একটা উচ্চ কান্নার রোল ছড়াইয়া পড়িল! বৃদ্ধা স্তব্ধ হইয়া শুনিয়া পাগলের মতো ঘরে ঢুকিয়া খিল আঁটিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। সন্ধ্যার মুখে সে একটা ছোট পুঁটলি লইয়া ঐ ছাতি-ফাটার মাঠের মধ্যে নামিয়া পড়িল। পলাইবে— সে পলাইবে।

একটা অস্বাভাবিক গাঢ় অঙ্ককার ঘনাইয়া আসিতেছে। সমস্ত নিখর, নিস্তব্ধ। তাহারই মধ্যে পায়ের ধূলা উড়াইয়া বৃদ্ধা ডাইনী পলাইয়া যাইতেছিল। কতকটা দূরে আসিয়া সে বসিল, চলিবার শক্তি যেন খুঁজিয়া পাইতেছে না।

অকস্মাৎ আজ বহুকাল পরে তাহার নিজেরই শোষণে মৃত স্বামীর জন্য বুক ফাটাইয়া সে কাঁদিয়া উঠিল, ওগো, তুমি ফিরে এসো গো।

উঃ, তাহার নরুন-দিয়া চেরা ছুরির মত চোখের সম্মুখে আকাশের বায়ুকোণটা তাহার চোখের তারার মতোই খয়ের রঙের হইয়া উঠিয়াছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত পায়ের ধুলার আন্তরঙ্গের মধ্যে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া কালবৈশাখীর ঝড় নামিয়া আসিল। সেই ঝড়ের মধ্যে বৃদ্ধা কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গেল। দুর্দান্ত ঘূর্ণিঝড়! মাত্র দুই-চারি ফোঁটা বৃষ্টি।

পরদিন সকালে ছাতি-ফাটার মাঠের প্রান্তে সেই বহুকালের কণ্টকাকীর্ণ খৈরী ওল্মের একটা ভাঙ্গা ডালের সূচালো ডগার দিকে তাকাইয়া লোকের বিশ্বয়ের আর অবধি রইল না। শাখাটার তীক্ষ্ণগ্র প্রান্তে বিদ্ধ হইয়া ঝুলিতেছে ডাকিনি। আকাশপথে যাইতে যাইতে এ গুলীনের মন্ত্রপ্রহারে পঙ্গুপক্ষ পাখির মত পড়িয়া এ গাছের ডালে বিদ্ধ হইয়া মরিয়াছে। ডালটার নিচে ছাতি-ফাটার মাঠের খানিকটা ধূলা কালো কাদার মতো ডেলা বাঁধিয়া গিয়াছে, ডাকিনীর কালো রক্ত ঝরিয়া পড়িয়াছে।

অতীত কালের মহানাগের বিষের সহিত ডাকিনীর রক্ত মিশিয়া ছাতি-ফাটার মাঠ আত্ম আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল। চারিদিকে দিকচক্র রেখার চিহ্ন নাই, মাটি হইতে আকাশ পর্যন্ত একটা ধূমাচ্ছন্ন ধূসরতা। সেই ধূসর শূন্যলোকে কালো কতগুলি সঞ্চরমান বিন্দু ক্রমশ আকারে বড় হইয়া নামিয়া আসিতেছে।

নামিয়া আসিতেছে শকুনির পাল!

## অদ্বিতীয়া

বনফুল

বেশ ছিলাম।

আপিসে সাহেব এবং গৃহে মা স্বস্তী আমার প্রতি সদয় ছিলেন। সাহেব আমার মাহিনা বাড়াইয়াছেন এবং মা-স্বস্তী আমার সংসার বাড়াইতেছিলেন। আমার পিতৃমাতৃকুলে আর কেহ ছিল না। উত্তরাধিকারসূত্রে কিছু টাকাও জুটিয়া গিয়াছিল। খাসা ছিলাম।

প্রভাবতী অর্থাৎ আমার গৃহিণী গড়ে বছরে দেড়টি করিয়া সন্তান প্রসব করিয়া চারি বৎসরেই আমাকে ছয়টি পুত্রকন্যার মালিক করিয়া তুলিয়াছিলেন—মাঝে দুইবার যমজ হয়।

এবস্থি প্রজাবৃদ্ধিসত্ত্বেও কোন অভাব ছিল না। হঠাৎ কিন্তু বেকুব বনিয়া গেলাম।

পঞ্চম বর্ষেও গৃহিণী তাঁহার স্বাভাবিক গর্ভভার বহন করিতেছিলেন। এবার কিন্তু ব্যাপারটা স্বাভাবিক হইলেও সহজ ছিল না বোঝা গেল। কারণ তিনি মারাই গেলেন। তিনি তাঁহার পিত্রালয় শান্তিপুরে ছিলেন। যদিও আমার শ্বশুর ও শাশুড়ী উভয়েই অনেককাল স্বর্গীয় হইয়াছেন কিন্তু আমার শ্যালক বিনোদ ডাক্তার বলিয়া প্রভা প্রতিবারই সেখানে যাইত। বিনোদ লিখিতেছে—

“হঠাৎ ‘এক্সম্প্‌সিয়া’ হইয়া দিদি ৩/৪ ঘণ্টার মধ্যেই মারা গেলেন। আপনাকে খবর দেওয়ার সময় ছিল না। ‘কিডনি’ খারাপ ছিল। সেজ্জদি ছেলেদের লইয়া সম্বলপুরে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চিঠি বোধ হয় পাইয়াছেন।”

পাইলাম ত। তিনি লিখিতেছেন— “কি করিবে বল ভাই। সবই অদৃষ্ট। তোমার ছেলেমেয়েরা এখন আমার কাছে কিছুদিন থাকুক। আমি ত বাঁজা মানুষ। আমার কোন অসুবিধা হইবে না। ছেলেরা ভালই আছে। কোন ভাবনা করিও না। ইতি ”

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ছুটির দরখাস্ত করিলাম। কপালগুণে আমার সাহেবও বদলি হইয়া গিয়াছিলেন। ছুটি সূতরাং মঞ্জুর হইল না।

দুই

দুই মাস পরে।

সম্বলপুরবাসিনী শ্যালিকার আর একখানি পত্র পাইলাম। তিনি অন্যান্য নানা কথার পর লিখিতেছেন—

“প্রভা সতীলক্ষ্মী ভাগ্যবতী ছিল। সে গেছে, বেশ গেছে। জাজুল্যমান সংসারে স্বামী ছেলেপুলে সব রেখে গেছে। কিন্তু তোমার তা বলে সংসারটা ছারখার করা ত’ ভাল দেখায় না। উচিতও নয়। আমার কথা শোনো। আবার বিয়ে কর তুমি।... এখানে একটি বেশ ডাগর ডোগর মেয়ে আছে। যদি তোমার ইচ্ছে হয়— বলো, সম্বন্ধ করি। আমার ত’ মেয়েটিকে বেশ পছন্দ। তোমার নিশ্চয়ই পছন্দ হবে।”— ইত্যাকার নানারূপ কথা।

সাত দিন ভাবিয়া— অর্থাৎ এক টিন চা ও পাঁচ টিন সিগারেট নিঃশেষ করিয়া আমি এই চিরন্তন সমস্যার সে মীমাংসা করিলাম তাহা মোটেই অসাধারণ নয়। সেজ্জদিকে যে পত্র দিলাম তাহা অংশতঃ এইরূপ—

“বিয়ে করতে আর ইচ্ছে হয় না। প্রভার কথা সর্বদাই মনে পড়ে। কিন্তু দেখ সেজ্জদি, আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছের উপর নির্ভর করে ত সংসার বসে নেই। সে আপনার চালে ঠিক



চলছে ও চলবে। সুতরাং ভাবপ্রবণ হওয়াটা শোভন হলেও সুসুস্তির নয়— এটা ঠিকই। তাছাড়া দেখ আমরা “মা ফলেষু কদাচন” দেশের লোক। আর তোমরাও যখন বলছ— তখন আর একবার সংসারটা বজায় রাখার চেষ্টাই করা যাক!... দ্বিতীয় পক্ষের বিয়েতে আবার পছন্দ অপছন্দ। তোমার পছন্দ হয়েছে ত?...”

ক্রমশঃ বিবাহের দিন স্থির হইল। সম্বলপুরেই বিবাহ। সেজদি বুদ্ধিমতী। লিখিয়াছেন— “ছেলেদের লাহোরে বড়দির কাছে পাঠিয়ে দিলাম। বাপের বিয়ে যে দেখতে নেই।” স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলাম।

যথাকালে সাহেবের হাতে-পায়ে ধরিয়া হস্তাধিনেকের ছুটি লইয়া সোজা রওনা হইয়া পড়িলাম। একাই! এ বিয়ের কথা কাউকে বলিতে আছে? কি ভাবিয়া গোঁফটা কামাইয়া ফেলিলাম। একে এই কালো মোটা চেহারা— তাহার উপর কাঁচাপাকা একঝুড়ি গোঁফ লইয়া বিবাহ করিতে যাইতে নিজেরই কেমন বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল।

বিবাহ-বাসর।

ওই অবগুষ্ঠিতা চলি-পরা মেয়েটিই আবার আমার সঙ্গিনী হইতে চলিয়াছে। প্রভাকেও একদিন এই ভাবেই পাইয়াছিলাম— সে কোথায় চলিয়া গেল। আজ আবার আর একজন আসিয়াছে। ইহার ‘কিডনি’ কেমন— কে জানে। নানারূপ এলোমেলো কথা মনে আসিতে লাগিল। প্রভার মুখ বারবার মনে পড়ে। ছেলেগুলো না জানি এখন কি করিতেছে?... মৃত্যুর পরও কি আত্মা সত্যি থাকে?... এ মেয়েটি বেশ বড়সড় দেখিতেছি— কিন্তু ভারি জড়সড় হইয়া বসিয়া আছে— একেবারে মাথা নীচু করিয়া! আচ্ছা প্রভার আত্মার যদি— গৃহামি। গৃহামি!

যন্ত্রচালিতবৎ বিবাহ-অনুষ্ঠান চলিতে লাগিল। শুভদৃষ্টির সময় মেয়েটি কিছুতেই ঘোমটা খুলিল না। সেজদি বলিলেন— ভারি লাজুক। বাসরঘরেও শুনিলাম ভারি লাজুক। আপাদমস্তক মুড়িয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। আমিও ঘুমাইলাম। সেজদি লোক জমিতে দেন নাই। তাছাড়া এ দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহে কে আর আমোদ করিতে চায়? মেয়েটির আপন বলিতে কেহ ছিল না। পরের বাড়ীতে মানুষ। সেজদির বাড়ীতেই বিবাহ— বলিতে গেলে সেজদিই কন্যাকর্তা। সুতরাং বিবাহ-উৎসব জমে নাই।

\* \* \* \*

জমিল ফুলশয্যার রাতে!

বক্ষে অনেক আশা ও আশঙ্কা লইয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখি আমার ছয়টি সন্তান ও আব একটা নবজাত শিশু লইয়া স্বয়ং প্রভা খাটে বসিয়া! স্বপ্ন দেখিতেছি না কি?

প্রভা কহিল— “ছি, ছি, সেজদিরই জিং হল!”

“মানে?”

“মানে আবার কি? এবার ছেলে হওয়ার সময় ভারি কষ্ট হয়েছিল। অপরাধের মধ্যে সেজদিকে বলেছিলাম যে আমি মরে গেলে ওঁর ভারি কষ্ট হবে। সেজদি বলে— ‘হাতী হবে। তিনমাস যেতে না যেতে ফের বিয়ে করবে।’ আমি বললাম— ‘ককখনো নয়।’ তারপর বাজি রেখে সেজদি আর বিনোদে মিলে এই ষড়যন্ত্র! আমিও শান্তিপুুরেই ছিলাম। আজ এই সম্বন্ধেবেলা এসেছি। এসে দেখি সেজদিরই জিং। পাড়ার মাণকে ছোঁড়াকে কনে’ সাজিয়ে সেজদি বাজী জিতেছে। একশটি টাকা দাও এখন। ছি ছি— কি তোমরা! অমনি গোঁফটা কি বলে কামালে?”

আমার অবস্থা অবর্ণনীয়!

\* \* \*

পরদিন প্রভাতে সেজদির পাওনা চুকাইয়া দিয়াছি। এখন গোঁফটা উঠিলে যে বাঁচি।